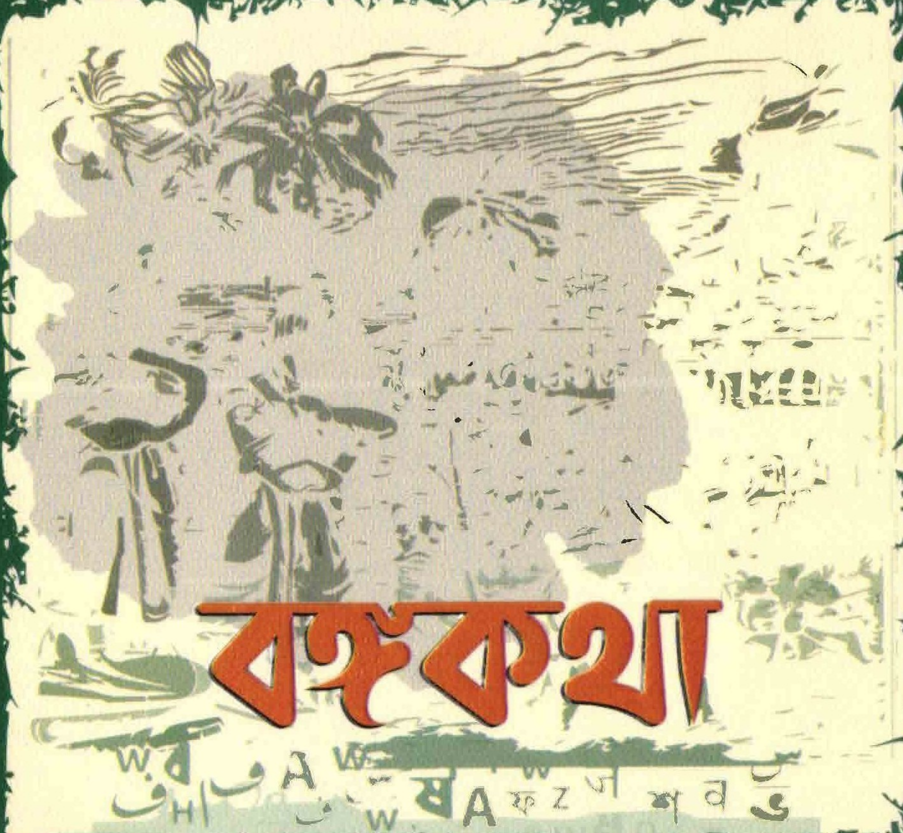

বঙ্গকথা

বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস

আহমেদ আফগানী

বঙ্গকথা

বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস

আহমেদ আফগানী

ইকরি বিকরি প্রকাশনী

www.pathagar.com

বঙ্গকথা

আহমেদ আফগানী

- **প্রথম প্রকাশ :** অক্টোবর-২০২৩
- **দ্বিতীয় প্রকাশ :** মার্চ-২০২৪

- **প্রকাশনায়**
  Ikri Bikri Prokashoni
  Brunton Road, Birmingham,
  United Kingdom B10 9HY

- **প্রকাশনায়**
  ইকরি বিকরি প্রকাশনী, ঢাকা।
  মোবাইল : ০১৫৬৮-৩৩৬৭৩৮
  Email : ikribikriprokashoni@gmail.com

- **অনলাইন পরিবেশক**
  রকমারী, ওয়াফিলাইফ
  ও সকল অনলাইন শপ

- **গ্রন্থস্বত্ব :** লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

- **ই.বি.পি :** ০১

- **মূল্য : ৮৫০ (আট শত পঞ্চাশ) টাকা**

BONGO KOTHA
Published by Ikri Bikri Prokashoni
Price: 850 Tk. Only USD: 20$
ISBN: 897-498-69732-8-8

www.pathagar.com

উৎসর্গ

তাওহীদবাদী বনাম মুশরিক; এই দীর্ঘ লড়াইয়ে যেসব মর্দে মুজাহিদ নিজের প্রাণ বিলিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা হাসিল করেছেন, সেসব শহীদের পবিত্র রুহের প্রতি। তাঁদের প্রতি সালাম ও দু'আ।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করুন।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লেখক আহমেদ আফগানী" যার দুঃসাহসী পদক্ষেপের ফসল বঙ্গকথা"। ২০১৫ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে এই দীর্ঘ ইতিহাস লেখার স্বপ্ন দেখেন লেখক। অবশেষে তা "বঙ্গকথা"নামে আজ পাঠকের হাতে। আলহামদুলিল্লাহ

ধন্যবাদ লেখককে।

বঙ্গকথা" বইটিতে অনেক বছরের কল্পিত ও মিথ্যে ইতিহাসের বিপরীতে সত্য ইতিহাসকে সামনে এনেছেন লেখক। এবার সত্যের সাথে দেখা হবে পাঠকের।

প্রকাশক হিসেবে মনে করি বইটি সচেতন পাঠককে নাড়া দেবে। সত্য ইতিহাস যখন মুখ থুবড়ে পড়েছে, ঠিক তখনই বঙ্গকথার আগমন। অনেক তথ্যের ভিত্তিতে সাজানো হয়েছে অজানা এই দীর্ঘ ইতিহাসের বইটি।

দীর্ঘদিন ধরে যে সব পাঠক সত্য ইতিহাসকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন, জানতে চেয়েছেন নিজ জাতির ইতিহাস। তাদের জন্য "বঙ্গকথা"।

আশাকরি প্রিয় পাঠকদের জন্য লেখক ও প্রকাশকের শ্রম স্বার্থক হবে। তাতেই আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির প্রথম সংস্করণে নানা রকম ভুল থাকতে পারে। যা পাঠকদের চোখে ধরা পড়বে।

প্রত্যাশা রইলো, প্রিয় পাঠক বিনা দ্বিধায় ভুলগুলি ধরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার সুযোগ করে দিবেন।

www.pathagar.com

পরিশেষে পাঠকদের প্রতি আহ্বান বইটির বহুল প্রচারে সহযোগিতা করবেন, সাথে থাকবেন, দু'আয় রাখবেন।

প্রিয় পাঠক, সুদীর্ঘ সময় ধরে জাতি বিকৃত ইতিহাসের কবলে। যা থেকে মুক্তি পেতে "বঙ্গকথা" বইটি পড়া সবার জন্য জরুরী। আশাকরছি বইটি আপনাদের প্রত্যেকের সংগ্রহে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল কৃতজ্ঞতা মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের প্রতি। আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমাকে বাছাই করেছেন। তিনি আমাকে সুস্থতার সাথে, নিরাপত্তা দিয়ে ও ধৈর্য দিয়ে কাজটি শেষ করার তাওফিক দিয়েছেন। এর পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি। তারা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

আমার বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তারা আমাকে নিয়মিত সাপোর্ট করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। অনলাইনের অসংখ্য বন্ধু, যাদের অনেককেই আমি চিনি না, তবে তারা আমাকে নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করেছেন এমন একটি ইতিহাসকে বই আকারে প্রকাশ করার জন্য।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। আপনাদের জন্য ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু দেওয়ার সামর্থ্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের উত্তমভাবে পুরস্কৃত করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করুন।

বঙ্গকথা বইটি লিখতে গিয়ে অনেক বইয়ের সহায়তা নিতে হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নানের "আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা" আব্বাস আলী খানের "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া, মহিউদ্দিন আহমেদের তিনটি বই (জাসদের উত্থান পতন, আওয়ামীলীগ: উত্থানপর্ব, আওয়ামীলীগ: যুদ্ধদিনের কথা), এম আই হোসেনের "বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ": বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, শর্মিলা বসুর "ডেড রেকনিং" ইত্যাদি। আমি এই লেখকদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ০১

প্রাচীন বাংলা

(খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ১২০৩ খ্রিস্টাব্দ)

অধ্যায় : ০২

মুসলিম বাংলা

(১২০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

অধ্যায় : ০৩

উপনিবেশিক বাংলা

(১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

অধ্যায় : ০৪

আধুনিক বাংলা

(১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় (প্রাচীন বাংলা)

- প্রাচীন বাংলার পত্তন তাওহীদবাদীদেরই হাতে ১৯
- আর্যদের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ২৪
- মৌর্য শাসনামলে বাংলাদেশ ২৯
- বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শাসন শুরু হয়েছিল যেভাবে.................. ৩৩
- কুষাণ সাম্রাজ্য ও বৌদ্ধধর্মের বিকৃতির ইতিহাস ৩৭
- শোষণের যে যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় ৪০
- বঙ্গাব্দের শশাঙ্ক, মাৎস্যন্যায় এবং পাল রাজাদের উত্থান............... ৪৫
- বাংলায় বৌদ্ধদের পুনরায় উত্থান ৪৮
- আবারো ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শাসন ৫২

দ্বিতীয় অধ্যায় (মুসলিম বাংলা)

- বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে ৫৬
- বাংলায় দিল্লীর শাসন যেভাবে শুরু হয়.................................. ৫৯
- খিলজি ও তুঘলকদের শাসন ৬৩
- অবহেলিত বাংলা যেভাবে 'শাহী বাংলা'-তে পরিণত হলো ৬৮
- বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন ৭৩

www.pathagar.com

- গণেশের উত্থান ৭৬
- ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান ৭৭
- হাবশি শাসন ৮৩
- হোসেন শাহী আমল ৮৩
- শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ও মুসলিমদের চ্যুতি ৮৫
- বাংলায় আফগানদের শাসন ৮৯
- বাংলায় মোঘল শাসনের সূত্রপাত ও ঢাকার গোড়াপত্তন ৯৬
- সুবাদার ইসলাম খান চিশতি ৯৮
- সুবাদার শাহ্ সুজা ১০২
- সুবাদার মীর জুমলা ১০৫
- সুবাদার শায়েস্তা খাঁ ১০৭
- নবাবী যুগে বাংলা ১১২
- নবাব সিরাজের পরাজয় তথা মুসলিমদের পরাজয় ১২০
- বাঙালি মুসলিমদের দুর্দশা ১২৬

তৃতীয় অধ্যায় (উপনিবেশিক বাংলা)

- বাংলায় ইংরেজদের ব্যাপক লুটপাট ১২৭
- অরাজনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বিদ্রোহ ১৩২
- সন্দ্বীপে কৃষকদের তিন-তিনটি বিদ্রোহ ১৩৮
- রংপুরের নূরুলদীনের কৃষক বিদ্রোহ ১৪৪
- বাংলায় প্রথম খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ১৪৮
- বাংলার প্রথম প্রতিরোধ জিহাদের সূচনা হয় যেভাবে ১৫৫
- মুশরিকদের বিরুদ্ধে মওলানা তিতুমীরের জিহাদ ১৬২
- সাতান্ন সালের খালক-ই-খুদা, মুলক-ই-বাদশাহ, হুকুম-ই-সিপাহী ১৬৯
- সাতান্ন সালের বিদ্রোহ ও তার আফটারম্যাথ ১৭২
- তারপরও ব্যর্থ এই বিদ্রোহ ১৭৬
- ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তী অবস্থা ১৭৭

www.pathagar.com

▶ আব্দুল লতিফ ও মুসলিমদের রাজনৈতিক উত্থান ১৭৯
▶ সৈয়দ আহমদ এবং তার আলিগড় আন্দোলন ১৮৫
▶ মুসলিমদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিকথা ১৮৯
▶ বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলিম ও মুশরিকদের দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি............... ১৯২
▶ মুসলিমলীগ গঠন ও মুসলিমদের রাজনৈতিক যাত্রা ১৯৬
▶ হিন্দু সমাজে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ও স্বদেশী (সন্ত্রাসবাদী) আন্দোলন.. ২০১
▶ নিজের নাক কেটে মুসলিমদের যাত্রা ভঙ্গ করলো মুশরিকরা ২০৮
▶ মুশরিকদের সাথে ঐক্যের কিছু ব্যর্থ চেষ্টা............................. ২১৫
▶ বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩.. ২১৯
▶ রেশমি রুমাল আন্দোলনের ইতিকথা.................................. ২২১
▶ খেলাফত আন্দোলন.. ২২৫
▶ হিজরত আন্দোলন.. ২২৮
▶ ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতার প্রথম ধাপ 'ভারত শাসন আইন-১৯৩৫' ২৩০
▶ বাংলার ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন ও তার ফলাফল ২৩৪
▶ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও তার রাজনীতি ২৪০
▶ লাহোর প্রস্তাব থেকে পাকিস্তান আন্দোলন ২৪৭
▶ পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শিক লড়াই................................ ২৫১
▶ ভারতের স্বাধীনতায় আরেকটি ব্যর্থ সুযোগ 'ক্রিপস মিশন'.......... ২৫৩
▶ জাপানের জোরে গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন.................... ২৫৮
▶ কোণঠাসা কংগ্রেসের সাথে মুসলিমলীগের কতক ঐক্য প্রচেষ্টা- ২৬১
▶ সি আর ফর্মুলা ২৬৩
▶ সাপ্রু প্রস্তাব... ২৬৬
▶ দেশাই-লিয়াকত চুক্তি ২৬৬
▶ ওয়াবেল পরিকল্পনা ২৬৮
▶ শিমলা সম্মেলন.. ২৬৮
▶ ১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিমদের গণরায়.. ২৭০

www.pathagar.com

- ক্যাবিনেট মিশন ও লীগ-কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার ২৭৩
- ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের দাঙ্গা রাজনীতি ২৮৩
- নোয়াখালী দাঙ্গা ও গান্ধীর ছাগল ২৮৬
- গান্ধীর ছাগল ২৯০
- অবশেষে পাকিস্তানের মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো ২৯০
- ১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ ২৯৭

চতুর্থ অধ্যায় (আধুনিক বাংলা)

- ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও জামায়াত ৩০৪
- ভাষা আন্দোলন ও এর ঘটনা প্রবাহ ৩১২
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের নাটকীয়তা ৩৩৩
- স্পিকার শাহেদ আলী হত্যা ও পাকিস্তানে গণতন্ত্রের কবর রচনা ... ৩৪৬
- আইয়ুব খাঁন ও তার মৌলিক গণতন্ত্র.................................. ৩৫৪
- ১৯৬০ সালের হ্যাঁ/না ভোট ৩৫৮
- ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ভাসানীর বিশ্বাসঘাতকতা ... ৩৬০
- যেমন ছিল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ.............................. ৩৬৫
- তাসখন্দ চুক্তি ও পাকিস্তানের পরাজয় ৩৭১
- আইয়ুবের ছয় দফা ও বিস্ময়কর রাজনৈতিক দুর্নীতি ৩৭৫
- বাংলার ইলুমিনাতি 'নিউক্লিয়াস'সম্পর্কে কিছু কথা ৩৮১
- ভুট্টো, পিডিএম এবং আইয়ুব খাঁনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন ৩৮৮
- আগরতলায় মুশরিকদের সাথে শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্র ৩৯৫
- মুশরিকদের সাথে করা আগরতলা ষড়যন্ত্র যেভাবে ফাঁস হয়......... ৪০৭
- ঊনসত্তরের গণভ্যুত্থান ও আইয়ুবের পতন ৪১৪
- সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ৪১৭
- ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি ৪১৮
- পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান ৪২২

www.pathagar.com

- পাকিস্তানের ১ম সাধারণ নির্বাচন ৪৩৭
- শেখ মুজিব কেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না?........ ৪৪৭
- অপারেশন সার্চলাইট এবং এর প্রেক্ষাপট.............................. ৪৫৮
- অপারেশন সার্চলাইট কী গণহত্যা ছিল? ৪৭৩
- ভারতীয় গুপ্তচরের চোখে মার্চের সেই দিনগুলি ৪৭৫
- জিয়া, তাজউদ্দিন ও স্বাধীনতার ঘোষণা................................ ৪৮২
- ১৯৭১ সালে দেশভাগের বিরুদ্ধে যারা ছিলেন ৪৯১
- আওয়ামীলীগের বেশিরভাগ নেতা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন ৪৯৭
- স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পক্ষে যারা ছিলেন ৫১১
- মুক্তিযুদ্ধ ও বাটা স্যু কোম্পানী.. ৫১৯
- ১৯৭১ এ যেভাবে ধরাশায়ী হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ৫২২
- ১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞ,ধর্ষণ ও সত্যাসত্য প্রসঙ্গ ৫২৭
- মেজর জিয়াউর রহমান ও গণহত্যা প্রসঙ্গ ৫৩৯
- তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র ৫৪৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শুরুর কথা

একটি জাতি যদি তাদের ইতিহাস না জানে তবে সে জাতির মেধায়, মননে জাতিগতভাবে হীনমন্যতা তৈরি হয়। দীর্ঘদিন শোষিত হওয়ার ফলে এবং শোষক ও তার অনুচরদের রচিত বিকৃত ইতিহাসের কবলে পড়ে এই জাতি তাদের শেকড় সম্পর্কে বেখবর হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে একজন বাঙালি আরেকজন বাঙালিকে 'বাঙাল' বলে তুচ্ছজ্ঞান করে। এটা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি।

বাংলার ইতিহাস মানে হলো তাওহীদবাদী ও মুশরিকদের চিরন্তন লড়াই। বাংলা ভাষা ও সভ্যতা তৈরি হয়েছে তাওহীদবাদীদের হাতে। আর এই জাতি সব সময় মুশরিকদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। মুশরিকরা কখনো সাঁড়াশি আক্রমণ করে, কখনো বন্ধুর বেশ ধরে এই জাতির অস্তিত্ব বিনাশে ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জাতি তাদের স্বকীয়তা ধরে রেখে আল্লাহর আনুগত্যে অটুট থেকেছে। তাই বহু বিচ্যুতির পরও বাংলায় তাওহীদবাদীদের এক অপূর্ব সম্মিলন তৈরি হয়েছে।

মুসলিম জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি বড় জাতি হলো বাঙালি জাতি। এই জাতির সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ জরুরি। এ জাতির ওপর মুশরিকদের সশস্ত্র হামলার সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাও হয়েছে ব্যাপক। এর অংশ হিসেবে প্রকৃত ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়েছে। ফলে বিকৃত ইতিহাস দিয়ে সন্ত্রাসীকে বানানো হয়েছে মহামানব আর মহামানবদের বানানো হয়েছে সন্ত্রাসী কিংবা অনগ্রসর গোষ্ঠী।

আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় চেষ্টা করেছি ক্রসচেকের মাধ্যমে সঠিক তথ্যগুলো তুলে নিয়ে আসার জন্য। এজন্য দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়েছে। এই বইয়ের জন্য আমাকে প্রায় পাঁচবছর প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে। এই বইতে আমাদের চার হাজার

www.pathagar.com

বছর আগের পূর্বপুরুষ (যতদূর জানা যায়) থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। বইটিকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রাবিড় জাতি, আর্যদের আক্রমণ, মৌর্য, সেন আমল, পাল আমল ও ইখতিয়ার উদ্দিনের বাংলা অধিকার পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজির বাংলার অধিকারের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয়।

বইটির ২য় অধ্যায়ে মুসলিম শাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মুসলিমদের সাড়ে পাঁচশত বছরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

বাংলায় মুসলিম শাসনের পতন হয় পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে। একই সাথে বাংলায় ইংল্যান্ডের উপনিবেশ কায়েম হয়। বইটির ৩য় অধ্যায়ে ১৯০ বছরের উপনিবেশিক বাংলার কথা বলা হয়েছে।

এই ১৯০ বছর বাংলার পতনের ইতিহাস। বাংলায় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা, শিল্প সবই নষ্ট করা হয় এই সময়ে। হাজার বছরের একটি সমৃদ্ধ জাতিকে গরীব ও অনগ্রসর জাতিতে রূপান্তরিত করা হয়।

এরপর ১৯৪৭ সালে বাংলার মুসলিম নেতারা এই উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম নেতাদের সাথে নিয়ে দেশ স্বাধীন করে। ইংরেজদের তাড়িয়ে দেয়। তাওহীদবাদীরা আবারো ঘুরে দাঁড়ায় ১৯৪৭ সাল থেকে। কিন্তু মুশরিকদের প্রবল ষড়যন্ত্র ও মুসলিম নেতাদের অদূরদর্শিতায় আবার বাংলার মানুষ মুশরিকদের কবলে পড়ে। ১৯৪৭ সাল থেকে শুরু হয় আধুনিক বাংলার ইতিহাস, যা ৪র্থ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে বললে পুরোপুরি সঠিক হবে না। বলা যেতে পারে এটা বাংলার দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সংকলন। ইতিহাস নতুন করে লেখা যায় না। এখানে বিভিন্ন গ্রন্থ ও সূত্র থেকে অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য অংশগুলো নিয়ে বাংলার একটি পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়াস চালানো হয়েছে। আমি চেষ্টা করেছি তথ্যসূত্রগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে।

মানুষ হিসেবে আমার ভুল আছে। এছাড়া মুদ্রণ জনিত ভুলও থাকতে পারে। বানান বিভ্রাট থাকতে পারে। ভুল বিশ্লেষণ হতে পারে। তথ্যগত দুর্বলতা থাকতে

www.pathagar.com

পারে। আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এই বিষয়গুলো থেকে মুক্ত থাকতে। তারপরও যদি আপনাদের কারো চোখে ভুলগুলো ধরা পড়ে তবে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা আপনার সমালোচনা ও সংশোধনী শ্রদ্ধার সাথে আমলে নিব, ইনশাআল্লাহ।

ইতিহাস, বিশেষত রাজনৈতিক ইতিহাস হুট করে পড়া যায় না। মাঝখান থেকে পড়া শুরু করলে ও এর ধারাবাহিকতা না থাকলে আমাদের ভুল বুঝার অবকাশ তৈরি হবে। বাঙালি জাতির উৎপত্তি থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন ধারাবাহিক ইতিহাস জানার জন্য এই বইটি সবার পড়া জরুরি। আশাকরি বইটি পাঠককে ইতিহাস নিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখাবে।

ইতিহাস জানা, অন্তত নিজ জাতির ইতিহাস জানা প্রতিটি সচেতন মানুষের একান্ত কর্তব্য। সঠিক ইতিহাস না জানলে ভবিষ্যত কর্মসূচি নির্ধারণে দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক। বাঙালি জাতিকে তাই সঠিক ইতিহাস জানানো আমার কর্তব্যজ্ঞান করেছি। আমার মরহুম দাদাজান আমাকে এই দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন ইতিহাসের বাঁকগুলো এবং এটাও দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে এবং কেন ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়ে।

মিথ্যার অতল সমুদ্রের মাঝ থেকে সত্যকে সেঁচে আনা কষ্টকর। তার চাইতেও বেশি কষ্টকর সত্যকে মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা। তারপরও আমি আমার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। বাংলার মানুষকে একটি ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এর দ্বারা অনেকেই এতদিনের বিশ্বাস ভাঙার কষ্ট পেতে পারেন। আবার ভুল বিশ্বাস ভাঙার আনন্দও পেতে পারেন। এটা নির্ভর করবে আপনি যা জানেন তার ওপর স্থির থাকতে চান নাকি সত্যকে আপন করে নিতে চান তার ওপর।

যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি এমন একটি বই প্রস্তুত করা জরুরি ছিল। তাই কাজটি করেছি। এর থেকে বাঙালি মুসলিম বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ্।

আহমেদ আফগানী
ahmedafgani@gmail.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বাংলার সভ্যতা তৈরি করে তাওহিদবাদীরা। সেই সভ্যতা ধারণ করে পৃথিবীর বুকে তৈরি হয় বাঙালি জাতি। এই জাতি পৃথিবীর বড় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন বাংলা মানে এখন থেকে চার হাজার বছর আগে শুরু হওয়া এই জাতির উপাখ্যান। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস মানে হলো খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছর থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস।

প্রাচীন বাংলার পত্তন তাওহীদবাদীদেরই হাতে

বাঙালি বহু জাতির মিশ্রণে তৈরি একটি সংকর জাতি। অনেক আগ থেকেই প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের দেহে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল বলেই কালক্রমে বাঙালি একটি সংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালি তার গঠনে ও চেহারায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যচিহ্ন বহন করে চলেছে বলেই বাঙালিদের মধ্যে আর্য-সুলভ ফর্সাবর্ণ যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি নিগ্রোদের মতো মোটা কোঁকড়া চুল ও পুরু ঠোঁটও দেখা যায়।

অনেকে বলে থাকেন, অস্ট্রিকভাষী আদি-অস্ট্রেলিয়রাই বাংলার প্রাচীনতম জাতি। তবে তাদের ভাষা, গড়ন, চলন ও সংস্কৃতির কোনো কিছুর সাথেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না এই অঞ্চলের মানুষদের সাথে। তাই অনেকে দাবী করলেও অস্ট্রিকভাষীরা বাংলার আদি বাসিন্দা এটা ধারণাই মাত্র। এই দাবীর পেছনে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী প্রাচীন বাংলায়

www.pathagar.com

এসেছিল। বাংলার ভাষা ও সভ্যতায় এই দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীর গভীর অবদান রয়েছে। এরাই প্রথম সভ্য জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলের।

দ্রাবিড় বলতে ঐতিহাসিকগণ দক্ষিণ, মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে অবস্থিত একটি বিশাল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সেই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষকে বুঝিয়ে থাকেন। আর্যরা ভারতবর্ষে আসার আগেই ভারতীয় উপমহাদেশ দ্রাবিড়-অধ্যুষিত ছিল। আর্যরা ইরান থেকে প্রাচীন ভারতে এসেছিল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে। এখানে উল্লেখ্য যে, বহিরাগত আর্যদের তুলনায় দ্রাবিড় সভ্যতা ছিল উন্নত। ঐতিহাসিক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার লিখেছেন, 'প্রাচীন দ্রাবিড়গণ বৈদিক আর্যদের অপেক্ষা সভ্যতায় কোনো অংশে পশ্চাৎপদ ছিল না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে আর্যগণ অপেক্ষা তাহারা অধিকতর উন্নত ছিল। বিজ্ঞানে, শিল্পে, যুদ্ধবিদ্যা ও বুদ্ধি কৌশলে তাহারা আর্যদের সম্যক প্রতিদ্বন্দী ছিল।'

এখন প্রশ্ন হলো- দ্রাবিড়রা কি ভারতবর্ষে সব সময়ই ছিল? নাকি তারাও কোনো এক সময়ে আর্যদের মতোই বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল? এই প্রশ্নে পণ্ডিতেরা দু'ভাগে বিভক্ত।

(ক) একদল পণ্ডিত মনে করেন যে দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে। এদের আদি বাসভূমি ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল।

(খ) আরেক দল পণ্ডিত মনে করেন- দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী ভারতবর্ষের আদি অধিবাসি।

তবে প্রথম মতটিই অধিকতরো গ্রহণযোগ্য। অবশ্য এর যথার্থ কারণও আছে। দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর বর্তমান বাসস্থান দক্ষিণ ভারত। সেখানকার সমাধিক্ষেত্রে যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর (ডিএনএ ইত্যাদির) মিল রয়েছে। তাছাড়া মিশরীয়দের সঙ্গেও দ্রাবিড়দের নৃতাত্ত্বিক মিল রয়েছে। এসব কারণে দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীকে ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠীর মানুষ বলে মনে করা হয়।[১]

দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীই প্রাচীন ভারতবর্ষে নগর সভ্যতার সূত্রপাত করেছিল। দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী ছিল সভ্য এবং তাদের সাংগঠনিক শক্তিও ছিল বেশি। যে

---

১. প্রাচীন বাংলার জনপদ ও জনজাতিগোষ্ঠী / কাবেদুল ইসলাম / মাওলা প্রকাশন / পৃ. ২৫

www.pathagar.com

কারণে নগরকে কেন্দ্র করে দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আসলে মিশর থেকে ভূমধ্যসাগর অবধি দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীর সভ্যতায় নগরকেন্দ্রিক উপাদানই বেশি। বিশিষ্ট বাঙালি ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, 'নব্যপ্রস্তরযুগের এই দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকেরাই ভারতবর্ষের নগর সভ্যতার সৃষ্টিকর্তা।'[২]

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে সেমিটিক দ্রাবিড়রা তাওহিদবাদী ধর্মমতের উত্তর-পুরুষ। এই দ্রাবিড়রা কারা এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলিম তার বিখ্যাত রিয়াজুস সালাতিন গ্রন্থে, "বলেন দ্রাবিড়রা মূলত নূহ আ. এর বংশধর। মহাপ্লাবণের পর নূহ আ. এর তিন ছেলে ছিল, হাম, সাম ও ইয়াফিস। নুহ আ. এর বড় ছেলে হামের ছিল ছয় ছেলে। তারা হলো, হিন্দ, সিন্দ, হাবাস, জানাস, বার্বার ও নিউবাহ।"

এদের মধ্যে হিন্দের মাধ্যমে ভারতবর্ষ আবাদ হয়েছিল। হিন্দের সন্তানরা এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল বলেই এ ভূখন্ড 'হিন্দুস্তান' নামে পরিচিত। আল্লাহর নবি নূহ আ. এর ছেলে ও নাতিদের সকলেই ছিলেন ঈমানদার ও ধর্মপ্রচারক। তারা ছিলেন তাওহীদবাদের পূর্ণ বিশ্বাসী। হামের বড় ছেলে হিন্দের ছিল চার ছেলে। তারা হলেন পূরব, বঙ্গ, দাখিন ও নাহরাওয়াল।

বড় ছেলে পূরবের মোট বিয়াল্লিশজন ছেলে ছিল। তারা ভারতবর্ষ ও এর আশেপাশে বসতি স্থাপন করে এবং অল্পকালের মধ্যেই তাদের বংশবিস্তার হয়। তারা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দের উল্লেখিত দ্বিতীয় ছেলে বঙ্গ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধরের আবাসস্থলই তার নামে অর্থাৎ 'বঙ্গ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।[৩] অর্থাৎ নূহ আ.-এর সময়ে ঘটে যাওয়া মহাপ্লাবনের পর এই অঞ্চলে তাওহীদবাদীরা মনুষ্যবসতি শুরু করে সভ্যতার পত্তন ঘটায়।

বহিরাগত আর্যরা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বে সিন্ধুসভ্যতার যে সব উন্নত নগরসমূহ ধ্বংস করেছিল সেসব নগরের নির্মাতা ছিল দ্রাবিড়গণ। তবে নগর জীবনের পাশাপাশি দ্রাবিড়রা বাংলায় কৃষি কাজও করতো। প্রাচীন বাংলায় দ্রাবিড়রা ধান

---

২ বাঙালির ইতিহাস / আদিপর্ব / নীহাররঞ্জন রায় / পৃ. ৭৫

৩. Riyazu-s-salatin; a history of Bengal / Ghulam Husain Salim / Translated by Maulavi Abdus Salam / P. 19

www.pathagar.com

চাষ করতো। ধান ছাড়াও দ্রাবিড়রা গম ও যব এর আবাদও করতো। দ্রাবিড়রা অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীদের মতো মাছ শিকার করে খেতো। মাছ ধরা ছাড়াও তারা নদীতে কিংবা সমুদ্রের ধারে মুক্তা ও প্রবাল আহরণ করতো। সংস্কৃত ভাষায় মুক্তা, নীর (পানি), মীন (মাছ) এসব শব্দের মূলে রয়েছে দ্রাবিড় শব্দ।

এ উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তারা এসেছে সেমিটিকদের আদি বাসভূমি পশ্চিম এশিয়া থেকে। ব্যাবিলন বা মেসোপটেমিয়া দ্রাবিড়দের উৎপত্তিস্থল। এই সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে। তারাই ইয়েমেন ও ব্যাবিলনকে সভ্যতার আদি বিকাশ ভূমিরূপে নির্মাণ করেছে। পৃথিবীতে প্রথম লিপি বা বর্ণমালা উদ্ভাবন দ্রাবিড় জাতিরই অবদান। সুপ্রাচীন এক গর্বিত সভ্যতার অধিকারী এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে আর্য আগমনের হাজার হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। অনুরূপ সভ্যতার পত্তন হয়তো তারা বাংলাদেশেও করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে সেগুলোর চিহ্ন এখন নেই।[৪]

এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, তারা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মতো সুন্দর নগরী পাক-বাংলায় নিশ্চয়ই নির্মাণ করেছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোনো চিহ্ন নেই। প্রাকৃতিক কারণে পাকবাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলা যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতি, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া পাকবাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দাজ করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না।'[৫]

উন্নততর সংস্কৃতির ধারক দ্রাবিড়রা আর্যদের শিরক ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের ব্রাহ্মণদের পবিত্র ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে কখনো মেনে নেয়নি। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপট, নজিরবিহীন জুলুম-সন্ত্রাস চালিয়েও এ এলাকার সাধারণ মানুষকে বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বশীভূত করা যায়নি। অথচ বিশ্বাস, শিক্ষা, সংকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈন ধর্ম এ এলাকায়

---

৪. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ২৩

৫. আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি / আবুল মনসুর আহমদ / পূর্বদেশ / ঈদ সংখ্যা-১৯৬৯

www.pathagar.com

প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই এখানকার মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। গৌতম বুদ্ধের অহিংসার বাণীও তারা গ্রহণ করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের আহ্বানে এখানকার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সবার শেষে ইসলামেই এই জাতিগোষ্ঠী তাদের সর্বশেষ গন্তব্য বলে নির্ধারণ করেছে।

তবে দ্রাবিড়দের সবচে বড় অবদান হলো বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে। বাংলা ব্যাকরণে অনেক নিয়ম দ্রাবিড় ভাষাতত্ত্বের ওপর গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া দ্রাবিড় ভাষার প্রচুর শব্দ বাংলা শব্দ ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। একটা সময় ছিল যখন- ভারতীয় উপমহাদেশে দ্রাবিড়ভাষাই ছিল সর্বসাধারণের ভাষা। এ কারণেই প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব পড়াই ছিল স্বাভাবিক। দ্রাবিড় ভাষা থেকে এসেছে বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ হলো: অণু, অরণি, অগুরু, অনল, কাল (সময়), কলা, পুষ্প, মুকুল, মল্লিকা, পূজা, গণ, কোণ, নীল, পন্ডিত, শব, অর্ক, অলস, ফল, বীজ, উলু, রাত্রি, অটবী, আড়ম্বর, তন্ডুল, খড়গ, কুন্ড, চন্দন, দন্ড, খাল, বিল, ময়ূর, কাক, কাজল, কোদাল, কেয়া, বালা, পল্লী, বেল, তাল, চিকণ, চুম্বন, কুটির, খাট, ঘুণ, কুটুম্ব ...ইত্যাদি। ভাষাই তো একটি জাতির আসল পরিচয়। সেই অনুসারে বলা যায় দ্রাবিড়রাই বাঙালি জাতির পূর্বসূরী।

আর্যরা এসে বঙ্গ বা বাংলাকে দমিয়ে রেখেছে। বঙ্গের শৌর্য ও সভ্যতা আর্য তথা ব্রাহ্মন্যবাদীদের হাতে ধ্বংস হওয়ার পর বহুদিন বাংলা অবনত ছিল। এরপর এই অঞ্চলে নতুন দাওয়াত নিয়ে আসেন গৌতম বুদ্ধ। দ্রাবিড়রা বেশিরভাগ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে যান। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ শাসন শুরু হয়। বঙ্গের নাম দিন দিন আরো মলিন হতে থাকে।

এরপর ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের মানুষ মুশরিক হতে শুরু করে। নানান দেব দেবীর পূজা শুরু করে দেয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ও বৌদ্ধদের আচার আচরণের মিশেলে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব হয়। এরা আর্যদের ধর্মীয় সাহিত্য 'বেদ'-কেই ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে সম্মান করে। যদিও তারা বেদ পড়তে পারতো না বা অনুমতি ছিল না। এই অঞ্চলের মানুষ মুশরিক হয়ে যাওয়ার কারণ এটাও যে আর্যরা আবার বৌদ্ধদের পরাজিত করে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে।

এরপর আবার মুসলিমরা এদেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসে। দ্রাবিড়দের

www.pathagar.com

উত্তরসূরী শূদ্ররা (দ্রাবিড়দের মধ্যে যারা মুশরিক হয়েছে তাদের আর্যরা নীচুজাত শূদ্র বলে অভিহিত করতো) দলে দলে মানবতার ধর্ম ইসলামে দাখিল হতে থাকে। এরপর বখতিয়ার খিলজির মাধ্যমে আর্য রাজবংশের পতন হয়।

বঙ্গের বেশিরভাগ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে মুসলিমদের সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ সালে) আবার দ্রাবিড়দের সেই বঙ্গকে তুলে নিয়ে আসেন।

প্রথমবারের মতো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন অববাহিকার বড় একটি এলাকাকে বাঙ্গালাহ্ নামে অভিহিত করেন। লখনৌতি ও বাঙ্গালাহ্কে তিনিই স্বাধীন সুলতানী শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল তার আমলেই প্রথম বাঙ্গালাহ্ নামে পরিচিত হয় এবং তিনি প্রথমবারের মতো শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ্ নাম ধারণ করে নিজেকে বৃহৎ বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এর ফলে এখানে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের সূচনা হয়। বাংলা আবার পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের- সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হলো"।[৬]

আর্যদের সামরিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। আর্য নামের এক ধ্বংসপ্রবণ জাতি প্রবেশ করেছিল উত্তর ভারতে। তবে বাংলা দখল করতে তাদের আরো এক হাজার বছর প্রয়োজন হয়। দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত আর্যদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই যাযাবরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অধিকাংশ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আর্যরা তাদের দখল বাড়াতে আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বৈদিক আর্যরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় অর্জনেও সকল শক্তি নিয়োগ করে। পুরো উত্তর ভারত আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু স্বাধীন

---

৬. বাঙালির ইতিহাস / আদিপর্ব / নীহাররঞ্জন রায় / পৃ. ২২

www.pathagar.com

মনোভাব ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত বঙ্গবাসীরা আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ায়। ফলে করতোয়ার তীর পর্যন্ত এসে সামরিক অভিযান বন্ধ হয়ে যায় আর্যদের।

বাংলাদেশের পূর্বপুরুষদের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বলেন, "প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল।" শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, "আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে ভাগলপুরের সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই"।[৭]

জাবি অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহ্নাওয়াজ বলেন, "আর্যদের আদিবাস ছিল ইরানের শেষ উত্তরে, কাস্পিয়ান সাগরের তীরে। কৃষিকাজ ছিল তাদের প্রধান পেশা। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের কৃষি জমির সংকট দেখা দেয়। ফলে তাদের খাদ্যের অভাব প্রকট হয়। বাধ্য হয়ে এরা নতুন জমির খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশে। এদেরই একটি দল দক্ষিণে এসে ইরানের মূল ভূমিতে বসতি গড়ে। এখানে বসবাস করতে করতে এক সময় খোঁজ পায় ভারত আর বাংলার। জানতে পারে সম্পদশালী এই দেশগুলোর মাটি খুব উর্বর। প্রচুর ফসল ফলে ওখানে। কৃষিজমির লোভে এক সময় আর্যরা ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। প্রথমে বসতি স্থাপন করে ভারতে। তারপর সুযোগ মত চলে আসে বাংলায়"।

তবে যত সহজে ভারতে আসতে পেরেছিল, বাংলায় প্রবেশ করা ততটা সোজা ছিল না। প্রথমদিকে বাংলার বীর যোদ্ধারা রুখে দিয়েছিল আর্য আগমন। আর্যদের এ সময়ের ইতিহাস জানার একমাত্র উপায় আর্যদের লেখা ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থের মূল নাম বেদ। এ কারণে আর্যদের ধর্মকে বলা হয় 'বৈদিক ধর্ম'। এই বৈদিক ধর্ম থেকেই ''সনাতন ধর্মে'র জন্ম হয়। সনাতন ধর্মকে আমরা সাধারণভাবে 'হিন্দু ধর্ম' বলে থাকি। বেদগ্রন্থের অনেক খণ্ড ছিল। যেমন ঋগবেদ, যযুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। বেদের লেখা থেকে জানা যায়, খুব নাক উঁচু জাতি ছিল আর্যরা। অর্থাৎ নিজেদের সকল জাতি থেকে অনেক বড় মনে করতো।

---

৭. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ / মন্মথমোহন বসু / কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৯) / পৃ. ২১

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে ভারত দখল করেছিল তারা। কিন্তু নিজেদের অন্যায়কে আড়াল করতে চেয়েছে বেদ গ্রন্থে।[৮]

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তার জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা বইতে লিখেন, "সামরিক অভিযান ব্যাহত হওয়ার পর আর্যরা অগ্রসর হয়ে বুদ্ধির আশ্রয় নেয়। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান পরিচালনা করে। তাই দেখা যায়, আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এ দেশে প্রথম আসেনি, আগে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। কেননা, ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেলে সামরিক বিজয় সহজেই হয়ে যাবে। এ এলাকার জনগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তা ছিল মূলত তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা হেফাযত করার লড়াই। তাদের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শত শত বছর স্থায়ী হয়। 'স্বর্গ রাজ্যে' প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের যে অসংখ্য কাহিনী ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি আর্য সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের কাহিনীকে এসব আর্য সাহিত্যে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ধর্মশাস্ত্রে কোনো মানবগোষ্ঠীকে এমন নোংরা ভাষায় চিহ্নিত করার নজির পাওয়া যাবে না"।[৯]

একই কথা বলেছেন কামরুদ্দীন আহমদ তার 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' বইয়ে, "তিন স্তরে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি। এদেশে প্রথমে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। বাংলা ও বিহারের জনগণ আর্য-অধিকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাও ছিল ধর্মভিত্তিক তথা সাংস্কৃতিক।

বেদগ্রন্থগুলোকে সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্য বলা হয়। এমন একটি বৈদিক সাহিত্যের নাম 'শতপথ ব্রাহ্মণ'। কিভাবে আর্যরা ভারতে এসেছে তা বলতে গিয়ে একটি গল্প সাজিয়েছিলেন আর্য লেখক। বলেছেন ভারত একটি অপবিত্র দেশ। নিচু জাতির মানুষেরা বাস করে এখানে। অগ্নি উপাসক উঁচু জাতির আর্যরা অমন দেশে বাস করতে পারে না।

---

৮. বাংলায় আর্য আগমন / ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ / দৈনিক ইত্তেফাক / ২৫ আগষ্ট, ২০১৫

৯. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ২৪-২৫

www.pathagar.com

তারপরও তারা ভারতে এসেছে কেন? বলেছে এই সমস্যাটির সমাধান করে নিয়েছিল আর্যরা। বইতে লেখা আছে, আর্যদের একজন মুনি অর্থাৎ ধর্মগুরু ছিলেন, যার নাম বিদেঘ। বিদেঘের একটি বিশেষ গুণ ছিল। তার মুখ দিয়ে আগুন বেরুতো। সে আগুনে পুড়ে পবিত্র হয়েছিল ভারত ভূমি। আর সেই পবিত্র মাটিতেই বসতি গড়েছিল আর্যরা। তবে বাংলায় পৌঁছতে তখনো অনেকটা বাকি ছিল।

বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চার শতক পর্যন্ত এদেশে আর্য-প্রভাব রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্য এবং তার পর গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় আর্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। মৌর্যদের বিজয়কাল থেকেই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বাড়তে থাকে। তারপর চার ও পাঁচ সালের গুপ্ত শাসনামলে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।

মৌর্য বংশের শাসনকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। আশোকের যুগ পর্যন্ত এই ধর্মে মূর্তির প্রচলন ছিল না। কিন্তু তারপর তথাকথিত সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটে। হিন্দু দেব-দেবীরা বৌদ্ধ মূর্তির রূপ ধারণ করে বৌদ্ধদের পূজা লাভ করতে শুরু করে। বৌদ্ধ ধর্মের এই বিকৃতি সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডট 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইয়ে লিখেছেন,

"Buddhism had, for a variety of reasons, declined and many of its ideas and forms had been absorbed into Hinduism. The Hinduization of the simple teachings of Gautama was reflected in the elevation of th Buddha into a Divine being surrounded, in sculptural representations, by the gods of the Hindu partheon. The Buddha later came to be shown as an incarnation of Vishnu."

সতিশচন্দ্র মিত্র তার 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পোড়াইয়া থাকেন, পূর্বে ইহা পুঁতিয়া রাখিতেন। .... উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখা হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগিত, তাহারা মনে করিতেন, উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়"।

www.pathagar.com

অর্থাৎ হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগার কারণে এভাবে বৌদ্ধদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই মুছে ফেলতে হয়েছিল। অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতিমা-পূজা চালু ছিল না। পরে বুদ্ধের শূন্য আসনে শোভা পেলো নিলোফার বা পদ্ম ফুল। তারপর বুদ্ধের চরণ দেখা গেলো। শেষে বুদ্ধের গোটা দেহটাই পূজার মণ্ডপে জেঁকে বসলো। এভাবে ধীরে ধীরে এমন সময় আসলো, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ লোপ পেতে থাকলো।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ শুরু হয়। আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবলভাবে আছড়ে পড়ে এখানে। এর মোকাবিলায় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতি বাংলার জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এ সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর জনগণের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী প্রতিরোধ শক্তিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন এ এলাকার প্রধান ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন, "আর্য রাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আন্দোলনের ফলাফল"।[১০]

এ আন্দোলনের তোড়ে বাংলা ও বিহারে আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল। আর্য-দখল থেকে এ সময় উত্তরাপথের পূর্ব-সীমানার রাজ্যগুলো শুধু মুক্তই হয়নি, শতদ্র নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা অনার্য রাজাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাচারের বিরুদ্ধে সৃষ্ট গণজোয়ারের শক্তিতেই আর্যরা পরাজিত হয় বাংলায়। এই আন্দোলনের নেতা শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শূদ্র-পুত্র মহাপদ্মনন্দ ভারত ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন এবং ক্ষত্রিয় শাসকদের নির্মূল করে সমগ্র ভারতকে অনার্য অধিকারে আনার শপথ করেছিলেন। তিনি এজন্য 'একরাট' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

---

১০. বাঙ্গালার ইতিহাস / রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় / পৃ. ২৭-২৮

www.pathagar.com

মৌর্য শাসনামলে বাংলাদেশ

মহাপদ্ম নন্দ দ্রাবিড় জাতির লোক ছিলেন। আর্যদের তিনি বাংলা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ মগধ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। মগধ প্রাচীন ভারতে ষোলটি মহা জনপদ বা অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম। ষোলটি মহা জনপদের মধ্যে মগধ বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই রাজ্য বর্তমানের বিহারের পাটনা, গয়া আর বাংলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। পরে এর রাজধানী পাটালিপুত্রে স্থানান্তরিত হয় রাজা অজাতশত্রুর সময়ে।[১১]

মহাপদ্মনন্দ নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের তথা আর্যদের পরাজিত করে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তাকে ভারতের প্রথম সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। সামাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি ২, ০০, ০০০ লক্ষ পদাতিক, ২০, ০০০ হাজার অশ্বারোহী, ২, ০০০ হাজার রথ ও ৩, ০০০ হাজার হস্তীবিশিষ্ট সুবিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। গ্রিক ঐতিহাসিক প্লুটার্কের মতে তার বাহিনী আরো বড় ছিল। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন মহাপদ্ম নন্দের ছেলে ধননন্দ। তিনিই ছিলেন নন্দ বংশের শেষ রাজা।

আর্যদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যক্তি চাণক্য এই নন্দ রাজবংশকে ধ্বংস করার জন্য কাজ শুরু করেন। তিনি ক্ষত্রিয় রাজাদের একত্রিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে সক্ষম হননি। তিনি এক ক্ষত্রিয়কে অর্থশাস্ত্র, যুদ্ধনীতি, রাজনীতির জ্ঞান দেন এবং তাকে মগধ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলেন তক্ষশীলা বিদ্যালয়ে। তক্ষশীলা হলো বর্তমান পাকিস্তানে পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডিতে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য সমস্ত জ্ঞান লাভ করে।

চন্দ্রগুপ্তকথা নামক গ্রন্থানুসারে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ও চাণক্যের সেনাবাহিনী প্রথমদিকে নন্দ সাম্রাজ্যের কর্তৃক পরাজিত হয়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত এরপর বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ধননন্দ ও তার সেনাপতি ভদ্রশালাকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং অবশেষে পাটলিপুত্র নগরী অবরোধ করে ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে নন্দ সাম্রাজ্য অধিকার করেন। এভাবেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শাসনামল শুরু করেন।

---

১১. A History of India: Volume 1 / Romila Thapar / P. 384

www.pathagar.com

চন্দ্রগুপ্ত তার রাজত্বের শেষ পর্যন্ত তামিল ও কলিঙ্গ অঞ্চল ব্যতিরেকে ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ স্থান অধিকার করতে বা পদানত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান, উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি পর্যন্ত তার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এর চেয়ে বৃহৎ সাম্রাজ্য নির্মিত হয়নি।[১২]

চন্দ্রগুপ্ত ও তার প্রধান পরামর্শদাতা চাণক্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। চাণক্য রচিত অর্থশাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে চন্দ্রগুপ্ত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসন গড়ে তোলেন। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির সাথে সাথে এই সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার ফলস্বরূপ একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে, চন্দ্রগুপ্তের মৌর্যের বিশাল সেনাবাহিনীতে ৪ লক্ষ সৈন্য ছিল।

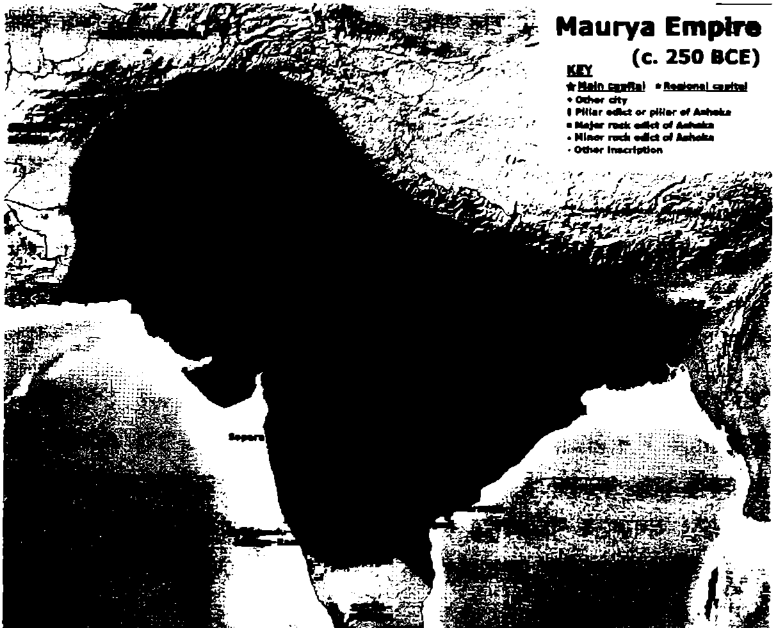

১২ Ancient Indian History And Civilization / S N Sen / P. 165

www.pathagar.com

ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় এলাকাজুড়ে শাসন করেছে মৌর্য বংশের রাজারা। এই মৌর্যদের সময়েই আর্যরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বাংলায় প্রবেশ করেছিল। এখনকার বাংলা অঞ্চল তখন একটি প্রদেশ ছিল। প্রদেশকে তখন বলা হতো, 'ভুক্তি'। বাংলা অঞ্চলের এই ভুক্তিটির নাম হয় 'পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তি'। এই ভুক্তিটির রাজধানী করা হয় আজকের বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়। মৌর্য শাসনামলে এর নাম ছিল 'পুন্ড্রনগর'।[১৩]

মৌর্যবংশের রাজাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১-২৯৮ অব্দ), বিন্দুসার (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮-২৭২ অব্দ) এবং অশোক (খ্রিস্টপূর্ব ২৭২-২৩২ অব্দ) ছিল উল্লেখযোগ্য। অশোকের মৃত্যুর পর উল্লেখযোগ্য কোনো রাজা মৌর্য বংশে আসেনি।

২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের জৈন ধর্ম গ্রহণ ও রাজ্য শাসন থেকে স্বেচ্ছা অবসরের পর তার পুত্র বিন্দুসার মাত্র বাইশ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। বিন্দুসার মৌর্য সাম্রাজ্যকে তিনি দক্ষিণ দিকে আরো প্রসারিত করেন এবং কলিঙ্গ, চের, পাণ্ড্য ও চোল রাজ্য ব্যতিরেকে সমগ্র দক্ষিণ ভারত ছাড়াও উত্তর ভারতের সমগ্র অংশ তার করায়ত্ত হয়। তার রাজত্বকালে তক্ষশীলার অধিবাসীরা দুইবার বিদ্রোহ করেন কিন্তু বিন্দুসারের পক্ষে তা দমন করা সম্ভব হয়নি। তক্ষশীলার বিদ্রোহের মূল কারণ আর্যরা। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মৌর্য শাসকদের নিজেদের মতো করে চালাতে চাইলেন কিন্তু তারা আর্যদের সব পরামর্শ মানতেন না বিশেষ করে জাতিভেদ মানতে চাইতেন না। এই নিয়ে আর্যরা বিদ্রোহ করে।

২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিন্দুসার তার অপর পুত্র সুসীমকে উত্তরাধিকারী হিসেবে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুসীমকে উগ্র ও অহঙ্কারী চরিত্রের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে বিন্দুসারের মন্ত্রীরা তার অপর পুত্র অশোককে সমর্থন করেন। রাধাগুপ্ত নামক এক মন্ত্রী অশোকের সিংহাসনলাভের পক্ষে প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং পরবর্তীকালে তার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অশোক সুসীমকে হত্যা করেন।[১৪]

সিংহাসনে আরোহণ করে অশোক তার সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন।

---

১৩. পুন্ড্রনগর / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/31S5QrF/ অ্যাকসেস ইন ২২ আগস্ট ২০১৯

১৪. India: From Indus Valley Civlization to Mauryas / Gyan Swarup Gupta / P. 268

www.pathagar.com

উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বতমালা (আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত) থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ তার অধীনে চলে আসে। তার রাজত্বকালের শুরুর দিকে তিনি কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হন এবং অগণিত মানুষ উদ্বাস্তু হন। অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপিতে বর্ণিত হয়েছে যে কলিঙ্গের যুদ্ধে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ও তাদের আত্মীয় স্বজনদের অপরিসীম কষ্ট দেখে অশোক দুঃখে ও অনুশোচনায় দগ্ধ হন। এই ভয়ানক যুদ্ধের কুফল লক্ষ্য করে যুদ্ধপ্রিয় অশোক একজন শান্তিকামী ও প্রজাদরদী সম্রাট এবং বৌদ্ধ ধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় শুধুমাত্র মৌর্য্য সাম্রাজ্য নয়, এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়।[১৫]

সম্রাট অশোকের সময় বর্তমান বাংলা তৎকালীন পুণ্ড্রনগরের শাসকরা প্রজাদের প্রতি ভালো আচরণ করতেন। তাদের সুখে রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তবুও স্বস্তি ছিল না বাংলার মানুষের। স্বাধীনতা প্রিয় বাংলার মানুষের এই পরাধীনতা ভালো লাগেনি। বাংলার কোনো কোনো অংশে সুযোগ পেলেই তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতো। এর প্রমাণ হচ্ছে গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে ওঠা একটি স্বাধীন রাজ্য। গ্রিক লেখকরা এই রাজ্যটির নাম লিখেছেন 'গঙ্গারিডি'। হিসেব মতে বাঙালির এই স্বাধীন রাজ্যটি গড়ে উঠেছিল মৌর্য যুগে। এই শক্তিশালী রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে চার হাজার হাতির এক বিশাল বাহিনী ছিল।

অশোকের মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চাশ বছর দশরথ, সম্প্রতি, শালিশুক, দেববর্মণ, শতধনবান ও বৃহদ্রথ এই ছয় জন সম্রাটের রাজত্বকালে মৌর্য্য সাম্রাজ্য দুর্বল হতে থাকে।

মৌর্য্য শাসকেরা মূলত জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতমের জীবনধারা এবং তাদের সত্য-সন্ধানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মওলানা আবুল কালাম আযাদসহ অনেক গবেষক মনে করেন যে, তারা হয়তো বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাদের সে সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব।

---

১৫. Asoka and the Buddhist Emperor of India / Vincent A. Smith / P. 130-134

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান তালিব লিখেছেন, "জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রাত্মা ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য ছাড়া বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরুপণ করে যে, বেদবিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে"।[১৬]

মৌর্যরা সরাসরি আর্যদের প্রতিনিধিত্ব না করলেও প্রচুর আর্য এ সময় বাংলায় প্রবেশ করে। তারা তাদের কৃষ্টি, কালচার ও ধর্ম দিয়ে দ্রাবিড়দের প্রভাবিত করে। পরবর্তী গুপ্ত আমলে আর্যরা পুরোপুরিভাবে দ্রাবিড়দের সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়।

বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শাসন শুরু হয়েছিল যেভাবে

সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য্য সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শাসক শাসন করতে থাকেন। বাংলা, বিহার, নেপাল এই অঞ্চল শেষ পর্যন্ত মৌর্য্যদের অধীনে ছিল। মৌর্যদের শেষ শাসক ছিলেন বৃহদ্রথ।

---

১৬. বাংলাদেশে ইসলাম / আব্দুল মান্নান তালিব / পৃ. ৩৭-৩৮

www.pathagar.com

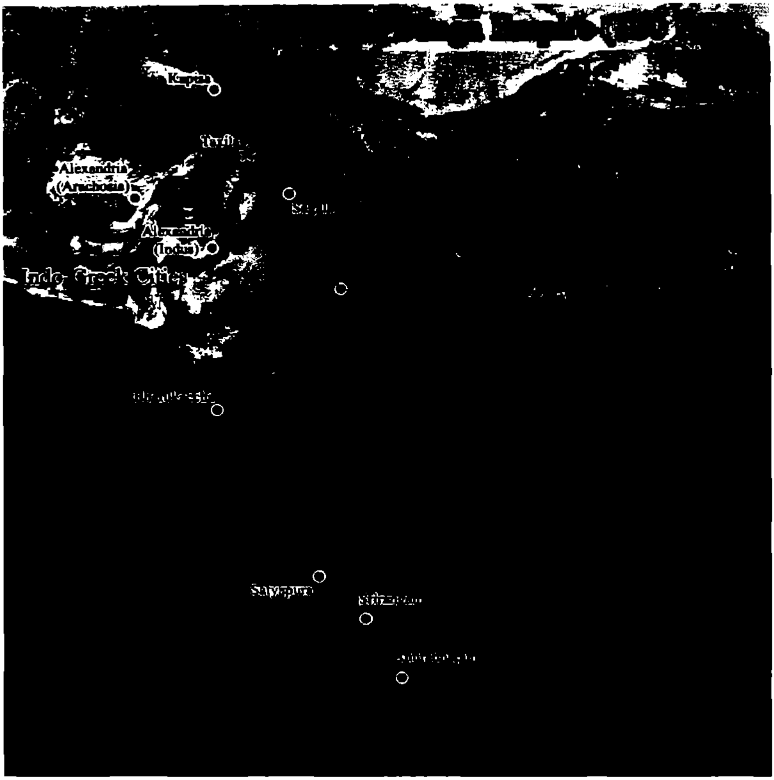

খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে মৌর্য রাজবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র রাজা হন। এই সূত্রে মৌর্য সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় শুঙ্গ-রাজবংশের শাসন। হর্ষচরিত মতে, সেনা পরিদর্শনকালে সেনাপতি পুষ্যমিত্র সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। তার পুরো নাম পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। এই কারণে তার এবং তার উত্তরাধিকারদের রাজত্বকালকে শুঙ্গ রাজত্বকাল বলা হয়। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যদের সেনাপতি থাকলেও তিনি ছিলেন একজন আর্য ও ব্রাহ্মণ। মৌর্যদের সাথে তার বিবাদের মূল কারণ তার ধর্মীয় পার্থক্য। শেষদিকের সব মৌর্য সম্রাটরাই বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন যেটা আর্য তথা ব্রাহ্মণদের চক্ষুশূল ছিল।[১৭]

১৭. বাংলাদেশের ইতিহাস (আদিপর্ব)/রমেশচন্দ্র মজুমদার / অনুশীলন / শুঙ্গ রাজবংশ / https://bit.ly/2L1sMyW / অ্যাকসেস ইন ২৯ আগস্ট ২০১৯

www.pathagar.com

মৌর্য সাম্রাজ্যের নয়জন শাসক ছিলেন। তারা হলেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য, বিন্দুসার, অশোক, দশরথ, সম্প্রতি, শালিশুক, দেববর্মণ, শতধনবান, বৃহদ্রথ। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় খৃস্টপূর্ব ১৮৫ সাল থেকে সরাসরি আর্য শাসন তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন শুরু হয়। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ছিলেন শুঙ্গ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শুঙ্গ সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী পাটালিপুত্রে (বিহার)। পরে তারা তাদের রাজধানী বিদিশাতে স্থানান্তর করেন। বিদিশা ভারতের মধ্য প্রদেশের একটি জেলার নাম।

শুঙ্গ সাম্রাজ্য প্রায় ১১০ বছর স্থায়ী হয়। এই সময়ে তারা বৌদ্ধদের ওপর ভয়ংকর নির্যাতন করে। মৌর্য বংশের পর প্রথম ব্রাহ্মণ সম্রাট ছিলেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গ এবং প্রায় সব ঐতিহাসিক মনে করেন তিনি বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করতেন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের মাধ্যমে এই সময় বৌদ্ধধর্মকে কাশ্মীর, গান্ধার ও ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে তাড়িয়ে দেন। দিব্যবদান গ্রন্থের অশোকবদান, প্রাচীন তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথের রচনা প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রের মাধ্যমে বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়। শুঙ্গ রাজারা বৌদ্ধ মঠ পুড়িয়ে দেন, বৌদ্ধস্তুপগুলি ধ্বংস করেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নির্বিচারে হত্যা করেন এবং তাদের মাথার জন্য পুরস্কার ধার্য করেন।[১৮]

অশোকবদানে উল্লেখ রয়েছে, "পুষ্যমিত্র চারশ্রেণীর সেনা সজ্জিত করেছিলেন, এবং বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংস করবার জন্যে তিনি কুক্কুতরম (পাটালিপুত্রে) যাত্রা করেছিলেন....অতঃপর পুষ্যমিত্র সংঘরম ধ্বংস করলেন, সেখানকার সন্ন্যাসীদের হত্যা করলেন, এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন....কিছু সময় পর, তিনি শাকলে উপনীত হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি তাকে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মাথা উপহার দিতে পারবে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন।" (দিব্যবদান গ্রন্থের অশোকবদান : ২৯৩)[১৯]

ভারতীয় পৌরাণিক সূত্র যেমন, ভবিষ্য পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে মৌর্য যুগের পর ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে হত্যার কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে। "এই সময়ে (চন্দ্রগুপ্ত,

---

১৮. Sarvastivada / P. 38–39

১৯. The legend of King Aśoka : a study and translation of the Aśokāvadāna / John Strong

www.pathagar.com

বিন্দুসার ও অশোকের শাসনের পর) কাণ্বকুব্জ নামক সর্বশ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ অর্বুদ পর্বতের শিখরে বলিযজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। বৈদিক মন্ত্রের প্রভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান (বলি) থেকে চারজন ক্ষত্রিয়ের আবির্ভাব হয়। (...) তারা অশোককে তাদের অধীনে রাখেন এবং সকল বৌদ্ধদের নির্মূল করেন। মনে করা হয়, সেখানে ৪০ লক্ষ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করা হয়। [২০]

পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধিপত্য এবং পশুবলি (যজ্ঞ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন বলে জানা যায়; এই পশুবলি অশোকের সময় থেকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। শুঙ্গ রাজবংশের সময় আর্যরা তাদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলা অঞ্চলে দ্রাবিড় ও বৌদ্ধদের সকল পাঠশালা বন্ধ ও ধ্বংস করে। সেখানে তারা তাদের বিদ্যালয় স্থাপন করে। বাংলা থেকে একেশ্বরবাদের অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া শুঙ্গ আমল থেকে শুরু হয়।

দেবভূতি ছিলেন শুঙ্গ রাজবংশের শেষ সম্রাট। শুঙ্গ সম্রাট ভগভদ্রের পরে তিনি ৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন। দেবভূতি একজন দুশ্চরিত্র শাসক ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি বেদ অনুসারে চলতেন না। ফলে তার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব কাণ্ব তাকে হত্যা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেন। যার ফলে শুঙ্গ রাজবংশের শাসনের অবসান ঘটে ও কাণ্ব রাজবংশের শাসন শুরু হয়। শাসনের প্রকৃতি অনুসারে শুঙ্গ ও কাণ্ব রাজাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তারা উভয়েই বেদ অনুসরণ করতেন এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাণ্ব বংশে ৪ জন রাজা ছিলেন। তারা খৃস্টপূর্ব ৩০ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। সাতবাহন শাসক দ্বারা তাদের পরাজয় হয়।

মৌর্য্য শাসনামলে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ভিত্তিক সামন্তরাজা সাতবাহনরা মৌর্য্যদের অনুগত ছিল। অশোকের মৃত্যুর পর তারা স্বাধীনভাবে দক্ষিণ ভারত শাসন করতো। তাদের হাতে বাংলা দখল হয় খৃস্টপূর্ব ৩০ সালে এবং কাণ্বরা পরাজিত হয়। সাতবাহনের রাজারা নিজেদের হিন্দু ধর্মের দাবী করলেও তারা বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের ব্যাপারে ছিল বেশ উদার।

---

২০. পুরাণ / ভবিষ্য পুরাণ / প্রতিসর্গ পর্ব / পৃ. ১৮/ https://bit.ly/2UfCQas / অ্যাকসেস ইন ২৯ আগস্ট ২০১৯

www.pathagar.com

সাতবাহনরা মূলত অন্ধ্রপ্রদেশ ভিত্তিক হিন্দুস্থানের দক্ষিণ অংশে শাসন করতো। তারা বাংলা অধিকার করলেও বাংলায় তাদের ভালো প্রভাব কখনোই তৈরি হয়নি। তবে তারা ভারতের দক্ষিণ অংশে বহু বছর শাসন করেছে। এই অংশে যাতায়াতের ভালো সুবিধে না থাকায় বিদেশী কোনো গোষ্ঠীই সাতবাহনদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি বহু বছর। ঈশা আ. এর জন্মের ২৩০ বছর আগে থেকে শুরু হওয়া এই সাম্রাজ্য ঈশা আ. এর জন্মের পরে আরো ২২০ বছর রাজত্ব করে। তাদের ইতিহাস প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের ইতিহাস। আমরা যেহেতু বাংলার শাসকদের নিয়ে আলোচনা করবো তাই তাদের নিয়ে আর বিস্তারিত বলতে আগ্রহী নই। তবে ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কৃষ্টি কালচার ভুলিয়ে দিতে এই সাম্রাজ্য ভালো ভূমিকা রেখেছিল।

www.pathagar.com

সাতবাহনের পাশাপাশি বাংলার শাসক হিসেবে কুষাণ সাম্রাজ্যের কথাও শোনা যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সমস্ত বৈদেশিক জাতি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের মধ্যে কুষাণরাই ছিল একমাত্র আলোচনাযোগ্য। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতি বাস করতো। হিউঙ-নু নামে অপর এক যাযাবর জাতির তাড়া খেয়ে তারা সির দরিয়া নদী তীরবর্তী অঞ্চলে এসে সেখান থেকে শকদের বিতাড়িত করে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু হিউঙ-নুরা এই অঞ্চল থেকেও তাদের উৎখাত করায় তারা আবার শকদের যারা ইতিপূর্বে তাদের তাড়া খেয়ে ব্যাকট্রিয়ার বসতি স্থাপন করেছিল তাদের উৎখাত করে। পূর্বের সেই ব্যাকট্রিয়ার বর্তমান নাম বলখ। এটি বর্তমানে আফগানিস্তানের উত্তর দিকের একটি প্রদেশ।

ব্যাকট্রিয়ার আসার পর ইউ-চিদের দলগত সংহতি বিনষ্ট হয় ও তারা পাঁচটি পৃথক শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। কুষাণরা ছিল এই পাঁচ গোষ্ঠীর অন্যতম। চৈনিক ঐতিহাসিক সুমা-কিয়েনের মত অনুযায়ী কুজুল কদফিসেস নামে জনৈক ইউ-চি ঐ পাঁচটি গোষ্ঠীকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করেন ও ভারতে প্রবেশ করে কাবুল ও কাশ্মীর দখল করেন। এই কুজুল কদফিসেস ছিলেন কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কুজুল কদফিসেস মারা গেলে তার পুত্র বিম কদফিসেস রাজা হন।

কণিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তার সঙ্গে কুজুল ও বিম কদফিসেসের কী সম্পর্ক ছিল, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেকে মনে করেন তার সঙ্গে এই বংশের প্রথম দু'টি রাজার সঙ্গে কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। কণিষ্কের আমলেই কুষাণ সাম্রাজ্য সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তার লাভ করে ও উত্তর ভারতের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন ৭৮ খ্রিস্টাব্দে "শকাব্দ" নামে যে বর্ষগণনা শুরু হয়, কণিষ্ক ছিলেন তার প্রবর্তক। এই সূত্র অনুসারে কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।[২১]

কণিষ্কের শাসনের সময়ই বাংলা কুষাণদের অধিকারে আসে। হিউয়েন সাঙের মতে কণিষ্কের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার

---

২১. প্রাচীন ভারত / সুকুমারী ভট্টাচার্য / কুষাণ সাম্রাজ্য / https://bit.ly/2Zw30XL / অ্যাকসেস ইন ২৯ আগস্ট ২০১৯

www.pathagar.com

এবং এর বিস্তৃতি ছিল উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে সাঁচী ও পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা থেকে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত।

বলা চলে সাতবাহন সাম্রাজ্য ও কুষাণ সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি অবস্থান করেছে বাংলা অঞ্চল। ফলশ্রুতিতে কোনো সাম্রাজ্যেরই ভালো প্রভাব বিস্তার হয়নি এখানে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে এখানে স্থানীয় জমিদার প্রথা চালু হয়েছে। কিছু অংশ প্রাচীন দ্রাবিড় গোষ্ঠী, কিছু বৌদ্ধরা ও কিছু অংশ ব্রাহ্মণ জমিদাররা শাসন করতো।

ভারতের ইতিহাসে কণিষ্কের স্থান ও গুরুত্ব অবশ্য কেবল মাত্র একজন কৃতি ও দক্ষ সেনানায়ক হিসেবে নয়। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে তার অবদানের জন্যই কণিষ্ক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন ও পুরুষপুরে একটি বহুতল চৈত্য নির্মাণ করেন। অশোকের পর তার সময়েই বৌদ্ধধর্ম পুনরায় রাজানুগ্রহ লাভ করে। এর ঢেউ পড়ে বাংলাতেও। শুঙ্গ ও কাণ্ব শাসনের সময় পালিয়ে যাওয়া বৌদ্ধরা আবার বাংলায় ফিরে আসে এবং বগুড়ার মহাস্থানগড় তথা পুন্ড্রনগরে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[২২]

ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে কণিষ্ক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তার প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম খোটান, চীন, জাপান ও কোরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কণিষ্ক ছিলেন দ্বিতীয় অশোক। এর প্রভাব বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও কণিষ্ক অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল ছিলেন বলে ইতিহাসে স্বীকৃত।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কণিষ্ক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ, বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন, বৌদ্ধ সাহিত্যিক বসুমিত্র, স্বনামধন্য চিকিৎসক চরক, স্থপতি এজেসিলাস রাজনীতিবিদ মাথর প্রভৃতি মনীষীগণ তার রাজত্ব কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, স্তুপ ও চৈত্য নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তারই সময়ে সারনাথ, মথুরা, গান্ধার ও অমরাবতীতে চারটি পৃথক শিল্পরীতির আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃতিও ঘটে কুষাণদের সময়ে। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী কিছু কিছু বৌদ্ধ

[২২] অনুশীলন / কুষাণ জাতি / https://bit.ly/2zsucfx / অ্যাকসেস ইন ২৯ আগস্ট ২০১৯

www.pathagar.com

গোষ্ঠী বহু-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। কুষাণ আমলেই বুদ্ধের প্রতিমা তৈরির রীতি শুরু হয়।[২৩]

কুষাণ আমলে মানবপুত্র বুদ্ধকে বসানো হয় ভগবানের আসনে। বুদ্ধের মূল দর্শনে আনা হয় দেবতা এবং মিথের সমষ্টি। বুদ্ধের দর্শন বিকৃতিতে যোগ হলো স্বর্গ নরক, জাতক, বুদ্ধের জন্ম মৃত্যুর নানা কাহিনী নিয়ে হাজারো মিথ। তৎকালীন মানুষ ধ্যান-সাধনা পরিত্যাগ করে জাঁকজমকভাবে বুদ্ধের পূজায় লিপ্ত হলেন। শুরু হলো মহাজন এবং তন্ত্রজান বুদ্ধ ধর্মের ধারনি, মঞ্জুশ্রী মূল কল্প, গুহ্য সমাজ, চক্র সংবর, তৎকালীন ব্রতশ্চারন, বলি পূজা, পুরশ্চরন ইত্যাদি তপ-জপ ও তন্ত্র-মন্ত্রের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম আজকের রূপে এসে পৌঁছাল। যাতে হারিয়ে গেছে বৌদ্ধ দর্শনের প্রকৃত সত্ত্বা। সেখান থেকে উদ্ভব হয় স্তবিরবাদ এবং মহাসঙ্ঘবাদ। যে কারণে রচিত হয় বুদ্ধের নামে নানা সূত্র এবং পার্থক্য দেখা যায় সূত্র-পিটক এবং বিনয়-পিটকের মাঝে।[২৪]

ধারণা করা হয় এই বিকৃতির কারণ বৌদ্ধদের কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি যারা আর্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের সেরা মানুষ বা অভিজাত শ্রেণীর মানুষ মনে করতেন। আর এসব পণ্ডিতরা কুষাণ সাম্রাজ্যের রাজাদের আনুকূল্য পেয়েছিলেন।

শোষণের যে যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়

উত্তর ভারতে কুষাণরা ও দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজারা কিছুটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে উভয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। এর জন্য উল্লেখযোগ্য কারণ হলো শাসকদের ব্যর্থতা ও বৈদেশিক আক্রমণ। এরপর এই অঞ্চলে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যকে এদেশের বাহ্মণ্যবাদীরা ও বর্তমান প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। কিন্তু আসলে সেটা ছিলো একটি শোষণের যুগ।

---

২৩. বৌদ্ধদের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান / ড. জগন্নাথ বড়ুয়া / https://bit.ly/2PmlJVU / অ্যাকসেস ইন ২৯ আগস্ট ২০১৯

২৪. প্রাচীনভারত/সুকুমারীভট্টাচার্য/গুপ্তযুগ/https://bit.ly/2lLseTH/অ্যাকসেসইন২সেপ্টেম্বর২০১৯

www.pathagar.com

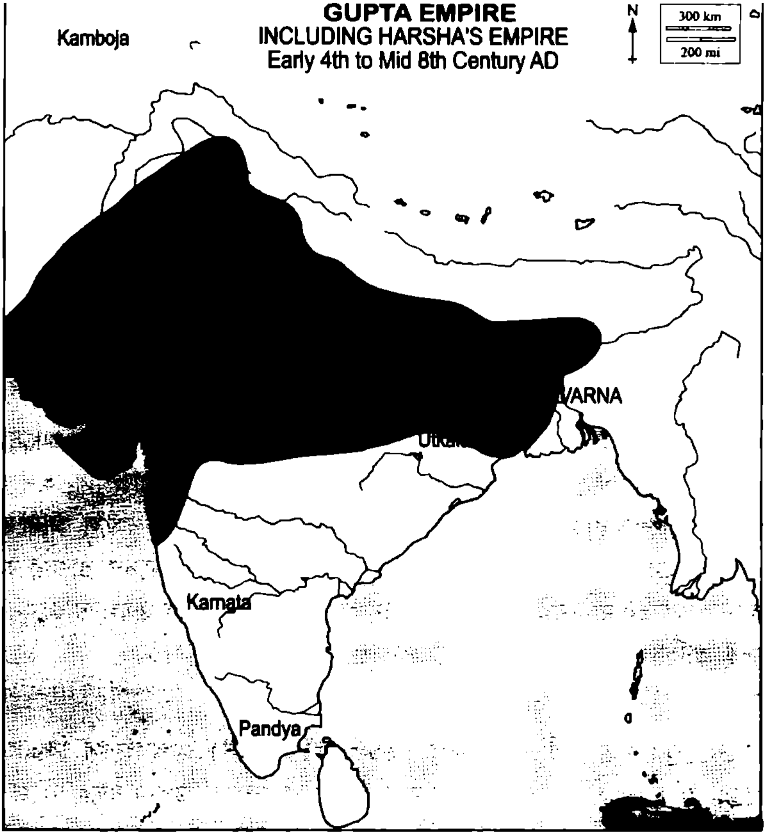

৩২০ সালে রাজা ১ম চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুত্থানের ফলে এই রাজনৈতিক শূন্যতার অবসান হয় । কুষাণ ও সাতবাহন উভয় সাম্রাজ্যের বেশ কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও আয়তনের দিক থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্যের তুলনায় ছোট ছিল । গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রধানত বিহার ও উত্তর প্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল । বিহার অপেক্ষা উত্তর প্রদেশই ছিল এই সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। গুপ্ত সাম্রাজ্যের মুদ্রা ও শিলালিপি প্রধানত এখান থেকেই পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজারা আর্য তথা ব্রাহ্মন্যবাদী ছিল। এরা কুষাণ রাজাদের সামন্ত হিসেবে উত্তর প্রদেশে শাসন করতেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত । তিনি ২৭৫ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য ২৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হলেও মূলত ৩২০ সালে এটি এই অঞ্চলে সাম্রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং কুষাণদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে গাঙ্গে ও উপত্যকায় নিজ প্রাধান্য স্থাপন করেন। তার রাজ্য উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশ, বিহার, এমনকি বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে নিজ উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করে যান।

গুপ্ত রাজাদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। তিনি ৩৮০ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। শৌর্য-বীর্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি ভারত ইতিহাসে একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ৩৩৫ সালে পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন। তার আমলে নোয়াখালী ও কুমিল্লা (সমতট) অঞ্চল ছাড়া পুরো বাংলা গুপ্ত শাসনের অধীনে চলে আসে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এই রাজার প্রশংসা করে তাকে বলেছেন–বিজিগীষু, অর্থাৎ যে আশপাশের রাজ্যগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করে সেগুলো নিজের দখলে আনতে পারে। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন এমনই এক বিজিগীষু রাজা যিনি অনেক রাজার ও অনেক জাতের মানুষের সঙ্গে অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করেন এবং জয়লাভ করেন। সেই কাহিনি এলাহাবাদের একটি প্রকাণ্ড পাথরের থামে তিনি খোদাই করে রাখেন। সেটি আজও আছে।[২৫]

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১২ সাল) গুপ্তবংশের বিখ্যাত রাজা। ইনি সরাসরি যুদ্ধ না করে বরং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের রাজপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজের মেয়ে প্রভাবতীর বিয়ে দেন মধ্যভারতের ব্রাহ্মণ বাকাটক (সেন) রাজপুত্রের সঙ্গে, এতে মর্যাদাও বাড়লো আবার বাকাটকদের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তার করাও হলো। বাকাটক রাজপুত্রের মৃত্যুর পরে প্রভাবতীই বাকাটকদের নেত্রী হয়ে রাজত্ব করেন।[২৬]

গুপ্ত আমলে কেন্দ্রীয় শাসন সব অঞ্চলে সমানভাবে ছিল না। রাজধানী থেকে যে অঞ্চল যত দূরে, শাসনব্যবস্থা সেখানে ততই শিথিল। রাজস্ব আদায়ে গুপ্তরা খুবই অত্যাচারী ছিল। ফসলের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব বলে আদায় করা হতো।

---

২৫. Chandragupta II / Encyclopaedia Britannica / https://bit.ly/2ko9eKL / অ্যাকসেস ইন ২সেপ্টেম্বর ২০১৯

২৬. প্রাচীন ভারত/সুকুমারী ভট্টাচার্য/গুপ্ত যুগ/https://bit.ly/2lLseTH/অ্যাকসেস ইন ২সেপ্টেম্বর ২০১৯

www.pathagar.com

সৈন্যদল খুব শক্তিশালী ছিল, রাজকোষ থেকে প্রতিরক্ষা খাতে বিস্তর খরচ হতো। যুদ্ধে রথ ক্রমে অপ্রচলিত হয়ে পড়ছিল, তার বদলে অশ্বারোহী সৈন্যই প্রাধান্য পাচ্ছিল। ঘোড়সওয়ার তীরন্দাজরাই এ সময়ে সৈন্যদলে যোদ্ধা ছিল। রাজার সৈন্যদল রাজ্যের যে অঞ্চল দিয়ে যাত্রা করতো, সেই সব স্থানীয় লোকজনদের সৈন্যদল এবং ঘোড়াদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হতো। সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম ও বিলাসের সব ব্যবস্থাই করতে হতো সাধারণ গ্রামবাসীদের। রাজার সৈন্যদল ও কর্মচারীদের পরিচর্যা করতে হতো জনগণের। চাষিদের আর্যদের ক্ষেতখামারে কাজ করতে হতো বাধ্যতামূলকভাবে এবং বিনা পারিশ্রমিক বা যৎসামান্য বেতনে।

গুপ্ত আমল ছিল দ্রাবিড় নির্মূলের স্বর্ণযুগ। গুপ্ত আমলের পরে দ্রাবিড়রা তাদের জাতিসত্ত্বা হারিয়ে ফেলে। জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা বইয়ে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেন, "বাংলায় দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে দীর্ঘ দিন আর্য-প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এরপর খ্রিস্টীয় চার ও পাঁচ শতকে গুপ্ত শাসনে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।[২৭]তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক হিন্দু ধর্মের কিছুই প্রসার হয়নি। ষষ্ঠ শতকের আগে বঙ্গ বা বাংলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঢুকতেই পারেনি। উত্তর-পূর্ববাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে ওঠে। পঞ্চম ও অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃতির নাম পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, গুপ্ত আমলে বাংলার আর্যকরণ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বাঙালি সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হচ্ছিল। অযোধ্যাবাসী ভিনদেশী বাহ্মণ, শর্মা বা স্বামী, বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, গাঙি নামে ব্রাহ্মণেরা জেঁকে বসেছিল।

তিনি বলেন, "বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন, এরা কেউ ঋগ্বেদীয়, কেউ বাজসনেয়ী, কেউ শাখাব্যয়ী, যাজুর্বেদীয়, কেউ বা সামবেদীয়, কারো গোত্র কান্ব বা ভার্গব, বা কাশ্বপ, কারো ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎসা বা কৌন্ডিন্য। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছাল"।[২৮]

২৭. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ২৫

২৮. বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব / ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় / পৃ. ১৩২

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন বাংলা' বইয়ে সে সময়ের সমাজচিত্র, নারী ও ধর্মীয় বিদ্বেষ নিয়ে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা উল্লেখ করা হলো, এই সময়ে বহিরাগত আগন্তুক গোষ্ঠী বিজয়ী হলে যেমন সমাজে 'ক্ষত্রিয়' পরিচয় পাচ্ছিল, তেমনি প্রান্তিক দ্রাবিড় আদিবাসীরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষ হিসেবে ঠাঁই পেয়েছিল। জাতি-উপজাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এদের মধ্যে নতুন নতুন গোষ্ঠীকে অস্পৃত বা অস্পৃশ্য নাম দেওয়া হচ্ছে। সাধারণভাবে এদের চণ্ডাল বলা হয়। পঞ্চম শতকে ফাক শিয়েন এ দেশের সমাজে বিপুল সংখ্যক চণ্ডাল দেখেছিলেন। এরা মাছ, মাংস বিক্রি করতো, অন্যান্য নিচু কাজ করতো এবং সমাজে এদের ঠাঁই ছিল না; তাই এদের গ্রামের বাইরে থাকতে হতো। শহরে এলে উচ্চবর্ণের মানুষ এদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে রাস্তায় হাঁটতো, যাতে এদের অশুচিতা কোনো ভাবেই তাদের স্পর্শ না করে।[২৯]

সমাজে রাজা ও রাজন্যদের প্রাসাদে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রবল ছিল, দানে পাওয়া নিষ্কর জমিতে নিচু বর্ণের প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় করে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ব্রাহ্মণরা নিজেদের প্রতিপত্তি ঘোষণা করতো। দেশে এবং বিদেশে বাণিজ্যের দরুণ বৈশ্যদের হাতে বিস্তর টাকা জমতো। ফলে সমাজে তাদের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। এ সময়ে নারী ও শূদ্রদের বেদে কোনো অধিকার ছিল না। গুপ্ত যুগে সমাজ ক্রমশই রক্ষণশীল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নারী ও শূদ্রের স্বাধীনতা ক্রমে সংকুচিত হয়ে এলো।

কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক উপাসনার চল হওয়াতে আগে শূদ্র সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মপালনের একটা অধিকার পেলো, কিন্তু তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে শাস্ত্রকার পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে তাদের অধিকার নির্ধারিত হতো। সংখ্যায় অর্ধেক হলেও নারীর অধিকার, সমস্ত শাস্ত্রে ক্রমশই খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে। নানা কাহিনী ও তত্ত্বকথা শোনানো হলো সাধারণ মানুষকে, যাতে দেখানো হয়েছে নারী স্বভাবত পাপিষ্ঠ, পুরুষের অধঃপতনের হেতু, তার প্রকৃতিই হীন, তার একমাত্র কর্তব্য স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির দাস্য। এই সময়ে রচিত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম-এ পড়ি, দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে অকারণে পরিত্যাগ করবার পর কণ্বের শিষ্য শার্ঙ্গরব রাজাকে বলছে: 'এ তোমার স্ত্রী, একে ত্যাগ করো বা গ্রহণ করো (যা তোমার ইচ্ছা), কারণ স্ত্রীর ওপরে স্বামীর সর্বতোমুখী প্রভুত্ব আছে।'

---

২৯. প্রাচীনভারত / সুকুমারীভট্টাচার্য / গুপ্তযুগ / https://bit.ly/2lLseTH / অ্যাকসেসইন২ সেপ্টেম্বর২০১৯

www.pathagar.com

একেবারে ওপরতলার মেয়েরা অলংকার, সম্পত্তি ও জমির মালিকানা পেতো; শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সজ্জন হলে স্ত্রীধান, যৌতুক ও অন্যান্য সম্পত্তিতেও নারীরা অধিকার পেতো। কিন্তু শাস্ত্র বলেছে, দেহ বা ধনের ওপরে নারীর কোনো অধিকার থাকবে না। ফলে নারীর নিগ্রহ শাস্ত্রসম্মত, পুরোপুরি মানুষের মর্যাদা না পাওয়াই গুপ্ত সমাজে নারীর অবস্থানের যথার্থ চিত্র।

গুপ্ত যুগের শাস্ত্রে ও সাহিত্যে আবার নতুন করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবনের এক সক্রিয় চেষ্টা চোখে পড়ে। যাগযজ্ঞ নতুন করে বিস্তর জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো। বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক প্রভাবে বৈদিক ধর্ম যেটুকু প্রতিহত হয়েছিল সেই সব ক্ষতিপূরণ করে যজ্ঞ নতুন করে সমাজে এলো। এর একটা কারণ হলো রাজা ও ধনীদের হাতে বিস্তর সম্পত্তি জমেছিল, যাতে তাদের এ সব খরচ বহন করবার সামর্থ হয়েছিল। এরই সঙ্গে বৈদিক যুগেরও আগেকার সমাজে যে সব আঞ্চলিক পূজা প্রচলিত ছিল সেগুলো এখন মাথা তুললো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো নানা আঞ্চলিক দেবতার উপাসনার পদ্ধতি, তৈরি হতে লাগলো বিভিন্ন পুরাণ। বিভিন্ন দেবতাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন দেবতার অভ্যুত্থান ঘটলো, পূজার বিস্তার হলো বৃহৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিসরে।

বঙ্গাব্দের শশাঙ্ক, মাৎস্যন্যায় এবং পাল রাজাদের উত্থান

যখন আরবে আল্লাহর রাসুল (সা.) দাওয়াতি কাজ করছেন, তখন আমাদের বাংলায় শাসক ছিলেন শশাঙ্ক। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ দিকে এই সাম্রাজ্যের শক্তি দিন দিন ক্ষয় হতে থাকে। একের পর এক এলাকা তাদের হাতছাড়া হতে থাকে। গুপ্ত রাজাদের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। ততদিনে এই অঞ্চলে দ্রাবিড়দের ভাষা থেকে নানারূপ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষা সৃষ্টি হয়। শশাঙ্ক বাংলা ভাষার একজন রাজা। ধারণা করা হয় তিনিই প্রথম বাঙালি শাসক।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে তিনি বাংলার বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যকে একত্র করে গৌড় নামের জনপদ গড়ে তোলেন। তিনি ৫৯০ হতে ৬২৫ সালের মধ্যে রাজত্ব করেন। তার রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা। কর্ণসুবর্ণ নগরী মানে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজবাড়িডাঙ্গার সন্নিকটে চিরুটি রেল স্টেশনের কাছে। এটা বহরমপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। এটাই ছিল গৌড় রাজার রাজধানী। গৌড় অঞ্চল বলতে যা

www.pathagar.com

বুঝানো হয় তা হলো ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, মুর্শিদাবাদ ও বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে বগুড়া পর্যন্ত।

শশাঙ্ক সিংহাসনে আরোহন করে বঙ্গাব্দ চালু করেন। কিন্তু গৌড়ের রাজার শক্তিশালী শাসনের অভাবে এই ক্যালেন্ডার হারিয়ে যায়। বর্তমানে যে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন আমরা ব্যবহার করি তা তৈরি হয়েছে মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে। ইরানি গবেষক আমীর ফতুল্লাহ শিরাজী চান্দ্র হিজরি সনকে বাংলা সনে রূপান্তরিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিশাল হিন্দুস্থানের জন্য তৈরিকৃত ক্যালেন্ডারের নাম বঙ্গাব্দ কেন হলো। ঐতিহাসিকরা যা বলতে চান তা হলো আমীর ফতুল্লাহ শিরাজী আগের প্রচলিত বঙ্গাব্দকে ঘষে মেজে ঠিক করেছেন ভারতবর্ষের জন্য।[৩০] রাজা শশাঙ্কের তৈরি ক্যালেন্ডারকে আকবরের আগেও ব্যবহার করেছেন বাংলার বিখ্যাত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তিনিও কিছু সংস্কার করেছেন সেই ক্যালেন্ডারকে।

আমীর ফতুল্লাহ শিরাজী সবচেয়ে বেশি অবদান রাখেন এই ক্যালেন্ডারকে সঠিক অবস্থানে আনতে। তার ক্যালেন্ডার প্রায় নির্ভুল ছিল। আকবরের নির্দেশে এই ক্যালেন্ডার তৈরির মূল কারণ ছিল ফসলের হিসেবগুলো ঠিক করার জন্য। এটা চাষিদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল। আমীর ফতুল্লাহ শিরাজী কোন ফসল কবে রোপণ করতে হবে কবে উত্তোলন করতে হবে সবই ঠিক করে দেন। এর ফলে শাসক ও প্রজা উভয়েরই উপকার হয়। শাসকরা এমন সময়ে খাজনা আদায় করতে যেতেন যখন চাষিরা খাজনা দিতে সক্ষম। আমরা বাংলাদেশে এখন যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তা আরেক দফা সংশোধিত হয় ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান আমলে ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর নেতৃত্বে। শিরাজীর ক্যালেন্ডার এখনো হুবুহু ব্যবহার করেন ভারতের বাঙালিরা।[৩১]

শশাঙ্ক থানেসোরের রাজা হর্ষবর্ধনের কাছে পরাজিত হন ও মৃত্যবরণ করেন। থানেসোর মানে হলো উত্তর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের কুরুক্ষেত্র জেলার একটি শহর। হর্ষবর্ধন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বি ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। যা নালন্দা মহাবিহার নামে পরিচিত। বানভট্ট এবং

---

৩০. Land of Two Rivers: A History of Bengal from the Mahabharata to Mujib / Nitish Sengupta / P. 96-98

৩১. বাংলা বর্ষপঞ্জি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2jWsZsH / অ্যাকসেস ইন ২সেপ্টেম্বর ২০১৯

www.pathagar.com

হিউয়েন সাঙ থেকে জানা যায় হর্ষবর্ধন এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছেন।

হর্ষবর্ধনের পর পাল আমল পর্যন্ত আর কোনো শক্তিশালী শাসক পায়নি বাংলা। ফলে এই অঞ্চলে একটি অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থাকে বলা হয় মাৎস্যন্যায়। মাৎস্যন্যায় মানে মাছের ন্যায়। মাছ যেভাবে একটি আরেকটিকে গিলে ফেলে এভাবে এই অঞ্চলে একে অপরকে ঘায়েল করার নেশা চেপে বসেছে। বাংলাপিডিয়ায় এই অরাজক পরিস্থিতি নিয়ে যা জানা যায় তা হলো, ৬৪৭ সালে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর নৈরাজ্য ও সংশয় দেখা দিলে, মন্ত্রীরা বলপূর্বক রাজ্য দখল করে নেয়। আনুমানিক ৬৫০ সাল থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত এক শতক কালেরও বেশি সময় ধরে গৌড়ের ইতিহাস অস্পষ্ট ছিল। তিব্বতের রাজা শ্রং-ছান-গেমপো বাংলায় পরপর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেন। সাত শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় দু'টি নতুন রাজবংশ আত্মপ্রকাশ করে। গৌড় ও মগধে (পশ্চিম বাংলা ও দক্ষিণ বিহার) পরবর্তী গুপ্তগণ এবং বঙ্গ ও সমতট (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) খড়গ রাজবংশ। কিন্তু এ রাজবংশের কোনোটিই বাংলায় ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি।

অষ্টম শতকের শুরুর দিকে বার বার বৈদেশিক আক্রমণে বাংলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কনৌজ রাজ যশোবর্মণের (৭২৫-৭৫২ সাল) আক্রমণ। কাশ্মীরের ললিতাদিত্য যশোবর্মণের গৌরবকে ম্লান করে দেন। গৌড়ের পাঁচ জন রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন বলে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহন উল্লেখ করেন। এ থেকে গৌড়ের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে স্থানীয় প্রধানগণ স্বাধীন হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ লিপ্ত হন। বার বার বৈদেশিক আক্রমণ রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে এবং তাতে বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। তাই শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তী একশ বছর বাংলায় কোনো স্থায়ী সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি বলা চলে। তিব্বতি সন্ন্যাসী তারনাথ ১৬০৮ সাল 'ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ মত সমর্থন করে লিখেন: 'প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও বণিক স্ব স্ব গৃহে অথবা প্রভাবাধীন এলাকায় ছিলেন এক এক জন রাজা, কিন্তু সমগ্র দেশে কোনো রাজা ছিলেন না'।

www.pathagar.com

সংস্কৃত শব্দ মাৎস্যন্যায়ম বিশেষ অর্থবহ। যখন দণ্ডদানের আইন স্থগিত বা অকার্যকর থাকে তখন এমন অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা মাছের রাজ্য সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচনের মধ্যে পরিস্ফুট। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বড় মাছ ছোটটিকে গ্রাস করে, কারণ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অবর্তমানে সবল দুর্বলকে গ্রাস করবেই। সমসাময়িক পাল লিপিতে এ অর্থবহ শব্দটির প্রয়োগ করে বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো শক্তিশালী শাসন ক্ষমতার অভাবে সম্পূর্ণ অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।[৩২]

গোপাল ছিলেন পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তার উত্থানের মাধ্যমেই অরাজক পরিস্থিতির অবসান হয়। তিনি ৭৫০ থেকে ৭৭০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের নামের শেষে "পাল" শব্দাংশটির অর্থ "রক্ষাকর্তা"। তাদের সঠিক জাতি-পরিচয় জানা যায়নি। গোপাল কিভাবে ক্ষমতায় আসেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে, জনগণই গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেন। তিনি কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তি বা নেতার সমর্থন লাভ করেই রাজা হন ও মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটিয়ে জনসমর্থন লাভ করেন। পাল লিপিতে দাবী করা হয়েছে যে, গোপাল 'বেপরোয়া ও স্বেচ্ছাচারী লোকদের পরাভূত করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন'।

অন্য কথায় বলা যায়, যারা বাংলায় মাৎস্যন্যায় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তাদের তিনি সমূলে উৎপাটন করেন। মাৎস্যন্যায় সময়ে আসলে কী ধরণের সামাজিক অবস্থা বিরাজ করেছিল তার প্রত্যক্ষ কোনো সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমরা একথা বলতে পারি গোপালের উত্থানের মাধ্যমে এই অঞ্চল শাসক পেয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় সাড়ে চারশত বছরের পাল সাম্রাজ্য। পাল সাম্রাজ্যের রাজারা যখন বাংলা শাসন করে তখন পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী ছিল মুসলিমরা।

বাংলায় বৌদ্ধদের পুনরায় উত্থান

দীর্ঘ এক শতাব্দীর মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে আট শতকের মধ্যভাগে গৌড়-বঙ্গ-বিহারে এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল শাসনের সূচনা হয়।

---

৩২ মাৎস্যন্যায় / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2lKHKPG / অ্যাকসেস ইন ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

www.pathagar.com

পাল শাসনের চারশ' বছর ছিল এদেশের মানুষের গৌরব পুনরুদ্ধার, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এ আমলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। কয়েকটি ছাড়া সকল মহাবিহারই ছিল বাংলাদেশে।

রাজ কুমার লিখেছেন, পাল সম্রাটরা ছিলেন ভালো যোদ্ধা। তাদের সেনাবাহিনীর বৈশিষ্ট্য ছিল একটি বিশাল হাতি বাহিনী। তাদের নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করতো। পাল সম্রাটরা ছিলেন ধ্রুপদি ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, চিত্রকলা ও ভাস্কর্যশিল্পের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তারা একাধিক বৃহদায়তন মন্দির ও মঠ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল সোমপুর মহাবিহার। তারা নালন্দা ও বিক্রমশিলা মহাবিহারের পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। তাদের রাজত্বকালেই বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য, তিব্বতি সাম্রাজ্য ও আরব আব্বাসীয় খিলাফতের সঙ্গে পাল সাম্রাজ্যের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। বাংলা ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাল যুগেই বাংলায় প্রথম ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। পাল আমলের স্থাপনাগুলোতে আব্বাসিয় মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া আরব ইতিহাসবিদদের রচিত নথিপত্রেও পাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে তাদের দেশের বাণিজ্যিক ও বৌদ্ধিক যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাগদাদের বাইতুল হিকমাহ এই যুগেই ভারতীয় সভ্যতার গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কীর্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।[৩৩]

আব্দুল মান্নান তার জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা বইতে উল্লেখ করেন, বাংলার পাল-রাজত্ব চারশ' বছর স্থায়ী হয়। গৌড়-বঙ্গে পাল শাসন চলাকালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সমসাময়িক আর্য-ব্রাহ্মণ্য শক্তিপুঞ্জ সুলতান মাহমুদের হামলায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিল। ফলে পাল শাসন তার ভৌগোলিক সীমান্তে দীর্ঘদিন নিরুপদ্রব থাকে। আট শতক থেকে এগারো শতক পর্যন্ত পাল শাসনে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলা ও বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম এ সময় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করে। পূর্ব ভারত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বয়স আরো চার-পাঁচশ বছর বৃদ্ধি পায়।[৩৪]

---

৩৩. Essays on Ancient India / Raj kumar / P. 199

৩৪. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ২৯

www.pathagar.com

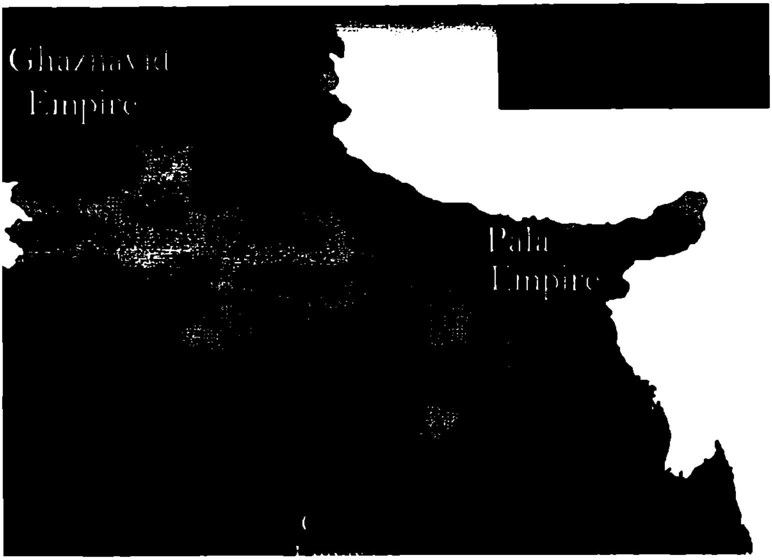

খ্রিস্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল সাম্রাজ্য সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই সময় পাল সাম্রাজ্যই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। সেই যুগে এই সাম্রাজ্য আধুনিক পূর্ব-পাকিস্তান, উত্তর ও উত্তরপূর্ব ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে প্রসারিত হয়। পাল সাম্রাজ্য সর্বাধিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল সম্রাট ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে। তিব্বতে অতীশের মাধ্যমে পাল সাম্রাজ্য প্রভূত সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব পড়েছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেও। উত্তর ভারতে পাল শাসন ছিল ক্ষণস্থায়ী। কারণ কনৌজের আধিপত্য অর্জনের জন্য গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পাল সম্রাটরা পরাজিত হন। কিছুকালের জন্য পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। তারপর সম্রাট প্রথম মহীপাল বাংলা ও বিহার অঞ্চলে দক্ষিণ ভারতীয় চোল অনুপ্রবেশ প্রতিহত করেন। সম্রাট রামপাল ছিলেন সর্বশেষ শক্তিশালী পাল সম্রাট। তিনি কামরূপ ও কলিঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ১১শ শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এর ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি অনেকটাই হ্রাস পায়।

পাল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির

www.pathagar.com

মিল-সমন্বয়ের শ্লোগান দেয়। বহিঃসীমান্তে তাদের মিত্ররা সাময়িকভাবে সুবিধা করতে না পারলেও ব্রাহ্মণদের এই চতুর কৌশল বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় তারই বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেন, "পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজ-পরিবারের মেয়ে বিয়ে করছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটা পারস্পরিক সম্মন্ধ গড়ে উঠেছিল"।[৩৫]

এ সময় পাল রাজারা অনেকেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আর তাদের মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াকর্মে নিজ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। বিশেষত দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় হলো, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় নয় শতক থেকে এগারো শতকের মধ্যেকার। এই সমন্বয় ছিল এক তরফা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচেই গড়ে উঠেছিল সবকিছু। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়, "এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল।...... বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুঁচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল"।[৩৬]

আব্দুল মান্নান বলেন, তথাকথিত এই মিল-সমন্বয়ের আদর্শ বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের খোল-নলচে পাল্টে দিচ্ছিল, তাদের জাতিসত্ত্বাকে করে তুলেছিল অন্তঃসারশূন্য, আর রাষ্ট্রসত্ত্বাকে করে তুলেছিল বিপন্ন। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতির সীমানা হেফাযত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাল শাসকেরা রেখে গেছেন।

তাওহীদবাদীদের দুর্বলতা এখানেই। যখনই তাওহীদবাদীরা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করে তখনই তাদের পরাজয় হয়। বৌদ্ধরা তাদের ধর্মীয় স্বকীয়তা হারিয়ে ফেললো তথাকথিত মিল-সমন্বয় করতে গিয়ে। পরবর্তীতে মুসলিম শাসনের সময়ও আমরা একই চিত্র দেখতে পাবো।

খ্রিস্টীয় ১২শ' শতাব্দীতে হিন্দু সেন রাজবংশের পুনরুত্থানের ফলে পাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সেই সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বশেষ প্রধান বৌদ্ধ

---

৩৫. বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব / ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় / পৃ. ১৩৯

৩৬. বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব / ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় / পৃ. ১৫১

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। বাংলার ইতিহাসে পাল যুগকে অন্যতম সুবর্ণযুগ মনে করা হয়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কয়েক শতাব্দীব্যাপী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পাল সম্রাটরা বাংলায় স্থিতাবস্থা ও সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। পূর্বতন বঙ্গীয় সভ্যতাকে তারা উন্নত করে তোলেন। সেই সঙ্গে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অসামান্য কীর্তি রেখে যান। তারা বাংলা ভাষার ভিত্তি রচনা করেছিলেন। বাংলার প্রথম সাহিত্যকীর্তি চর্যাপদ পাল যুগেই রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি একেশ্বরবাদীদের দ্বারাই হয়েছে।

আবারো ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শাসন

পাল-রাজত্বের অবসানের পর কর্ণাটদেশীয় চন্দ্র-বংশীয় ক্ষত্রিয় বর্ণের সেনরা বাংলাদেশ শাসন করে। দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে সামন্ত বিদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন বারো শতকের শুরুতে রাঢ়-এর একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল দখল করে সামন্তরূপে জেঁকে বসেন। পাল বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর পাল-রাজ্যের গোলযোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভগ্নাদশার এই সুযোগে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন এখানে প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা করেন। তার রাজধানী ছিল বিজয়পুর। বঙ্গের বিক্রমপুরে (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ) ছিল তার দ্বিতীয় রাজধানী । শিব-এর পূজারী বিজয় সেন ও তার পুত্র বল্লাল সেন বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধারায় কুলীন প্রথাভিত্তিক বর্ণশ্রমবাদী সমাজের ভিত রচনা করেন।

তখনকার অবস্থা সম্পর্কে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "সেন শাসনামলে দেখতে দেখতে যাগযজ্ঞের ধুম পড়ে গেলো। নদ-নদীর ঘাটে-ঘাটে শোনা গেলো বিচিত্র পুণ্য-স্নানার্থীর মন্ত্র-গুঞ্জরণ, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা, বিভিন্ন পৌরাণিক ব্রতের অনুষ্ঠান, জনগণের দৈনন্দিন কাজ কর্ম, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, আহার-বিহার, বিভিন্ন বর্ণের নানা স্তর-উপস্তর বিভাগের সীমা-উপসীমা- এক কথায় সমস্ত রকম সমাজ-কর্মের রীতি-পদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য নিয়ম অনুযায়ী বেঁধে দেওয়া হলো। এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক সমাজাদর্শের একাধিপত্যই সেন-বর্মন যুগের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। সে সমাজাদর্শ পৌরণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। সে আদর্শই হলো সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা, তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে, মন্দিরে, রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহারে

www.pathagar.com

ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পিটানো হতে লাগলো। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো"।[৩৭]

সেন আমলে বর্ণাশ্রম প্রথা পুরোপুরি চালু হলো। উৎপত্তি হলো ছত্রিশ জাতের। যারা উৎপাদনের সাথে যত বেশি সম্পর্কযুক্ত, তাদের স্থান হলো সমাজে ততো নীচুস্তরে। যারা যতো বেশি উৎপাদন-বিমুখ, অন্যের শ্রমের ওপর যত বেশি নির্ভরশীল, যত বেশি পরভোজী ও পরাশ্রয়ী, সমাজে তাদের মার্যাদা হলো ততো উপরে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। এভাবে সেন-বর্মন শাসিত বাংলাদেশে একটি সর্বভুক পরগাছা শ্রেণীর স্বৈরাচার কায়েম হয়।[৩৮]

পাল আমলে সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েমের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণেরা তথাকথিত মিল-সমন্বয়ের কৌশল গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেন-বর্মন পর্বে ব্রাহ্মণ্য সমাজ তথাকথিত সমন্বয়ের মুখোশ আর রাখলো না। তারা স্বমূর্তিতে উন্মোচিত হলো, নিজেদের আসল রূপ জনগণের সামনে প্রকাশ করলো। পাল আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি যে উদারতা দেখানো হয়েছিল, তার বদলা হিসেবে ব্রাহ্মণবাদী সেনরা বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিসত্ত্বার বিরুদ্ধে পরিচালনা করলো নিষ্ঠুর নির্মূল অভিযান। সে নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "যে জনপদে (পূর্ববঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১৫৫০ ঘর ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ ত্রিশ বছরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব ভারত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান লীলাকেন্দ্র ছিল, তথায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় অধুনা আবিস্কৃত হইতেছে"।[৩৯]

ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনদের অত্যাচারের কারণে বাংলা সাহিত্যেরও ক্ষতি হয় ব্যাপক। এই নিয়ে অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, "পাল বংশের পরে এতদ্দেশে সেন বংশের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিন্তা অতিশয় ব্যাপক হইয়া ওঠে ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবাহ বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। সেন বংশের রাজারা সবাই ব্রাহ্মণ্যধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ তাহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এভাবে রাজ ও রাষ্ট্র উভয়ই

---

৩৭. বাঙালির ইতিহাস / ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় / পৃ. ৫৬-৫৭

৩৮. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ৩০

৩৯. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান / ড. দীনেশচন্দ্র সেন / পৃ. ১১-১২

www.pathagar.com

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরূপ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা স্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংগালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যজাত বাংগালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাংগালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদি যুগের বাংগালা গ্রন্থ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য"।[৪০]

সেনদের এই বর্বর শাসন থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে মুসলিমরা। তখন সারাবিশ্বে মুসলিমদের জয়জয়াকার। এমনকি উত্তর ভারতের কিছু অংশ, মুলতানসহ পাকিস্তানের বেশ কিছু অংশ মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে। ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যদের দ্বারা নির্যাতিত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণে দেশবাসীর জীবন যখন বিপন্ন, সে সময় মজলুম জনগণের পক্ষের শক্তি হিসেবে তাদের পাশে এসে দাঁড়ান ইসলাম প্রচারক আলেম, সূফী ও মুজাহিদগণ। ইসলাম প্রচারকগণ নিপীড়িত জনগণকে সংগঠিত করে রুখে দাঁড়ান মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরে, বগুড়া বা পুন্ড্রবর্ধনে, রামপুর বোয়ালিয়া বা রাজশাহীতে, গৌড় বা চাঁপাইনবাবগঞ্জে। বিখ্যাত মুজাহিদ বাবা আদম শহীদের কবর মুন্সিগঞ্জে এখনো সেই সংগ্রামের সাক্ষ্য বহন করছে।

আব্দুল মান্নান বলেন, দ্বাদশ শতকের শেষ নাগাদ বাংলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগে বিখ্যাত গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। এই দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাঙ্গেয় উপত্যকার অভ্যন্তরে এক নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলে। আর্যদের বৈদিক ও পৌরণিক ধর্মের বিরুদ্ধে বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর ধরে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল, ইসলামের দ্রোহাত্মক বাণী তাদের সে প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলল।[৪১]

একেকজন ইসলাম প্রচারক জনগণের কাছে আবির্ভূত হন তাদের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক রূপে। প্রচারকদের গড়ে তোলা মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাগুলো নির্যাতিতের আশ্রয়স্থল, অভুক্তের লঙ্গরখানা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময় ও চাহিদা পূরণের কেন্দ্র এবং মুক্তি সংগ্রামের দুর্গ হিসেবে পরিচিত হয়।

---

৪০. প্রাচীন বাংগালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস / দেবেন্দ্রকুমার ঘোষ / পৃ. ৯-১০

৪১. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ৩২

www.pathagar.com

••| দ্বিতীয় অধ্যায় |••

মুসলিম বাংলা

অনেকেই মনে করেন ইখতিয়ার উদ্দিনের মাধ্যমেই এদেশে ইসলাম এসেছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। বখতিয়ারের বিজয়ের আগেই এদেশে ইসলাম প্রচারক আলেম, দরবেশ ও মুজাহিদগণ জনগণকে সাথে নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজত্বের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণিবৈষম্যে নির্যাতিত মানুষের পাশে ইসলামের দায়ীরা দাঁড়িয়েছিল। তার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রতি জনগণের সমর্থন গড়ে ওঠে। জনসমর্থনের সে দৃঢ় ভিত্তির ওপর ১২০৩ সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন হয় ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির ঐতিহাসিক বিজয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ভিক্ষু লামা তারানাথ তার ষোল শতকের বিবরণীতে জানান, বৌদ্ধরা মুসলমানদের বিজয়কে অভিনন্দিত করেছিল এবং ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীকে বিজয়ে সাহায্য করেছিল। শ্রীচারু বন্দোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বৌদ্ধরা মুসলমান বিজেতার সাহায্যে হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে কিছুটা শান্তি লাভ করেছিল।[৪২] বখতিয়ার খিলজির শুরু করা মুসলিম শাসন চলে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত। মুসলিম বাংলার ইতিহাস হলো ১২০৩ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের ইতিহাস।

---

৪২ আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান / পৃ. ৩৩

www.pathagar.com

বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল যেভাবে

এদেশের মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বখতিয়ার খিলজি। ইদানিংকালে কিছু সাহিত্যিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বলতে চান বখতিয়ার কোনটা দুর্গ আর কোনটা বিশ্ববিদ্যালয় তা বুঝতেন না। তিনি দুর্গ মনে করে বৌদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয় বা বিহারগুলো ধ্বংস করেছিলেন। অথচ বৌদ্ধ ঐতিহাসিকরাই জানিয়েছেন বৌদ্ধরা মুসলিমদের স্বাগত জানিয়েছে এদেশে। খিলজিকে বৌদ্ধরা সমগ্র বিহার ও বাংলা অঞ্চল দখল করতে সাহায্য করেছিল। সুতরাং নালন্দা বিহারসহ অন্যান্য বিহার ধ্বংসের যে অভিযোগ খিলজির ওপর আরোপ করা হয়েছে তা পুরোটাই অসত্য ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মূলত সেন আমলে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদের ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছিল তার দায় তারা মুসলিমদের ওপর চাপাতে চেয়েছে।

ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজি ছিলেন জাতিতে তুর্কি আর পেশায় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। জীবনের প্রথম ভাগে তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী। তিনি গজনির সুলতান মুহাম্মাদ ঘুরির সৈন্যবাহিনীতে চাকুরিপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। আকারে খাটো, লম্বা হাত এবং অসুন্দর চেহারার অধিকারী হওয়ায় সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হন। গজনীতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দিল্লিতে কুতুবউদ্দীন আইবেকের দরবারে হাজির হন। এখানেও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিন বখতিয়ার খিলজিকে নগদ বেতনে সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রদান করেন। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোদ্ধায় যান। অযোদ্ধার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার পূর্ব দক্ষিণ কোণে ভগবৎ ও ভিউলি নামক দুইটি পরগনার জায়গির প্রদান করেন।[৪৩]

মুসলিমদের দুর্দশা ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে ১২০১ সালে বখতিয়ার মাত্র দু'হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্যগুলো আক্রমণ করতে থাকেন। সেই সময়ে তার বীরত্বের কথা চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং অনেক মুসলিম সৈনিক তার বাহিনীতে যোগদান করতে থাকে, এতে করে তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে বিহার অধিকার করেন।

---

৪৩. বাংলাদেশের ইতিহাস / ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম / পৃ. ১৪৯

www.pathagar.com

বিহার জয়ের পর বখতিয়ার খিলজি কুতুবউদ্দিন আইবকের সাথে দেখা করতে যান এবং কুতুবউদ্দিন কর্তৃক সম্মানিত হয়ে ফিরে আসেন। এর পরই তিনি বাংলা জয়ের জন্য সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। তৎকালীন বাংলার রাজা লক্ষণ সেন বাংলার রাজধানী নদিয়ায় অবস্থান করছিলেন কারণ নদিয়া ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত অঞ্চল। বলা হয়ে থাকে যে নদিয়ায় আসার কিছু আগে রাজসভার কিছু দৈবজ্ঞ পণ্ডিত তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এক তুর্কি সৈনিক তাকে পরাজিত করতে পারে। এতে করে লক্ষণ সেনের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং নদিয়ার প্রবেশপথ রাজমহল ও তেলিয়াগড়ের নিরাপত্তা জোরদার করেন। লক্ষণ সেনের ধারণা ছিল যে ঝাড়খণ্ডের শ্বাপদশংকুল অরণ্য দিয়ে কোনো সৈন্যবাহিনীর পক্ষে নদিয়া আক্রমণ করা সম্ভব নয় কিন্তু বখতিয়ার সেই পথেই তার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে আসেন। নদিয়া অভিযানকালে বখতিয়ার ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে তার সাথে মাত্র ১৮ জন সৈনিকই তাল মেলাতে পেরেছিলেন।

বখতিয়ার সোজা রাজা লক্ষণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং দ্বাররক্ষী ও প্রহরীদের হত্যা করে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করেন। এতে প্রাসাদের ভিতরে হইচই পড়ে যায় এবং লক্ষণ সেন দিগ্বিদিক হারিয়ে ফেলে প্রাসাদের পেছনের দরজা দিয়ে নৌপথে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। নদিয়া জয় করে পরবর্তীতে লক্ষণাবতীর (গৌড়) দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। এই লক্ষণাবতীই পরবর্তীকালে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। গৌড় জয়ের পর আরও পূর্বদিকে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি এলাকাগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে একজন করে সেনাপতিকে শাসনভার অর্পণ করেন। বখতিয়ারের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে দু'জনের নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে আলি মর্দান খিলজি বরসৌলে, হুসামউদ্দিন ইওজ খিলজি গঙ্গতরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। লাখনৌতিকে কেন্দ্র করে বাংলার নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুর্নিয়া শহর, দেবকোট থেকে রংপুর শহর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গার মূলধারা (পদ্মা) এবং পশ্চিমে কুশী নদীর নিম্নাঞ্চল থেকে গঙ্গার কিনারায় রাজমহল পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী একশ' বছরের মধ্যে বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা মুসলিম শাসনাধীনে আসে।

www.pathagar.com

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসন শুরু হয়। এই আমলই ছিল বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সময়। শিক্ষা, সভ্যতায় ও সম্পদে বাংলা হয়ে উঠেছিল পৃথিবী বিখ্যাত স্থান। সারা পৃথিবী থেকে পর্যটক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা বাংলায় আসতেন বাংলার রূপ, রস, সৌন্দর্য ও গন্ধ উপভোগ করতে। ভারতে মুসলিম বিজয় সম্পর্কে গোপাল হালদার মন্তব্য করেন, "ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একেশ্বরবাদ এবং জাতিভেদহীন সাম্যদৃষ্টির কাছে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির.......... এ পরাজয় রাষ্ট্র-শক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদারনীতি ও আত্ম-সচেতনতার কাছে। .... কারণ ইসলাম কোনো জাতির ধর্ম নয়, প্রচারশীল ধর্ম। ইহা অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না, কোলে তুলে নেয়"।[৪৪]

ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির ব্যর্থতা ও ইসলামী সংস্কৃতির বিজয়ের কারণ চিহ্নিত করে কমরেড এম. এন. রায় 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "ভারতে বৌদ্ধ বিপ্লবের পরাজয় ঘটেনি বরং তার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে। সেই বিপ্লবকে জয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমাজ-শক্তি তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তার ফল হলো এই যে, বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই সমগ্র দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচার-বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ডুবে গেলো। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র সমাজ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গেছে। এজন্য নিপীড়ত জনগণ ইসলামের পতাকার নীচে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো..........। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো। তার কারণ তার পিছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিল শ্রেয়; কেননা হিন্দু দর্শন সমাজদেহে এনেছিল বিরাট বিশৃঙ্খলা আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়"।[৪৫]

মুসলিম শাসন আমল বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ হিসেবে ঐতিহাসিকদের বিবেচনা লাভ করেছে। এ জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ যুগেই একটি উন্নত ও সংহত রূপ লাভ করে। রাজনৈতিকভাবে

---

৪৪. সংস্কৃতির রূপান্তর / গোপাল হালদার / পৃ. ১৯৬

৪৫. ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান / এম. এন. রায় / পৃ. ৬১-৬২

www.pathagar.com

এ যুগেই বাংলার জনগণ একটি আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ হয়। বাংলা ভাষা ও বাঙালির ইতিহাসের ভিত্তিও এই যুগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. এম এ রহীমের মন্তব্য, "যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এ প্রদেশে আর কয়েক শতকের জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন অব্যাহত থাকত, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত এবং অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো"।[৪৬]

বাংলায় দিল্লীর শাসন যেভাবে শুরু হয়

বাংলায় দিল্লীর শাসন প্রতিষ্ঠা হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির হাত ধরেই। তিনি বিহার, বাংলা ও তদসংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নির্যাতিত মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জয় করে নেন। এরপর তিনি দিল্লির শাসক সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের সাথে দেখা করেন এবং নিজেকে সমর্পন করেন। কুতুবউদ্দিন খুশি হন এবং এই অঞ্চলের শাসনভার তার হাতে অর্পন করেন। এরপর প্রায় একটানা ১৩৬ বছর দিল্লীর অধীনে ছিল বাংলা।

বখতিয়ার খিলজি একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি তার রাজ্যকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন এবং সে গুলির শাসনভার তার প্রধান অমাত্য ও সামরিক প্রধানদের ওপর ন্যস্ত করেন। তাদেরকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, রাজস্ব আদায় করা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং জনগণের পার্থিব ও নৈতিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপনের পর খুৎবা পাঠ করেন এবং দিল্লীর সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি দিনাজপুর ও রংপুরের নিকট দু'টি ছাউনি শহর নির্মাণ করেন। তার সময়ে প্রচলিত প্রশাসনিক বিভাগকে ইকতা এবং এর শাসনকর্তাকে মুকতা বলা হতো। তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন।[৪৭]

কুতুবউদ্দিন আইবেক মধ্য এশিয়ার কোনো এক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; তার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন তুর্কি। শিশুকালেই তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়। তাকে ইরানের খোরাসান অঞ্চলের নিসাপুরের প্রধান কাজী সাহেব কিনে নেন।

৪৬. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস / ড. এম এ রহীম / ভূমিকা

৪৭. বখতিয়ার খিলজি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2kcRpOO / অ্যাকসেস ইন ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

www.pathagar.com

কাজী তাকে তার নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন এবং আইবেককে তিনি উন্নত শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি আইবেককে ফার্সি এবং আরবি ভাষায় দক্ষ করে তোলেন, তীর এবং অশ্বচালনায়ও প্রশিক্ষণ দেন। আইবেকের প্রভুর মৃত্যুর পরে প্রভুর ছেলে আইবেককে আবারও এক দাস বণিকের কাছে বিক্রি করে দেন। কুতুবউদ্দিনকে এবার কিনে নেন গজনির গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ ঘুরি।[৪৮]

মোহাম্মদ ঘুরির কোনো সন্তান না থাকায় তার প্রিয় সন্তানের মতো কুতুবউদ্দিন আইবেকই হন দিল্লির শাসনকর্তা। তিনিই প্রথম দিল্লীকে রাজধানীতে পরিণত করেন। তিনি মামলুক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। মামলুক সালতানাত ১২০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ার তুর্কি সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেক মামলুকদের উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন। দিল্লি সালতানাত শাসনকারী পাঁচটি রাজবংশের মধ্যে মামলুক রাজবংশ প্রথম। এর শাসনকাল ছিল ১২০৬ থেকে ১২৯০ সাল পর্যন্ত। ঘুরি রাজবংশের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯২ থেকে ১২০৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন। এ সময় তিনি গাঙ্গেয় অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং নতুন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

---

৪৮. ইতিহাসের ইতিহাস / গোলাম আহমেদ মোর্তজা / পৃ. ৬৬-৬৯

www.pathagar.com

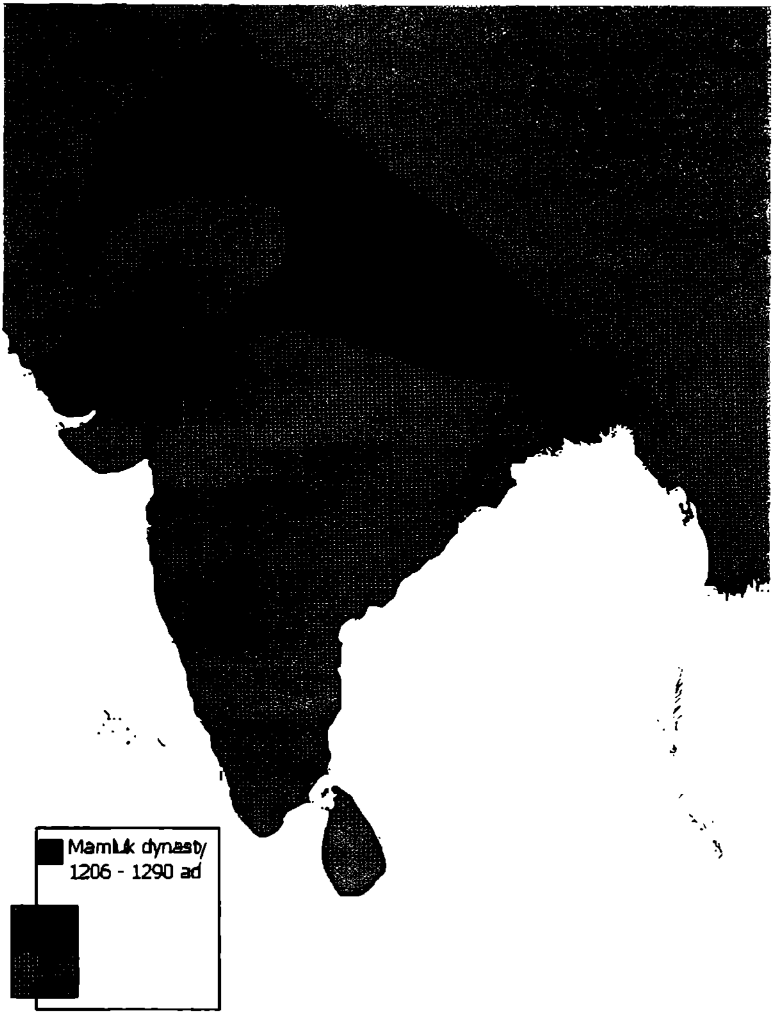

কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির প্রাচীন মুসলিম স্মৃতি স্থাপনাগুলোর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এর মধ্যে রয়েছে কুয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ ও কুতুব মিনার। ১২১০ সালে তিনি পোলো খেলার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান। লাহোরের আনারকলি বাজারের কাছে তাকে দাফন করা হয়। এরপর শাসক হন আরাম শাহ। আরাম শাহ কুতুবউদ্দিনের সাথে কী সম্পর্কিত এই নিয়ে দ্বিমত আছে

www.pathagar.com

ঐতিহসিকদের মধ্যে। কেউ বলেছেন ভাই, কেউ বলেছেন ছেলে। যাইহোক আরাম শাহ্ ক্ষমতায় বেশিদিন ছিলেন না। চিহালগনি নামে পরিচিত ৪০ জন অভিজাত ব্যক্তির একটি দল আরামশাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বাদাউনের গভর্নর শামসউদ্দিন ইলতুতমিশকে আমন্ত্রণ জানায়। ১২১১ সালে ইলতুতমিশ আরামশাহকে দিল্লির নিকটে জুদের সমতল ভূমিতে পরাজিত করেন।

ইলতুতমিশ দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি মুলতানের নাসিরউদ্দিন কাবাচা ও গজনির তাজউদ্দিন ইলদুজকে পরাজিত করেন। এই দু'জন দিল্লির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তার শাসনামলে মঙ্গোলরা জালালউদ্দিন খোয়ারিজম শহরে খোঁজে ভারত আক্রমণ করে। ইলতুতমিশ শত হাতে মঙ্গোলদের প্রতিহত করেন। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর ইলতুতমিশ হারানো এলাকা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে উত্তর ভারতে তার নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেন। ১২৩০ সালে তিনি মেহরাউলিতে হাউজ-ই-শামসি নামক জলাধার নির্মাণ করেন। ১২৩১ সালে তিনি দিল্লিতে প্রথম মুসলিম সমাধি 'সুলতান গারি' নির্মাণ করেন।[৪৯]

ইলতুতমিশের কন্যা রাজিয়া সুলতানা ছিলেন ভারতের প্রথম মুসলিম নারী শাসক। তিনি অভিজাত ব্যক্তিদের সাথে সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন এবং সালতানাত পরিচালনায় সফল ছিলেন।আফ্রিকান বংশোদ্ভূত জামালউদ্দিন ইয়াকুতের সাথে তার সহযোগিতার কারণে মধ্য এশিয়ার তুর্কীয় বংশোদ্ভূত অভিজাতরা তার বিরূপ হয়ে পড়ে। এছাড়া নারী সম্রাজ্ঞীর শাসনকে তারা নেতিবাচক হিসেবে দেখতেন। ক্ষমতাশালী অভিজাত মালিক আলতুনিয়া তাকে পরাজিত করেছিলেন। রাজিয়া সুলতানা তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিলেন। রাজিয়ার ভাই মুইজ উদ্দিন বাহরাম চিহালগনিদের সহায়তায় সিংহাসন দখল করেন এবং রাজিয়া ও তার স্বামীর সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। পরাজিত হয়ে তারা কাইথাল পালিয়ে যান। তাদের সাথে থাকা অবশিষ্ট সৈনিকরা এরপর তাদের ত্যাগ করে। তারা দু'জনেই জাটদের হাতে ধৃত হন। ১২৪০ সালের ১৪ অক্টোবর তাদের হত্যা করা হয়। এরপর কয়েক বছর বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়।[৫০]

---

৪৯. মোঘল সাম্রাজ্যের সোনালী অধ্যায় / সাহাদত হোসেন খান / পৃ. ২৪

৫০. মোঘল সাম্রাজ্যের সোনালী অধ্যায় / সাহাদত হোসেন খান / পৃ. ২৬

www.pathagar.com

১২৪৬ সালে ইলতুতমিশের আরেক ছেলে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ক্ষমতা দখল করেন। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ধার্মিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অধিকাংশ সময় তিনি নামাজ এবং দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা করতেন। তার অধীনস্থ গিয়াসউদ্দিন বলবন রাষ্ট্রীয় বিষয় দেখাশোনা করতেন। তিনি ও গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। প্রায় ২০ বছর শাসক থাকার পর নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু হয়। তারপর ১২৬৬ সালে গিয়াসউদ্দিন বলবন শাসক হন। তিনি ১২৮৭ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন।

গিয়াসউদ্দিন বলবন কঠোর হস্তে শাসন পরিচালনা করেন। তিনি চিহালগনিদের প্রভাব খর্ব করেন। ভারতে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ছিলেন। বিশৃঙ্খল অঞ্চলগুলোতে তিনি অনেক চৌকি নির্মাণ ও সেনা মোতায়েন করেন। আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য তিনি সফল গোয়েন্দা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এরপর আর উল্লেখযোগ্য মামলুক সুলতান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। এরপর শুরু হয় দিল্লীর ২য় সালতানাত খিলজি রাজবংশ।

খিলজি ও তুঘলকদের শাসন

খিলজি রাজবংশ হলো মধ্য যুগের মুসলিম রাজবংশ, যারা ১২৯০ সাল থেকে ১৩২০ সাল পর্যন্ত ভারতের বিশাল অংশ শাসন করতো। জালাল উদ্দিন ফিরোজ খিলজি এর প্রতিষ্ঠাতা। খিলজি শাসনামল অবিশ্বাস, হিংস্রতা এবং দক্ষিণ ভারতে তাদের শক্ত অভিযানের জন্য খ্যাত হলেও খিলজি শাসনামল মূলত ভারতে বর্বর মঙ্গোলদের বারংবার অভিযান রুখে দেওয়ার জন্য সুপরিচিত।

খিলজিরা ছিল দিল্লির মামলুক রাজবংশের সামন্ত এবং দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সেনাপতি। বলবনের উত্তরাধিকারীদের ১২৮৯-১২৯০ সালে হত্যা করা হয় এবং এর পরপরই মামলুকদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কোন্দল শুরু হয়ে যায়। এই কোন্দলের মধ্যে জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজির নেতৃত্বে বিদ্রোহ সংগঠিত হয় এবং মামলুকদের বংশের শেষ উত্তরাধিকারী ১৭ বছর বয়সী মুইজ উদ্দিন কায়কোবাদকে অপসারণ করে তিনি দিল্লির সালতানাতে অধিষ্ঠিত হন।

www.pathagar.com

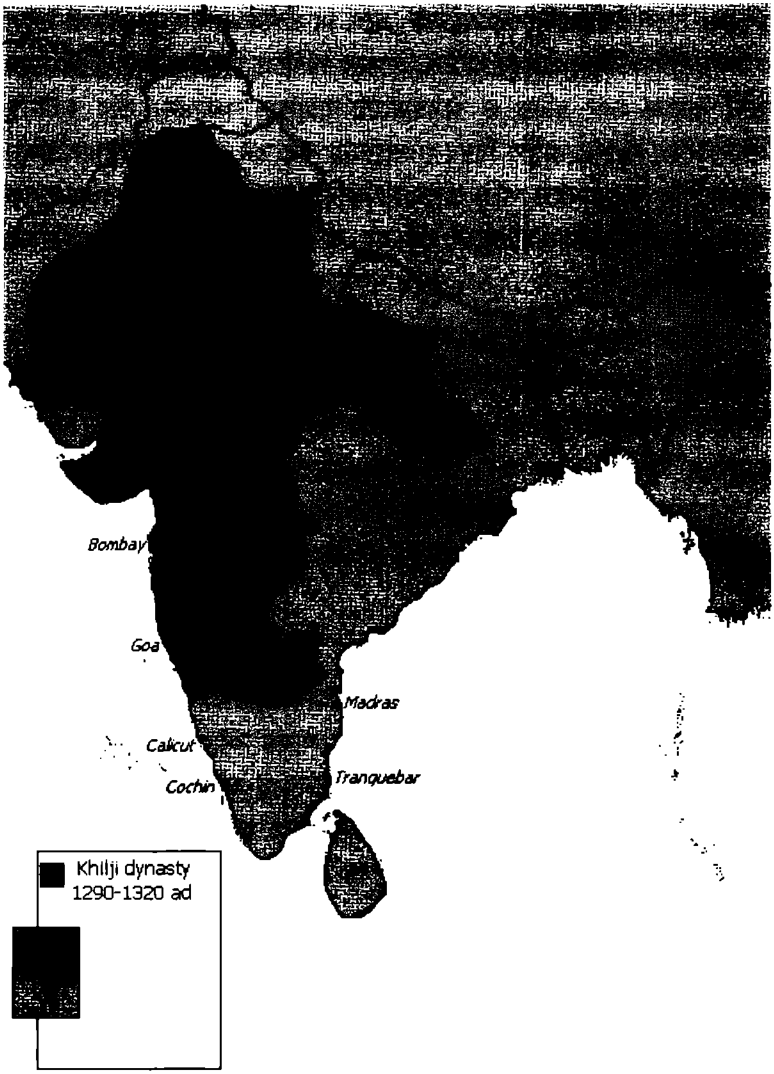

জালালউদ্দিন খিলজি একজন প্রজাদরদি এবং বিনয়ী সুলতান ছিলেন। তুর্কি অভিজাতদের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তিনি ১২৯০ সালে দিল্লির মসনদে বসেন। জালালউদ্দিনের এই আরোহণ সবাই মেনে নিতে পারেনি। তার ৬ বছরের শাসনে বলবনের ভাইপো মামলুকদের প্রতি অনুগত সামরিক অধিনায়কদের

www.pathagar.com

নিয়ে বিদ্রোহ করে। জালালউদ্দিন এই বিদ্রোহ রুখে দেন। তিনি তার ভাইপো জুনা খানকে সাথে নিয়ে মধ্য ভারতের সিন্ধু নদী তীরে মঙ্গোল বাহিনীকে সফলভাবে প্রতিহত করেন।

জালালউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন খিলজি (জুনা খান) দিল্লির মসনদে বসেন। তিনি ছিলেন জালালউদ্দিন খিলজির ভাইপো এবং জামাতা। আলাউদ্দিন খিলজি হিন্দু রাজ্য মহারাষ্ট্রের রাজধানী দেবগীরি অধিকার করেন।

আলাউদ্দিন খিলজি প্রায় বিশ বছর এই উপমহাদেশ শাসন করেন। তিনি ভারতের গুজরাটের রাজা কর্ণদেব, রণ-থম্ভোরের রাজপুত নেতা হামির দেব, মেবারের রাজা রতন সিং ও মালবের অধিপতি মহ্লক দেবকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। কাফুর দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র, বরঙ্গলের কাকতীয়রাজ প্রতাপ রুদ্র, দোর সমুদ্রের হোয়্সলরাজ তৃতীয় বল্লালকে পরাজিত করবার পর ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে পান্ড্য রাজ্য অধিকার করেন। এরপর তিনি রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন।

আলাউদ্দিন খিলজি অবশ্য দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি সরাসরি সাম্রাজ্যভুক্ত না করে সেখানকার রাজাদের মৌখিক আনুগত্য ও করদানের প্রতিশ্রুতি নিয়েই করদ রাজ্যে (কর দিতে স্বীকৃত) পরিণত করেন। বিজেতা হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজি ছিলেন দিল্লির সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আলাউদ্দিনের দৃঢ়তা ও তার অসম সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধকৌশলের কারণে তিনি ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন। এছাড়াও তিনি দু'বার ভারতের দিকে ধেয়ে আসা মঙ্গোল বাহিনীকে সফলভাবে প্রতিহত করেন।[৫১]

আলাউদ্দিন খিলজি কয়েকটি কারণে বিখ্যাত

১- কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালীকরণ। যে কোনো নির্দেশ বা আইন অল্প সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যে তিনি বাস্তবায়ন করতে পারতেন।

২- বাজারদর নিয়ন্ত্রণ। তার শাসনামলে তিনি ব্যবসায়ীদের জনগণের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মজুতদারি ও প্রতারণা বন্ধ করেছিলেন। ব্যবসায়ীরা যাতে মূল্যের বেশি টাকা দাবী না করে, তার জন্য তিনি কঠোর প্রসাশনিক ব্যবস্থা গ্রহন

---

৫১. তারিখ ই ফিরুজশাহী / জিয়াউদ্দিন বারানী / দিব্য প্রকাশ / পৃ. ২০২-২১০

www.pathagar.com

করেছিলেন। বিষয়টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 'শাহানা-ই-মান্ডি' ও 'দেওয়ান-ই-রিসালাত' -এর ওপর।

৩- জমি জরিপ ও রাজস্ব সংস্কার। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম জমি জরিপ করে রাজস্বব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন। দেশে যাতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেদিকেও তিনি নজর দেন। অপরাধীদের কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হতো। গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি দেশের সমস্ত খবরাখবর রাখতেন। তিনি এক সুদৃঢ় ও কঠোর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দিল্লি সালতানাতকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন।

৪- বর্বর মঙ্গোলদের রুখে দিয়েছিলেন তিনি। তাদের শোচনীয়ভাবে প্রতিহত করেছিলেন।

১৩১৫ সালের ডিসেম্বরে আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যু হয়। এর পরপরই সাম্রাজ্য জুড়ে বিশৃঙ্খলা, একে অপরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, গুপ্তহত্যা ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি মালিক কাফুর নিজেকে সুলতান দাবী করে বসে। কিন্তু আমীরদের সম্মতি না থাকায় তিনি মসনদ ধরে রাখতে পারেননি এবং কয়েক মাসের মধ্যে তাকেও হত্যা করা হয়।

পরবর্তী তিন বছরে একের পর এক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তিনজন সুলতান দিল্লির মসনদে বসেন। নানান গোলযোগের পর সেনাপ্রধান গাজী মালিক বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লিতে অভ্যুত্থান ঘটান এবং দিল্লীর মসনদ নিজ দখলে নেন। এরপর তিনি নিজের নাম বদলে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করেন এবং তুঘলক রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তিনি ভূমিকর হ্রাস করে উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগে নামিয়ে আনলেন। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় খরচে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কৃষিকাজে সেচের জন্য খাল খনন করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের অমর কীর্তি হচ্ছে তারই নির্মিত তুঘলকাবাদ। পুরো শহরটি গোলাপী রঙয়ের গ্রানাইট পাথর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য শহরটি উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এই প্রাচীরগুলোকেও দেখলে অনেকটা দুর্গের মতো মনে হতো।

১৩২৩ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তেলেঙ্গানার কাকতীয় রাজা

www.pathagar.com

প্রতাপ রুদ্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযান চালান। কাকতীয় রাজ্যের রাজধানী ওয়ারঙ্গল দখল করে এর নাম রাখা হলো সুলতানপুর। পুত্র জুনাহ্ খানের নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যেও তিনি একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সে সময় বাংলায় বিভিন্ন স্বাধীন সুলতানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলাকে দিল্লী সালতানাতের অধীনে নিয়ে আসতে চাইলেন। ১৩২৪ সালে তিনি বাংলায় অভিযান চালান এবং সফল হন।[৫২]

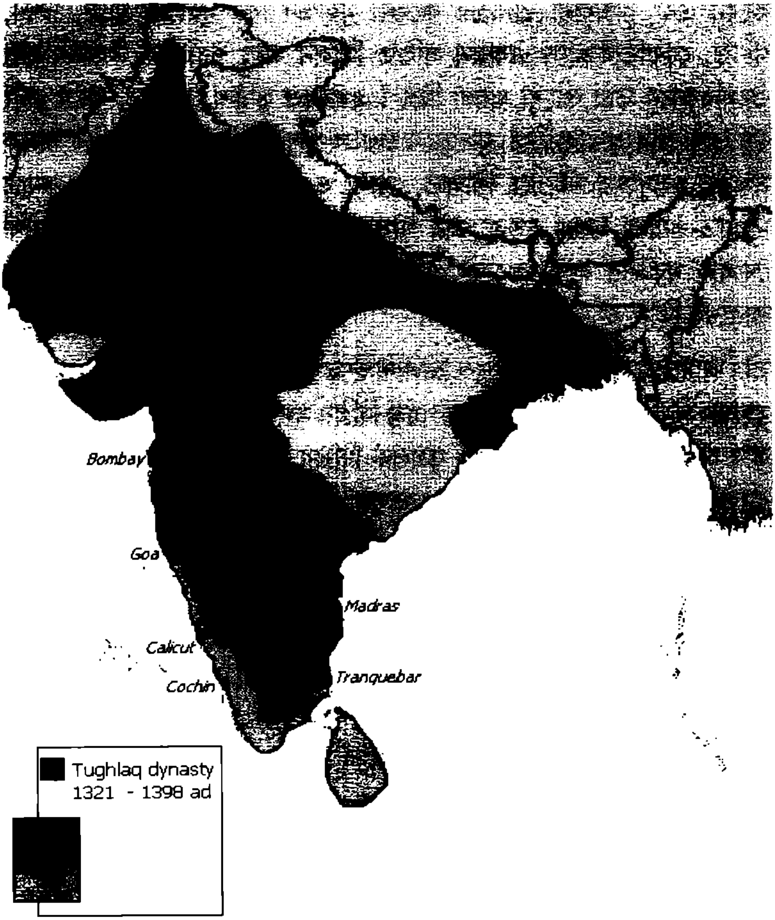

৫২. তারিখ ই ফিরুজশাহী / জিয়াউদ্দিন বারানী / দিব্য প্রকাশ / পৃ. ৩৩৭-৩৪০

www.pathagar.com

১৩২৫ সালে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মৃত্যুর পর তার পুত্র উলুগ খাঁ জুনাহ খান দিল্লির রাজসিংহাসনে বসেন। ইতিহাসে তুঘলক বংশের এই শাসক মুহাম্মদ বিন তুঘলক নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। 'মুহাম্মদ বিন তুঘলক' নামের মানে হচ্ছে তুঘলকের পুত্র মুহাম্মদ। ১৩২৫ সালে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের পর হিন্দুস্তান যেন এক নতুন যুগে প্রবেশ করলো। তিনি শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলো সংস্কার নিয়ে আসেন, তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন এবং রাজধানী স্থানান্তর করেন। মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ যুক্তি, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানে একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং শারিরীক বিজ্ঞান এবং ঔষধবিজ্ঞানে তার ভালো ধারণা ছিল । এছাড়াও তুর্কিশ, আরবি, ফার্সি এবং উর্দু ভাষা তার আয়ত্তে ছিল। মুলতানে জন্মগ্রহণকারী তুঘলক বংশের এই শাসক সম্ভবত মধ্যযুগের সবচেয়ে শিক্ষিত, যোগ্য ও দক্ষ সুলতান ছিলেন। একমাত্র বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা তার শাসনামলের সমালোচনা করেন। আল্লামা গোলাম মর্তুজার মতো অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণেই তিনি এমনটা লিখেছিলেন।

তার আমলেই বাংলা দিল্লি থেকে আলাদা হয়ে যায় শাহ-ই-বাঙ্গালাহ'র নেতৃত্বে। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩৫১ সাল পর্যন্ত দিল্লির সুলতান ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার চাচাতো ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লির ক্ষমতায় আসীন হন। এদিকে বাংলা, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নেপাল, আরাকানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় বাংলা সালতানাত। ১৩৪২ সালে সেনাপতি শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে লখনৌতির সুলতান ঘোষণা করেন। তিনি অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যসমূহও জয় করার মাধ্যমে নিজের শাসন সংহত করেন এবং ১৩৫২ সালে নিজেকে স্বাধীন বাংলার সুলতান ঘোষণা করেন। এজন্য তাকে শাহ-ই-বাঙ্গালাহ বলা হয়ে থাকে।

অবহেলিত বাংলা যেভাবে 'শাহী বাংলা'-তে পরিণত হলো

শাহী বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৫২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের হাত ধরে। এর মাধ্যমে বাংলা দিল্লি সালতানাত থেকে আলাদা হয়। সমগ্র বাংলা অঞ্চল, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নেপাল, আরাকানের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় বাংলা সালতানাত। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ পুনরায় সেই হারিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া শব্দ বঙ্গকে তুলে এনেছেন। বঙ্গ থেকেই তিনি সালতানাতের নাম দেন বাঙ্গালাহ। বাংলা ভাষা ও বাংলার জাতিসত্তা বিকাশে তাই শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত ছিল। সে সময় বিশ্বের মোট উৎপাদনের (জিডিপির) ১২ শতাংশ উৎপন্ন হতো সুবাহ বাংলায়, যা সে সময় সমগ্র ইউরোপের জিডিপির চেয়ে বেশি ছিল।[৫৩] সারা পৃথিবী থেকে এখানে ব্যবসায়ীরা আসতেন বাণিজ্য করার জন্য।

ইলিয়াস শাহ ইরানের সিজিস্তানের এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের শুরুর দিকে তিনি দিল্লির মালিক ফিরোজের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন। পরে সাতগাঁও-এর তুঘলক শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন ইয়াহিয়ার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। নিজ যোগ্যতা বলে তিনি মালিক পদে উন্নীত হন। ইজ্জউদ্দিন ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তিনি ১৩৩৮ সালে সাতগাঁওয়ের শাসক হন। সেখানে তার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি লখনৌতির আলাউদ্দিন আলী শাহ-এর বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ উপাধি নিয়ে ১৩৪২ সালে লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেন।

লখনৌতিতে তার ক্ষমতা সুদৃঢ় করে ইলিয়াস শাহ রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৩৪৪ সালে সহজেই ত্রিহুত দখল করেন এবং ১৩৫০ সালে নেপালের তরাই অঞ্চলে এক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন। ইতঃপূর্বে কোনো মুসলিম বাহিনী এ অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি রাজধানী কাঠমুণ্ডু পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে স্বয়ম্ভুনাথ মন্দির অধিকার করেন। অতঃপর ইলিয়াস শাহ পূর্ব বাংলায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহকে পরাজিত করে ১৩৫২ সালে সোনারগাঁও অধিকার করেন। এরূপে তিনি সমগ্র বাংলার অধিপতি হন। শামস-ই-সিরাজ আফিফ তাকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' ও 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' বিশেষণে ভূষিত করেন।

---

৫৩. Developing cultures: case studies / Peter L. Berger / P. 158

www.pathagar.com

ইলিয়াস শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং জয়পুর ও কটকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত পৌঁছেন। অতঃপর ইলিয়াস শাহ্ ১৩৫৩ সালে বিহার আক্রমণ করেন। বিহারের পরেও তিনি তার কর্তৃত্ব চম্পারণ, গোরখপুর এবং বেনারস পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

ইলিয়াস শাহের সাথে দিল্লির সুসম্পর্ক তখনো হয়নি। সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক ইলিয়াস শাহকে দমন করার জন্য বাংলা অভিমুখে অভিযান করেন। ইলিয়াস শাহ তাকে রুখে দেন। পরবর্তীতে ইলিয়াস শাহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে ফিরোজ শাহ তুগলক দিল্লি ফিরে যান। ইলিয়াস শাহ্ সফল সেনানায়ক ছিলেন। ফিরোজ শাহকে তিনি যেভাবে প্রতিহত করেন, তা থেকেই ইলিয়াস শাহের কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫৫৩ সালে ৯০ হাজার অশ্বারোহী এবং এক লাখ পদাতিক সেনা ও তীরন্দাজ নিয়ে ফিরোজ বাংলা অভিযানে আসেন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে অবস্থান নেন।

দিল্লির দরবারের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারুণীর মতে, "পাণ্ডুয়ার পার্শ্বেই 'একডালা' নামে একটি দুর্গ আছে, যার একদিকে নদী, অন্যদিকে জঙ্গল।' ফিরোজ শাহ এই দুর্গ অবরোধ করলে প্রথম দিনই প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এতে ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকান্দার শাহ দিল্লির বাহিনীর হাতে বন্দি হন। ২২

www.pathagar.com

দিন অবরোধের পরও দুর্গ দিল্লির দখলে নিতে পারলো না দিল্লির বাহিনী। তখন ফিরোজ শাহ্ একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি অবরোধ প্রত্যাহারের কথা বলে পিছু হটেন। এই দেখে ইলিয়াস শাহ্ দশ হাজার অশ্বারোহী, ২ লাখ পদাতিক সৈন্য এবং ৫০টি হাতী নিয়ে দিল্লির বাহিনীকে আক্রমণ করেন। ফিরোজ শাহ এটিই চেয়েছিলেন। তিনিও ঘুরে আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু তার কৌশল কাজ করলেও শেষমেশ ফিরোজ জিততে পারেননি। পিছু হটে গিয়ে ইলিয়াস আবার দুর্গে প্রবেশ করেন।

ফিরোজ শাহ্ আবার দুর্গ অবরোধ করেন। অনেকদিন অবরোধের পর যুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে না চিন্তা করে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক সন্ধি প্রস্তাব করেন। তাছাড়া বর্ষা ঋতু চলে আসায় তার সৈন্যরাও পড়েছিল বিপদে।

১. ইলিয়াস শাহ্ বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তা থাকবেন।

২. দিল্লির দরবারে বার্ষিক কর ও উপঢৌকন পাঠাবেন।

৩. পাণ্ডুয়ায় বন্দি সকল সৈন্যকে ফিরোজ শাহ্ মুক্তি দেবেন।

এর ফলে ইলিয়াস শাহের স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করতে আর কোনো বাধা থাকলো না। পরবর্তীতে বাংলা ও দিল্লির সুলতানদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, উপহার ও দূত বিনিময়ের মাধ্যমে আরও দৃঢ় হয়। তাদের মধ্যে প্রায়ই দূত ও উপহার বিনিময় হয়েছিল। দিল্লির সুলতানের সঙ্গে আপোস হলে ইলিয়াস শাহকে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ করে দেয়।

শাসন কাজেও ইলিয়াস শাহ্ দক্ষ ছিলেন। লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁ তিনি একীভূত করেন। অভিজ্ঞ কূটনীতিকের মতো তিনি সময় ও সুযোগকে ব্যবহার করে সমগ্র বাংলাকে একীভূত করেছিলেন এবং তিনি রাজধানী লক্ষ্মণাবতী থেকে সরিয়ে পাণ্ডুয়ায় আনেন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধু, দরবেশ ও সুফি ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তার রাজত্বকালে সাদত, উলামা ও মাশায়েখদের মতো হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরাও সরকার থেকে বৃত্তি পেতেন। তার দরবেশ প্রীতির একটি গল্প প্রচলিত আছে। ফিরোজ শাহ্ যখন একডালা দুর্গ

www.pathagar.com

অবরোধ করে রেখেছিলেন, তখন রাজা বিয়াবানি নামে এক মস্ত দরবেশ মৃত্যুবরণ করেন। ইলিয়াস শাহ্ এ খবর শুনে ছদ্মবেশে দুর্গের বাইরে যান এবং দরবেশের দাফনে অংশ নেন। ফেরার সময় ইলিয়াস তার শত্রু ফিরোজ শাহের শিবিরে প্রবেশ করেন। ফিরোজ তাকে চিনতে পারেননি। বরং দরবেশ ভেবে আপ্যায়ন করেন। ইলিয়াস দুর্গে ফেরার পর ফিরোজ শাহ্ আসল ঘটনা জানতে পারেন। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সালিম তার 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

ইলিয়াস শাহ্ স্থাপত্য শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হাজিপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। সুফি সাধক আলা-উল-হকের সম্মানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ ছাড়া দিল্লির শামসী হাম্মামখানার অনুকরণে ফিরোজাবাদে একটি হাম্মামখানা নির্মাণ করেন।

অভিজ্ঞ কূটনীতিকের মতো ইলিয়াস শাহ্ সমগ্র বাংলাকে একত্রিকরণের সময় ও সুযোগ তার অনুকূলে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। তিনি সুশাসন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তা প্রবর্তন করে বাংলার স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার জন্য জনসমর্থন লাভে প্রয়াসী হন। স্থানীয় জনগণকে উদারভাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে তিনি তার শাসনকে গণশাসনের রূপ দেন। তিনি বর্ণ, গোত্র ও ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য লোকদের চাকরিতে নিয়োগ লাভের সুযোগ দেন।[৫৪]

তিনিই সর্বপ্রথম স্থানীয় লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ দেন। ইনশাহ-ই-মাহরু থেকে জানা যায় যে, খান, মালিক, উমারা, সদর, আকাবির ও মারিফগণ সামরিক ও বেসামরিক শাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এদের মধ্যে খান, মালিক ও আমীরগণ ছিলেন জায়গির ভূমির অধিকারী ও রাজ্যের পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাদের কেউ কেউ হয়তো মন্ত্রী হিসেবে সুলতানের উপদেষ্টাও ছিলেন।

এভাবে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ বাংলার স্বাধীন সালতানাতকে সুদৃঢ় করেন। এ সালতানাত প্রায় দু'শ বছর টিকে ছিল। ষোল বছর গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের পর ১৩৫৮ সালে তার মৃত্যু হয়।

---

৫৪. ইলিয়াস শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2jVfEke / অ্যাকসেস ইন ২সেপ্টেম্বর ২০১৯

www.pathagar.com

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন

১৩৫৮ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ মৃত্যুবরণ করলে তার সুযোগ্য পুত্র সিকান্দার শাহ্ বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি বাংলার মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। প্রায় ৩৫ বছরের শাসনে তিনি বাংলার মুসলিম শাসনকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

তার শাসনামলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক বাংলা জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। সোনারগাঁওয়ের প্রাক্তন শাসক ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের জামাতা পারস্য বংশোদ্ভূত ব্যক্তি জাফর খান ফারস বাংলা থেকে পালিয়ে দিল্লী পৌঁছান। ফিরোজ শাহ্ তাকে বাংলার ন্যায়সঙ্গত শাসক বলে ঘোষণা করেন। জাফর খানের আহ্বানে ১৩৫৯ সালে সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলক ৮০, ০০০ অশ্বারোহী, ৪৭০ হস্তী ও বড় আকারের পদাতিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীকে ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব দেন। পিতার মত সিকান্দার শাহ্ও একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ্ প্রাসাদ অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত ফিরোজ শাহ্ বাংলা থেকে তার বাহিনী ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হন এবং সিকান্দার শাহের সাথে সন্ধি করেন। এভাবে ফিরোজ শাহের দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর ফলে সিকান্দার শাহ্ স্বাধীনভাবে দীর্ঘদিন ধরে নির্বিঘ্নে বাংলাদেশ শাসন করেন।[৫৫], [৫৬]

সুলতান সিকান্দার শাহ্ করিতকর্মা ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। তিনি দায়ী, সুফী ও দরবেশদের শ্রদ্ধা করতেন। তার শাসনামলের উজ্জ্বল কীর্তি হযরত পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত আদিনা মসজিদ। প্রায় দশ বছর ধরে [১৩৭৪-৮৪] এই মসজিদ নির্মিত হয়। এটি বাঙালিদের কাছে পৃথিবীর আশ্চর্যতম ইমারত ছিল। পাথর ও পোড়া মাটির নকশা করা এই বৃহৎ মসজিদটি বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। এছাড়া ১৩৬৩ সালে দিকে সিকান্দার শাহ্ দিনাজপুরের দেবকোটে মোল্লা আতার দরগাহে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তার রাজদরবারে বহু সুফী, দরবেশের সমাগত ঘটে। এদের মধ্যে শেখ আলাউল হক ও শেখ সরফউদ্দিন ইয়াহিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৭]

---

৫৫. The Delhi Sultanate / R.C. Majumdar / P. 202, 203

৫৬. Far East Kingdoms / The History File / https://bit.ly/3rYL0EQ / অ্যাকসেস ইন ৬জানুয়ারী ২০২১

৫৭. সিকান্দর শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3hOzBmn / অ্যাকসেস ইন ৬জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

প্রজাহিতৈষী ও সুশাসক সুলতান সিকান্দার শাহের শেষ জীবন সুন্দর ছিল না। সিকান্দার শাহের দুই স্ত্রী ছিল। ১ম স্ত্রীর ১৭ জন পুত্র ছিল আর দ্বিতীয় স্ত্রীর একজন পুত্র ছিল। সেই পুত্র গিয়াসউদ্দিন বিমাতার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। গিয়াসউদ্দিন শাসনকার্যে ও যুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। সেই কারণে সিকান্দার শাহ তাকেই পরবর্তী শাসক নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার বিমাতা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন ও সিকান্দার শাহকে তার প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। অবশেষে গিয়াসউদ্দিন রাজধানী পাণ্ডুয়া ত্যাগ করে সোনারগাঁয়ে চলে যান। সেখানে তিনি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সিকান্দার শাহও একটি সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে পুত্রের মোকাবিলা করলেন। ১৩৯৩ সালে গোয়ালপাড়ায় পিতা-পুত্রের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধে সুলতান সিকান্দার শাহ পুত্র গিয়াসউদ্দিনের কাছে পরাজিত হন।[৫৮]

গিয়াস উদ্দিন 'আযম শাহ' নামধারণ করে বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসে। তিনি ১৩৮৯ থেকে ১৪১০ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন। রাজ্যের বিস্তৃতির চেয়ে তিনি রাজ্যকে সুদৃঢ় করার দিকে বেশি মনোযোগ দেন। তিনি তার রাজত্বের প্রথম দিকে শুধু কামরূপে অভিযান করে তা দখল করেন এবং কামরূপের ওপর কয়েক বছর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ তার আদর্শ চরিত্র, শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা এবং সুশাসনের জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। আইনের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তার বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকরা কাজীর কাছে মামলা করার অধিকার রাখতো। তার বিরুদ্ধে বলার মতো অভিযোগ হলো তিনি তার পিতা ও সৎ ভাইদের শাস্তি দিয়েছেন।[৫৯]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ নিজে বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তিনি বিদ্বান লোকদের খুব সমাদর করতেন। মাঝে মাঝে তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় কবিতা লিখতেন। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তার পত্রালাপ ছিল। একবার তিনি হাফিজের নিকট কবিতার একটি চরণ লিখে পাঠান এবং কবিতাটিকে পূর্ণ করার জন্য কবিকে অনুরোধ জানান। তিনি তাকে বাংলায় আসার আমন্ত্রণও

---

৫৮. Far East Kingdoms, South Asia / https://bit.ly/38Vvzpz / অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১

৫৯. পর্যটকদের আকর্ষণ গিয়াস উদ্দিন আযম শাহর সমাধি / মনিরুজ্জামান / দৈনিক প্রথম আলো/ ১৬ জানুয়ারী, ২০১৭

www.pathagar.com

জানান। হাফিজ দ্বিতীয় চরণটি রচনা করে কবিতাটি পূর্ণ করে পাঠান। তিনি সুলতানের নিকট একটি গজলও লিখে পাঠান। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ বাংলা সাহিত্যের উন্নতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শাহ মুহম্মদ সগীর তার বিখ্যাত কাব্য 'ইউসুফ জোলেখা' রচনা করেন।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ তার পিতা (সুলতান সিকান্দার শাহ্) ও পিতামহের (সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্) মতোই্ আলেম ও সুফিদের অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বিদ্বান ও ধার্মিকদের উদার পৃষ্ঠপোষকতাও করতেন। তার সামসময়িকদের মধ্যে শেখ আলাউল হক ও নূর কুতুব আলম খুবই বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বিহারের শেখ মুজাফফর শামস বলখীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। মুজাফফর শামস বলখীর সঙ্গে তার পত্রালাপ ছিল। তিনি পবিত্র মক্কা ও মদীনার তীর্থযাত্রীদের সব ধরনের সাহায্য দিতেন। তিনি একাধিকবার মক্কা ও মদীনা শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাংলায় প্রচুর মাদরাসা ও খানকাহ্ স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া মক্কার উম্মে হানির ফটকে একটি এবং মদীনার 'বাব আল-সালামে'র (শান্তির দ্বার) নিকটে অপর একটি মাদরাসা নির্মাণ করান। এ প্রতিষ্ঠান দু'টির জন্য তিনি প্রয়োজনীয় অর্থও প্রদান করেন। এ দু'টি মাদরাসা 'গিয়াসিয়া মাদরাসা' নামে পরিচিত। তিনি আরাফায় পানির বন্দোবস্তের জন্য ত্রিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা প্রেরণ করেন।

বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জন্য গিয়াসউদ্দিন বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার মক্কা ও মদীনায় দূত পাঠিয়েছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ জৌনপুরের সুলতান খাজা জাহানের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং উপঢৌকন স্বরূপ তাকে কয়েকটি হাতিও পাঠান। তিনি সমসাময়িক চীন সম্রাট ইয়ংলোর সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ১৪০৫, ১৪০৮ ও ১৪০৯ সালে চীনে দূত পাঠিয়েছিলেন। চীন সম্রাট দূতদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান এবং প্রতিদানে তিনিও বাংলার সুলতানের নিকট দূত ও উপঢৌকন প্রেরণ করেন।[৬০]

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, তার সময় হিন্দুরা তার দরবারে বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর ফলে ভাতুরিয়ার বর্তমান

৬০. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ/বাংলাপিডিয়া/https://bit.ly/3bREJ8e/অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

দিনাজপুরের জমিদার রাজা গণেশের উত্থান ঘটে। ১৪১০ সালে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এর মৃত্যু হয়। ধারণা করা হয় রাজা গণেশ সুলতানকে হত্যা করে। রাজা গণেশ পনের শতকের প্রারম্ভে ইলিয়াস শাহী বংশের দুর্বল সুলতানের নিকট থেকে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে বাংলার রাজা হন। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালের শেষের দিকে ফিরুজাবাদের (পাণ্ডুয়া) ইলিয়াসশাহী রাজদরবারে যে সকল অমাত্য প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন, গণেশ তাদের অন্যতম। তিনি সাইফুদ্দীন হামজাহ শাহ, শিহাবউদ্দিন বায়েজীদ শাহ ও আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে বাংলার রাজনীতিতে ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকা পালন করেন এবং কম করে হলেও চার বছর (১৪১০-১৪১৪) রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা তার হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করেন এবং বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হত্যা করে ১৪১৫ সালে বাংলার সিংহাসন দখল করেন।[৬১]

গণেশের উত্থান

গণেশের বাংলার সিংহাসনে আরোহণ দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা ও গভীর ষড়যন্ত্রের ফল। গণেশ ও তার সমমনা হিন্দু সামন্তবর্গ বাংলায় মুসলমানদের শাসন মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। যদিও বিগত দুই শতকের ইতিহাসে মুসলিম শাসকগণ কর্তৃক অমুসলমানদের প্রতি কোনো প্রকার উৎপীড়নের নজির পাওয়া যায় না, তারপরও মুসলিম শাসনকে তারা হিন্দুজাতির জন্যে চরম অবমাননাকর মনে করতো। তাই গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করার পর মুসলিম নির্মূলে আত্মনিয়োগ করে। এভাবে মুসলমানদের প্রতি তার বহুদিনের পুঞ্জিভূত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

ইসলাম প্রচারক শায়খ বদরে ইসলাম এবং তার পুত্র ফয়জে ইসলাম গণেশকে অবনত মস্তকে সালাম না করার কারণে তিনি উভয়কে হত্যা করেন। শুধু তাই নয়, বহু মুসলমান ওলী দরবেশ, মনীষী, পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদকে গণেশ নির্মমভাবে হত্যা করেন। মুসলিম নিধনের এ লোমহর্ষক কাহিনী শ্রবণ করে শায়খ নূর কুতুবে আলম মর্মাহত হন এবং জৌনপুরের গভর্ণর সুলতান ইব্রাহীম শর্কীকে বাংলায় আগমনের আহ্বান জানান। সুলতান ইব্রাহীম বিরাট বাহিনীসহ

---

৬১. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ৩৪-৩৫

www.pathagar.com

বাংলা অভিমুখে যাত্রা করে ফিরোজপুরে শিবির স্থাপন করেন। রাজা গণেশ জানতে পেরে ভীত হয়ে কুতুবে আলমের শরণাপন্ন হন এবং নিজেকে মুসলিম দাবী করেন। শুধু তাই নয় তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেন তার পুত্র যদুর কাছে। যদু ইতিমধ্যে মুসলিম হয়ে জালাল উদ্দিন নাম ধারণ করে।

শায়খ নূর কুতুবে আলম গণেশের এই চালাকি ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সুলতান ইবরাহীম শর্কিকে ফেরত যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। ইবরাহীম শর্কি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফেরত চলে যান। তার প্রত্যাবর্তনের পরপরই গণেশ জালালউদ্দিনের নিকট থেকে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। গণেশ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পর সুবর্ণধেনু অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মচ্যুত যদুর শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। অর্থাৎ একটি নির্মিত সুবর্ণধেনুর মুখের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে তার মল ত্যাগের দ্বার দিয়ে হিন্দু শাস্ত্রের বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতিতে বহির্গত হওয়াই হলো শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি। এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের পর গণেশ দেশ থেকে মুসলমানদের মূলোৎপাটনের কাজ পুনরায় শুরু করে। সে পূর্বের চেয়ে অধিকরত হিংস্রতার সাথে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। সে কুতুবে আলমের পুত্র শায়খ আনওয়ারকে হত্যা করে ও পৌত্র শায়খ জাহিদকে নির্বাসনে পাঠায়। যদু প্রকৃত অর্থেই মুসলিম হয়েছিল। তিনি তার পিতার অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অবশেষে গণহত্যার অভিযোগে যদু ওরফে জালালউদ্দিন তার পিতা গণেশের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।[৬২]

ইলিয়াস শাহী বংশের পুনরুত্থান

গণেশের পরিকল্পনা ছিল এক রকম, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছে ছিল ভিন্ন। রাজা গণেশ তার ছেলে যদুকে প্রতারণা করে মুসলিম বানিয়েছিল। কিন্তু যদু সত্যিকার অর্থেই মুসলিম হয়েছিলেন। যদু জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামধারণ করে বাংলার সুলতান হন। তিনি দু'পর্যায়ে ১৪১৫ থেকে ১৪১৬ এবং ১৪১৮ থেকে ১৪৩৩ সালে পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। ১৪১৬ সালে রাজা গণেশ তাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দি করে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। তার প্রকৃত শাসন শুরু হয় ১৪১৮ সালে রাজা গণেশ ও তার কনিষ্ঠ পুত্র মহেন্দ্রের চূড়ান্ত উৎখাতের পর।

---

৬২ বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৮০-৮২

www.pathagar.com

প্রায় দু'দশকের শান্তিপূর্ণ রাজত্বকাল জালালউদ্দিনকে পূর্ববঙ্গ ও চট্টগ্রামসহ প্রায় সমগ্র বাংলার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তিনি ফতেহাবাদ (ফরিদপুর) অধিকার করেন এবং দক্ষিণবঙ্গে রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। তিনি, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু শাসক ছিলেন।

তিনি দায়ি, পীর, উলামা ও শেখদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি রাজা গণেশ কর্তৃক ধ্বংসকৃত মসজিদ, খানকাহ ও মাদরাসা পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করেন এবং নতুন মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তার আমলে পাণ্ডুয়া সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। তিনি তার রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে (চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ) স্থানান্তর করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ, একটি পুকুর (জালালী পুকুর) ও একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন। তখন বাংলা পৃথিবীর অন্যতম ধনী অঞ্চল ছিল। জালালউদ্দিন পবিত্র মক্কা নগরীতে বিতরণের জন্য অর্থ প্রেরণ করেন এবং সেখানে একটি মাদরাসা নির্মাণ করান। তার রাজত্বকালে বাংলার সম্পদ ও জনবল বৃদ্ধি পায়।[৬৩]

জালালউদ্দিন হিরাতের তৈমুরি শাসক শাহরুখ, চীনের ইয়াং লো এবং মিশরের মামলুক সুলতান আল-আশরাফ বার্সবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি 'সুলতান' ও আমীর উভয় উপাধি ব্যবহার করেন এবং আব্বাসীয় খলিফার নিকট থেকে সম্মানসূচক পোশাক খিলাত ও খেতাব লাভ করেন। বাংলার সুলতানরা তখন থেকে আব্বাসীয় সুলতানদের আনুকূল্য তাদের মৌখিক প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ খলিফাতুল্লাহ উপাধি ধারণপূর্বক তিনি ১৪৩১ সালে একটা নতুন মুদ্রা চালু করেন। তিনি তার মুদ্রায় কালিমা উৎকীর্ণ করেন।

সুলতান জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ-এর দু'টি শিলালিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমটি রাজশাহী থেকে সুলতানগঞ্জ লিপি, এবং অপরটি ঢাকা থেকে মান্দ্রা লিপি। উভয় লিপিই দু'টি মসজিদ স্থাপনের স্মারক। লিপি দু'টির অস্তিত্ব প্রমান করে যে, উক্ত অঞ্চলে সুলতান কর্তৃক বিজিত হয় ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।[৬৪]

---

৬৩. জালালউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3ivbadZ / অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১

৬৪. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৮৩-৮৪

www.pathagar.com

জালালউদ্দিন ১৪৩৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র শামসুদ্দিন আহমাদ শাহ্ ক্ষমতায় আসেন। তবে তিনি বয়সে কম হওয়ায় পুরোপুরি ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হননি। তিনি প্রায় তিন বছর ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি তার পিতার উদারনীতি বজায় রাখেন এবং ন্যায়বিচার ও দানশীলতার জন্য পরিচিত ছিলেন। তার দুইজন মন্ত্রী সাদি খান ও নাসির খান তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। পরে তারা দু'জনই বিবাদে লিপ্ত হয় এবং ক্ষমতাচ্যুত হয়।[৬৫]

১৪৩৭ সালে আমাত্যবর্গ ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদকে ক্ষমতায় বসান। তার মাধ্যমে আবার ইলিয়াস শাহী বংশ ক্ষমতায় আসে। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তার রাজত্বকালে বাংলা দিল্লি সালতানাতের সাথে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়নি। তিনি তার রাজ্যের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের দিকে সময় ও মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পান। তদুপরি নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বাংলার সামরিক শক্তিও পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং এর ফলে সামরিক বিজয়ও লাভ করেন।[৬৬]

তার রাজত্বকালে খানজাহান আলী খুলনা-যশোহর এলাকা জয় করেন। খান জাহান দিল্লির তুগলক সুলতানদের অধীনে একজন আমীর ছিলেন। তিনি বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের নিকট থেকে সুন্দরবন বনাঞ্চল জায়গির লাভ করেন। সুন্দরবন এলাকায় তিনি জনবসতি গড়ে তোলেন। অচিরেই তার দুই নায়েব বুরহান খান ও ফতেহ খানের অক্লান্ত পরিশ্রমে মসজিদকুড় (খুলনা জেলার বয়রা থানাধীন) এবং কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরবর্তী সন্নিহিত এলাকা বাসোপযোগী করে তোলা হয়। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে, খান জাহান বৃহত্তর যশোর ও খুলনা জেলার অংশে প্রথম মুসলিম বসতি গড়ে তুলেছিলেন। তার সমাধিসৌধের ফলকে উৎকীর্ণ 'উলুগ খান' ও 'খান-ই-আযম' উপাধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খান জাহান একজন স্বাধীন সৈনিক ছিলেন না, বরং তিনি গৌড়ের সুলতানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি নড়াইলের উত্তরে নলদি পর্যন্ত বিস্তৃত খলিফতাবাদ পরগণা শাসন করতেন।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অগ্রগতি ছিল

---

৬৫. শামসুদ্দিন আহমদ শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3ilT91M / অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১
৬৬. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

মুসলিম উপনিবেশের দৃঢ় সম্প্রসারণ এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বসতি স্থাপন। দক্ষিণ বাংলায় মুসলিম বসতি স্থাপনের এ প্রক্রিয়ার পুরোধা ছিলেন খান জাহান। মসজিদ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং এ ধরনের আরও বহু জনহিতকর কাজের মাধ্যমে তিনি পুনর্বাসনের একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাজ্যের অন্যান্য অংশেও মুসলিম বসতি স্থাপন ও উপনিবেশ সম্প্রসারণের অনুরূপ কাজ চলতে থাকে।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শিল্প ও স্থাপত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তার রাজত্বকালে বহু মসজিদ, খানকাহ, সেতু ও সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। তার রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে বাগেরহাটের খান জাহানের ষাটগম্বুজ মসজিদ, মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে সরফরাজ খানের নির্মিত দু'টি মসজিদ (১৪৪৩), গৌড়ের নিকটবর্তী এলাকায় জনৈক হিলালী কর্তৃক নির্মিত মসজিদ (১৪৫৫), ঢাকার বখত বিনত মসজিদ (১৪৫৫) এবং ভাগলপুরে খুরশীদ খানের মসজিদ (১৪৪৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাগেরহাটে খান জাহান আলীর সমাধিসৌধ এবং হজরত পাণ্ডুয়ায় জনৈক আল্লামার সমাধিসৌধ তার রাজত্বকালে নির্মিত হয়। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নিজে গৌড়ে একটি দুর্গ ও প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। বহু ইমারত দ্বারা তিনি গৌড় শহর সুসজ্জিত করেন। স্থাপত্যকীর্তিসমূহের মধ্যে পাঁচটি খিলানবিশিষ্ট পাথরের সেতু, দুর্গের পুরু দেওয়াল এবং কোতোয়ালী দরওয়াজার অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। উপরিউক্ত ইমারতসমূহ নাসিরুদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকালে শান্তি ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে।

নাসিরুদ্দিন মাহমুদ একজন আদর্শ সুলতান ছিলেন এবং তার রাজত্বকালে সাধারণ ও অভিজাত, ধনী ও দরিদ্র সর্বস্তরের মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করতো। গোলাম হোসেইন সলিমও তাকে উদার ও ন্যায়পরায়ণ সুলতান বলে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, তার সুশাসনে যুবক-বৃদ্ধ সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। চব্বিশ বছর শান্তিপূর্ণ রাজত্বের পর ১৪৫৯ সালে সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ এর মৃত্যু হয়।[৬৭]

---

৬৭. নাসিরুদ্দি মাহমুদ শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3sz4AYD / অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তার ছেলে বাংলার ক্ষমতায় আসেন রুকনউদ্দিন বারবাক শাহ্। তিনি ১৪৫৯ সাল থেকে ১৪৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলার ক্ষমতায় ছিলেন। রুকন উদ্দিন তার বাবার মতই খ্যাতিমান ছিলেন।

বারবাক শাহের শাসনামলে কলিঙ্গের গজপতি রাজ্যের (বর্তমান উড়িষ্যা) রাজা দক্ষিণ বঙ্গ আক্রমণ করেন এবং মান্দারান দুর্গ দখল করেন। বারবাক শাহ্ তার সেনাপতি শাহ্ ইসমাইল গাজীকে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইসমাইল গাজি কলিঙ্গের সেনাদের পরাজিত করে দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। কামরূপের (বর্তমান আসাম) রাজা কামেশ্বর বাংলার উত্তর অঞ্চলে আক্রমণ করেন। শাহ ইসমাইল গাজীকে এবারও কামরূপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। সন্তোষের যুদ্ধক্ষেত্রে বারবাক শাহের সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলেও ইসমাইল গাজী তার গুণের কারণে কামেশ্বরের মন জয় করেন। কামরূপের রাজা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বারবাক শাহের অধীনতা স্বীকার করেন।

তবে ইসমাইল গাজীর শাসন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গুজব ছড়ায় যে তিনি কামেশ্বরের সাথে পরিকল্পনা করে নিজের জন্য কামরূপে একটি স্বাধীন রাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। বারবাক শাহ্ ইসমাইল গাজীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। বারবাক শাহের আমলে সিলেট, আসাম ও চট্টগ্রামে সুলতানী শাসন দৃঢ় হয়।

বারবাক শাহের আমলে সাহিত্য সংস্কৃতি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পায়। তার নির্দেশনায় ইবরাহিম কাওয়াম ফারুকী শরফনামা নামে একটি ফারসি ভাষার অভিধান রচনা করেন। বারবাক শাহের সভাকবি ছিলেন জৈন উদ্দিন হারবি। এছাড়াও তার সভা অলংকৃত করে রাখতেন শাহ উদ্দিন হাকিম কিরামানি, মনসুর শিরাজি, মালিক ইউসুফ, সৈয়দ জালাল, সৈয়দ মুহাম্মদ রুকন, সৈয়দ হাসান, শায়খ ওয়াহেদীসহ অনেক কবি ও পণ্ডিতগণ।

বারবাক শাহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তিনি আট হাজার হাবশি সৈন্য আমদানি করেন। তিনি তার পূর্বপুরুষের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাই হিন্দুমুক্ত করে স্পেশাল এই হাবশিদের দিয়ে তার রাজবংশ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর এই হাবশীদের হাতেই ইলিয়াস শাহী বংশ পুরোপুরি ক্ষমতা হারায়।[৬৮]

৬৮. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৮৮-৮৯

www.pathagar.com

১৪৭৪ সালে বারবাক শাহের মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ ক্ষমতায় আসেন। তার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি 'খলিফাতুল্লাহ বিল হুজ্জত ওয়াল বুরহান', 'সুলতান-উস-সালাতীন', 'জিল্লুল্লাহ ফিল আলামীন' এবং 'খলিফাতুল্লাহ ফিল আরদিন' উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ একজন আদর্শ, বিচক্ষণ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তার শাসন ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি তার সালতানাতে শরীয়া আইন কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং তার রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। ন্যায় বিচারের প্রতি অনুরাগী ইউসুফ শাহ প্রায়ই আলেম ও কাজীদের তার দরবারে ডেকে পাঠাতেন এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিতেন। আইন বিশারদ হিসেবে জটিল মামলায় তিনি প্রায়শ কাজীদের সাহায্য করতেন।[৬৯]

সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি জৈনু উদ্দিন তার 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনা করেন। ধার্মিক মুসলমান হিসেবে তিনি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজার সঙ্গে অভিন্ন আচরণ করতেন। ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে অনেক মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এগুলির মধ্যে মালদহের সাকোমোহন মসজিদ, তাঁতিপাড়া মসজিদ, লট্টন মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ এবং গৌড়ের (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) দারাসবাড়ি মসজিদ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মেজর ফ্রাঙ্কলিনের মতে ইউসুফ শাহ পাণ্ডুয়ার সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান ইউসুফ শাহ সাত বছর রাজত্ব করার পর ১৪৮১ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

তার মৃত্যুর পর তার ভাই জালাল উদ্দিন ফাতেহ শাহ ক্ষমতায় আসেন। এই আমলেই মূলত হাবশিরা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে। ফাতেহ শাহ পুনরায় নিয়ন্ত্রণ লাভ করার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয় ও পরবর্তীকালে ১৪৮৭ সালে হাবশি প্রাসাদরক্ষীদের প্রধান তাকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর মাধ্যমে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনের সমাপ্তি হয়।[৭০], [৭১]

---

৬৯. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৯০

৭০. শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2N6Sfui / অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১

৭১. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৯১-৯২

www.pathagar.com

হাবশি শাসন

শাহজাদা বারবাক বাংলায় হাবশি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি জালাল উদ্দিন ফাতেহ শাহ-এর রাজত্বে তার প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। কিন্তু তার রাজত্ব একমাস বা তার চেয়ে বেশি কিছুদিন বলে জানা যায়। পুরো হাবশি রাজবংশ বাংলায় বেশিদিন ক্ষমতায় ছিল না। তারা প্রায় সাত বছরের মতো ক্ষমতায় ছিল। এর মধ্যে শাসক এসেছেন চারজন। শাহজাদা বারবাকের পর সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ ক্ষমতায় এসেছেন। তিনি দু'বছরের কাছাকাছি সময় শাসন করেছেন। এরপর দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ। তিনি এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন শামসুদ্দিন মোজাফফর শাহ। তিনি প্রায় চার বছর সময় ধরে বাংলার ক্ষমতায় ছিলেন। হাবশি সুলতান মোজাফফর শাহ অত্যাচারী শাসক ছিলেন। এ সময় তার উজির ছিলেন সৈয়দ হোসেন। তার প্রধান উজির সৈয়দ হোসেনের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং তিনি নিহত হন। তার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলায় সাত বছরের হাবশি শাসন শেষ হয় এবং একই সাথে হোসেন শাহী রাজবংশ ক্ষমতায় আসে।[৭২]

হোসেন শাহী আমল

সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নাম ধারণ করে ১৪৯৪ সালে বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। হোসেন শাহী রাজবংশ ১৪৯৪ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। তার রাজত্বকালে বাংলায় এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ দেখা যায়। তিনি কামরূপ, কামতা ও উড়িষ্যার জাজনগর অধিকার করেছিলেন। তার রাজ্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বকালেই চট্টগ্রামে পর্তুগিজ বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়। বাবরের ভারত অভিযানকালে নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ আফগান নেতাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজে নিরপেক্ষ থাকেন। নুসরত শাহ বাবরের সঙ্গে চুক্তি করে বাংলাকে বাবরের অভিযানের হাত থেকে রক্ষা করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ এই বংশের শেষ সুলতান যিনি গৌড় থেকে রাজ্যশাসন করতেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে তাকে আফগান শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ১৫৩৮ সালে আফগানরা গৌড় অধিকার করে।

৭২ বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ৯৩-৯৪

www.pathagar.com

এরপর মোঘল শাসনের পূর্বে কয়েক দশক তারা গৌড়েই বসবাস করেছিলেন। হোসেন শাহী বংশের শাসকবৃন্দ হলেন, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯), নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (১৫১৯-১৫৩৩), দ্বিতীয় আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৫৩৩), গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮)। এরা প্রত্যেকেই সুশাসক ছিলেন। এরাই ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান। এরপর আফগানরা বাংলা শাসন করতে শুরু করে।

ক্ষমতালাভ করার পর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এজন্য তাকে অনেক কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। এরপর তিনি প্রাসাদ রক্ষীদের দলকে বিলুপ্ত করেন। প্রাসাদের ভেতর এরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি ছিল। প্রশাসন থেকে তিনি হাবশিদের সরিয়ে দেন এবং তাদের স্থলে তুর্কি, আরব, আফগান ও স্থানীয় লোকদের নিয়োগ দেন।

জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শারকি বাহলুল খান লোদির কাছে পরাজিত হওয়ার পর বিহারে ফিরে আসেন। সেখানে অল্প এলাকায় তার কর্তৃত্ব বহাল ছিল। ১৪৯৪ সালে তিনি পুনরায় সিকান্দার লোদির কাছে পরাজিত হন এবং বাংলায় পালিয়ে যান। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এর ফলে সুলতান সিকান্দার লোদি ১৪৯৫ সালে বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। দিল্লীর সেনাদের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তার পুত্র দানিয়েলের অধীনে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। দুই বাহিনী পাটনার কাছে বড়হ নামক স্থানে মিলিত হয়। সিকান্দার লোদি তার সেনাদের অগ্রযাত্রা থামানোর নির্দেশ দেন এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করেন। এই চুক্তি মোতাবেক বড়হের পশ্চিমাঞ্চল সিকান্দার লোদির অধীনে যাবে এবং পূর্বাঞ্চল আলাউদ্দিন হোসেন শাহের অধীনে থাকবে। জৌনপুর সালতানাতের চূড়ান্ত বিলুপ্তির ফলে এর সেনারা বাংলার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একে শক্তিশালী করে তোলে।

১৪৯৯ থেকে ১৫০২ সাল পর্যন্ত হোসেন শাহ কামরূপ ও কামতা রাজ্য আক্রমণ করেন এবং হাজো (আসামের গুয়াহাটি) পর্যন্ত এলাকা দখল করে নেন। এরপর একের পর এক উড়িষ্যার, ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানে তিনি তার কর্তৃত্ব সুসংহত করেন। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে সমুদ্রপথে ভারত আসেন। হোসেন শাহের রাজত্বের শেষের দিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি পর্তুগিজ দল বাংলায় আসে।

www.pathagar.com

হোসেন শাহ দুর্বলচিত্তের মুসলমান ছিলেন। তিনি মসজিদ, মাদরাসাও তৈরি করেছেন, আবার মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বও করেছেন। তিনি মালদহে একটি বিরাট মাদরাসা নির্মাণ করেন এবং পাণ্ডুয়াতে নূর-কুতুব-ই-আলম-এর দরগাতে বহু সম্পত্তি ও অর্থ দান করেন। প্রত্যেক জেলার বিভিন্নস্থানে তিনি মসজিদ ও সরাইখানা স্থাপন করেন। ৯০৭ হিজরীর সমকালীন এক শিলালিপির অন্তর্লিখন থেকে দেখা যায় যে, তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য অনেক মাদরাসা স্থাপন করেন। তার আমলে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা ও জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছিল। সম্ভবত এ অভাব দূর করার জন্য হোসেন শাহ তার আমলে অধিক সংখ্যক মাদরাসা কায়েম করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৭৩]

শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে হোসেন শাহী বংশের বিশেষ অবদান ছিল। হোসেন শাহের উদ্যোগে নির্মিত গৌড় নগরীর গুণমন্ত মসজিদ, দরমাবাড়ি মসজিদ ও ছোটো সোনা মসজিদ এবং নসরত শাহের আমলে নির্মিত কদম রসুল, বড়ো সোনা মসজিদ ও হোসেন শাহের সমাধিতে নির্মিত পাণ্ডুয়ার একলাখি মসজিদ হোসেন শাহী যুগের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন। শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাবে ব্রাহ্মণ্য, বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম ছাড়া হোসেন শাহী আমলে নাথ, ধর্মঠাকুর, মনসা ও চণ্ডী প্রভৃতি আঞ্চলিক ধর্মমতের উদ্ভব হয়। হিন্দু-মুসলিম মিলিতভাবে সত্যপীর-এর অনুসরণ হোসেন শাহের এক ধর্মীয় চ্যুতি। হোসেন শাহের যুগে বাংলার কয়েকটি স্থানে হিন্দু-মুসলিম একত্রে সত্যপির, গঙ্গাদেবী, ওলাবিবি ও শীতলার উপাসনা শুরু করে।

শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ও মুসলিমদের চ্যুতি

হোসেন শাহী বংশের শাসনের সময় শ্রীচৈতন্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। পূর্বে গণেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার পর বর্ণহিন্দুরা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন শুরু করে। হোসেন শাহী আমলে মুসলিম সুলতানগণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ মুসলিম শাসকদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত থেকে ভাষান্তর ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়।

---

৭৩. হোসেন শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/38UG9Nj / অ্যাকসেস ইন ১৮ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সমসাময়িক দুনিয়ার সবচে' সমৃদ্ধ ভাষা আরবীতে তখন তাফসীর, হাদীস. উসুল, তর্কবিদ্যা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল গ্রন্থরাজি মজুত ছিল। মুসলমানদের সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের উপযোগী এই বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার জনগণের সামনে তুলে ধরার কোনো ব্যবস্থাই এ সময় করা হয়নি। সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মুখের ভাষা বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। কিন্তু তাদের তৈরি বাংলা সাহিত্য এমন একটি রূপ লাভ করলো, যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের যথার্থ প্রতিফলন ছিল না।[৭৪]

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণববাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন এমনি পটভূমিতে পরিচালিত হয়েছিল। চৈতন্য সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার তার গ্রন্থ 'বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ'-এ লিখেছেন, "তিন শত বছরের মধ্যে বাঙালি ধর্ম রক্ষার্থে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় নাই- মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংসের অসংখ্য লাঞ্ছনা ও অকথ্য অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে। চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল"।[৭৫]

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়। তাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ সময় যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। বহু হিন্দু লেখক চৈতন্যের জীবন ও দর্শন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন। বৈষ্ণব-চিন্তা ও ভাবধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্র অঙ্গনকে প্লাবিত করে।

এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় কোনো কর্মপন্থা সে সময় মুসলিম সমাজে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায় না। এ শূণ্যতার কারণে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধেরও জন্ম হয়। এ কারণে বৈষ্ণব কবি-সাহিত্যিকদের বিরাট মিছিলে এক শ্রেণীর মুসলমান কবিও গা ভাসিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের ভাষায় এরা ছিলেন "বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি"।[৭৬]

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ

---

৭৪. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ৩৫-৩৬

৭৫. বাংলাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ / রমেশচন্দ্র মজুমদার / দিব্য প্রকাশ / পৃ. ২৬১

৭৬. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

১৫১৯ সালে বাংলার শাসক হন। শাসনকার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তিনি তার পিতার নীতিই বজায় রাখেন। তার বাংলা শাসনের সময় জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর দিল্লি অধিকার করেন। এই সময় আফগান নেতারা বাবরের বিরোধীতা করেন। বাবরের সাথে তারা পরাজিত হয়ে বাংলায় নুসরাত শাহের নিকট আশ্রয় নেন। ফলে বাবরের সাথে নুসরাত শাহের তিক্ততা তৈরি হয়। নুসরাত শাহ বাবরের সাথে চুক্তি করে সেই তিক্ততা নিরসন করেন।

১৫৩৩ সালে নাসিরুদ্দিন নুসরাত শাহের মৃত্যুর পর তার ছেলে আলাউদ্দিন ফিরোজ ক্ষমতায় আসেন। অল্প কিছুদিন পরই তার চাচা গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩-১৫৩৮) বাংলার হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান।[৭৭]

ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ অমাত্যদের মধ্যে নিজের শত্রু সৃষ্টি করেন এবং নিজ রাজ্যে অন্তর্বিরোধের বীজ বপন করেন। তাই সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি খুব জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মাহমুদ শাহের গভর্নর ও সেনাপতি খুদা বখশ খান তার শাসন কর্তৃত্ব কর্ণফুলী থেকে আরাকানের পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যবর্তী এলাকায় বিস্তৃত করেন এবং প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো আচরণ করতে থাকেন। অন্যদিকে রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক শক্তিসমূহ ঐকবদ্ধ হচ্ছিল। মাহমুদ শাহকে বাংলার সুলতান হিসেবে মেনে নিতে হাজীপুরের শাসনকর্তা মখদুম আলম অস্বীকার করেন এবং সুলতান আলাউদ্দিন ফিরুজের হত্যার অজুহাতে তিনি বিহারের উপ-শাসনকর্তা শেরশাহের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করেন। এ সময়ে, জালাল খান লোহানীর অভিভাবক হিসেবে তিনিই ছিলেন বিহারের প্রকৃত শাসনকর্তা।

মাহমুদ শাহ মখদুম আলমকে দমন করতে সক্ষম হলেও শেরশাহের শক্তি ও মর্যাদা অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পায়। শেরশাহের ক্রমবর্ধমান শক্তি বিহারে দু'টি দলের সৃষ্টি করে একটি শেরশাহের এবং অপরটি জালাল খানের নেতৃত্বে। জালাল খান শেরশাহের বিরুদ্ধে মাহমুদের নিকট সাহায্য চান এবং বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ছলে তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে সীমান্ত

৭৭. History of Delhi Sultanate / M. H. Syed / Anmol Publications / P. 237-238

www.pathagar.com

অতিক্রম করেন এবং নিজেকে মাহমুদের আশ্রয়ে সমর্পণ করে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন।

মাহমুদ শাহ বিহার জয় করার জন্য ১৫৩৪ সালে ইব্রাহিম খানের নেতৃত্বে গোলন্দাজ, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসম্বলিত একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ অভিযানে জালাল খানও ইব্রাহিম খানের সাথে ছিলেন। শেরশাহ অতর্কিতে সম্মিলিত বাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং ১৫৩৪ সালে মার্চে সুরজগড়ে তাদেরকে পরাভূত করেন। এ যুদ্ধে ইব্রাহিম খান পরাজিত ও নিহত হন এবং জালাল খান তার আশ্রয়দানকারী মাহমুদ শাহের নিকট ফিরে যেতে বাধ্য হন।

ইতোমধ্যে বাংলার উপকূলে পর্তুগিজদের আগমন এবং তাদের কর্মকাণ্ড মাহমুদকে আরও সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। ১৫৩৪ সালে পর্তুগিজরা বাংলায় বাণিজ্য শুরু করার জন্যই চট্টগ্রাম বন্দরে আসে। কিন্তু তারা চট্টগ্রামের মুসলিম গভর্নর ও ব্যবসায়ীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। ফলে তারা গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহের নির্দেশে বন্দি হয় এবং তাদেরকে বন্দি হিসেবে গৌড়ে পাঠানো হয়। কিন্তু শেরশাহের আক্রমণাত্মক কর্মতৎপরতায়, যা সুরজগড়ে বিজয়ের ফলে আরও তীব্রতর হয়েছিল, মাহমুদ তার কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। শেরশাহের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মাহমুদ শাহ পর্তুগিজদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই তিনি পর্তুগিজ বন্দিদের মুক্তি দেন এবং এমন কি, তিনি ডি. মেলো জুসার্তেকে তার সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। পর্তুগিজদেরকে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওএ (হুগলি) তাদের কারখানা নির্মাণেরও অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের জায়গা করে দেন মাহমুদ শাহ।

এদিকে গুজরাটে হুমায়ুনের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে শেরশাহ ১৫৩৫ সালে বাংলা আক্রমনের চেষ্টা শুরু করেন। এ সময়ে পর্তুগিজদের সহায়তায় মাহমুদ শাহের সৈন্যবাহিনী তেলিয়াগড়ি গিরিপথ সুরক্ষিত করে রেখেছিল। তেলিয়াগড়ি গিরিপথকে দুর্ভেদ্য দেখে শেরশাহ তার গতিপথ পরিবর্তন করেন এবং অপ্রত্যাশিতভাবে ঝাড়খন্ডের পথে গৌড়ে উপস্থিত হন।

এভাবে তিনি মাহমুদ শাহের সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনাকে নিষ্ফল করে দেন। শেরশাহ খানের আকস্মিক উপস্থিতিতে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

এরপর শান্তি স্থাপনের জন্য শেরশাহের নিকট প্রস্তাব দেন। শেরশাহ তার শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫৩৭ সালে শেরশাহ পুনরায় বাংলায় আসেন এবং রাজধানী অবরোধ করেন। এ সময়ে হুমায়ুন চুনার দখল করার জন্য পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হুমায়ুনের এ অগ্রযাত্রার গুরুত্ব অনুধাবন করে শেরশাহ তার পুত্র জালাল খান ও খাবাস খানকে গৌড় অবরোধের কাজ অব্যাহত রাখার দায়িত্ব দিয়ে মোঘলদেরকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত চুনারে চলে যান। মাহমুদ শাহ দুর্গ থেকে বের হয়ে আসেন এবং শত্রুদের আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং পরাজিত হয়ে উত্তর বিহারের হাজীপুরের দিকে পালিয়ে যান। এভাবে গৌড় ১৫৩৮ সালের ৬এপ্রিল আফগানদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ দুর্বল, আরাম প্রিয় এবং সহজ প্রকৃতির সুলতান ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি যে রাজনৈতিক সমস্যাবলির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা সমাধান করার মতো কূটনৈতিক দূরদর্শিতা কিংবা বাস্তব জ্ঞান তার ছিল না। স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি গৌড়ে দু'টি মসজিদ এবং ময়মনসিংহে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি ১৫৩৩ সালে দিনাজপুর জেলার ধোরাইলে একটি সেতু, ১৫৩৬-৩৭ সালে রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একটি তোরণ এবং ১৫৩৭ সালে পূর্ণিয়াতে একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন।[৭৮]

বাংলায় আফগানদের শাসন

শেরশাহ সুর ১৫৩৮ সালে ৬ এপ্রিল সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বাংলা দখল করে নেন। সেই থেকে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং একই সাথে বাংলায় আফগানদের শাসন শুরু হয়। তখন থেকে শুরু করে ১৫৭৬ সালে দাউদ খান কররানী মোঘলদের হাতে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত বাংলায় আফগানীদের শাসন জারি থাকে। শেরশাহ

৭৮. গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3qwskdT / অ্যাকসেস ইন ১৯জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ছিলেন বাবরের একজন সেনানায়ক। তিনি ১৫২২ সালে মোঘল শাসনের অধীনে বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হন।

১৫৩৮ সালে নতুন মোঘল সম্রাট হুমায়ুন যখন অন্যত্র অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় শেরশাহ্ সুরি বাংলা জয় করে সুরি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেকে নতুন সম্রাট ঘোষণা করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মোঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হলে শেরশাহ্ বাংলা ত্যাগ করেন। ১৫৩৯ সালে চৌসার যুদ্ধে (বক্সারের নিকটে) হুমায়ুনকে পরাভূত করে তিনি 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং বাংলা পুনর্দখল করে খিজির খানকে এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তী বছর পুনরায় হুমায়ুনকে পরাজিত ও ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে তিনি দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন।

হিন্দুস্তানের শাসন ক্ষমতা লাভের পর নিজের ক্ষমতা সুসংহত করার কাজে মনোযোগ দিলেন শেরশাহ্। তার শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল নিজেকে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ সম্রাটই ছিলেন শাসন ব্যবস্থার মূলে। শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আর প্রশাসনিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে পরামর্শের জন্য অভিজাত আর বিজ্ঞদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একটি পরামর্শক কাউন্সিল।

দিউয়ান-ই-ওয়াজির, দিউয়ান-ই-আরীজ, দিউয়ান-ই-রসলত আর দিউয়ান-ই-ইনশাহ, এই চারটি পদ নিয়ে গঠিত হয়েছিল শেরশাহের মন্ত্রীসভা। দিউয়ান-ই-ওয়াজির বা উজির সাম্রাজ্যের সকল বিষয়ই দেখাশোনা করতেন। মন্ত্রীসভার কাজ তদারক করাও তার দায়িত্বের মাঝে অন্তর্ভূক্ত ছিল। দিউয়ান-ই-আরীজ বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজ ছিল সেনাবাহিনীকে নিয়ে। সেনাবাহিনীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, অস্ত্র-শস্ত্র জোগান দেওয়া, যুদ্ধপরিকল্পনা করা, নতুন সৈন্য ভর্তি, সেনাবাহিনীর রসদ জোগান ইত্যাদি বিষয় তদারক করতো এই মন্ত্রণালয়। শেরশাহ্ প্রায়ই এই মন্ত্রণালয়ের কাজ নিজে ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করতেন।

দিউয়ান-ই-রসলত পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখতো আর রাষ্ট্রীয় বার্তা, ঘোষণা ইত্যাদি প্রচারের দায়িত্ব ছিল দিউয়ান-ই-ইনশাহ্ এর। শেরশাহ্ তার পুরো সাম্রাজ্যকে ৬৬টি সরকারে ভাগ করে দিয়েছিলেন। সরকার আবার কতগুলো পরগণায় এবং পরগণা কতগুলো গ্রামে বিভক্ত থাকতো। প্রতিটি পর্যায়েই

www.pathagar.com

প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য একজন করে প্রধান নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। সরকার বা পরগণা বা গ্রামের সমস্ত দায়িত্ব সেই প্রধানের উপরই বর্তাতো।

সড়ক-ই-আযম

শেরশাহ মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন এবং হয়রানিমূলক কর রহিত করে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার সঙ্গে রাজধানী আগ্রার চমৎকার সংযোগ-সড়ক নির্মাণ করে এবং এই সড়কের ধারে নির্দিষ্ট দুরত্বে সরাইখানা, মসজিদ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার অভিনব উন্নতি সাধন করেন। তার নির্মিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ছিল সড়ক-ই-আযম (মহাসড়ক)। তিন হাজার মাইল দীর্ঘ এই মহাসড়ক আরাকান থেকে আগ্রা, দিল্লি ও লাহোর হয়ে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এর দু'পাশে ছিল ছায়াদানকারী বৃক্ষশ্রেণি। ইংরেজ আমলে এই সড়ক গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজধানী থেকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং বাইরে থেকে রাজধানীতে সহজে ও দ্রুত সরকারি নির্দেশ ও সংবাদ আদান প্রদানের জন্য যাত্রাপথে পর্যায়ক্রমে সংবাদ-বাহকের ঘোড়া বদল করার এক অভিনব পদ্ধতি তিনি চালু করেন। পথের পাশের সরাইখানাগুলি সংবাদবাহী ঘোড়া বদলের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ন্যায়বিচার ছাড়া কোনো সাম্রাজ্য, রাজ্য বা দেশ টিকে থাকতে পারে না। শেরশাহ তাই তার সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছিলেন। প্রশাসন পরিচালনা কিংবা বিচারকার্যে শেরশাহ ছিলেন সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ। দুর্নীতি করলে বা অন্য কোনো অপরাধ করলে তিনি কাউকে ছাড় দিতেন না। এক্ষেত্রে তিনি কে আমির আর কে প্রজা, কে আমিরের ছেলে আর কে মুচির ছেলে এসব কিছুই দেখতেন না। সবার জন্যই একই আইন ছিল। বিচারের শাস্তি দেওয়া হলে তা বাস্তবায়নেও তিনি কখনো পিছপা হননি।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সাম্রাজ্যজুড়ে তিনি নিয়োগ দিয়েছিলেন অসংখ্য বিচারক। 'কাজী' আর 'মুনসিফ'রা দিউয়ানী মামলার বিচার করতেন। ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন 'শিকদার'রা। গ্রামাঞ্চলে বিচারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত দিউয়ানি আর ফৌজদারি দুই ধরনের মামলারই বিচার করতে পারতো। তাছাড়া সাম্রাজ্যের রাজস্ব সম্পর্কিত বিচারের

www.pathagar.com

জন্য আলাদা বিচার ব্যবস্থা ছিল। বিচার ব্যবস্থায় শেরশাহ তেমন নতুন কিছু যোগ করেননি। পূর্বের বিচার কাঠামোর মাঝেই তিনি মূলত জোর দিয়েছিলেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি।

শেরশাহের জনহিতকর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মুক্ত হস্তে অর্থদান, দরিদ্রদের জন্য লঙ্গরখানা স্থাপন, মাদরাসা, মসজিদ, গুরুত্বপূর্ণ ইমারত, বাগবাগিচা, হাসপাতাল ও সরাইখানা নির্মাণ। সাসারামে নিজের অনুপম সমাধিসৌধ, নির্মাতা হিসেবে তার উন্নত রুচির পরিচায়ক। শেরশাহ ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। হিন্দুদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই সহনশীল। তার মধ্যে একজন সমরনেতা, একজন বিচক্ষণ নৃপতি এবং একজন যোগ্য ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল।[৭৯]

১৫৪৫ সালে চান্দেল রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় কালিঞ্জর দুর্গে বারুদের বিস্ফোরণে শেরশাহ সুরির মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র জালাল খান ইসলাম শাহ সুরি নাম গ্রহণ করে সুরি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। সাসারামে একটি কৃত্রিম হ্রদের মাঝখানে তার ১২২ ফুট উঁচু নয়নাভিরাম সমাধিসৌধটি আজও বিদ্যমান। তার মৃত্যুর পর হুমায়ুনের নেতৃত্বে ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সুরি শাসন অব্যাহত থাকে।[৮০]

ইসলাম শাহ সুরি সাম্রাজ্যের ২য় শাসক। তিনিও তার পিতার মতো দক্ষতার সাথে শাসন করেন। তবে তার সময়ে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। ১৫৫৪ সালে তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে নিহত হন। তারপরে ফিরোজ শাহ সুরি ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু বাংলায় যিনি গভর্নর ছিলেন তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলার শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ খান সুর। তিনি বছর দু'য়েকের মাথায় সুরি শাসক আদিল শাহের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। এরপর তার ছেলে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ১৫৬১ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসক ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ভাই গিয়াসউদ্দিন জালাল শাহ ক্ষমতায় আসেন এবং ১৫৬৩ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৫৬৩ সালে তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন শাহ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ছিলেন জালাল শাহের পুত্র।[৮১]

---

৭৯. শেরশাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3szYG9A / অ্যাকসেস ইন ১৯ জানুয়ারী ২০২১

৮০. The Mausoleum of Sher Shāh Sūrī / Catherine B. Asher / Vol.39 / P. 298

৮১. ৮১- বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১১৩-১১৬

www.pathagar.com

১৫৬২ সালে শুরুতে আফগান কররানী রাজবংশের তাজ খান কররানী বাংলার একটি বড় অংশ দখল করে নেন। ১৫৬৪ সালে তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত করে তাজ খান কররানী নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাজ খান কররানী ছিলেন শেরশাহের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহের সময়ে দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন। আদিল শাহের শাসনামলে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমীর। গোয়ালিয়রে আদিল শাহের দরবারে রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে তাজ খান সেখান থেকে পলায়ন করেন এবং গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলে নিজের কতৃর্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৫৪ সালে আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নিকট তারা পরাস্ত হন। তাজ খান ও সুলায়মান কররানী বাংলায় পালিয়ে যান। বাংলার আফগান দলপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে নানা উপায়ে তাজ খান ও সুলায়মান নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। অবশেষে তাজ খান সুলতান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ১৫৬৪ সালে কররানী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাজ খান বেশিদিন তার সুফল ভোগ করতে পারেননি। ১৫৬৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

তার ভাই সুলায়মান কররানী তার উত্তরাধিকারী হন এবং গৌড় থেকে তান্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মোঘলগণ উত্তর ভারত দখল করার পর সেখান থেকে এসে তার রাজধানীতে একত্রিত হওয়া আফগানদের নিয়ে তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। একজন বিচক্ষণ কুটনীতিবিদ সুলায়মান কররানী সব সময়ই আকবরের সাথে প্রকাশ্য বিরোধিতা এড়িয়ে চলেন। তিনি মোঘল রাজদরবারে নিয়মিত উপহার পাঠাতেন এবং কখনোই প্রকাশ্যে স্বাধীনতা দাবী করেননি। তিনি আকবরের নামে খুৎবা পাঠ করান ও মুদ্রা প্রচলন করেন। বাহ্যত সুলায়মান কররানী মোঘলদের আধিপত্য স্বীকার করলেও তিনি হযরত-ই-আলা উপাধি নেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, কার্যত তিনি একজন স্বাধীন শাসক ছিলেন।

পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সুলায়মান কররানী উড়িষ্যা জয় করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তার পুত্র বায়েজীদ কররানীকে ১৫৬৭-৬৮ সালে একটি শক্তিশালী সৈন্যদলসহ ওই দেশের বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধে বায়েজীদ উড়িষ্যার

www.pathagar.com

রাজাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। ইতোমধ্যে সুলায়মান কররানী স্বয়ং উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হন এবং এর রাজধানী তাজপুর দখল করেন। সুলায়মান কররানীর নির্ভীক সেনাপতি কালা পাহাড়পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং প্রত্যন্ত এলাকাসমূহ দখল করেন। এভাবে উড়িষ্যা সরাসরি কররানী শাসনাধীনে আসে।

সুলায়মান কররানী আট বছর বাংলা শাসন করেন। তার রাজ্য উত্তরে কোচবিহার থেকে দক্ষিণে পুরী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে শোন নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৫৭২ সালের ১১অক্টোবর সুলায়মান কররানীর মৃত্যু হয়। সুলায়মান কররানীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়েজীদ কররানী তার উত্তরাধিকারী হন। তিনি তার পিতার নীতি পরিহার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজের নামে খুৎবা পাঠ এবং মুদ্রা প্রচলন করেন।[৮২]

বায়েজীদ কররানী মাত্র অল্প কয়েকমাস বাংলা শাসন করেন। তার চাচাত ভাই এবং ভগ্নীপতি হান্সু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করেন এবং ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু শীঘ্রই সুলায়মান কররানীর বিশ্বস্ত উজির লোদী খান কিছু সংখ্যক আমীরের সহায়তায় হান্সুকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাকে হত্যা করেন। অতঃপর তারা ১৫৭৩ সালে বায়েজীদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খান কররানীকে বাংলার সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। দাউদ তার ভাইয়ের স্বাধীন নীতি অনুসরণ করে নিজের নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করেন।

দাউদ কররানী উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বিশাল সৈন্য বাহিনী ও বিপুল ধন সম্পদ লাভ করেন। এর সাহায্যে তিনি আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং গাজীপুরের নিকট জামানিয়া অবরোধ করেন। বাদশাহ আকবর জৌনপুরের শাসক মুনিম খানকে দাউদ কররানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ দেন। মুনিম খান পাটনায় পৌঁছে দাউদ খানের প্রধানমন্ত্রী লোদী খানের মুখোমুখি হন এবং সহজ শর্তে সন্ধি সম্পাদন করে সন্তুষ্ট হন। আকবর অথবা দাউদ কেউই এ সন্ধিতে খুশী হননি। দাউদ তার প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। অপর দিকে বাদশাহ মুনিম খানকে আবার বাংলা ও বিহার আক্রমণের আদেশ দেন। তদানুসারে মুনিম খান বিহারে পৌঁছান এবং পাটনা অবরোধ করেন। এ অবস্থায় ১৫৭৫ সালে আকবর স্বয়ং দাউদ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি

---

[৮২] কররানী শাসন/বাংলাপিডিয়া/https://bit.ly/39OHW5M/ অ্যাকসেস ইন ১৯ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সরাসরি হাজীপুর আক্রমণ করে সহজেই তা দখল করেন। সম্রাট পাটনা দখল করে মুনিম খানকে বিহার ও বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন এবং দাউদ কররানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়ে দিল্লি অভিমুখে রওনা হন।

মুনিম খান বাংলার বিরুদ্ধে তার অভিযান চালু রাখেন। তিনি তান্ডা ও সাতগাঁও দখল করে নেন। দাউদ খান উড়িষ্যায় পালিয়ে যান। মুনিম খান ও টোডরমল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করে উড়িষ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। বালাশোর জেলার তুকারয়ে সংঘটিত যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন (১৫৭৫ সালে)। দাউদ কররানী ও মোঘলদের মধ্যে অতঃপর কটকে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। দাউদ কররানী বাংলা ও বিহার মোঘলদেরকে ছেড়ে দেন এবং শুধু উড়িষ্যা নিজের দখলে রাখেন।

১৫৭৫ সালের অক্টোবরে মুনিম খানের আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে, দাউদ কররানী বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তেলিয়াগড়ি গিরিপথ পর্যন্ত দখল করেন। এ পরিস্থিতিতে আকবর হোসেন কুলী বেগকে খানজাহান উপাধি দিয়ে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন ও দাউদ কররানীকে আক্রমণ করার আদেশ দেন। খানজাহান টোডরমলকে সঙ্গে নিয়ে দাউদের রাজধানী তান্ডা অভিমুখে যাত্রা করেন। উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা এবং দক্ষিণ-পূর্বে পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাজমহল এর সংকীর্ণ প্রবেশ পথে কররানী তাদের পথ অবরোধ করেন।

খান জাহান প্রথমে তেলিয়াগড়িতে আফগানদের সম্মুখীন হন এবং যুদ্ধের পর এটি অধিকার করেন। ১৫৭৬ সালের ১২জুলাই রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে দাউদ খান পরাজিত ও নিহত হন। দাউদ কররানীর মৃত্যুদন্ডের ফলে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ও মোঘল শাসনের সূচনা হয়। দাউদ খানের পতনের একটি অন্যতম কারণ ছিল খান জাহান দাউদ খানের দুইজন সেনানায়ক কতলু খান ও শ্রীহরিকে নিজের পক্ষে নিয়ে নেন। তারা দাউদ খানের সাথে প্রতারণা করে। বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে কতলু খান উড়িষ্যার ও শ্রীহরি যশোরের শাসনভার লাভ করেন। এই শ্রীহরিই যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা। দাউদ খানের পতনের মধ্য দিয়ে বাংলার সুলতানী আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৮৩]

---

৮৩. **বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১১৬-১২০**

www.pathagar.com

বাংলায় মোঘল শাসনের সূত্রপাত ও ঢাকার গোড়াপত্তন

১৫৭৬ সালে বাংলার আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী পরাজয়ের পর বাংলা মোঘল সম্রাট আকবরের অধীনে চলে আসে। সম্রাট আকবর বারো সুবাহ্‌র একটি হিসেবে বাংলার নাম ঘোষণা করেন। এরপর থেকে বাংলার নাম হয়ে যায় সুবাহ্ বাংলা। যার সীমানা ছিল বর্তমান বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা হয়ে আরাকান পর্যন্ত।

১৫৭৬ সাল থেকে ১৭১৭ সাল পর্যন্ত বাংলা মোঘলদের অধীনে ছিল। ১৭শ' শতাব্দীতে মোঘলগণ বারো-ভূঁইয়া ভুস্বামীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈসা খাঁ। মোঘল আমলে বাংলা একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। মোঘলেরা ১৬১০ সাল থেকে ঢাকায় নতুন মহানগরী গড়ে তোলে, যেখানে ছিল সুবিন্যস্ত বাগান, দুর্গ, সমাধি, প্রাসাদ এবং মসজিদ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি সম্মান জানিয়ে শহরটি তার নামে নামকরণ করা হয়।[৮৪] ঢাকা মোঘল সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে আবির্ভূত হয়, জানা যায় সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ রপ্তানি কেন্দ্র ছিল মসলিন বস্ত্রকে ঘিরে। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামে মোঘলেরা যুদ্ধে জয় লাভ করে আরাকান রাজ্য দখল করে এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় নিয়ে নেয়, যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল ইসলামাবাদ।

দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের পর হোসেন কুলি বেগ খান জাহান উপাধি নিয়ে সুবাহ্ বাংলার শাসক নিযুক্ত হন। তিনি ১৫৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলার শাসক ছিলেন। এরপর ১৫৭৮ থেকে ১৫৯৪ সাল পর্যন্ত ছয়জন সুবাহ্‌দার বাংলা শাসন করেছেন। এরপর ১৫৯৪ থেকে ১৬০৬ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবাহ্‌দার নিযুক্ত হন মানসিংহ।

মানসিংহ ছিলেন রাজা ভগবান দাসের পালক পুত্র। আম্বরে জন্মগ্রহণকারী মির্জা রাজারূপে পরিচিত মানসিংহকে সম্রাট আকবর ফরজন্দ খেতাবে ভূষিত করেন। ভগবান দাস পাঞ্জাবের সুবাহ্‌দার নিযুক্ত হলে মানসিংহ সিন্ধু নদের তীরবর্তী জেলাগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রদেশের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ১৫৮৫ সালে তাকে কাবুলে পাঠানো হয় এবং ১৫৮৮ সালে তিনি বিহারের সুবাহ্‌দার নিযুক্ত

---

৮৪. Dhaka / Britannica / https://www.britannica.com/place/Dhaka / অ্যাকসেস ইন ২৮ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

হন। তখন পর্যন্ত কুনওয়ার রূপে পরিচিত মানসিংহকে ১৫৯০ সালে 'রাজা' উপাধি এবং পাঁচ হাজারি মনসব প্রদান করা হয়। ১৫৯৪ সালের ১৭ মার্চ তাকে বাংলার সুবাহদার নিয়োগ করা হয়। ১৫৯৪-১৫৯৮, ১৬০১-১৬০৫ এবং ১৬০৫-১৬০৬ সালে তিনি তিন মেয়াদে সুবাহদারের দায়িত্ব পালন করেন।

আফগান নেতাদের এবং ঈসা খাঁর নেতৃত্বাধীন ভূঁইয়াদের দমন করা ছিল বাংলা রাজা মানসিংহের প্রধান কাজ। তান্ডা থেকে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি চারদিকে কয়েকটি পরীক্ষামূলক অভিযান পরিচালনা করেন এবং ১৫৯৫ সালের ৭নভেম্বর তান্ডা থেকে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর করেন। নতুন রাজধানীর নামকরণ করেন "আকবর নগর"। মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংহের নেতৃত্বে এক পরীক্ষামূলক অভিযানে ঈসা খাঁর মিত্র কেদার রায়ের নিকট থেকে ১৫৯৫ সালের ২এপ্রিল ভূষণা দুর্গ দখল করে। ঈসা খাঁর নিকট থেকে ভাটি জয়ের উদ্দেশ্যে ১৫৯৫ সালের ৭ডিসেম্বর মানসিংহ নিজেই নতুন রাজধানী থেকে যাত্রা করেন। মানসিংহ নিকটবর্তী হলে ঈসা খাঁ ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে পশ্চাদপসরণ করেন। মানসিংহ শেরপুর মোর্চায় (বগুড়া জেলায়) শিবির স্থাপন করেন এবং সেখানে একটি মাটির দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি এই স্থানের নামকরণ করেন সেলিম নগর এবং বর্ষাকালটা তিনি সেখানেই কাটান। ইতোমধ্যে ঈসা খাঁর মিত্র খাজা সুলায়মান খান নুহানী এবং কেদার রায় মোঘলদের কাছ থেকে ভূষণা দুর্গ পুনর্দখল করেন। মানসিংহ তার পুত্র দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর ১৫৯৬ সালের ২০জুন তিনি দুর্গটি পুনর্দখল করতে সক্ষম হন। ১৫৯৬ সালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটে তার শিবির স্থাপন করেন। তিনি সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবে সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঈসা খাঁ ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে হিম্মত সিংহের নেতৃত্বে একটি ছোট সৈন্যদল পাঠান। হিম্মত সিংহ নিকটবর্তী হলে ঈসা খাঁ এগারসিন্ধুর দিকে পশ্চাদপসরণ করেন।

১৫৯৭ সালে সেপ্টেম্বরে মানসিংহ স্থল ও জলপথে ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে দু'টি বিরাট বাহিনী পাঠান। দুর্জন সিংহের অধিনায়কত্বে মোঘল সেনাবাহিনী প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করে, এমনকি তারা ঈসা খাঁর রাজধানী কাত্রাবোও (নারায়ণগঞ্জ) আক্রমণ করে। কিন্তু শেষে ৫সেপ্টেম্বর বিক্রমপুর থেকে ২০ কি.মি. দূরে এক নৌ-যুদ্ধে দুর্জন সিংহ নিহত হন এবং মোঘল বাহিনী বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

হয়। এভাবে ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে মানসিংহের অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং হতোদ্যম সুবাহ্দার ১৫৯৮ সালে আজমীরের উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন।[৮৫]

১৬০১ সালের প্রথম দিকে মানসিংহ দ্বিতীয়বার সুবাহ্দার হিসেবে বাংলায় আসেন এবং ১২ফেব্রুয়ারী শেরপুর আতাই-এর যুদ্ধে আফগান বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন। পরের বছর তিনি ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়কে মোঘলদের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। উত্তরবঙ্গের মালদহ পর্যন্ত এলাকায় হামলাকারী জালাল খান ও কাজী মুমিনের মতো আফগান দলপতিদের বিরুদ্ধে মানসিংহ ঘোড়াঘাট থেকে তার পৌত্র মহাসিংহের অধীনে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। মানসিংহ সে অঞ্চল থেকে আফগান দলপতিদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে বুকাই নগরের খাজা উসমান খান নুহানী ময়মনসিংহের মোঘল থানাদার বজ বাহাদুর কলমাককে ভাওয়ালে বিতাড়িত করেন।

ঘটনার এ গতি পরিবর্তনে মানসিংহ দ্রুত ঢাকা থেকে ভাওয়াল অভিমুখে অগ্রসর হয়ে উসমান খানকে পরাজিত করেন। এর অল্পকাল পরেই ইছামতি নদীর তীরে মানসিংহের সঙ্গে মুসা খান ও তার ভাই দাউদ খান, উসমান খান ও কেদার রায়ের সম্মিলিত বাহিনীর আরেকটি যুদ্ধ হয়। ১৬০৩ সালে মানসিংহ বহু কষ্টে ত্রিমোহিনীর মোঘল দুর্গে মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। মগদের সহায়তায় কেদার রায় শ্রীনগরে মোঘল ঘাঁটি আক্রমণ করেন। মানসিংহ উসমান খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভাওয়ালে ফিরে এলে উসমান খান পালিয়ে যান। ১৬০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মানসিংহ আগ্রার উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন। এরপর কুতুবউদ্দিন কোকা ও জাহাঙ্গীর কুলি বেগ কিছুদিন বাংলা শাসন করেন। এরপর বাংলা শাসন করেন সুবাহ্দার ইসলাম খান।

সুবাদার ইসলাম খান চিশতি

ইসলাম খান চিশতি পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য বাংলার মোঘল সুবাদার ছিলেন। তার মূল নাম শেখ আলাউদ্দিন চিশতি। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে ইসলাম খান উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আগের মোঘল সেনানায়কেরা যেখানে ব্যর্থ

---

৮৫. মানসিংহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3psJiK3 / অ্যাকসেস ইন ২৮ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

হয়েছিলেন সেখানে চট্টগ্রাম ছাড়া সমগ্র বাংলা জয় করে মোঘলদের নিয়ন্ত্রণে আনার সাফল্য লাভ করায় বাংলার সুবাদার হিসেবে ইসলাম খান খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৫৭৬ থেকে ১৬০৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আকবর প্রায় বারোজন দক্ষ সামরিক কর্মকর্তাকে বাংলা জয় করার জন্য পাঠালেও রাজধানী নগরী তান্ডা এর আশে পাশের কিছু অংশ মাত্র দখল করতে সফল হয়েছিলেন। স্থানীয় রাজা, ভূঁইয়া, জমিদার ও আফগান নেতা তখন বাংলাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে শাসন করছিলেন। আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর তরুণ ও উদ্যোমী ইসলাম খানকে বাংলা জয়ের জন্য নির্বাচিত করেন ও সুবাদার হিসেবে ১৬০৮ সালে বাংলায় প্রেরণ করেন।[৮৬]

ইসলাম খান অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাংলার ভূ-রাজনীতি পরীক্ষা করে দেখেন এবং সম্রাটের প্রবীণ যোদ্ধাদের সহযোগিতায় তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তৈরি করেন। বিদ্রোহী বাংলা প্রদেশে মোঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত, অনুগত, বিশ্বাসী ও কর্তব্যপরায়ণ সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ভাটি অঞ্চলে বারো ভূঁইয়া এবং খাজা উসমান ও তার ভাইদের নেতৃত্বাধীন আফগানরা মোঘল কর্তৃক বাংলা বিজয়ে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল বলে তিনি মনে করতেন। আফগানরা বুকাইনগর দখল করে নিয়েছিল। ফলে ইসলাম খান সর্বপ্রথম ভাটি ও বারো ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। তিনি ছোট-বড় নদী ও খালে পরিপূর্ণ ভাটির নিম্নাঞ্চলে যুদ্ধে কার্যকর ফললাভের জন্য শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সুতরাং ইসলাম খান মোঘল নৌ-বাহিনীকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি এটাও উপলব্ধি করেন যে, তদানীন্তন রাজধানী রাজমহল ছিল বাংলা প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এবং গোলযোগপূর্ণ পূর্ব বাংলা থেকে রাজমহলের দূরত্বও ছিল অনেক। সুতরাং তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। কারণ ঢাকা ছিল ভাটি অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং বারো ভূঁইয়াদের সদর দফতরের সঙ্গে নদী দ্বারা উত্তম যোগাযোগের জন্য সুবিধাজনক স্থান।

সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বাহিনী পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ইসলাম খান সম্রাটের কাছ

---

৮৬. ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী / মুনতাসীর মামুন / অনন্যা প্রকাশনালয় / পৃ. ৪৭

www.pathagar.com

থেকে সহায়তা লাভ করেন। মোঘল সম্রাট ইতিমাম খানকে মীর বহর (নৌ-সেনাপতি) এবং মুতাকিদ খানকে দিউয়ান নিযুক্ত করেন। এ দু'জনই ছিলেন অভিজ্ঞ এবং স্ব স্ব বিভাগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ইসলাম খান তাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করেন। ১৬০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসলাম খান রাজমহল থেকে যাত্রা শুরু করে ১৬০৯ সালের জুন মাসে ঘোড়াঘাট পৌঁছেন। বর্ষাকালটা সেখানে কাটিয়ে তিনি অক্টোবর মাসে ভাটির দিকে অগ্রসর হন। ১৬১০ সালের জুন-জুলাই মাসের দিকে ঢাকা পৌঁছার আগে তিনি সে বছরের প্রথম কয়েক মাস বারো ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটান। ঈসা খাঁ'র পুত্র মুসা খাঁন ছিলেন বারো ভূঁইয়াদের নেতা। তার নেতৃত্বে বারো ভূঁইয়াগণ প্রতিটি দুর্গে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে ব্যর্থ হন। ইসলাম খান ঢাকা দখল করে সেখানে তার রাজধানী স্থাপন করেন এবং সম্রাটের নামানুসারে এ স্থানের নতুন নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর। তখন পর্যন্ত ভূঁইয়াদের সম্পূর্ণরূপে দমন করা সম্ভব হয়নি। তারা শীতলক্ষ্যা নদীর উভয় তীরে তাদের অবস্থানগুলিকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন। ইসলাম খান ঢাকাকে সুরক্ষিত করে তিনি ভূঁইয়াদের সব অবস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং ১৬১১ সালেই মুসা খাঁ সহ বারো ভূঁইয়াদের সবাই ইসলাম খানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। সুবাদার যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার (বরিশাল) রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার (নোয়াখালী) অনন্তমাণিক্যকেও পরাজিত করেন এবং তাদের রাজ্যগুলি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।[৮৭]

এরপর তিনি খাজা উসমানের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং তার নেতৃত্বাধীন আফগানদের বুকাই নগরে (ময়মনসিংহ) পরাজিত করেন। আফগানরা উহারে (মৌলভীবাজারে) পালিয়ে যায়, তবে তারা তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখে। ইসলাম খানের অনুরোধে উসমানের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে সুজ্জাত খানকে সম্রাট প্রেরণ করেন। আফগানদের সঙ্গে এ যুদ্ধের ফলাফল প্রায় অনিশ্চিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু উসমানের আকস্মিক মৃত্যু মোঘলদের অপ্রত্যাশিত বিজয় এনে দেয়। রাতের অন্ধকারে আফগানরা পালিয়ে গেলেও পরবর্তীকালে তারা মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে। সিলেটে বায়েজীদ কররানী এর নেতৃত্বাধীন আফগানদেরও বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। এভাবে

---

৮৭. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১৫০

www.pathagar.com

সমগ্র বাংলা মোঘলদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বাংলার দক্ষিণ পূর্ব সীমান্ত নির্ধারিত হয় ফেনী নদী, যার পরেই ছিল আরাকান রাজ্য।

এরপর ইসলাম খান কুচবিহার, কামরূপ এবং কাছাড় রাজ্যের দিকে মনোযোগ দেন। কুচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সর্বদাই ছিলেন মোঘলদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু রাজা পরীক্ষিৎ নারায়ণ মোঘলদের অগ্রগতির বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর তিনি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীকালে তাকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করা হয় এবং কামরূপ মোঘল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। কাছাড়ের পরাজিত রাজাও মোঘলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

ইসলাম খান সমগ্র বাংলা জয় করতে এবং সীমান্তরাজ্য কামরূপ দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক এক করে প্রতিপক্ষদের পরাজিত করে তিনি তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেননি। ভূঁইয়া ও সামন্ত রাজাদের দ্বিধাবিভক্ত করে শাসন করা ছিল তার রাজনৈতিক কৌশল। পরাজিত জমিদার, ভূঁইয়া এবং সামন্তরাজাদের তিনি তাদের স্ব স্ব এলাকায় বিনা শর্তে ফিরে যেতে অনুমতি প্রদান করেননি। তাদের এলাকা ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি তাদের সৈন্যদেরকে মোঘল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেন এবং রণতরীগুলি বাজেয়াপ্ত করেন। মোঘল সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে তাদের সমগোত্রীয় জমিদার ও ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হতো। এ ভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা ও অব্যাহত প্রচেষ্টার দ্বারা ইসলাম খান সাফল্য অর্জন করেন এবং সম্রাট কর্তৃক তার ওপর ন্যস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব সফলভাবে পালন করেন। দাউদ খান কররানীর পতনের বত্রিশ বছর পরেও আকবরের বিখ্যাত সেনাপতিগণ যে কাজ করতে পারেননি, ইসলাম খান পাঁচ বছরের কম সময়েই তা সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হন। এরপর ভূঁইয়া, জমিদার এবং আফগান দলপতিগণ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। আফগান শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং ভূঁইয়া, জমিদার ও স্থানীয় রাজাগণ মোঘলদের অধীনস্থ জমিদারে পরিণত হন।

ঢাকাকে বাংলার রাজধানী করা ছিল ইসলাম খানের আরেকটি বড় কৃতিত্ব। ইসলাম খান ছিলেন প্রথম সুবাদার যিনি মোঘলদের সৈন্য ও যুদ্ধ পরিচালনায় পূর্ব বাংলার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এ জন্যই তিনি সে এলাকার কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ইসলাম খানই

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে মোঘলদের জন্য বাংলা জয় করেছিলেন। তার দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে মোঘল সাম্রাজ্যের একজন নির্মাতা এবং বাংলা প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সুবাদার হিসেবে গণ্য করা হয়।[৮৮]

সুবাদার শাহ্ সুজা

ইসলাম খান চিশতির পর ১৬১৩ থেকে ১৬৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় নয়জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন। তাদের এই শাসনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ঢাকা গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। মোঘল সম্রাট শাহজাহান তার ছেলে শাহ্ সুজাকে ১৬৩৯ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬৪২ সালে তাকে উড়িষ্যা প্রদেশের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ১৬৩৯-১৬৬০ সাল পর্যন্ত বিশ বছরের কিছু অধিক সময় ধরে তিনি প্রদেশ দু'টি শাসন করেন। এ সময়ে তার শাসনের দু'টি সংক্ষিপ্ত বিরতি ছিল প্রথম। বিরতি হয় ১৬৪৭-৪৮ পর্যন্ত। প্রথম বিরতিতে আফগানিস্তানের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে তিনি সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন, দ্বিতীয় বিরতি ঘটে ১৬৫২ সালে, তখন তিনি এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত চার মাস কাল কাবুলে অবস্থান করেন। তার সুবাদারির শেষ দিকে ১৬৫৮ সাল থেকে সিংহাসন দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে দু'বার তিনি রাজধানী দিল্লি অভিমুখে অগ্রসর হন।

শাহ্ সুজার নিযুক্তির সময় ঢাকা সুবাহ্ বাংলার রাজধানী ছিল। শাহ্ সুজার শাসনকালে বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশ দু'টিতে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করছিল; কোনো অংশেই কোনো বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে জমিদার ও দুষ্কৃতিকারীরা সুবাদার হিসেবে রাজকুমারকে দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। তদুপরি সুজার ওপর কেবল দুই প্রদেশের (বাংলা ও উড়িষ্যা) সুবাদারির দায়িত্ব ন্যস্ত থাকেনি, তিনি কামরূপ ও আশ্রিত রাজ্য কুচবিহার দখল করেন, যা তৃতীয় আর এক প্রদেশের সমতুল্য ছিল এবং এটিও তার অধীনে দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে সুজা পূর্ব ভারতের শাসক ছিলেন।

---

৮৮. ইসলাম খান চিশতি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/39rBBhC / অ্যাকসেস ইন ২৮জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

শাহ্ সুজা ব্যাপক রাজ্য বিজয়ের জন্য খ্যাত ছিলেন না, তবে মনে হয় তিনি হিজলি ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হিজলি অঞ্চলে বাহাদুর খান নামক এক স্বভাবগত বিদ্রোহী শাসন করতেন (পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলা)। সুজার সময়ে বাহাদুর রাজস্ব পরিশোধে বিলম্ব করেন, এই বিলম্বের জন্য সুজা তড়িৎ ব্যবস্থা নেন। বাহাদুর খান পরাজিত হন এবং আগের চেয়ে আরও বেশি রাজস্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ক্ষমা লাভ করেন। ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস রাজমালায় ওই রাজ্যের সাথে সুজার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বর্তমান কুমিল্লার সীমান্ত সংলগ্ন অংশবিশেষ ছেড়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করেন। একটি মসজিদ তৈরির মধ্য দিয়ে সুজা এই বিজয় স্মরণীয় করে তোলেন। মসজিদটি এখনও ভালো অবস্থায় আছে এবং সুজার নাম মনে করিয়ে দেয়। এটি কুমিল্লা শহরের অদূরে গোমতি নদীর তীরে অবস্থিত।

শাহ্ সুজা বড় নির্মাতা ছিলেন। ঢাকার প্রাচীন মোঘল দালানগুলি তার সময়েই নির্মিত হয়। দালানগুলি হলো বড় কাটরা, ঈদগাহ, হোসেনী দালান এবং চুড়িহাট্টা মসজিদ। চকবাজারের একটু দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার তীরে বড় কাটরা তৈরি করা হয়। মনোমুগ্ধকর স্থাপনাটি মূলত যুবরাজের বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়, কিন্তু থাকার জন্য তিনি রাজমহল পছন্দ করায় বড়কাটরা ভ্রাম্যমাণ বণিকদের বাসের জন্য দেওয়া হয়, অর্থাৎ এটি কাটরা বা সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঈদগাহ উঁচু ভিতের চারদিকে ঘেরা দিয়ে বানানো হয়। বছরে দুই ঈদে জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। তার শাসনামলে সৈয়দ মুরাদ ১৬৪২-৪৩ সালে হোসেনী দালান নির্মাণ করেন। এখানে শিয়া সম্প্রদায় জামাতে নামাজ আদায় করতেন, আর চুড়িহাট্টা মসজিদ ১৬৫০ সালে তৈরি করা হয়। রাজমহলে শাহ্ সুজা 'সাঙ্গ-ই-দালান' (পাথরের প্রাসাদ) নামে এক প্রাসাদ এবং মার্বেল পাথরের এক মসজিদ তৈরি করেন। 'আনন্দ-সরোবর' নামে এক দিঘি এখনও শাহ্ সুজার স্মৃতি বহন করে। পুকুরের চারদিকে তৈরি করা হয় দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, হাম্মাম (গোছল খানা), হাউজ (জলাধার) এবং ফোয়ারা (ঝর্ণা)। এর বাইরে গৌড়ে (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) তিনি তাহখানা, তিন গম্বুজ মসজিদ, সরাইখানা, দীঘি খননসহ নানান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।[৮৯]

---

৮৯. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১৬৬-১৭০

www.pathagar.com

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়ে শাহ সুজা সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি বিদেশি বণিক ও ইউরোপীয় কোম্পানীদের সাদর আমন্ত্রণ জানান এবং অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা করে দেন। তিনি পর্তুগিজদের এক 'নিশান' (যুবরাজের দেওয়া অনুমতি পত্র) প্রদান করেন, যার মাধ্যমে সম্রাটের 'ফরমানে' দেওয়া বাণিজ্যিক সুবিধাদি স্বীকার করা হয়। তিনি ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ডাচ কোম্পানীকেও অনুরূপ সুবিধাদি দেন।

১৬৫৭ সালের ৬সেপ্টেম্বর শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে গুজব রটে যে সম্রাট মারা গেছেন। কিন্তু তার বড় পুত্র দারাশিকো সিংহাসনে তার অবস্থান দৃঢ়করণের জন্য তা গোপন রেখেছেন। বাকি তিন যুবরাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী অভিমুখে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সুজা নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন ও রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। গঙ্গা নদীতে বহু সংখ্যক যুদ্ধের নৌকা সজ্জিত করে বিরাট বাহিনী নিয়ে তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। বাহাদুরপুরের তুমুল যুদ্ধে (আধুনিক উত্তর প্রদেশ, ভারত) দারার বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়ে আবার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সুজা রাজমহলে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব দু'বার (ধর্মাট ও সামগড়ে) দারাকে পরাজিত করেন এবং তাকে বন্দি ও হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুজা আবারও রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। এবার তার অভিযান ছিল আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে। ১৬৫৮ সালের ৫জানুয়ারী খাজোয়াতে (ফতেহপুর জেলা, উত্তর প্রদেশ, ভারত) যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও সুজা পরাজিত হন। তিনি বাংলার দিকে পশ্চাদপসরণ করেন।

আওরঙ্গজেবের সেনা নায়ক মীর জুমলার অধীন রাজকীয় বাহিনী দ্বারা ভীষণভাবে তাড়িত হলেও সুজা প্রতিটি জায়গায় তাদেরকে বাধা দিতে থাকেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ১৬৬০ সালের এপ্রিল মাসে চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি পরাজয় বরণ করেন। প্রতিটি পরাজয়ের পর স্বীয় বাহিনীর সেনারা তাকে ছেড়ে যেতে থাকে কিন্তু তিনি তাতে হতোদ্যম হননি। তিনি বরং নতুন উদ্যোমে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। কিন্তু তান্ডাতে যখন চারদিক থেকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ছিলেন এবং সৈন্য পুনর্গঠিত করা আর সম্ভব নয় মনে করলেন তখন চিরকালের জন্য তিনি বাংলা (এবং ভারতবর্ষ) ত্যাগ করে আরাকানে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেন। তিনি সপরিবারে এবং দলবল নিয়ে ১৬৬০ সালের ৬এপ্রিল তান্ডা ত্যাগ করে এপ্রিলের ১২ তারিখে ঢাকা পৌঁছেন। ৬ মে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং ১২মে নোয়াখালীতে দলবল নিয়ে আরাকানের পথে জাহাজে ওঠেন।[১০]

সুবাদার মীর জুমলা

শাহ্ সুজার পর বাংলার নতুন সুবাদার নিযুক্ত হন মীর জুমলা। তিনি সম্রাট আলমগীরের (আওরঙ্গজেব) প্রতিনিধি ছিলেন। মীর জুমলার শাসন ছিল মাত্র তিন বছরের। কিন্তু তিনি যুদ্ধ জয় ও বাংলায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলাকালে শাহ্ সুজার অনুপস্থিতির কারণে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল এবং সেখানে অবাধ্যতা এবং একগুঁয়েমি দেখা দিয়েছিল। তিনি সুজা কর্তৃক রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তর বাতিল করে ঢাকাকে তার পূর্বতন গৌরবে পুনঃঅধিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি বিচার বিভাগের প্রতি নজর দেন। তিনি অসৎ কাজী ও মীর আদলদের বরখাস্ত করে তাদের স্থলে সৎ ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করেন।

ঢাকা ও শহরতলী এলাকায় মীরজুমলার নির্মাণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে দ্রুত সৈন্য চলাচল, যন্ত্রপাতি ও গোলাবারুদ প্রেরণের জন্য এবং জনকল্যাণমূলক দু'টি রাস্তা ও দু'টি সেতু। কৌশলগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে তিনি কয়েকটি দুর্গও নির্মাণ করেন। একটি দুর্গ ছিল টঙ্গী জামালপুরে, যা ঢাকাকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্তকারী (বর্তমানে ময়মনসিংহ রোড নামে পরিচিত) সড়কটির নিরাপত্তা বিধান করতো। অন্য সড়কটি পূর্বদিকে চলে গিয়ে রাজধানীকে ফতুল্লার (পুরাতন ধাপা) সঙ্গে যুক্ত করেছে, যেখানে দু'টি দুর্গ রয়েছে। আরও বিস্তৃত হওয়া এই সড়কটি দিয়ে খিজিরপুর পর্যন্ত যাওয়া যেতো এবং সেখানেও দু'টি দুর্গ অবস্থিত ছিল। ফতুল্লার অদূরে পাগলা সেতুটি এই রাস্তায় অবস্থিত। মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত সড়ক ও দুর্গগুলির কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান।

বাংলায় মীর জুমলার শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তিনি সীমান্তবর্তী কামরূপ এবং আসাম রাজ্যগুলি জয় করেছিলেন। কুচবিহার ছিল সামন্ত রাজ্য,

---

১০. শাহ সুজা / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3oseZSq / অ্যাকসেস ইন ২৮ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

কিন্তু উত্তরাধিকার যুদ্ধের সুযোগে রাজা প্রাণ নারায়ণ আনুগত্য অস্বীকার করেন। আসামের রাজা জয়ধ্বজ সিংহ কামরূপ দখল করে নেন। এটা আগে বাংলা সুবাহর অঙ্গীভূত ছিল। এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী নিয়ে মীর জুমলা শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর মূল অংশ কামরূপের দিকে প্রেরণ করে তিনি নিজে কুচবিহারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি নিকটবর্তী হলে প্রাণ নারায়ণ দেশ ত্যাগ করে পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যান। কুচবিহার দখল করতে দেড় মাসের মতো সময় লেগেছিল এবং সেখানকার প্রশাসনিক বন্দোবস্ত করে মীরজুমলা কামরূপের দিকে প্রেরিত অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে যোগদান করেন। আসামের রাজা কামরূপ ত্যাগ করে যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দান করেন। তবে মীর জুমলা আসাম জয়েরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে আসাম ছিল একটি বড় ভূখন্ড এবং এর ভৌগোলিক প্রকৃতি ছিল বাংলা থেকে অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু কিছুই মীর জুমলাকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি।[৯১]

গৌহাটি থেকে যাত্রা শুরু করার পর ছয় সপ্তাহেরও কম সময়ে মীর জুমলা আসামের রাজধানী গড়গাঁও পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। রাজা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই ভূখন্ডটি ছিল ঘোড়া ও সৈন্যদের পক্ষে দুর্গম উঁচু পাহাড়। বর্ষাকালে মোঘল সৈন্যবাহিনী কিছু উঁচু ভূমিতে আটকে পড়ে, রাস্তাঘাট ডুবে যায় এবং ছোট ছোট নদী, এমনকি নালাগুলিও (নর্দমা) স্ফীত হয়ে বড় নদীর আকার ধারণ করে। অসমিয়াগণ চারদিক থেকে তাদের অভ্যাসগত রাত্রিকালীন আক্রমণ চালিয়ে মোঘলদের নাজেহাল করে; রাস্তাগুলি প্লাবিত হওয়ার ফলে কোনো কিছু পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। যার ফলে ঘাঁটি থেকে তাদের জন্য খাদ্য দ্রব্যাদি আসাও বন্ধ হয়ে যায়। শিবিরগুলিতে মানুষ ও পশুর জন্য প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত ঘোড়াগুলি হত্যা করতে শুরু করে এবং বহু কষ্টে মোঘলগণ সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়। খাদ্যাভাব ছাড়াও দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর বায়ু এবং জলের কারণে মোঘল শিবিরগুলিতে মহামারি দেখা দেয়। এর ফলে মীর জুমলার সৈন্যবাহিনীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মীর জুমলা নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

দেশের অর্থনীতিতে ব্যবসা ও ব্যবসায়ীদের অবদান সম্পর্কে মীর জুমলা অবগত

---

৯১. মীর জুমলা / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2KWvBnV / অ্যাকসেস ইন ২৮জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ছিলেন। বাংলার সুবাহ্দার হিসেবে তিনি ব্যবসায়ীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন। তার আমলে পর্তুগিজদের বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু, তাদের স্থান নেওয়ার জন্য ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানীগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল। তারা তার ক্ষমতায় ভীত ছিল এবং তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করতো। রাজকীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে তাদেরকে প্রদত্ত বাণিজ্যিক সুবিধাদি ভোগ করার জন্য তিনি ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিসহ বিদেশী বণিকদের সাহায্য করেছিলেন।

নিজের চেষ্টায় সামান্য অবস্থা থেকে অতি উচ্চপদে উন্নীত মানুষ মীর জুমলা ছিলেন সতেরো শতকে ভারতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন উদ্যোগী এবং নম্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। একজন সাধারণ কেরানি হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি মোঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সুবাদার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালক এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। একজন ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু মোঘল সুবাদার হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।[১২]

সুবাদার শায়েস্তা খাঁ

মীর জুমলার মৃত্যুর পর শায়েস্তা খাঁ'কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন সম্রাট আলমগীর। শায়েস্তা খাঁ ৬৩ বছর বয়সে প্রথম বাংলায় আসেন। তার ছয়জন দক্ষ পুত্র শাসন কাজে তাকে সহায়তা করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই এক বা একাধিক সরকারের ফৌজদারের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। যার ফলে একই পরিবার বাংলার সব বিভাগ কার্যকরভাবে শাসন করেছিলেন। সামসময়িক ঐতিহাসিকগণ তার প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ, কর্মচারীদের দুর্নীতিদমন এবং অন্যায় কর বিলোপ করে জনগণকে স্বস্তিদানের জন্য শায়েস্তা খাঁ'র প্রশংসা করেছেন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাদের শাসনকালে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং শায়েস্তা খাঁ প্রশাসনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তার শক্তি নিয়োজিত করেন। সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক সততার ফলে অসৎ কর্মকর্তা ও অবাধ্য জমিদাররা ভীত হয়ে পড়েছিল, যার ফলে প্রশাসনের সকল শাখায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

---

[১২] বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১৭৪-১৭৯

www.pathagar.com

প্রধানত চট্টগ্রাম জয়ের জন্যই বাংলায় শায়েস্তা খাঁ'র বিশাল খ্যাতি। মোঘলদের বাংলা বিজয়ের আগে চট্টগ্রাম আরাকানিদের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান চিশতি বাংলা ও আরাকানের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী ফেনী নদী পর্যন্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের কয়েকজন সুবাদার চট্টগ্রাম দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। আরাকানি সৈন্যরা নৌ-চালনা ও নৌ-যুদ্ধে দক্ষ ছিল। যার ফলে আরাকানের রাজাগণ কখনোই মোঘল সুবাদারদের শান্তিতে থাকতে দেননি। মাঝে মাঝেই তারা বাংলায় নৌ-অভিযান পাঠাতেন এবং তাদের গতিপথের অন্তর্ভুক্ত এলাকার যে কোনো অংশে লুঠপাট চালাতেন। এমনকি কখনও কখনও তারা রাজধানী শহর ঢাকায়ও আক্রমণ করতেন। ওলন্দাজ ও ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য হারিয়ে ফেলার পর পর্তুগিজরাও সতেরো শতকের গোড়া থেকে জলদস্যুতা শুরু করেছিল। পর্তুগিজ জলদস্যুরা আরাকানে আশ্রয় লাভ করতো। আরাকানের রাজা তার শত্রুর অধীন বাংলার সীমান্ত অঞ্চল লুঠ করার জন্য মগ জলদস্যুদের সঙ্গে পর্তুগিজদেরও নিযুক্ত করতেন। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত জলদস্যুদের যাত্রাপথে নদীগুলির দুই তীর অর্থাৎ উপকূলীয় জেলাগুলি প্রায় জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছিল। জলদস্যুরা ধন সম্পদের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান, পুরুষ, নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে যেতো এবং ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসিদের মতো বিদেশী বণিকদের কাছে এবং দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলিতে বন্দীদের দাস হিসেবে বিক্রি করতো।

কাজেই বাংলায় পৌঁছে শায়েস্তা খাঁ প্রথমেই আরাকানীদের বিপজ্জনক মনোভাবের প্রতি মনোযোগী হন। শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাকে পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সুবাদার ত্রিমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করেন:

প্রথমত, তিনি নওয়ারা বা রণতরীগুলি পুনর্গঠিত করেন,

দ্বিতীয়ত, পর্তুগিজদের নিজের দলে টেনে আনার চেষ্টা করেন, এবং

তৃতীয়ত, তারা যেন তাকে সাহায্য করে অথবা অন্ততপক্ষে নিরপেক্ষ থাকে এ উদ্দেশ্যে তিনি ওলন্দাজ কোম্পানীকে তার দলে টানার চেষ্টা করেন।

শায়েস্তা খাঁ মোঘল সরকারের পূর্ববর্তী নৌ-বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। তাছাড়া

www.pathagar.com

পুরানো নৌকাগুলিকে মেরামত করা হয় এবং ঢাকা ও যশোরের জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানায় এবং অন্যান্য নদীবন্দরে নতুন নৌকা তৈরি করা হয়।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শায়েস্তা খাঁ প্রথমে সন্দ্বীপ দ্বীপটি জয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে অভিযানের ঘাঁটি ছিল ভুলুয়া (নোয়াখালী), তবে এটা ছিল স্থলবাহিনীর জন্য ঘাঁটি। পক্ষান্তরে আরাকান ছিল মূলত একটি নৌ-শক্তি। স্থল ও জল উভয় দিক থেকেই চট্টগ্রাম আক্রমণ করা ছিল আবশ্যক। সুতরাং নৌ-বাহিনীর জন্য একটি ঘাঁটির প্রয়োজন ছিল এবং সন্দ্বীপ ছিল একটি আদর্শ নৌ-ঘাঁটি। শায়েস্তা খাঁ তার নৌ-সেনাপতিকে সন্দ্বীপ আক্রমণের আদেশ দেন এবং তিনি ১৬৬৫ সালের নভেম্বরে সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। সন্দ্বীপের শাসক ছিলেন মোঘলদের এক পলাতক প্রাক্তন নাবিক, ৮০ বছর বয়স্ক দিলওয়ার খান। তিনি শৌর্য ও দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। সন্দ্বীপ দখল করে মোঘলদের শাসনাধীন করা হয়।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিরাও মোঘলদের পক্ষে চলে আসে। মোঘলদের জন্য সৌভাগ্যক্রমে তখন চট্টগ্রামের মগ রাজা ও সেখানকার পর্তুগিজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আরাকানি রাজার তীব্র রোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্তুগিজরা তাদের পরিবার, জাহাজ এবং কামান নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে পালিয়ে এসে ভুলুয়ার (নোয়াখালী) মোঘল সেনাপতির কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। শায়েস্তা খাঁ পর্তুগিজ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা ও সম্মান জানান। তিনি তাকে নগদ ২, ০০০ টাকা পুরস্কার ও ৫০০ টাকা মাসিক বেতন প্রদান করেন। তার অনুগামীদেরও উপযুক্ত বেতন-ভাতাসহ মোঘল সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়। বাটাভিয়ার ওলন্দাজ গভর্নর জেনারেল তার কোম্পানীর সাহায্যের ব্যাপারেও শায়েস্তা খাঁ'কে আশ্বস্ত করেছিলেন। তারা আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ তাদের বাণিজ্য কুঠি বন্ধ করে দেয়, তাদের কর্মচারীদের প্রত্যাহার করে নেয় এবং তাদের জাহাজগুলির গতিপথ আরাকান থেকে অন্যান্য স্থানে পাল্টে দেয়। চট্টগ্রাম অভিযানে কাজে লাগানোর জন্য ওলন্দাজ কোম্পানী শায়েস্তা খানকে দু'টি জাহাজ পাঠান। তবে সেগুলি এসে পৌঁছার আগেই শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রামে আরাকানিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন।

শায়েস্তা খাঁ ১৬৬৫ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তার দীর্ঘদিন ধরে

www.pathagar.com

পরিকল্পিত চট্টগ্রাম অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেন। তার পুত্র বুজুর্গ উমেদ খানকে সার্বিক নেতৃত্ব দেওয়া হয় এবং নৌ-সেনাপতি ইবনে হোসেনকে নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। সুবাদার নিজে রসদ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী একই সময়ে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে স্থল ও সমুদ্রপথে যাত্রা করে। স্থল বাহিনীকে জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করে অগ্রসর হতে হয়েছিল। সমুদ্রে এবং পরে কর্ণফুলী নদীতে একটি বড় যুদ্ধে পর্তুগিজদের সাহায্য নিয়ে মোঘলরা বিজয়ী হয়। আরাকানী নৌ-বাহিনী পরাজিত হলে তাদের নাবিকরা পালিয়ে যায় এবং তাদের কেউ কেউ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। চট্টগ্রাম দুর্গ অবরোধ করা হয় এবং ১৬৬৬ সালের ২৬জানুয়ারী তা মোঘল অধিকারে আসে। পরের দিন বুজুর্গ উমেদ খান দুর্গে প্রবেশ করেন এবং চট্টগ্রামকে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একজন ফৌজদারের অধীনে মোঘল প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সম্রাটের অনুমতি সাপেক্ষে এর নাম পরিবর্তন করে ইসলামাবাদ রাখা হয়। প্রধানত মগ-পর্তুগিজ জলদস্যুদের লুটতরাজ, অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মানুষ রক্ষা পাওয়ায় চট্টগ্রাম জয় সারাদেশে অবর্ণনীয় আনন্দ বয়ে আনে। হাজার হাজার অপহৃত ও ক্রীতদাসে পরিণত বাঙালি কৃষকদের মুক্তিলাভ ছিল এই বিজয়ের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল।

শায়েস্তা খাঁ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে সহায়তা করেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ব্যবসাকে উৎসাহিত করেন এবং তাদের স্বার্থের নিরাপত্তার জন্য রাস্তা ও নদীগুলিকে ডাকাতমুক্ত করেন। রাজকীয় ফরমানগুলির শর্তানুসারে তিনি ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে বিশেষ অধিকার প্রদান করেছিলেন। কিন্তু কখনো কখনো ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি তাদের বিশেষ অধিকারগুলির অপব্যবহার করতো এবং তাদের কুঠিয়াল ও নাবিকরা রাজকীয় ফরমান দ্বারা নিষিদ্ধকৃত ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত হতো। কাজেই মাঝে মাঝে বিশেষত শুল্ক দাবী ও প্রদান নিয়ে বন্দর ও শুল্ক বিভাগের মোঘল কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটতো। সম্রাট বাণিজ্যের প্রসারকে উৎসাহিত করতেন, কারণ বাণিজ্য বিশেষত রপ্তানি বাণিজ্য আয় বৃদ্ধি ঘটায়।

শায়েস্তা খাঁ একজন নির্মাতাও ছিলেন। তিনি রাজধানী শহর ঢাকা ও তার

www.pathagar.com

বাইরে বেশ কয়েকটি মসজিদ, সমাধি এবং অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ঢাকাকে স্থানীয় বাণিজ্য, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যান। তার কল্যাণে ঢাকা একটি ছোট দাপ্তরিক কেন্দ্র থেকে বৃহৎ ও উন্নত শহরে পরিণত হয়। শয়েস্তা খাঁ মসজিদটি তার তৈরি একটি সুবৃহৎ কীর্তি। বাংলা ও মোঘল স্থাপত্য কীর্তির মিশ্রণে তৈরি এই ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে। এছাড়াও তার আমলে লালবাগ কেল্লা, হোসনী দালান, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা নির্মিত হয়।

তার দক্ষ সেনাপতিত্ব, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণের অগ্রগতি সাধনের জন্য সামসময়িক ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকবৃন্দ শায়েস্তা খানের প্রশংসা করেছেন। তার উদারতা, বদান্যতা এবং ধর্মপ্রাণতার ওপরও তারা গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি একজন কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তার নির্মাণ কার্যাবলি পরবর্তীকালে শায়েস্তা খাঁ নীতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। মোঘল আমলে সুবাহ্ বাংলার দায়িত্ব পাওয়া সুবাদারদের মধ্যে অনন্য কীর্তিতে উজ্জ্বল ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তার জীবদ্দশায় তিনি দুই পর্বে বাংলার সুবাদারির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একই সাথে সবচেয়ে বেশি সময় বাংলার সুবাদারের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথম দীলির খান ও দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার রূপে বাংলাদেশ শাসন করেন।

১৬৬৪ সালে শায়েস্তা খাঁ সুবাদারের দায়িত্ব নিয়ে ঢাকায় আসেন। ১৬৭৬ সালে উড়িষ্যা তার সুবেদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। টানা ১৪ বছর পর ১৬৭৮ সালে জাহাঙ্গীরের আদেশে এক বছরের জন্য তিনি দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন। ১৬৭৯ সালে সেপ্টেম্বরে তিনি আবার দ্বিতীয়বারের জন্য বাংলায় ফিরে আসেন। শায়েস্তা খাঁ প্রায় ২২ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন। শায়েস্তা খাঁ একদিকে ছিলেন সুশাসক, অন্যদিকে একজন বিজয়ী যোদ্ধা ও নিপুণ নির্মাতা। ১৬৮৮ সালের জুন মাসে এই শাসক দিল্লির উদ্দেশ্যে বাংলা ত্যাগ করেন। এর মধ্য দিয়েই শেষ হয় শায়েস্তা খাঁ'র সোনালি যুগ।[১৩]

---

[১৩] বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১৮০-১৮৩

www.pathagar.com

নবাবী যুগে বাংলা

শায়েস্তা খাঁ'র পর এদেশে আর যোগ্য ও দক্ষ সুবাহ্দার আসেননি। গতানুগতিক কয়েকজন সুবাদার এসেছেন। এরমধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন করতলব খাঁ বা মুর্শিদকুলি খাঁ। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খাঁ স্বাধীন নবাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

শায়েস্তা খাঁ'র পর ফিদা খান ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ মুহাম্মদ আজম পর পর বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৭৮ সালে মুহাম্মদ আজম সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের অবৈধ সুবিধা আদায়ের জন্যে মুহাম্মদ আজমকে একুশ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করে। সম্রাট আওরঙ্গজেব তা জানতে পেরে তাকে পদচ্যুত করে পুনরায় শায়েস্তা খাঁ'কে বাংলায় প্রেরণ করেন। এ সময়ে ইংরেজদের ঔদ্ধত্য চরমে পৌঁছে। আকবর নামক জনৈক ব্যক্তি সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং ইংরেজগণ তাকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। শায়েস্তা খাঁ এ ষড়যন্ত্র জানতে পেরে পাটনা কুঠির অধিনায়ক মিঃ পিককে কারারুদ্ধ করেন। কোম্পানীর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় লন্ডন থেকে ক্যাপ্টেন নিকলসনের নেতৃত্বে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং চট্টগ্রাম অধিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু ক্যাপ্টেন নিকলসন বিফল মনোরথ হন।

ইংরেজদের এহেন দুরভিসন্ধির জন্যে নবাব শায়েস্তা খাঁ তাদেরকে সুতানটি থেকে বিতাড়িত করেন। ১৬৮৭ সালে কাশিমবাজার কুঠির প্রধান জব চার্ণক নবাব প্রদত্ত সকল শর্ত স্বীকার করে নিলে পুনরায় তাদেরকে ব্যবসায় অনুমতি দেওয়া হয়। নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্তগুলি জব চার্ণক কর্তৃক মেনে নেওয়ার কথা ইংল্যান্ডে পৌঁছলে কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ এটাকে অবমাননাকর মনে করে। অতঃপর তারা ক্যাপ্টেন হীথ নামক একজন দুর্দান্ত নাবিকের পরিচালনাধীনে 'ডিফেন্স' নামক একটি রণতরী বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে ভারতে প্রেরণ করে। হীথ সুতানটি পৌঁছে মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর লোকজনসহ বালেশ্বর (উড়িষ্যার একটি শহর) গমন করে। এখানে তারা জনগণের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে। অতঃপর হীথ বালেশ্বর থেকে চট্টগ্রাম গমন করে আরাকান রাজের সাহায্য প্রার্থনা করে। এখানেও সে ব্যর্থ হয় এবং নিরাশ হয়ে মাদ্রাজ চলে যায়। তাদের এসব দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্র

www.pathagar.com

জানতে পেরে সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদের মসলিপট্টম ও ভিজেগাপট্টমের বাণিজ্য কুঠিসমূহ বাজেয়াপ্ত করেন। এভাবে কোম্পানী তাদের দুষ্কৃতির জন্যে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[১৪]

শায়েস্তা খাঁ'র পর অল্পদিনের জন্যে খানে জাহান বাংলার সুবাদার হন এবং ১৬৮৯ সালে ইব্রাহীম খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। এ দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারকল্পে কোম্পানীর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়। অতঃপর উড়িষ্যার বন্দী ইংরেজদেরকে মুক্তিদান করে জব চার্ণককে পুনরায় বাংলায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। জব চার্ণক পলায়ন করে মাদ্রাজ অবস্থান করছিল। ধূর্ত জব চার্ণক অনুমতি পাওয়া মাত্র ১৬৯১ সালে ইংরেজ বণিকদেরকে নিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে এবং কোলকাতা নগরীর পত্তন করে নিজেদেরকে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, এর সুদূরপ্রসারী ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজগণ বাংলা তথা সমগ্র ভারতভূমিতে তাদের আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ণ রাখে।[১৫]

এ সময়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ইস্তানবুলের শায়খুল ইসলাম বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে জানান যে, ইংরেজরা ভারত থেকে যে বিপুল পরিমাণ যবক্ষার সংগ্রহ করে তা ইউরোপে রপ্তানী করা হয় এবং তাই দিয়ে গোলাবারুদ তৈরি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। আওরঙ্গজেব যবক্ষার ক্রয় নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গোপনে তারা যবক্ষার পাচার করতে থাকে। অতঃপর ইউরোপীয়দের সাথে ব্যবসা নিষিদ্ধ করে বাদশাহ আওরঙ্গজেব এক ফরমান জারী করেন। হুগলী কুঠির প্রধান বাংলার সুবাদারের কৃপাপ্রার্থী হলে তিনি এ নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা হ্রাস করে দেন।[১৬]

ইব্রাহীম খাঁ'র অযোগ্যতার কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেব তার স্থলে স্বীয় পৌত্র আজিমুশশানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। আজিমুশশান ছিলেন অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও অর্থলোভী। সেই সুযোগে ইংরেজগণ তাকে প্রভূত পরিমাণে উপঢৌকনাদি নজরানা দিয়ে সুতানটি বাণিজ্যকুঠি সুরক্ষিত করার অনুমতি লাভ

---

১৪. শায়েস্তা খাঁ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2KWvBnV / অ্যাকসেস ইন ২৮জানুয়ারী ২০২১

১৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৫১-৫২

১৬. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৫৩

www.pathagar.com

করে। তারপর পুনরায় ষোল হাজার টাকা নজরানা ও মূল্যবান উপহার দিয়ে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা গ্রাম তিনটি লাভ করে।

১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজিমুশশানের পিতা বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। ফলে পুনরায় আজিমুশশান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। অযোগ্য, অকর্মণ্য ও আরামপ্রিয় সুবাদারকে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে মুর্শিদ কুলী খাঁ'কে দেওয়ান নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠানো হয়। বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে মুর্শিদকুলী খাঁ'কে দাক্ষিণাত্যে বদলি করা হয়। তবে দু'বছরের মধ্যেই ১৭১০ সালে তাকে আবার ফেরত আনা হয়।[৯৭]

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে ফরোখশিয়ার কর্তৃক আজিমুশশান নিহত হন এবং ফরোখশিয়ার মুর্শিদ কুলী খাঁ'কেই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ ইংরেজদের হাতের পুতুল সাজার অথবা অর্থদ্বারা বশীভূত হবার পাত্র ছিলেন না। অতএব তার কাছ থেকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা লাভে ইংরেজগণ ব্যর্থ হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা সম্রাটের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে হ্যামিল্টন নামে একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ছিল। বাংলার সুবাদার ছিলেন ইংরেজদের প্রতি বিরাগভাজন। তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে সম্রাট ছিলেন নারাজ। কিন্তু এখানে একটি প্রেমঘটিত নাটকের সূত্রপাত হয় যার ফলে ইংরেজদের ভাগ্য হয় অত্যন্ত সুপ্রসন্ন।[৯৮]

উদয়পুরের মহারাণা সিংহের এক পরম রূপসী কন্যার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন যুবক সম্রাট ফরেখশিয়ার। বিবাহ স্থিরীকৃত হওয়ার পর হঠাৎ তিনি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হন। বিবাহ অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত হয়ে যায়। কোনো চিকিৎসায়ই কোনো ফল হয় না। অবশেষে সম্রাট হ্যামিল্টনের চিকিৎসাধীন হন। তার চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের পর মহারাণার কন্যার সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়। প্রিয়তমাকে লাভ করার পর সম্রাট ফরোখশিয়ার ডাঃ হ্যামিল্টনের প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং ইংরেজ বণিকদিগকে কোলকাতার দক্ষিণে

---

৯৭. আজিম-উস-শান / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2MIjQ56 / অ্যাকসেস ইন ৩০ জানুয়ারী ২০২১

৯৮. ফররুখ সিয়ার / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3oycEFV / অ্যাকসেস ইন ৩০ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

হুগলী নদীর উভয় তীরবর্তী আটত্রিশটি গ্রাম দান করেন। তার নামমাত্র বার্ষিক খাজনা র্নিধারিত হয়। মাত্র আট হাজার একশ' একুশ টাকা। সম্রাটের নিকট থেকে এতকিছু লাভ করার পরও মুর্শিদ কুলি খাঁ'র ভয়ে তারা বিশেষ কোনো সুবিধা করতে পারেনি।[৯৯]

১৭১৬ সালে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নাজিম পদে উন্নীত হন। তিনি অসংখ্য উপাধি ও পদবিতে ভূষিত হন। প্রথমে তিনি 'জাফর খান' উপাধি পান এবং পরে তাকে 'মুতামিন-উল-মুলক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরী নাসির জঙ্গ বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়। তাকে সাত হাজারি মনসব প্রদান করা হয়। ১৭১৭ সালে তিনি প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে ১৭২৭ সালের ৩০জুন মুর্শিদকুলী খাঁ'র মৃত্যু হয়।[১০০]

মুর্শিদকুলী খাঁ কেবল বাংলার দীউয়ান ও সুবাদার ছিলেন তা নয়, একই সময়ে তিনি ছিলেন উড়িষ্যার দীউয়ান ও সুবাদার, বিহারের দীউয়ান এবং কয়েকটি জেলার ফৌজদার। তার নিয়ন্ত্রণে ছিল তিনটি প্রদেশ। এই সুবাদে তিনি তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধ-বান্ধবদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তারা তাকে রাজস্বসহ প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করেন। ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলী খাঁ পূর্ববর্তী টোডরমল ও শাহ সুজা প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত পদ্ধতির সংস্কার করে একটি নতুন বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। রাজস্ব কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা নিশ্চিত করেন এবং এভাবে সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করেন। তার রাজস্ব ব্যবস্থা মাল জমিনী নামে পরিচিত, অর্থাৎ তিনি জমিদারদের ওপর তাদের জমির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তার আমলে বেশ কিছু নতুন ও বৃহৎ জমিদারির পত্তন হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁ'র আমলে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যে বাংলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আরব, পারস্য ও আর্মেনীয় ব্যবসায়ীরা বাংলায় বেশ সক্রিয় ছিল। সতের শতক থেকে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি বাংলায় উৎপাদিত সুতা, রেশম ও তা থেকে উৎপন্ন বস্ত্রসামগ্রী ক্রয় শুরু করে। এসব ক্রয়ের জন্য তারা স্বর্ণ ও রৌপ্য

---

৯৯. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৫৪

১০০. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ১৯৯

www.pathagar.com

আমদানি করতো। এর ফলে এদেশে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এই ব্যবসা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ব্যবসায়ী, সাহু বা পোদ্দার, মহাজন, বানিয়া ও দালালরা দ্রুত মহাজনি ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে। এ ধরনের বহু মহাজনের মধ্যে জগৎ শেঠ অতি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বাণিজ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং ব্যবসায়ী ও কোম্পানীগুলিকে সৎ ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি অসৎ ব্যবসায়ীদের কঠিন শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে কোলকাতার আশেপাশে বেশি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি দেননি, এমনকি কোম্পানীর রাজকীয় ফরমান লাভের পরও তিনি অনমনীয় ছিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মসজিদ নির্মাণে যত্নবান ছিলেন। তিনিই ঢাকার করতলব খান মসজিদ (বেগম বাজার মসজিদ) এবং মুর্শিদাবাদ মসজিদ নির্মাণ করান। ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং স্বহস্তে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি তৈরি করে তিনি পবিত্র স্থানে বিতরণ করতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ ছিলেন বাংলার প্রথম নবাব। তার ওপর মোঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র আধিপত্য ছিল, সকল ব্যবহারিক উদ্দেশ্যেই তিনি বাংলার নবাব ছিলেন। তার পরিবার সম্পর্কে কয়েক প্রকার মতভেদ রয়েছে। প্রথম সংস্করণ মতে মুর্শিদ কুলি খাঁ'কে, হাজি শফি ইসফাহানি নামে ইরানের একজন উচ্চপদস্থ মোঘল কর্মকর্তা ক্রীতদাস হিসেবে ক্রয় করেন। ইসফাহানিই তাকে শিক্ষিত করে তুলেন। ভারতে ফেরার পর তিনি মোঘল সাম্রাজ্যে যোগদান করেন। ১৭১৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে কার্তালাব খান নামে ইসলাম ধর্মে স্থানান্তরিত করেন ও বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করেন।[১০১]

১৭২৫ সালে মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর তার জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের পদ অলংকৃত করেন। তার আমলে ইংরেজরা ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করে এবং তাদের ঔদ্ধত্যও বহুগুণে বেড়ে যায়। হুগলীর ফৌজদার একবার ন্যায়সংগত কারণে ইংরেজদের একটি মাল বোঝাই নৌকা আটক করেন। একথা জানতে পেরে ইংরেজরা একদল সৈন্য পাঠিয়ে প্রহরীদের কাছ থেকে নৌকা কেড়ে নিয়ে যায়। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান সুবাদার নিযুক্ত হন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ তার সময়ে হয়েছিল।

---

১০১. মুর্শিদকুলী খান / বাংলাপিডিয়া / **https://bit.ly/3tcxmyD** / অ্যাকসেস ইন ৩০ জানুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সরফরাজ খান ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও দুর্বলচিত্ত। তিনি তার মন্ত্রী ও আমলাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। তাদের কূটনীতি ধরতে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি তার সেনাপতি আলীবর্দী খাঁ'র সংগে সংঘর্ষে নিহত হন এবং আলীবর্দী খাঁ ১৭৪১ সালে বাংলার সুবাদার হন। আলীবর্দী খাঁ'র সময় বার বার বাংলার ওপর আক্রমণ চলে বর্গী দস্যুদের। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে রক্ষার জন্যে তিনি কয়েকবার ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থ আদায় করেন। দেশের আর্থিক উন্নতিকল্পে তিনি ব্যবসা বাণিজ্যে উৎসাহ দান করতেন।[১০২]

১৭৪১ সালে দিকে বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ শুরু হয় এবং ১৭৫০ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। প্রায় প্রতি বৎসরই মারাঠী সৈন্যরা এই আক্রমণ করতো। এই আক্রমণের সময় তারা ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ করতো। মূলত পশ্চিমবঙ্গেই এই আক্রমণ হতো। স্থানীয় লোকেরা এই আক্রমণের ভয়ে পূর্ব-বাংলার দিকে পালিয়ে যেতো। এছাড়া বহুমানুষ তখন কোলকাতায় আশ্রয় নিতো। ফলে এই সময় পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল আশঙ্কাজনকভাবে। ইতিহাসে এই আক্রমণকে 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে অভিহিত করা হয়।[১০৩]

মোঘল সাম্রাজ্যের প্রভাব হ্রাস হওয়ার পর, পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে মারাঠ সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র পেশোয়া বাজীরাও এই বিষয়ে যত্নবান হন। হায়দ্রাবাদের নিজাম মারাঠী আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য, নাগপুরের স্বাধীন মারাঠী রাজা রঘুজী ভোঁসলেকে বাংলা আক্রমণে উৎসাহিত করেন। রঘুজী ভোঁসলে সাতরায় তার আধিপত্য বিস্তারে ব্যর্থ হলে বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ নেন। এই সময় পরাজিত রুস্তম জঙ্গও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রঘুজী ভোঁসলেকে প্ররোচিত করেন।

১৭৪২ সালে আলীবর্দী খাঁ উড়িষ্যা অভিযানে থাকার সময়, মারাঠী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা আক্রমণ করেন এবং বিনা বাধায় বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এরপর তিনি কাটোয়া দখল করে নেন। এরপর মারাঠী সৈন্যরা আলীবর্দী খাঁ'র অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, দ্রুত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে মুর্শিদাবাদ শহর ও জগৎশেঠের কোষাগার লুণ্ঠন করে। এই সময় আলীবর্দীর খাঁ ফিরে এলে, ভাস্কর

---

১০২. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ২০৭
১০৩. বাংলাদেশের ইতিহাস । ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম / পৃ. ২৯৫

www.pathagar.com

পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে কাটোয়ায় ফিরে যান এবং সেখানে মারাঠী ঘাঁটি স্থাপন করে গঙ্গা নদীর পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হন।

১৭৪৩ সালে রঘুজী ভোঁসলে বাংলা আক্রমণের উদেশ্যে রওনা হন। এই সময় তার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন বালাজী রাও। মোঘল সম্রাটের অনুরোধে বালাজী রাও রঘুজী ভোঁসলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে, রঘুজী ভোঁসলে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। ফলে রঘুজী ভোঁসলের আক্রমণ থেকে আলীবর্দী খাঁ রক্ষা পান। ১৭৪৪ সালে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। আলিবর্দি খাঁ আফগান সেনাপ্রধান মুস্তফা খাঁ'র সহায়তায় ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাজিত ও হত্যা করেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর, রঘুজী ভোঁসলে মারাঠী সৈন্যদের ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন এবং ১৭৪৫ সালে বাংলা আক্রমণ করেন। রঘুজী প্রাথমিকভাবে উড়িষ্যা ও বিহার দখল করে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আলীবর্দী খাঁ'র বাধার মুখে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। ১৭৪৭ সালে রঘুজীর পুত্র জনজীর ভোঁসলে বাংলা আক্রমণ করে বাংলার মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা দখল করে নেন। এরপর টানা তিন বৎসর মারাঠী সৈন্যদের সাথে আলীবাদী খাঁ'র যুদ্ধ হয়। এই সময় আলীবর্দী খাঁ'র শত্রু মীর হাবিব মারাঠী বাহিনীর সাথে যোগ দেয় এবং নবাবের বাহিনীর আফগান সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। নবাব এই বিদ্রোহ দমন করলেও, উড়িষ্যা পুরোপুরি মারাঠীদের দখলে চলে যায়।

১৭৫১ সালে উভয় বাহিনীর মধ্যে একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে, উড়িষ্যা মারাঠীদের অধিকারে থেকে যায়। এছাড়া বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা মারাঠীদের কর প্রদানে আলীবর্দী খাঁ অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বাংলাতে মারাঠীরা আর কখনো আক্রমণ করবে না, এই অঙ্গীকার মারাঠীরা প্রদান করে। এই সন্ধির মধ্য দিয়ে বর্গীর হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আলীবর্দী খাঁ ইংরেজ, ফরাসীদের বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিকে তিনি ইংরেজদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১৭৫৬ সালের ২৯এপ্রিল তিনি মুর্শিদাবাদে মৃত্যবরণ করেন।[১০৪]

তার কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তিন কন্যার নাম ছিল- মেহার উন-নিসা বেগম (ঘসেটি বেগম), মুনিরা বেগম এবং আমেনা বেগম। আমেনা বেগমের

১০৪. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ২১২-২১৮

www.pathagar.com

বিবাহ হয়েছিল তার কনিষ্ঠ ভাতিজা জৈনুদ্দিন আহমেদ খান-এর সাথে। আমিনা বেগমের গর্ভেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার জন্ম হয়। আলীবর্দীর নিজের কোনো পুত্র সন্তান না থাকায়, আলীবর্দী সিরাজদ্দৌলাকে তার উত্তরসূরি ঘোষণা করে গিয়েছিলেন।[১০৫]

সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণের পর আলীবর্দী-কন্যা ঘসেটি বেগম ও তার দৌহিত্র পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জং-এর সকল ষড়যন্ত্র তিনি দক্ষতার সাথে বানচাল করে দেন। আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ করার সাথে সাথেই ঘসেটি বেগম বিশ হাজার সৈন্যকে তার দলে ভিড়াতে সক্ষম হন এবং মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সিরাজদ্দৌলা ক্ষিপ্রতার সাথে ঘসেটি বেগমের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন ও বেগমকে রাজপ্রসাদে বন্দী করেন। অপরদিকে শওকত জং নিজেকে বাংলার সুবাদার বলে ঘোষণা করলে যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক নিহত হন।

ঘসেটি বেগম ও শওকত জং-এর বিদ্রোহে নওয়াজেশ মুহাম্মদের দেওয়ান রাজবল্লভ ইন্ধন জোগাচ্ছিল। সিরাজদ্দৌলা তা জানতে পেরে রাজবল্লভের কাছে হিসাবপত্র তলব করেন। ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজেশ মুহাম্মদের অধীনে দেওয়ান হিসেবে রাজস্ব আদায়ের ভার তার ওপরে ছিল। আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছিল বলে হিসেব দিতে অপারগ হওয়ায় নবাব সিরাজদ্দৌলা রাজবল্লভের ঢাকাস্থ ধনসম্পদ আটক করার আদেশ জারী করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ আদায়কৃত রাজস্ব ও অবৈধভাবে অর্জিত যাবতীয় ধনসম্পদ সহ গঙ্গাস্নানের ভান করে পালিয়ে গিয়ে ১৭৫৬ সালে কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সিরাজদ্দৌলা ধনরত্নসহ পলাতক কৃষ্ণবল্লভকে তার হাতে অর্পণ করার জন্যে কোলকাতার গভর্ণর মিঃ ড্রেককে আদেশ করেন। ভারতের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ধনকুবের ও রাজ্যের মধ্যে অতি প্রভাবশালী হিন্দুপ্রধান মাহতাব চাঁদ প্রমুখ অন্যান্য হিন্দু বণিক ও বেনিয়াদের পরামর্শে ড্রেক সিরাজদ্দৌলার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। তারপর অকৃতজ্ঞ ক্ষমতালিপ্সু ইংরেজগণ ও তাদের দালাল হিন্দু প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত করে চিরদিরে জন্যে মুসলিম শাসন

---

১০৫. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ২২৩

www.pathagar.com

বিলুপ্ত করার যে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে তা চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয় –পলাশীর ময়দানে।[১০৬]

নবাব সিরাজের পরাজয় তথা মুসলিমদের পরাজয়

সিরাজদ্দৌলা নবাবী অর্জন করার পর থেকেই তিনি বিরোধীতার সম্মুখীন হন। এই বিরোধীতা এসেছে তার আত্মীয়-স্বজন যারা মসনদের দাবীদার ছিল। সেই বিরোধীতা ক্রমেই ষড়যন্ত্রে রূপ নেয়। এর সাথে যুক্ত হয় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ও আধিপত্যবাদী ইংরেজরা। বাংলাসহ এই উপমহাদেশে রাজনৈতিকভাবে ইংরেজ শাসন চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ শুরু হয় পলাশী যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। যে গোষ্ঠি এসেছিল এদেশে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে, তারা হত্যা করলো নবাব সিরাজদ্দৌলাকে।

পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের অনেকগুলো কারণ ছিল, কিছু ছিল প্রত্যক্ষ কারণ, আবার কিছু ছিল পরোক্ষ। পরোক্ষ কারণের প্রধান ছিল আলীবর্দী খাঁ'র প্রতি তার নিকটাত্মীয়দের ঈর্ষাপরায়ণতা। পুত্রহীন আলীবর্দী খাঁ'র দুই জামাতার মধ্যে একজন ছিলেন ঢাকার শাসনকর্তা, তারা আশা করেছিলেন আলীবর্দী খাঁ'র মৃত্যুর পরে তারা মসনদের উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু সিরাজকে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নেয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং তা অবশেষে শত্রুতায় পরিণত হয়।

নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান শত্রু ছিল তার খালাত ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জং। সিরাজদ্দৌলার অপর শত্রু ছিল তার খালা মেহেরুন নেসা। মেহেরুন নেসা ওরফে ঘসেটি বেগম ছিলেন অপুত্রক। তিনি সিরাজদ্দৌলার ছোট ভাই ইকরামুদ্দৌলাকে লালন পালন করেন। ঘসেটি বেগমের ইচ্ছা ছিল নবাব আলীবর্দী খাঁ'র মৃত্যুর পরে ইকরামুদ্দৌলাকে মসনদে বসাবেন। কিন্তু ইকরামুদ্দৌলা অকালে মৃত্যু বরণ করেন। ঘসেটি বেগম শওকত জং-এর প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে পড়েন। এক সময় ঘসেটি বেগম শওকত জং-কে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।[১০৭]

---

১০৬. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৫৬

১০৭. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ২২৪-২২৫

www.pathagar.com

সিরাজদ্দৌলার আরেক শত্রু ছিলেন মীর জাফর আলী খাঁ। তিনি আলীবর্দী খাঁর বৈমাত্রেয় বোন শাহ খানমকে বিয়ে করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পান। মীর জাফর আলী খাঁ ছিলেন অত্যন্ত লোভী ও অকৃতজ্ঞ। মীর জাফর নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি হয়ে নবাব সিরাজের প্রধান শত্রু হয়ে ওঠেন। ঘসেটি বেগম ও শওকত জং-এর সাথে যখন নবাব সিরাজদ্দৌলা ব্যতিব্যস্ত তখন মীর জাফর ইংরেজ কোম্পানীর সাথে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা খালা ঘসেটি বেগমকে তার প্রাসাদ থেকে নিজ প্রাসাদ মনসুর গঞ্জে নিয়ে আসেন। এ সময় সিরাজ মীর জাফরকে প্রধান সেনাপতি থেকে সরিয়ে মীর মদনকে ঐ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। পরে তিনি অবশ্য মীর জাফরকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু মীর জাফর আগে থেকেই নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন, এই ঘটনা অসন্তুষ্টি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

এ সময় মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘনিভূত হয়ে ওঠে। সিরাজের প্রতি নাখোশ জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রমুখ হিন্দু প্রভাবশালী ব্যবসায়ী সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে তদস্থলে ইয়ার লতীফকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করে। আলীবর্দী খাঁ'র হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বীজ বপনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবাব আলীবর্দী খাঁ'র শাসনামলে হিন্দু কর্মকর্তাদের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এ সময় যারা প্রধান ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে জানকী রাম, দুর্লভ রাম, রাম নারায়ন, কিরাত চাঁদ, বিরু দত্ত, গোকুল চাঁদ, উমিচাঁদ রায় এবং রাম রাম সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।[১০৮]

সামরিক ও বেসামরিক উভয় ক্ষেত্রে হিন্দু কর্মকর্তা অধিক সংখ্যায় নিয়োগ পান। এভাবে আলীবর্দী খাঁ'র শাসনামলে হিন্দুরা সকল ক্ষেত্রে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। এর পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত অশুভ। নবাব সিরাজদ্দৌলার শাসনামলে তারা ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বাংলার মুসলিম রাজত্বের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সিরাজদ্দৌলাও তার নানার মতই হিন্দুদেরকে উচ্চপদে নিয়োগ দেন। তিনি মোহনলাল নামক এক কাশ্মিরী হিন্দুকে উচ্চপদে নিয়োগ দেন। মোহন লাল সিরাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নবাবের প্রধান উজিরে পরিণত হন। আর এসব হিন্দুরাই নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন ত্বরান্বিত করে। নবাব

---

১০৮. সিরাজউদ্দৌলা / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3pNKlol / অ্যাকসেস ইন ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সিরাজের হাতে কোলকাতা পতনের পর যদি উমিচাঁদ নবকিষেণ, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মানিক চাঁদ প্রমুখ হিন্দুগণ গভর্ণর ড্রেক ও তার লোকজনকে সাহায্য না করতো তা হলে ইংরেজদের জন্য আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

উনত্রিশে ডিসেম্বর ক্লাইভের রণতরী হুগলী নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে বজবজ দখল করে। তার চার দিন আগে ক্লাইভ মানিক চাঁদের মাধ্যমে নবাবকে যে পত্র লিখে তাতে বলা হয়, নবাব আমাদের যে ক্ষতি করেছেন, আমরা এসেছি তার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী হতে আসিনি তার কাছে। আমাদের দাবী আদায়ের জন্যে আমাদের সেনাবাহিনীই যথেষ্ট। মানিক চাঁদ পত্রখানি নবাবকে দিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। হয়তো দেয়নি। দিলে নবাব নিশ্চয়ই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। মানিক চাঁদ সর্বদা নবাবকে বিভ্রান্ত রেখেছে। তার ফলে বিনা বাধায় ক্লাইভ ৩১ডিসেম্বর থানা ফোর্ট এবং ১জানুয়ারী, ১৭৫৭ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পুনরুদ্ধার করে। মানিক চাঁদ ইচ্ছা করলে নবাবের বিরাট সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজদের আক্রমণ সহজেই প্রতিহত করতে পারতো। সে তার কোনো চেষ্টাই করেনি। কারণ ইংরেজদের দ্বারা তার এবং তার জাতির অভিলাষ পূর্ণ হতে দেখে সে আনন্দ লাভই করেছিল। এমনকি এ সকল স্থান ইংরেজ-কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সংবাদটুকু পর্যন্ত সে নবাবকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।[১০১]

ইংরেজদের হাতে বলতে গেলে, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ তুলে দিয়ে সে হুগলী গমন করে এবং হুগলী ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। ক্লাইভ হুগলীতে তার নামে লিখিত পত্রে অনুরোধ জানায় যে, পূর্বের মতো সে যেন এখানেও বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়। দু'দিন পর হুগলী আক্রমণ করে ক্লাইভ সহজেই তা হস্তগত করে। ইংরেজ কর্তৃক এতসব গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অধিকৃত হওয়ার পর মানিক চাঁদ নবাবকে জানায় যে, ইংরেজদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। হুগলী অধিকারের পর ইংরেজ সৈন্যগণ সমগ্র শহরে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা বিরাট সন্ত্রাস সৃষ্টি করে।

হুগলীর পতন ও ধ্বংসলীলার সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাজদ্দৌলা বিরাট বাহিনীসহ ২০জানুয়ারী হুগলীর উপকণ্ঠে হাজির হন। ইংরেজগণ তখন হুগলী থেকে পালিয়ে

---

১০১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৮৬

www.pathagar.com

কোলকাতায় চলে যায়। নবাব সিরাজদ্দৌলা একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্যে তাদের সাথে সন্ধি করেন। ৯ফেব্রুয়ারী নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতিহাসে তা "আলী নগরের" সন্ধি বলে পরিচিত। এ সন্ধি অনুযায়ী ১৭১৭ সালের ফরমান মোতাবেক সকল গ্রাম ইংরেজদেরকে ফেরত দিতে হবে। তাদের পণ্যদ্রব্যাদি করমুক্ত হবে এবং তারা কোলকাতা অধিকতর সুরক্ষিত করতে পারবে। উপরন্তু সেখানে তারা একটা নিজস্ব টাকশাল নির্মাণ করতে পারবে।

সিরাজদ্দৌলাকে এ ধরনের অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। তার কারণ হলো মানিক চাঁদের মতো তার অতি নির্ভরযোগ্য লোকদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা।[১১০] অপরদিকে ক্লাইভের নিকটে এ সন্ধি ছিল একটা সাময়িক প্রয়োজন মাত্র। ইংরেজরা একই সাথে প্রয়োজনবোধ করেছিল নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার এবং ফরাসীদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করার। এতদুদ্দেশ্যে ক্লাইভ ওয়াটস এবং উমিচাঁদকে সিরাজদ্দৌলার কাছে পাঠিয়ে দেয় এ কথা বলার জন্যে যে, তারা ফরাসী অধিকৃত শহর চন্দরনগর অধিকার করতে চায় এবং তার জন্যে নবাবকে সাহায্য করতে হবে। এ ছিল তাদের এক বিরাট রণকৌশল। নবাব ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি বিদেশী বণিকদের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করে আসছিলেন। এ নীতি কি করে ভঙ্গ করতে পারেন?

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ইংরেজদের সাহায্য না করলে তারা এটাকে তাদের প্রতি শত্রুতা এবং ফরাসীদের প্রতি মিত্রতা পোষণের অভিযোগ করবে। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরপেক্ষ নীতিতেই অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত করেন। তদনুযায়ী তিনি সেনাপতি নন্দনকুমারকে নির্দেশ দেন যে, ইংরেজরা যদি চন্দরনগর আক্রমণ করে তাহলে ফরাসীদের সাহায্য করতে হবে। অনুরূপভাবে ফরাসীরা যদি ইংরেজদেরকে আক্রমণ করে তাহলে ইংরেজদেরকে সাহায্য করতে হবে। ক্লাইভ দশ-বারো হাজার টাকা উৎকোচ দিয়ে নন্দকুমারকে হাত করে। সে একই পন্থায় নবাবের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকেও বশ করে। এভাবে ক্লাইভ চারদিকে উৎকোচ ও বিশ্বাসঘাতকতার এমন এক জাল বিস্তার করে যে, সিরাজদ্দৌলা কোনো বিষয়েই দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে পারেন না। উপরন্তু হিন্দু শেঠ ও বেনিয়াগণ

১১০. সিরাজউদ্দৌলা / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3cH0jNi / অ্যাকসেস ইন ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

এবং তার নিমকহারাম কর্মচারীগণ, যারা মনেপ্রাণে মুসলিম শাসনের অবসান কামনা করে আসছিল, সিরাজদ্দৌলাকে হরহামেশা কুপরামর্শই দিতে থাকে। তারা বলে যে, ইংরেজদেরকে কিছুতেই রুষ্ট করা চলবে না। ওদিকে বাংলা-বিহার রক্ষার উদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী মুর্শিদাবাদ থেকে সেদিকে প্রেরণ করার কুপরামর্শ দেয়। এভাবে ইংরেজদের অগ্রগতির পথ সুগম করে দেওয়া হয়।

ইতোমধ্যে ৫মার্চ ইংল্যান্ড থেকে সৈন্যসামন্তসহ একটি নতুন জাহাজ 'কাম্বারল্যান্ড' কোলকাতা এসে পৌঁছায়। ৮মার্চ ক্লাইভ চন্দরনগর অবরোধ করে। নবাব রায়দুর্লভ রাম এবং মীর জাফরের অধীনে একটি সেনাবাহিনী চন্দরনগর অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাদের পৌঁছাবার পূর্বেই ফরাসীগণ আত্মসমর্পণ করে বসে। তারা চন্দরনগর ছেড়ে যেতে এবং বাংলায় অবস্থিত তাদের সকল কারখানা এডমিরাল ওয়াটসন এবং নবাবের হাতে তুলে দিয়ে যেতে রাজী হয়। অতঃপর বাংলার ভূখন্ড থেকে ফরাসীদের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে ক্লাইভ নবাবের কাছে দাবী জানায়। উপরন্তু পাটনা পর্যন্ত ফরাসীদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর দু'হাজার সৈন্য স্থলপথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করে। নবাব এ অন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এতে ফরাসীদের সাহায্য করা হয়েছে বলে নবাবের প্রতি অভিযোগ আরোপ করা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল কমিটি ২৩এপ্রিল নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারা আরও অভিযোগ করে যে, নবাব আলীনগরের চুক্তি ভংগ করেছেন।[১১১]

নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে পাকাপোক্ত ষড়যন্ত্র করে সিরাজেরই তথাকথিত আপন লোক রায়দুর্লভ রাম, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠ ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে। তাদেরই পরামর্শে মীর জাফরকে নবাবের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করা হয়। ইংরেজ ও মীর জাফরের মধ্যেও সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। শুধু উমিচাঁদ একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে। সে নবাবের যাবতীয় ধন-সম্পদের শতকরা পাঁচ ভাগ দাবী করে বসে। অন্যথায় সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয়। ক্লাইভ উমিচাঁদকে খুশি করার জন্যে ওয়াটসনের জাল স্বাক্ষরসহ এক দলিল তৈরি করে। মীর জাফরের সংগে সম্পাদিত চুক্তিতে সে আলীনগরের

---

১১১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৮৮

www.pathagar.com

চুক্তির সকল শর্ত পুরোপুরি পালন করতে বাধ্য থাকবে বলে স্বীকৃত হয়। উপরন্তু সে স্বীকৃত হয় ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে দিতে হবে এক কোটি টাকা, ইউরোপীয়ানদেরকে পঞ্চাশ লক্ষ, হিন্দু প্রধানদেরকে বিশ লক্ষ এবং আরমেনিয়ানদেরকে সাত লক্ষ টাকা। কোলকাতা এবং তার দক্ষিণে সমুদয় এলাকা চিরদিনের জন্যে কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হবে।

এতসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে ব্যর্থ হয় সিরাজদ্দৌলা। সে মীর জাফরকে একটি সেনাবাহিনীসহ পলাশী প্রান্তরে ইংরেজদের প্রতিহত করার আদেশ করেন যদি তারা ফরাসীদের অনুসরণে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে তার সৈন্য প্রেরণ করে। সিরাজ পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হন। নবাবের সৈন্য পরিচালনার ভার ছিল মীর জাফর, রায়দুর্লভ রাম প্রভৃতির ওপর। তারা চরম মুহূর্তে সৈন্য পরিচালনা থেকে বিরত থাকে। এরপরেও মীর মদন বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু ইংরেজদের গুলিতে নিহত হলেন মীরমদন। এই সময় নবাব সিরাজদ্দৌলা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তখনও যুদ্ধের গতি নবাবের পক্ষে ছিল। মীর মদনের সাথে মোহনলাল ও সিনফ্রে ইংরেজদের রপ্ত করে ফেলেছিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে মীর জাফর যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দেন। রায়দুর্লভের কুপরামর্শে ও চাপে নবাব সিরাজদ্দৌলা তাতে বাধ্য হলেন।

পরক্ষণে ইংরেজদের দিক থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। নিরুপায় হয়ে অবশেষে নবাবের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হয় এবং নবাব পালিয়ে যান। কিন্তু পথিমধ্যে মীর জাফরের পুত্র মীরন তাকে হত্যা করে।[১১২] এভাবে পলাশীর বেদনাদায়ক রাজনৈতিক নাটকের যবনিকাপাত হয়। আর এভাবেই বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়, যা উদিত হতে সময় লেগেছিল দীর্ঘ ১৯০টি বছর।

পলাশী যুদ্ধের ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়

এক. বাংলার জমিদার প্রধান, ধনিক বণিক ও বেনিয়া গোষ্ঠী দেশের স্বাধীনতার বিনিময়ে হলেও মুসলিম শাসনের অবসানকল্পে ইংরেজদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে তাদের ধারণা ছিল ইংরেজ শক্তির সহায়তায় তারাই হবে মূলত বাংলার শাসক।

---

[১১২] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৮৯

www.pathagar.com

দুই. ইংরেজগণ হিন্দু প্রধানদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যে হিন্দুদের পুরোপুরি ব্যবহার করে।

তিন. নবাবের সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে যারা অধিষ্ঠিত ছিল তারা প্রায় সকলেই ছিল তার প্রতি নাখোশ এবং তাদের ওপরই সিরাজকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হতো। যাদের ওপরে তিনি নির্ভর করতেন তারাই তার পতনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

চার. পলাশীর যুদ্ধকে যুদ্ধ বলা যায় না। এ ছিল যুদ্ধের প্রহসন। ইংরেজদের চেয়ে নবাবের সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেকগুণ বেশি। নবাবের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করলে ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো এবং ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। অথবা সিরাজদ্দৌলা যদি স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, তাহলেও তাকে হয়তো পরাজয়বরণ করতে হতো না।

বাঙালি মুসলিমদের দুর্দশা

১৫৯৯ সালে কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ী মাত্র ৩০ হাজার পাউন্ডের ক্ষুদ্র মূলধন নিয়ে গঠন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। তৎকালীন মুদ্রামান অনুযায়ী তা ২৫ হাজার ভারতীয় রুপির চেয়েও কম ছিল। এর পরের বছর রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ভারতের সাথে তারা বাণিজ্য শুরু করে। ১৬১২ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতিতে তৎকালীন ভারতের প্রধান সমুদ্র বন্দর সুরাটে (ভারতীয় রাজ্য গুজরাটের একটি শহর) বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে তারা। সুরাটে তখন আরও অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী ছিলেন, যাদের একেক জনের মূলধন পুরো ইংরেজ কোম্পানীর চেয়ে কয়েকশত গুণ বেশি ছিল।

ইংরেজদের দৈন্যদশা দেখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাদের করুণার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাদের মোটেও গুরুত্বব মনে করতেন না। এই গুরুত্বহীন, করুণার পাত্র, নামমাত্র মূলধন নিয়ে ব্যবসা করতে আসা ইংরেজরা এক সময় পুরো উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নিলো। ১৭৫৭ সালের ২৩জুন পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুরো ভারতবর্ষে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করে ইংরেজরা। তারা প্রলুব্ধ হয়েছিল শুধুমাত্র এদেশের সম্পদ দ্বারা। আর তাই সুদীর্ঘকালের শাসনামলে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়ে যায় তারা।[১১৩]

১১৩. উপমহাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত / সিরাজুল হোসেন খান /পৃ. ১৫-১৮)

www.pathagar.com

৷ তৃতীয় অধ্যায় ৷

উপনিবেশিক বাংলা

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। ১৭৬৫ সালে দিল্লির নাম মাত্র মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী মঞ্জুর করার পর এ অঞ্চলের উপরে তাদের আইনগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলার যে চিত্র ফুটে ওঠে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক। পলাশী যুদ্ধের পর মীর জাফর প্রভৃতি নামমাত্র নবাব থাকলেও সামরিক শক্তির নিয়ন্তা ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। ১৭৬৫ সালের পর দেশের অর্থনীতিও সম্পূর্ণ তাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সর্বাপেক্ষা ও সর্বদিক দিয়ে। উপনিবেশিক বাংলার সময়কাল হলো ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৯০ বছর।

বাংলায় ইংরেজদের ব্যাপক লুটপাট

পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদে রাজকোষ ও রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়, সরকার দেউলিয়া হয়ে পড়ে। হিন্দু জমিদার ও চাকলাদারদের অর্থে তখন সরকার পরিচালিত হতো। গদি লাভের জন্য ইংরেজদের দাবী অনুযায়ী ঘুষ সংগ্রহ করার জন্য মীর জাফর ও মীর কাসিম রাজস্ব বাড়িয়ে দেন। নবাবের এসব রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতে জমিদাররা প্রান্তিক মুসলিম প্রজা ও রায়তদের ওপর বহুগুণে খাজনা বাড়িয়ে দেয়। সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের দেওয়া সম্পত্তি ও ভাতা বাজেয়াপ্ত হয়।

www.pathagar.com

দেশব্যাপী শুরু হয় অরাজকতা। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে দেখা দেয় অস্থিতিশীল অবস্থা। একইসাথে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্য বিদেশি বণিকদের বাংলা ছাড়া করে ইংরেজরা রেশম, মসলিন, সুতি কাপড়, চিনি, চাল, আফিম, সল্টপিটার প্রভৃতি পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বাজার কুক্ষিগত করে এরা এসব পণ্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম নামিয়ে দেয়। ক্ষতিগ্রস্থ হয় প্রান্তিক চাষী, তাঁতী ও জেলেরা।[১১৪]

বৃটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই হলো –সুপরিকল্পিত শোষণের হৃদয়বিদারক ইতিহাস। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসেব করে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে পাচার হয়েছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা।

ইংরেজদের লুণ্ঠন সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "নবাবের সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত করে, জমিদারী বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, ব্যক্তিগত ও অবৈধ বাণিজ্য থেকে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠন করে এবং আরও নানা উপায়ে উৎকোচ-উপঢৌকন নিয়ে চার্ণক, হেজেস, ক্লাইভ, হেষ্টিংস, কর্নওয়ালিসের আমলের কোম্পানীর কর্মচারীরা যে কি পরিমাণ বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন তা কল্পনাও করা যায় না। ...দেখতে দেখতে প্রচুর অর্থ ও নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে কোম্পানী সাহেবরা সত্যি সত্যি নবাব বনে গেলেন। তাদের মেজাজ ও চালচলন সবই দিন দিন নবাবের মতো হয়ে উঠতে লাগল"।[১১৫]

মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে নিয়ে গেলো পনের লক্ষ পাউন্ডের সমমানের টাকা, অবশ্য বহুমূল্য মণিমাণিক্যসহ ক্ষতিপূরণ হিসেবে বৃটিশ স্থলসেনা ও নৌসেনা পেলো চার লক্ষ পাউন্ড। সিলেক্ট কমিটির ছয়জন সদস্য পেলেন নয় লক্ষ পাউন্ড। কাউন্সিল মেম্বাররা পেলেন প্রত্যেকে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার পাউন্ড। আর খোদ ক্লাইভ পেলেন দু'লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড।

অবশ্য পলাশী বিজয়ী ক্লাইভের ভাষায় 'তিনি এতো সংযম দেখিয়ে নিজেই আশ্চর্য'। মীর কাসিম দিয়েছেন নগদ দু'লক্ষ পাউন্ড কাউন্সিলের সাহায্যের জন্যে। মীর জাফর নন্দন নাজিমদ্দৌলা দিয়েছেন এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার

---

১১৪. বক্সারের যুদ্ধ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3pUViVe / অ্যাকসেস ইন ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

১১৫. কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত / বিনয় ঘোষ / পৃ. ৪৪৫

www.pathagar.com

পাউন্ড। এছাড়া সাধারণ সৈনিক, কুঠিয়াল ইংরেজ কত লক্ষ মুদ্রা আত্মসাৎ করেছে, বলা দুঃসাধ্য। ইংরেজ গবেষক জেমস রেনেল ১৭৬৪ সালে বাইশ বছর বয়সে বার্ষিক হাজার পাউন্ডে নিযুক্ত হন এবং ১৭৭৭ সালে বিলাত ফিরে যান ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড আত্মসাৎ করে। এ থেকেই অনুমেয়, কোম্পানীর কর্মচারীরা কী পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করতেন। তারা এ দেশে কোম্পানী রাজ্যের প্রতিভূ হিসেবে এবং চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর হোমে প্রত্যাগত হয়ে এরূপ রাজসিক হালে বাস করতেন যে, তারা 'ইন্ডিয়ান নেবাবস' রূপে আখ্যায়িত হতেন।

...ক্লাইভ নিজেই স্বীকার করেছেন, "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক সম্পদাহরণের পাশবিক চিত্র বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি"। অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণ যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন।[১১৬]

পলাশী যুদ্ধের পর টাকার অবমূল্যায়ন ও পাউন্ডের অধিমূল্যায়ন করা হয়। মুর্শিদ কুলি খাঁ'র চাইতে মীর জাফরের সময় বত্রিশগুণ বেশি কর ও খাজনা আদায় করা হয়। জমিদাররা এক কোটি ত্রিশ লাখ পাউন্ড খাজনা আদায় করে কোম্পানীকে দেয় আটত্রিশ লাখ পাউণ্ড। অতিরিক্ত রাজস্ব ও খাজনার চাপে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে উৎপাদক গোষ্ঠী। খাজনা আদায়ের ঝঞ্ঝাট এড়ানোর জন্য ইংরেজরা পরগনা নিলামে চড়াতে শুরু করে। নব্য হিন্দু কোটিপতিরা ইজারা দিয়ে বিঘাপ্রতি দু'টাকা বারো আনা খাজনা ধার্য করে। আলীবর্দি খাঁ'য়ের সময় এই খাজনা ছিল মাত্র আট আনা। এভাবে ১৬৬০ পরগনার মধ্যে ১০০০ পরগনা হিন্দুদের হাতে দেওয়া হয়।

অত্যাচার-নিপীড়ন আর আর্থিক মন্দার কারণে চাষীরা এমনিই চাষ ছেড়ে দিয়েছিল, এর মধ্যে অনাবৃষ্টি আর খরায় ফসল এসেছিল কমে। এছাড়া খাদ্যশস্য উৎপাদনের ভূমিতে জোর করে অত্যধিক লাভজনক ব্যবসাপণ্য আফিম ও নীল চাষ করানোর কারণেও অনেক জমি উর্বরতা হারিয়ে ফেলে। আফিম যেতো চীন ও জাপানে, আর ইউরোপে সেই সময় শিল্প বিপ্লব ঘটায় তুঙ্গে ছিল নীলের চাহিদা।

এমন অবস্থায় ১৭৭০ সালের মাঘ মাসে সারাদেশে ধান কিনে গুদামজাত করা

---

১১৬. মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপায়ন / আব্দুল মওদুদ / পৃ. ৬০-৬২

www.pathagar.com

শুরু হলে জন্ম নেয় দুর্ভিক্ষ। বাংলা ১১৭৬ সালের এ মহাদুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। মানব ইতিহাসে এমন ভয়াবহ এবং পুরোপুরি মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কথা আর জানা নেই। বিশ্বের অন্যতম শস্যভাণ্ডার খ্যাত জনপদটির এক-তৃতীয়াংশ মানুষ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। যারা বেঁচে থাকে, তাদের হাল হয় আরও খারাপ। কারণ এত বড় দুর্যোগেও ইংরেজরা কোনো সাহায্য না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, এমনকি খাজনা হ্রাসেরও তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না। বাংলার ধনিক কৃষক সমাজ এ দুর্ভিক্ষের ফলে সর্বহারা, দুর্গত এক শ্রেণীতে পরিণত হয়। ধনী হিন্দুরা নৌকা বোঝাই করে দুর্ভিক্ষের অনাথ বালকদের কোলকাতায় এনে জড়ো করতো। সেখান থেকে ইংরেজরা তাদের ক্রীতদাস হিসেবে ইউরোপে চালান করে দিতো।[১১৭]

ইংরেজ আমলে বাংলার মুসলিম সমাজের চিত্র ছিল অত্যন্ত খারাপ। মুসলিমরা তিনটি অংশে অবস্থান করেছিল। নবাব, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলিম এবং সাধারণ শ্রেণী। পলাশী যুদ্ধের পর বাংলা হয়ে পড়েছিল কোম্পানীর হাতের পুতুল। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদেরকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। উপরন্তু কোম্পানী ও তাদের সাদা-কালো কর্মচারীদেরকে মোটা উপঢৌকনাদি দিতে হতো। এই অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে নবাবরা সাধারণ মানুষের ওপর চড়া কর ধার্য করতো। এই কারণে নবাবরা বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত আলেম ও শিক্ষাকেন্দ্রে সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়।

সম্ভ্রান্ত মুসলিম হলেন তারা যারা বিজয়ীর বেশে অথবা দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী হিসেবে বিভিন্ন সময়ে এ দেশে আগমন করেন। অতঃপর এ দেশকে তারা মনে প্রাণে ভালোবেসে এটাকেই তাদের চিরদিনের আবাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। বিজয়ী হিসেবে স্বভাবতঃই তারা সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার রাখতেন। হান্টার বলেন, একটি সম্ভান্ত মুসলমান পরিবার তিনটি প্রধান সূত্র থেকে সম্পদ আহরণ করতো –সামরিক বিভাগের নেতৃত্ব ও চাকুরি, রাজস্ব আদায় এবং বিচার বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগে চাকুরি।

এই তিনটি চাকুরির সবগুলোই মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। লাখ লাখ পরিবার মুহূর্তেই দরিদ্র হয়ে পড়ে। এই পেশাগুলোতে হিন্দুদের নিয়োগ

---

১১৭. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ৪৮

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক ছিল। মুসলিম নবাবরাও হিন্দুদের সেনাবাহিনীতে ও রাজস্ব আদায়ে নিয়োগ দিতে বাধ্য ছিলেন। আবহমান কাল থেকে বাংলার মুসলমান শাসকগণ জনগণের শিক্ষা বিস্তারকল্পে মুসলিম মনীষীদেরকে জায়গীর, তমঘা, আয়মা, মদদে-মায়াশ প্রভৃতি নামে লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। সেসব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজ সরকার। একই সাথে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদরাসা, মক্তব, খানকাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। যারা গোপনে শিক্ষা-দীক্ষার কাজ চালাতেন তাদের নির্মমভাবে হত্যা করে ইংরেজরা। ইংরেজ আমলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলিমরা।[১১৮]

সাধারণ মুসলিমরা তিনটি পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতো। কৃষক, তাঁতী এবং জেলে। তাদের ওপরে যে জুলুম নাজিল হয়েছে তা হলো চড়া খাজনা। ইংরেজদের কোষাগার সমৃদ্ধ করার জন্য তাদের উৎপাদিত প্রায় সকল সম্পদই জমা দিতে হতো রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ এভাবেই ডেকে এনেছে বর্বর ইংরেজ গোষ্ঠী। শোষণ-নিষ্পেষণের মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত হলো এই যে, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' বাংলার লোক মরেছে তিনভাগের একভাগ, চরম অবনতি ঘটেছে চাষবাসের। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস হিসেব কষে ও কড়া চাপে নির্ধারিত রাজস্বেরও বেশি টাকা আদায় করেছেন। অথচ মুমূর্ষু কৃষকদের দুঃখ মোচনের জন্যে কানাকড়িও খরচ করেননি। বরঞ্চ বাকেরগঞ্জ জেলার ৩৩, ৯১৩ মণ চাউল বিক্রয় করে ৬৭, ৫৯৩ টাকা মুনাফা লুটেছে। ঢাকার ৪০, ০০০ মণ চাউল বাঁকীপুরের সেনানিবাসে গুদামজাত করেছে।

এমন অমানবিক ও বর্বর শাসন দুনিয়ার ইতিহাসে প্রায় নজিরবিহীন। মাত্র ১৩ বছরের শাসনে পৃথিবীর তৎকালীন সমৃদ্ধ একটি জনপদ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যেভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়, তা নেহাত শাসকশ্রেণির লুটপাটের মানসিকতা ও খামখেয়ালীর ফল। যারা সেই সময়টায় জীবিত ছিল, শুধু তারাই জানে আসলেই কতটা ভয়ানক ছিল সেই নারকীয় অভিজ্ঞতা। এই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিপীড়নের পথ ধরেই এক সময় ভারতবাসীর মনে দানা বাঁধে স্বাধিকারের সাধ, আর সেখান থেকেই ধীরে ধীরে শুরু হয় প্রতিরোধ আন্দোলন।[১১৯]

---

১১৮. বাংলার ইতিহাস / ড. আবদুল করিম / বড়াল প্রকাশনী / পৃ. ২৮৯-২৯৪

১১৯. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৯৪

www.pathagar.com

অরাজনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বিদ্রোহ

ইংরেজরা বাংলা দখল করেই তাদের দালাল গোষ্ঠী তৈরি করে। দালালদের নানাবিদ সুযোগ সুবিধা দিয়ে গোটা ভারতবাসীকে শাসন-শোষণ করার ভিত্তি পাকাপোক্ত করে নেয় ইংরেজ। তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপন করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ভেঙ্গে দেয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে কেরানী বানানোর জন্য, শিক্ষানীতিসহ বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন করতে থাকে। বাংলার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য ইংরেজ তার স্বার্থের অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করে।

ইংরেজ শাসনকে শাসন না বলে বলা উচিত লুটপাট, অরাজকতা, শোষণ, ত্রাস, নিপীড়ন ও নির্যাতন। এই বাংলায় ইংরেজদের লুটপাট শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তারা বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এই বিদ্রোহ হয়েছে একেবারেই যারা রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় তাদের দ্বারা। পলাশী যুদ্ধের মাত্র তিন বছর পরই শুরু হয় ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ। ফকিরদের এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি ও নবাব কর্তৃক অনুদান। বাংলায় মুসলিম শাসনের শুরু থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ছিল অসাধারণ। হিন্দু-মুসলিমসহ সব ধর্মের ধর্মীয় পণ্ডিতরা লাখেরাজ সম্পত্তি ও অনুদান পেতেন। এটি সুলতানি আমল থেকেই চলমান ছিল। লাখেরাজ সম্পত্তি মানে হলো করহীন ভূমি। ইংরেজরা তাদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রথমে অনুদান বাতিল করে এবং পরে লাখেরাজ সম্পত্তি বাতিল করে। এতে ফকির সন্ন্যাসীদের জীবন ও স্বাভাবিক কর্ম বাধাগ্রস্থ হয়।

সম্মিলিত হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ধার্মিক ফকিরদের একটা বৃহৎ গোষ্ঠী যারা পবিত্রস্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারত থেকে বাংলার বিভিন্নস্থান ভ্রমণ করতেন। যাওয়ার পথে এসব সন্ন্যাসী-ফকিরগণ গোত্রপ্রধান, জমিদার অথবা ভূস্বামীদের কাছ থেকে ধর্মীয় অনুদান গ্রহণ করতেন যা তখন রেওয়াজ হিসেবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা লাভ করে তখন থেকে করের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফলে স্থানীয় ভূস্বামী ও গোত্র প্রধানগণ সন্ন্যাসী-ফকিরদেরকে ধর্মীয় অনুদান প্রদানে অসমর্থ হয়ে পড়ে। উপরন্তু ফসলহানি, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যাতে প্রায় এক কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। এই কারণে সন্ন্যাসী-ফকিরেরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং যার ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠে 'ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'।

www.pathagar.com

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ও সংগঠক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। এই বিদ্রোহের অন্যান্য নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন তাজশাহ, চেরাগ আলী শাহ, মুছা শাহ, পরাগল শাহ, করম শাহ প্রমুখ। তাদের সঙ্গে যোগ দেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নায়ক ভবানী পাঠক। ১৭৬০ সালে বাংলা বিহার উড়িষ্যার পুতুল নবাব মীর জাফর আলী খাঁ'কে সরিয়ে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মীর জাফর আলী খানের জামাতা মীর কাসেম আলী খাঁ'কে বাংলার নবাবের গদিতে বসান। পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) তিন বছর পর বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে মজনু শাহ-এর নেতৃত্বে ১৭৬০ সালে ফকির বিদ্রোহ শুরু হয়। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে রংপুরে এ বিদ্রোহ কালক্রমে ব্যাপক রূপ ধারণ করে।[১২০]

কোম্পানীর শোষণ ও অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সনাতন অধিকার ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমন্বয়ে জ্বলে ওঠে এই ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আগুন। টমাস ব্রস্টনের তথ্য মতে, হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ফকির সন্ন্যাসীদের দল। এরা এদেশের স্থায়ী অধিবাসী এবং ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে জীবনযাপন করলেও জীবিকার্জনে নির্দিষ্ট পেশা ছিল তাদের। কোম্পানীর শাসনের ফলে তাদের স্বাধীন চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষুন্ন হয় তাদের ধর্মপালনের অধিকার। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে তারা বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ফকিরদের নেতা ফকির মজনু শাহ গড়ে তোলেন দুর্বার ফকির বিদ্রোহ এবং ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চার দশকে অবিভক্ত বাংলার নানা স্থানে এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহে ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ বেগবান হয়ে ওঠে'।[১২১]

ফকির মজনু শাহের জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তিনি মীরাটের অধিবাসী ছিলেন। তার জন্ম দিল্লীর কাছাকাছি হলেও আমৃত্যু তার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলায়। ফকির মজনু শাহ ছিলেন মাদরিয়া সম্প্রদায়ের সূফিসাধক বা ফকির। তার বংশ ও পরিচয় প্রায় অজ্ঞাত। তার আসল নামও অজ্ঞাত। কখন মজনু শাহ বুরহানা বা মজনু

---

১২০. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ৯৯

১২১. ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3aCpbD5 / অ্যাকসেস ইন ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ফকির নামে পরিচিত হলেন সেটাও জানা যায়নি। তবে তিনি ফকির মজনু শাহ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন বলে জানা যায়। বাংলার মাদরিয়া সূফিসাধক সুলতান হাসান সুরিয়া বুরহানার মৃত্যুর পর তিনি মাদরিয়া তরিকা গ্রহণ করেন। মজনু শাহ সাধারণত দিনাজপুর জেলার বালিয়াকান্দিতে বসবাস করতেন।

বগুড়া জেলার বারো মাইল দক্ষিণে গোয়াইল নামক স্থানের নিকট সদরগঞ্জ ও মহাস্থানগড় ছিল তার কাজের প্রধান কেন্দ্র। বিহারের পশ্চিম প্রান্ত থেকে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে তিনি বিচ্ছিন্ন কৃষক ও কারিগর বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করে একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরিচালনাধীনে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিদ্রোহে তিনি কখনো সৈন্য সংগ্রহকারী, কখনো প্রধান সেনাপতি হিসেবে আবার কখনো সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিহারের বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিলেন।[১২২]

১৭৬৩ সালে মজনু শাহ এবং ফকিরদের নেতৃত্বে ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। তার সঙ্গে ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে হিন্দু সন্ন্যাসীগণও যোগ দেওয়ায় এ বিদ্রোহ ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। ১৭৬৩ সালে ফকির বিদ্রোহীরা বরিশাল এবং ঢাকায় ইংরেজদের কোম্পানীর কুঠি আক্রমণ করে দখল করে নেন। ১৭৬৩, ১৭৬৪ সালে ফকির সিপাহীগণ রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে। এ বাণিজ্য কুঠিগুলো শুধুমাত্র জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার ছিল না, এগুলো ছিল অস্ত্রের কেল্লাও। ওই সময় থেকে ঢাকাসহ বরিশাল, বগুড়া, ময়মনসিংহ, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, পুর্ণিয়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর ও যশোর জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আক্রমণের তীব্রতা ছিল মারাত্মক। ১৮০০ সাল পর্যন্ত তা চলে প্রায় অব্যাহতভাবে। ঢাকা জেলায় ফকির-সন্ন্যাসীদের আন্দোলন বা বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৬৩ সাল থেকে। ১৭৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার স্থানীয় প্রশাসন হয়ে পড়ে প্রায় অবরুদ্ধ। ১৭৭১ সালের ২৮মার্চ এক যুদ্ধের মাধ্যমে ফকির-সন্ন্যাসীর হাত থেকে ঢাকা মুক্ত হয়। ঢাকায় ফকির-সন্ন্যাসীদের বড় আক্রমণ পরিচালিত হয় ১৭৭৩ সালের ১০ফেব্রুয়ারী। ঢাকা কালেক্টর জানান হনুমানগিরির নেতৃত্বে বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ঢাকার পাকুল নামক স্থানে জড়ো হয় এবং তারা জনৈক

---

[১২২] মজনু শাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3oOUuj7 / অ্যাকসেস ইন ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

জমিদারের গোমস্তা রামলোচন বসুকে অপহরণ করে। এ সময় তারা রামলোচন বসুর কাছ থেকে ৪, ২০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে দ্রুত জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ময়মনসিংহের দিক তারা চলে যান। ঢাকায় ফকির-সন্ন্যাসীদের সর্ববৃহৎ আক্রমণ পরিচালিত হয় ১৭৭৩ সালের মার্চ মাসে। তখন দলবদ্ধ আক্রমণে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডকে তারা হত্যা করেন।

১৭৬৯ সালে ফকিররা রংপুর আক্রমণ করেন। সেনাপতি লেফটেনেন্ট কিং সৈন্যসহ বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য রংপুর গমন করেন। যুদ্ধে কোম্পানীর সৈন্য পরাজিত হয় এবং সেনাপতি লেফটেনেন্ট কিং নিহত হন। ১৭৭১ সালে মজনু শাহের নেতৃত্বে আড়াই হাজার বিদ্রোহী সৈন্য (ফকির) বিরাট ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হলে তিনি মহাস্থানগড়ের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন। পরে বিদ্রোহের প্রয়োজনে বিহার যান। ১৭৭১ সালে ১৫০ জন ফকিরকে হত্যা করে ইংরেজরা। যা প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এ ক্ষোভ পরবর্তীকালে ভয়াবহ রূপ নেয়।

১৭৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে নাটোর অঞ্চলে মজনু শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তারা এই অঞ্চলের অত্যাচারী ধনী ও জমিদারদের এবং ইংরেজ শাসকের অনুচরদের ধনসম্পদ দখল করে নেন এবং তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। এভাবে তারা কৃষকের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন। ১৭৭২ সালের ৩০জুন রংপুরের শ্যামগঞ্জে ১৫০০ ফকির বিদ্রোহী জমায়েত হন। ফকির সন্ন্যাসীরা একত্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বর্শা, তরবারি, বন্দুক, ত্রিশূল, গাদা বন্দুক, পিতলের বাঁটঅলা লাঠি এ সবই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। তাদেরকে দমন করার জন্য ক্যাপ্টেন টমাস একদল সৈন্য নিয়ে শ্যামগঞ্জ আসেন। ফকির বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে কোম্পানীর সৈন্যরা পরাজিত হয় এবং ক্যাপ্টেন টমাস নিহত হয়। ময়মনসিংহের শেরপুরে ফকির করম শাহ এবং তার পুত্র টিপু শাহের নেতৃত্বে শেরপুরের কৃষকেরা ইংরেজদের আধিপত্য অস্বীকার করে বিদ্রোহ করে। গারো ও হাজং উপজাতীয়রাও এই যুদ্ধে ফকিরদের সহযোগিতা করে।

বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজরা নতুন নতুন আইন প্রবর্তন করে। বিদ্রোহীদের গোপন সংগঠন, গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও চলাচল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য জমিদারদের এমনকি কৃষকদেরও আইন দ্বারা বাধ্য করা হয়েছিল। ইংরেজ

www.pathagar.com

শাসনের প্রথম থেকেই, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের তীর্থ ভ্রমণের ওপর নানারকম কর বসিয়ে তাদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হতো। ইংরেজ শাসকরা এমন কতকগুলো আইন তৈরি করে যার ফলে তীর্থভ্রমণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা যাতে বিপদের সময় পাশের ভুটান রাজ্যে আশ্রয় না নিতে পারেন সেজন্য ১৭৭৪ সালে ভুটানের রাজার সঙ্গে ইংরেজরা একটি চুক্তি করে। এতে বলা হয় ইংরেজ শাসকরা যাদের শত্রু বলে মনে করবে তাদের ভুটানে আশ্রয় দেওয়া চলবে না। প্রয়োজনে ইংরেজ বাহিনী ভুটানে প্রবেশ করে পলাতক বিদ্রোহীদের বন্দী করতে পারবে।

১৭৭৪ সালের শেষ ভাগ থেকে কয়েকটি অঞ্চলের বিদ্রোহী দলগুলি বিভিন্ন স্থানে ছোটখাটো আক্রমণ শুরু করলেও প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হয় ১৭৭৬ সালের শেষ দিক থেকে। এই সময় মজনু শাহ্ উত্তরবঙ্গে ফিরে এসে ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহীদের আবার সঙ্ঘবদ্ধ করার ও নতুন লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। দিনাজপুর জেলায় মজনু শাহের উপস্থিতির খবরে ইংরেজ শাসক এতই ভীত হয়েছিল যে, অবিলম্বে জেলার সব জায়গা থেকে রাজস্বের সংগৃহীত অর্থ দিনাজপুর শহরের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করে রাজকোষের রক্ষীবাহিনীর শক্তি বাড়ানো হয়। অন্যদিকে মজনু শাহ্ বগুড়া থেকে তার বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ইংরেজবাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে আপাতত যুদ্ধ এড়াবার জন্য করতোয়া নদী এবং ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ঘাঁটি স্থাপন করেন।

১৭৭৬ সালের ১৪নভেম্বর একটি ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে মজনু শাহ বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজদের গুলির হাত থেকে বাঁচতে মজনু শাহ্ সদলবলে জঙ্গলের মধ্যে পালাতে বাধ্য হন। শত্রুরা তাদের পিছু নিলে বিদ্রোহীরা হঠাৎ পিছন ফিরে ইংরেজ সৈন্যদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই আক্রমণে কয়েকজন ইংরেজ সেনা নিহত হন এবং সেনাপতি লেফটেনান্ট রবার্টসন গুলীর আঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েন। এরপর মজনু শাহ্ সদলে জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।[১২৩]

এই সময় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আত্মকলহ সশস্ত্ররূপ ধারণ করে ১৭৭৭ সালে। বগুড়া জেলায় একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে মজনু শাহের ও ফকির সম্প্রদায়ের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এরপর প্রায় তিনবছর ধরে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে মজনু

[১২৩] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ১৯৬-১৯৮

www.pathagar.com

শাহ্ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আবার সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বগুড়া, ঢাকা এবং ময়মনসিংহের বহু অঞ্চলের জমিদারদের কাছ থেকে 'কর' আদায় ও বহু স্থানে ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুট করেন। অনুচরদের ওপর তার কঠোর নির্দেশ ছিল, তারা যেন জনসাধারণের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ না করেন এবং জনগণের স্বেচ্ছায় দান ছাড়া কোনো কিছুই গ্রহণ না করেন। ইংরেজদের বিদ্রোহ দমনের বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও তিনি ও তার অনুচররা সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বিক্রমে কাজ চালিয়ে যান।

উপরে ফকির বিদ্রোহের কিছু বিবরণ দেওয়া হলো। তবে ফকীরদের সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা ইংরেজ লেখক ও ইতিহাসবিদদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তাদেরকে বেদুইন বলেছেন, আর হান্টার বলেছেন 'ডাকাত'। তাদের আক্রমণ অভিযানে কয়েক দশক পর্যন্ত নব প্রতিষ্ঠিত বৃটিশরাজ এখানে টলটলায়মান হয়ে পড়েছিল, সম্ভবতঃ সেই আক্রোশেই তাদের ইতিহাস বিকৃত করে রচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মজনু শাহ ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের মেওয়াত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কানপুরের চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত মাকানপুরে অবস্থিত শাহ্ মাদারের দরগায় মজনু শাহ্ বাস করতেন। সেখান থেকেই হাজার হাজার সশস্ত্র অনুচরসহ তিনি বাংলা বিহারের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ ও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। তার কার্যক্ষেত্র বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল এবং বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, রাজশাহী, মালদহ, পাবনা ময়মনসিংহ ছিল বলে বলা হয়েছে।

১৭৭২ সালের প্রথমদিকে মজনু শাহ বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র অনুচরসহ উত্তর বংগে আবির্ভূত হন। তার এ আবির্ভাবের কথা জানতে পারা যায় রাজশাহীর সুপারভাইজার কর্তৃক ১৭৭২ সালের ২২ জানুয়ারী তারিখে কোম্পানীর কাছে লিখিত এক পত্রে। তাতে বলা হয়, তিনশ' ফকিরের একটি দল আদায় করা খাজনার এক হাজার টাকা নিয়ে গেছে এবং আশংকা করা যাচ্ছে যে, তারা হয়তো পরগণা কাচারীই দখল করে বসবে। তলোয়ার, বর্শা, গাদাবন্দুক এবং হাউইবাজির হাতিয়ারে তারা সজ্জিত। কেউ কেউ বলে তাদের কাছে নাকি ঘূর্ণায়মান কামানও ছিল।

www.pathagar.com

১৭৭৬ সালে মজনু শাহ্ বগুড়া মহাস্থানে আগমন করে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সে সময় বগুড়া জেলার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মিঃ গ্লাডউইন। তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে পাঠান। ১৭৮৬ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফকির সর্দারকে (মজনু শাহ্) ইংরেজদের বিরুদ্ধে পর পর দু'টো সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ফকিরদের পক্ষে যেমন কিছু লোক হতাহত হয়, ইংরেজদেরও অনুরূপভাবে কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে অনুমিত হয় যে, এরপর গঙ্গা পাড়ি দিয়ে মজনু শাহ্ দেশে চলে যান। আর কোনোদিন তাকে বাংলাদেশে দেখা যায়নি। ১৭৮৬ সালের ২৯ডিসেম্বর সৈন্যসহ বগুড়া জেলা থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা করার পথে কালেশ্বর নামক স্থানে মজনু শাহ্ ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে মজনু শাহ্ মারাত্মকভাবে আহত হন। ১৭৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে বিহারের মাখনপুর গ্রামের এক গোপন ডেরাতে ফকির বিদ্রোহের এই নায়কের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। আনুমানিক ১৭৮৭ সালে কানপুর জেলার মাখনপুর এলাকায় তার মৃত্যু হয় বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। তার মৃতদেহ সেখান থেকে তার জন্মভূমি মেওয়াঁতে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হয়।

১৭৮৭ সালে ফকির মজনু শাহ্ মৃত্যুবরণ করার পর মুসা শাহ্, চেরাগ আলী শাহ্, সোবহান শাহ্, মাদার বকস, করিম শাহ্ প্রমুখ ফকির নেতা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হতে পারেননি। যে কারণে ফকির আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। আপাত ব্যর্থ মনে হলেও ফকির বিদ্রোহই ছিল এই অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী মানুষদের প্রেরণার স্থল। যেই প্রেরণা থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহী হয়েছে বাঙালীরা।[১২৪]

সন্দ্বীপে কৃষকদের তিন-তিনটি বিদ্রোহ

বঙ্গোপসাগরে তৎকালীন নোয়াখালীর অন্তর্গত সন্দ্বীপের মানুষ সব সময় স্বাধীনচেতা ছিল। ইংরেজ শাসনের শুরুর পর যখন রাজস্ব/খাজনা আদায়ের পরিমাণ অনেকগুণ বেশি হয়ে পড়ে তখন সন্দ্বীপের মুসলিমরা বিদ্রোহ করে।

---

১২৪. স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস / আবু জাফর / পৃ.- ৩৩-৪১

www.pathagar.com

এটি আগে নোয়াখালীর অন্তর্গত ছিল। ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর খাজা নাজিমুদ্দিনের সরকার যখন নতুনভাবে জেলা বিন্যাস্ত করে তখন এটি চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে সন্দ্বীপ নোয়াখালী থেকে আলাদা হয় এবং চট্টগ্রামের সাথে যুক্ত হয়।[১২৫]

'সন্দ্বীপ বিদ্রোহ' হলো ১৭৬৭ সাল থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ওখানকার মানুষদের তিনটি বিদ্রোহ। তাদের বিদ্রোহের কারণ জানতে হলে একটু পেছন থেকে শুরু করা দরকার। তাদের স্বাধীন শাসক ছিলেন দেলওয়ার খাঁ যিনি দিলাল রাজা নামে বহুল পরিচিত। মোঘল আমলে শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার সুবাদার হন তখন তিনি পর্তুগীজ দস্যুদের ও মগ দস্যুদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। আগের সুবাদাররা এই কাজে সুবিধে করতে পারেননি কারণ তাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল না। শায়েস্তা খাঁ তার ছেলে বুজুর্গ উমেদ খাঁ'কে চট্টগ্রাম অধিকার করা ও দস্যুদের লুণ্ঠন থেকে বাঁচানোর আদেশ করলেন।

উমেদ খাঁ নোয়াখালীতে একটি নৌঘাঁটি স্থাপনের চিন্তা করলেন। এজন্য তার নৌ-সেনাপতি আবুল হাসানকে এই কাজের দায়িত্ব দিলেন। তিনি নোয়াখালীর সন্দ্বীপে ঘাঁটি স্থাপনের চিন্তা করলেন। তাকে বাধা দেন দেলওয়ার খাঁ। মোঘল সেনাপতি আবুল হাসান তাকে সপরিবারে বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যান। এই ঘটনাটি ঘটে ১৬৬৫ সালে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৬৬৬ সালে শায়েস্তা খাঁ আবদুল করিম খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে সন্দ্বীপের মোঘল ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তখনকার দিনে ফৌজদারগণ বর্তমান সময়ের ম্যাজিস্ট্রেট-এর দায়িত্ব পালন করতেন। অবশ্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে তাদের অধীনে কিছু সৈন্য থাকতো। যেমন, সন্দ্বীপে ফৌজদারের নিয়ন্ত্রণে ১০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। রাজস্ব আদায় কার্যে সুবিধার জন্য সন্দ্বীপে মোহাম্মদ কাশেম নামক একজন সুদক্ষ ও সুচতুর লোককে আহাদদার নিযুক্ত করা হয়। 'আহাদদার' অর্থ সচিব।

দেলওয়ার খাঁ প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল স্বাধীন নৃপতি হিসেবে সন্দ্বীপ শাসন করেন। বহিরাগত মোঘল বাহিনীর হাতে তার পরাজয় এবং সে সাথে দ্বীপটির স্বাধীন

---

১২৫. Sandwip Island / Bangladesh Ethnobotany Online Database (BEOD) / https://bit.ly/36ROMH5 / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

মর্যাদা বিলুপ্ত হওয়ায় স্বভাবতই স্থানীয় অধিবাসীরা বিক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু মোঘল প্রশাসনের বিশেষ করে শায়েস্তা খাঁ'র সুশাসনে পরিস্থিতি মোঘলদের অনুকূলে চলে আসে। প্রথমত সেখানে ট্যাক্স ধার্য করা হয় দেলওয়ার খাঁ'র আমলের প্রায় অর্ধেক। দ্বিতীয়ত দেলওয়ার খাঁ'র আত্মীয় ও প্রভাবশালীদের ইজারা দেওয়া হয়। এতে তারা সম্মান ও আর্থিকভাবে লাভবান হয়। অল্প সময়ে সন্দ্বীপ মোঘলদের পূর্ণ আনুগত্য করতে থাকে।

রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেলোয়ার খাঁ'র জামাতা চাঁদ খাঁ'র কাছে সন্দ্বীপ ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। চাঁদ খাঁ ইজারা বন্দোবস্ত নেওয়ার পর বুঝতে পারেন যে, একা তার পক্ষে সুবিস্তীর্ণ সন্দ্বীপ পরগণার রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে না। উপর্যুক্ত বিবেচনা থেকেই তিনি তার দু'আত্মীয় বক্তার মোহাম্মদ ও মোহাম্মদ হানিফ এবং তখনকার কানুনগো দপ্তরের কর্মচারী বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) নিবাসী মধুসুদনকে বিভিন্ন অংশ ইজারা বন্দোবস্ত দেন। এটা ছিল অনেকটা সাব-কন্ট্রাক্ট-এর মতো। বলাবাহুল্য, এই ইজারাদারগণই পরবর্তীকালে সন্দ্বীপের জমিদার হন।[১২৬]

১৬৯০ থেকে ১৭৩০ সাল পর্যন্ত চাঁদ খাঁ'র দু'পুত্র জুনুদ খাঁ ও মুকিম খাঁ, মোহাম্মদ হানিফের পুত্র মোহাম্মদ মুকিম এবং মধুসুদনের পুত্র জনার্দন সন্দ্বীপের জমিদার ছিলেন। জুনুদ খাঁ ও মুকিম খাঁ ছিলেন অর্ধেকের বেশি জমিদারির মালিক। সে কারণে সন্দ্বীপের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ওদের হাতেই ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। আনুমানিক ১৭৩০ সাল থেকে ১৭৫০ সাল পর্যন্ত সন্দ্বীপের প্রভাবশালী জমিদারদের মধ্যে জুনুদ খাঁ'র ছেলে মোহাম্মদ রাজা, মুকিম খাঁ'র ছেলে মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ মুকিমের ছেলে বাখর মোহাম্মদ ও জাফর মোহাম্মদ এবং জনার্দনের ছেলে রামচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। বাখর মোহাম্মদের নামানুসারে তার জমিদারি বাখরপুর জমিদারি নামে পরিচিত ছিল। মুকিম খাঁর ছেলে জমিদার মোহাম্মদ হোসেন মারা যান ১৭৪৩ সালে। তার থেকে জমিদারি পান তার ছেলে আবু তোরাব।

আবু তোরাব, মোহাম্মদ মুরাদ, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, মোহাম্মদ ওয়াছিম, মোহাম্মদ আকবর, সূর্য নারায়ণ প্রমুখ ১৭৪৩ থেকে ১৭৫০ সালের মধ্যে সন্দ্বীপের

---

১২৬. সন্দ্বীপের বিদ্রোহ / অনিন্দ্য আরিফ / কালের কণ্ঠ / ১২ আগস্ট ২০১৪

www.pathagar.com

জমিদারি লাভ করেন। ওদের মধ্যে সব চাইতে বেশি প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন আবু তোরাব। আনুমানিক ১৭৫০ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দাপটের সাথে সন্দ্বীপে জমিদারি পরিচালনা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি হ্যারি ভেরেলেস্ট নবাব মীর কাসেম খাঁ'র আদেশ বলে ১৭৬১ সালে চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই ভেরেলেস্ট-এর প্রধান কার্যালয়ের কেরানী ছিলেন খিদিরপুরের ঘোষাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুল ঘোষাল নামক একজন ধূর্ত ক্ষমতালোলুপ ব্যক্তি। তারই পরামর্শে ভেরেলেস্ট সন্দ্বীপকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীন করেন। সন্দ্বীপের জমিদারদের সেই সক্ষমতা ছিল না ইংরেজদের ঠেকাবে।[১২৭]

মোঘল নিয়মানুসারে শেষ ওয়াদাদার ওজাকুর মুলকে অগ্রাহ্য করে ১৭৬৩ সালে ভেরেলেস্ট গোকুল ঘোষালকে বেনামীতে সন্দ্বীপের ওয়াদাদার নিযুক্ত করেন। তার একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী বিষ্ণুচরণ বসুর নামে ওয়াদাদারী নেন। কাজেই কাগজে কলমে এই বিষ্ণুচরণ ছিলেন সন্দ্বীপে বৃটিশ আমলের প্রথম ওয়াদাদার। তখন নায়েবে ওয়াদাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন রাম কিশোর বাড়ুজেজ। বলাবাহুল্য, তখনকার প্রতাপশালী জমিদার আবু তোরাব চৌধুরী গোকুল ঘোষালের মতো ক্ষমতালোলুপ লোককে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেননি। নায়েবে ওয়াদাদার রাম কিশোর বাড়ুজ্জের সন্দ্বীপে আগমনের সাথে সাথেই আবু তোরাব প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন।

গোকুল ঘোষাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে আহাদদার হিসেবে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপ আগমন করেন ১৭৬৩-৬৪ সালে। তার সাথে আবু তোরাবের বিরোধ চরমে পৌঁছে ১৭৬৭ সালে। জমিদার আবু তোরাব ইংরেজ ওয়াদদাদারের কাছে রাজস্ব জমা দেওয়া থেকে পুরাপুরি বিরত থাকেন। তাছাড়া, গোকুল ঘোষালের প্রতিনিধিদের সন্দ্বীপ থেকে বিতাড়ণের জন্য আবু তোরাব তার সেনাপতি মালকামকে নির্দেশ প্রদান করেন।

অতঃপর মীর জাফরের জামাতা নবাব মীর কাসেমের নির্দেশে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী থেকে নবাবের অনুগত একদল সৈন্য এসে তোরাব আলীর মুখোমুখি হয়। কিন্তু প্রতিরোধ ও চাপের মুখে কিছুদিনের মধ্যে আহাদদারের

---

১২৭. সন্দ্বীপ উত্তরণ / মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

www.pathagar.com

লোকজন সন্দ্বীপ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। অবশেষে ক্যাপ্টেন নলিকিন্স এবং আরো কয়েকজন সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে ইংরেজ সেনাবাহিনী নদী পার হয়ে সন্দ্বীপে পৌঁছায়। ১৭৬৭ সালের মধ্যভাগে সন্দ্বীপ শহরের সামান্য উত্তরে চার আনি হাটের অদূরবর্তী কিল্লাবাড়িতে আবু তোরাব বাহিনীর সাথে ক্যাপ্টেন নলিকিন্স-এর বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে আবু তোরাব পরাজিত ও নিহত হন। আবু তোরাব চৌধুরী জমিদার হলেও সুশাসনের কারণে কৃষক প্রজারা তাকে ভালোবাসতেন। এ কারণে উপরিউক্ত যুদ্ধে সন্দ্বীপের কৃষকগণ আবু তোরাব চৌধুরীর পক্ষাবলম্বন করেন। ইতিহাসে এটি সন্দ্বীপের প্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলেও খ্যাত হয়।[১২৮]

আবু তোরাবের পতনের পরে সন্দ্বীপের অন্যান্য জমিদারগণ ইংরেজদের আনুগত্য মেনে নেন। জমিদারদের তাদের জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে গোকুল ঘোষাল আবু তোরাবের জমিদারি জনৈক ভবানীচরণ দাসের নামে বন্দোবস্ত করে নেন। গোকুল ঘোষাল সন্দ্বীপের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। জমিদারদের সাময়িকভাবে জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়া হলেও গোকুল ঘোষাল আবার তা কেড়ে নেন। এরপর থেকে তিনি সন্দ্বীপের অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করেন। কৃষকেরা তার বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে নালিশ করে। কিন্তু সেই কথা শোনার ইচ্ছে নেই ইংরেজ লুটেরাদের।

এদিকে সকল প্রকার আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হলে সন্দ্বীপের কৃষকেরা বেপরোয়া হয়ে গোকুল ঘোষাল এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করে। প্রথমে তারা খাজনা প্রদান বন্ধ করে বিদ্রোহের সংকেত প্রদান করে। এদিকে গোকুল ঘোষালও সহজে দমবার পাত্র নন। জোরপূর্বক খাজনা আদায়ের জন্য তিনি কৃষকদের ঘরে ঘরে পেয়াদা ও পুলিশ পাঠাতে শুরু করেন। তারা জবরদস্তিমূলকভাবে খাজনা আদায়- অন্যথায় প্রজাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে থাকে। পরিণামে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। কৃষকগণ সম্মিলিত হয়ে ওদের প্রতিরোধ করতে শুরু করে। ১৭৬৯ সালে এ নিয়ে সন্দ্বীপে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং এমনকি ব্যাপক সংঘর্ষ লেগে যায়। অসন্তুষ্ট, হৃতসর্বস্ব জমিদারগণ কৃষকদের পক্ষাবলম্বন করেন। অবশেষে গোকুলের আবেদনক্রমে সে বছরের শেষের দিকে

---

১২৮. ভারতের কৃষকের-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম / সুপ্রকাশ রায় / পৃ. ৬২-৬৪

www.pathagar.com

ইংরেজ সৈন্যদল সন্দ্বীপে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। এটি সন্দ্বীপের দ্বিতীয় বিদ্রোহ।[১২৯]

ইংরেজ শাসকেরা সন্দ্বীপের প্রজা বিদ্রোহ, কৃষক অসন্তোষ দমনে অত্যাচারী গোকুল ঘোষালের পক্ষাবলম্বন করলেও তারা বুঝতে পারে যে, একটা কিছু পরিবর্তন না আনলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হবে। এমতাবস্থায় ১৭৭২-৭৩ সালে সন্দ্বীপে ওয়াদাদারের পদ বিলুপ্ত করে একজন আমিন (ম্যাজিসট্রেট) নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও কার্যতঃ গোকুল ঘোষালই সন্দ্বীপে কর্তৃত্ব করতে থাকেন। অবশেষে জমিদারগণ কোম্পানীর নিকট গোকুল ঘোষালের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে বাধ্য হন। তারই ফলে ঢাকায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ ১৭৭৮ সালে ডানকান নামক একজন ইংরেজকে প্রকৃত পরিস্থিতি জানার জন্য সন্দ্বীপ পাঠায়। ১৭৮৩ সালে তার হস্তক্ষেপে কোরেশা বানু এবং আরও দু'একজন জমিদার তাদের জমিদারি ফিরে পান। কিন্তু আবু তোরাব চৌধুরীর জমিদারি তার ছেলে আলী রাজাকে না দিয়ে ভবানী চরণ দাসের নামে গোকুল ঘোষাল অধিকার করেন।

এদিকে গোকুল ঘোষাল, ভবানীচরণ দাস প্রমুখ জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সন্দ্বীপের স্থানীয় জমিদার, তালুকদার এবং কৃষকদের সংগ্রাম দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। একই প্রেক্ষাপটে ১৮১৯ সালে সন্দ্বীপে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহও দমন করে ইংরেজরা। তবে এবার গোকুলকে প্রত্যাহার করা হয় এবং এখানে ইংরেজদের সরাসরি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে সন্দ্বীপে পৌঁছানো সহজ হতো না বিধায় ধীরে ধীরে এখানে ইংরেজদের শোষণ কমে আসতে শুরু করে।

উল্লেখ্য, স্বনামে বেনামে জমিদারির মালিকানা, দুর্নীতি, লুণ্ঠন দীর্ঘদিনের আহাদাদারি, লবণের ইজারা ইত্যাদি খাত থেকে গোকুল ঘোষাল বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হন। সন্দ্বীপ থেকে উপার্জিত, লুণ্ঠিত সে সম্পদের দ্বারা কোলকাতার খিদিরপুরের ভুর্কৈলাসের রাজপ্রাসাদে ঘোষাল রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গোকুল ঘোষালের নাম সন্দ্বীপের লোকেরা এখনো ঘৃণার সাথে স্মরণ করে। এই তিন বিদ্রোহে শত শত মুসলিম কৃষক শাহদাতবরণ করেন।

---

১২৯. ভারতের কৃষকের-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম / সুপ্রকাশ রায় / পৃ. ৬৫-৬৬

www.pathagar.com

রংপুরের নূরুলদীনের কৃষক বিদ্রোহ

রংপুরের বিখ্যাত 'জাগো বাহে, কুন্ঠে সবাই' স্লোগানের সাথে সারাদেশে সবাই পরিচিত। এই ডাক দিয়ে কৃষকদের জাগাতে চেয়েছেন রংপুরের এক প্রতিবাদী কৃষক নেতা নূর উদ্দিন। আঞ্চলিক ভাষায় তার পরিবর্তিত নাম নূরুলদীন। রংপুরের বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়া নূরলদীন মাটির নবাব হিসেবে পরিচিত হয়েছেন কৃষকদের কাছে।

পলাশীতে বিপর্যয়ের পর বাংলা অঞ্চল তখন পার করছিল একটি হাহাকারময় সময়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপশাসন ও লুটপাটের ফলে ১১৭৬ সালে সৃষ্ট 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে' কোটি মানুষ মারা গেছে না খেয়ে। ইংরেজ শাসন ভারতের কৃষি-সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। রাজস্ব আদায় আগে হতো গ্রাম-সমাজ থেকে, কোনো ব্যক্তির নিকট নয়। ইংরেজ বেনিয়ারাই সর্বপ্রথম ব্যক্তিগতভাবে রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রচলন করাসহ রাজস্ব হিসেবে ফসলের বদলে মুদ্রাপ্রথা প্রচলন করে। তারা মোঘল যুগের জমিদার বা রাজস্ব আদায়কারী গোমস্তাদের সরিয়ে প্রভাবশালী হিন্দুদের জমির মালিক বলে ঘোষণা করে। এরা কৃষকের কাছ থেকে ইচ্ছেমতো খাজনা ও কর আদায় করে সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ইংরেজদের দিতো।

খেয়াল-খুশী মতো রাজস্ব আদায়ের ফলে বাংলা ও বিহারের রাজস্ব মোঘলযুগের শেষ সময়ের রাজস্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ হয়। ১৭৬৪-৬৫ সালে রাজস্ব আদায় হয় এক কোটি ২৩ লাখ টাকা, ১৭৬৫-৬৬ সালে যা বেড়ে হয় দুই কোটি ২০ লাখ টাকা। ভূমি রাজস্ব, কর্মচারীদের উৎকোচগ্রহণ ও ব্যক্তিগত ব্যবসায় যে মুনাফা পেতো, তার পরিমাণও ছিল অবিশ্বাস্য। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল লুণ্ঠন। বাংলা ও বিহারের জনসাধারণের টাকায় নামমাত্র মূল্যে এ দেশের পণ্য ক্রয় করে ইউরোপের বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হতো। কার্ল মার্কস, রেজিনাল্ড রেনল্ডসের মতো লেখকরা এই ব্যবসাকে বলেছেন 'প্রকাশ্য দস্যুতা'।

ইংরেজদের শাসন ও শোষণের মাত্রা ক্রমশ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ফলে ১৭৭০ সালে বাংলা ও বিহারে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষের ভয়াল ছায়া। যার নিষ্ঠুর থাবায় অসংখ্য মানুষ নির্মম মৃত্যুর শিকার হন। ইংরেজ সৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষ ১৭৭৬ সালে মহাদুর্ভিক্ষে রূপ নেয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত এই দুর্ভিক্ষে চাষিরা ক্ষুধার জ্বালায় তাদের সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হয়, কোথাও কোথাও জীবিত

www.pathagar.com

মানুষ মৃত মানুষের মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। নদীর তীর মৃত ও মুমূর্ষু মানুষের ভাগাড়ে পরিণত হয়। মারা যাওয়ার আগেই মুমূর্ষু মানুষকে শিয়াল-কুকুরে খাওয়ার ঘটনাও ঘটে।

অত্যাচার, নিপীড়ন আর লুণ্ঠনের মাধ্যমে অর্জিত টাকায় কোম্পানীর অবস্থা তখন খুবই রমরমা। রাজস্ব ক্ষমতা হাতে পেয়ে ইংরেজরা তখন চালু করেছিল ইজারাদারি প্রথা। আর এই ইজারাদারি ব্যবস্থায় রংপুর, দিনাজপুরের ইজারাদারি লাভ করে একজন অত্যাচারী জমিদার দেবী সিংহ। দেবী সিংহ মুর্শিদাবাদ এসেছিলেন সূদুর পানিপথ থেকে। মুর্শিদাবাদে এসে ডাকাতির মাধ্যমে প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। পলাশীর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ইংরেজদের পক্ষে। এ কারণে ছিলেন বৃটিশদের সুনজরে। পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান হিসেবে দায়িত্ব লাভ করার পর তার কঠোরতায় প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল। এরপর তিনি লাভ করেন পূর্ণিয়ার শাসন ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা। এখানেও তার অত্যাচার আর নিপীড়নে কৃষকরা এক রকম বনে-জঙ্গলে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। যার ফলে হেস্টিংস নিজেই তাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু দেবী সিংহ ছিলেন খুবই ধুরন্ধর প্রকৃতির মানুষ। প্রচুর অর্থ উপঢৌকনের বিনিময়ে হেস্টিংসকে বাগে আনেন সহজেই। এবার তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক রেভিনিউ বোর্ডের সহকারী কার্যাধক্ষ্যের পদে। এখানেও তিনি প্রজাদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত রাখেন। এক সময় প্রচুর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। হেস্টিংস বাধ্য হন সেই রেভিনিউ বোর্ড ভেঙে দিতে।

নিখিলনাথ রায় তার মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে দেবী সিংহের অত্যাচারের ইতিহাস তুলে ধরে বলেছেন, "যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময় মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ মানবপ্রকৃতির মধ্যে শয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে একবার দেবী সিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন। দেখিবেন, সেই ভীষণ অত্যাচারে কত কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কত কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। কত কত জমিদার ভিখারীরও অধম হইয়া দিন কাটাইয়াছে।...দেবী সিংহের নাম শুনিলে, আজিও উত্তরবঙ্গ প্রদেশের অধিবাসিগণ শিহরিয়া উঠে! আজিও অনেক কোমলহৃদয়া মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। শিশুসন্তানগণ ভীত হইয়া, জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লয়!"

www.pathagar.com

নির্যাতন, নিপীড়ন আর অন্তহীন লুণ্ঠনে তখন সর্বশান্ত উত্তরবঙ্গের কৃষককূল। প্রাণ যখন একেবারেই ওষ্ঠাগত, তখন এ মৃত্যুপুরী থেকে মুক্তির স্বপ্ন তাদের এগিয়ে নিলো একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের দিকে। নিজের মাটি, ইজ্জত ও অস্তিত্ব রক্ষায় তারা ঘুরে দাঁড়ালেন একটি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। আর তখনই আবির্ভাব একজন নূরুলদীনের। নূরুলদীন একজন মানুষ ছিলেন । একজন কৃষক ছিলেন। একজন মহৎপ্রাণ কৃষক, যার নেতৃত্বে হাজারো কৃষক বুকের তাজা রক্ত ঢেলে বিদ্রোহী হয়েছিল নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়। এর বেশি ইতিহাসে নূরুলদীনের আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

নূরুলদীন এক ঘোষণাপত্রে দেবী সিংহকে কর না দেওয়ার আদেশ দেন। বিদ্রোহের ব্যয় পরিচালনার জন্য 'ডিংখরচা' নামে চাঁদা আদায় করেন। এভাবে রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহারসহ উত্তরাঞ্চলের প্রায় সব কৃষক নূরুলদীনের নেতৃত্বে দেবী সিংহের বর্বর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ ও এই অঞ্চল থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্যে প্রস্তুত হন।

১৭৮২ সালের শেষদিক থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের কণ্ঠ সোচ্চার হতে থাকে। যা দ্রুতই এগিয়ে যায় বিদ্রোহের দিকে। কাজিরহাট, কাকিনা, টেপা ও ফতেপুর চাকলা অঞ্চলে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করলে কুচবিহার ও দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষকরাও এই বিদ্রোহে শামিল হন। কৃষকগণ নূরুলদীনকে তাদের 'নবাব' হিসেবে ঘোষণা দেন। দয়াশীল নামে আরেকজনকে নিযুক্ত করা হয় তার দেওয়ান হিসেবে। নবাব নূরুলদীন কৃষকদের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর করে তোলেন। কৃষকরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নূরুলদীনকে স্বতঃফূর্তভাবে সহায়তা করতে থাকেন। প্রথমদিকে নূরুলদীন ও উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের প্রতিবাদ ছিল শান্তিপূর্ণ। তারা ভেবেছিলেন, ইংরেজ সরকার হয়তো দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এ লক্ষ্যে তারা কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিবরণ তাদের সইসহ গুডল্যান্ডের নিকট পাঠান এবং ব্যবস্থা নিতে নির্দিষ্ট সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু গুডল্যান্ড নিজেই দেবী সিংহের সুবিধাভোগী ছিলেন। দেবী সিংহের লুটের টাকার বড় অংশ আসতো তার পকেটে। কাজেই তিনি এদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

১৭৮৩ সালের শুরুতেই বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্রোহী কৃষকেরা রংপুর থেকে দেবী সিংহের কর সংগ্রহকারীদের বিতাড়িত করে। টেপা, ফতেপুর

www.pathagar.com

ও বাকলায় বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে। টেপা জমিদারির নায়েব বিদ্রোহে বাধা দিতে এসে নিহত হন। কাকিনা, কাজিরহাট, ডিমলা এলাকায়ও একই রকম ঘটনা ঘটে। ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরীও বিদ্রোহী কৃষকদের বাধা দিতে এসে নিহত হন। বিদ্রোহীদের সাফল্যে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষ করে দিনাজপুর, কুচবিহারের কৃষকেরাও 'নবাব' নূরুলদীনের বাহিনীতে যোগ দিয়ে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে।

বিদ্রোহ যখন চরমে, তখন রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাড দেবী সিংহকে রক্ষায় ও কৃষকদের ন্যায্য দাবী পর্যুদস্ত করার জন্য কয়েক দল সিপাহি পাঠান, যার নেতৃত্বে ছিলেন লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড। লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড অবশ্য নূরুলদীনের সাথে সম্মুখ সমরের দিকে গেলেন না। তিনি আশ্রয় নিলেন কূটকৌশলের। ছদ্মবেশ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে কৌশলে রাতের আধাঁরে ঘিরে ফেললেন বিদ্রোহীদের ঘাঁটি পাটগ্রাম। দিনটি ১৭৮৩ সালের ২২ফেব্রুয়ারী। অতি ভোরে ঘুমন্ত মুক্তিকামী কৃষকদের ওপর ভারি অস্ত্রসহ হামলে পড়লেন লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড ও তার বাহিনী।

বিদ্রোহ দমনে ইংরেজরা বর্বরের ভূমিকায় অংশ নেন। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং মানুষ দেখা মাত্রই পশুর মতো গুলি করে। বিদ্রোহের নায়ক 'নবাব' নূরুলদীন গুরুতর আহত হয়ে শত্রুদের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং তার বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়াশীল নিহত হন। কিছুদিন পর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে 'নবাব' নূরুলদীন মারা যান।

যুদ্ধে পরাজয় ও নূরুলদীনের মৃত্যু কৃষকদের হতোদ্যম করলেও লড়াই থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। শহীদ নবাব নূরুলদীনের আদেশকে মান্য করে তারা বন্ধ করে দেয় সকল প্রকার খাজনা প্রদান। প্রচুর টাকা খাজনা বাকি পড়লে ইংরেজ শাসকদের টনক নড়ে। ঘটনা তদন্তে আসেন পিটারসন নামক ইংরেজ সেনা অফিসার। তিনি অবশ্য রেভিনিউ কমিটির কাছে নির্মোহভাবে কৃষকদের ওপর নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরেন। অতঃপর দেবী সিংহকে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় আর কালেক্টর গুডল্যান্ডকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়া হয় কোলকাতায়।[১৩০]

---

১৩০. ভারতের কৃষকের-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম / সুপ্রকাশ রায় / পৃ. ১০৫-১১২

www.pathagar.com

বাংলায় প্রথম খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন

ইংরেজরা বাংলা দখলের পর বাংলার মুসলিমরা ব্যাপক অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখোমুখি হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা। মুসলিমদের সবক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলিম পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়। সে সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা মাদরাসা নামে পরিচিত ছিল সেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞান চর্চাও সমানতালে হতো। কিন্তু ইংরেজরা বুঝতে পেরেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকলে মুসলিমদের জাতিসত্ত্বা টিকে থাকবে। তাই তারা মুসলিমদের শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ করে দেয়। এভাবে দুই দশকের মধ্যেই বাঙালি শিক্ষার আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও পশ্চাতপদ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

এছাড়াও তারা মুসলমানদের হাত থেকে খাজনা আদায়ে প্রজাদের ওপরে শুরু করলো নির্মম শোষণ-পীড়ন। বৃটিশ নিম্নমানের বস্ত্রের বাজার সৃষ্টির জন্যে বাঙালি তাঁতীদের নির্মূল করার কাজ শুরু হলো। তাদের আঙ্গুল কেটে দেওয়া হয় যাতে তারা তাঁত চালাতে না পারে। ১৭৬৬ সালে প্রতিমণ লবণের ওপর দু'টাকা হারে কর ধার্য করে লবণ ব্যবসা ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকারে নেওয়া হলো। এভাবে মুসলমানরা সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে লাগলো। আমাদের শিক্ষা, শিল্প ও অর্থনীতি পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনেও মুসলমানরা বাধাগ্রস্ত হতে লাগলো। অত্যাচারী হিন্দু জমিদারদের এলাকায় গো-কুরবানী এবং আজান দেওয়া নিষিদ্ধ হলো। হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান প্রজাদের দাড়ির ওপরে ট্যাক্স ধার্য করলো। তাদের পূজা-পার্বণে মুসলমানদেরকে চাঁদা দিতে, পূজার যোগন ও বেগার দিতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদেরকে ধূতি পরতে ও দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখতে বাধ্য করা হলো। মুসলমানদের ধর্ম, তাহজিব-তমদ্দুনকে ধ্বংস করে হিন্দুজাতির মধ্যে একাকার করে ফেলার এক সর্বনাশা পরিকল্পনা শুরু হলো। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হয়ে উঠলো দিশেহারা। এর মধ্যে পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞান না থাকায় মুসলিমরা হিন্দুদের অনুকরণ করতে শুরু করে। মুসলিমদের মধ্যে প্রচুর শিরকি ও বিদআতি কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়।[১৩১]

---

১৩১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ১৯৯-২০০

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনের সময় ১৮২০ সালে ফরায়েজি আন্দোলনের সূচনা করেন হাজী মুহাম্মদ শরিয়তুল্লাহ। হাজি শরীয়তউল্লাহ ১৭৮৪ সালে ফরিদপুর জেলার বন্দর পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। হাজি শরীয়তউল্লাহ ইসলামের পাঁচটি মৌল আদর্শের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাওহীদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও পূর্ণ অনুশীলনের ওপর তিনি জোর দেন এবং মূল বিশ্বাস বা মতবাদ থেকে যে কোনো বিচ্যুতিকে তিনি 'শির্ক' ও 'বিদআত' বলে ঘোষণা করেন। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুসংখ্যক আচার অনুষ্ঠান যেমন ছটি, পট্টি, চিল্লা, শাবগাস্ত মিছিল, ফাতিহা, মিলাদ ও ওরস নিষিদ্ধ করেন। পীরপূজা, পীরের প্রতি অতিশ্রদ্ধা প্রদর্শন, মহররমে তাজিয়া নির্মাণকেও শির্ক বলে ঘোষণা করেন। তিনি ন্যায়বিচার, সামাজিক সাম্য এবং মুসলমানদের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বর্ণগত কুসংস্কার বিলোপ সাধনের তত্ত্ব প্রচার করেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলায় বৃটিশ শাসনকে মুসলমানদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতেন। হানাফি আইনের অনুসরণে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, বাংলায় বৈধভাবে নিযুক্ত একজন মুসলিম শাসকের অনুপস্থিতি মুসলমানদের জুম'আর নামাজের জামায়াত অনুষ্ঠানের সুযোগ হতে বঞ্চিত করেছে। এ মত ছিল ফরায়েজী আন্দোলনের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য যা একে ওই সময়ের অপরাপর পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন থেকে আলাদা করে তুলেছে।

দিল্লীতে শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভীর নেতৃত্বে ভারতভূমিতেও আবদুল ওহাব নজদীর অনুকরণে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, যা 'ওহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করেন এবং 'দারুল হরব'কে 'দারুল ইসলাম' তথা একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সক্রিয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভী, শাহ্ আবদুল আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহ ইসমাইল ও জামাতা মাওলানা আবদুল হাই। হাজী শরীয়তুল্লাহও এ দেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন এবং যতোদিন এ দেশ 'দারুল ইসলাম' না হয়েছে ততোদিন এখানে 'জুমা' ও ঈদের নামাজ সঙ্গত নয় বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুর পূজা-পার্বণে কোনো প্রকার আর্থিক অথবা দৈহিক সাহায্য-সহযোগিতা ইসলাম-বিরুদ্ধ (শিরক ও হারাম) বলে অভিহিত

www.pathagar.com

করেন। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদেরকে ধুতি ছেড়ে তহবন্দ-পায়জামা পরিধান করতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে এবং সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে তওবা করতে হবে। মোটকথা যাবতীয় পাপকাজ পরিত্যাগ করে নতুনভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে।[১৩২]

শোষিত-বঞ্চিত ও নিষ্পেষিত মুসলমান জনসাধারণ হাজী শরীয়তুল্লাহর আহ্বানে নতুন প্রাণসঞ্চারণ অনুভব করলো এবং দলে দলে তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলো। অল্প সময়ের মধ্যে দশ হাজার মুসলমান তার দলভুক্ত হলো। এটা হলো হিন্দু জমিদারদের পক্ষে এক মহা আতংকের ব্যাপার। এখন মুসলমানদের নিষ্পেষণ করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং যেসব নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মুসলমানদেরকে তারা তাদের দাসানুদাসে পরিণত করে ইসলাম ধর্ম থেকেও দূরে নিক্ষেপ করেছে, তারাও তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব, তাদের উদ্বিগ্ন ও আতংকিত হয়ে ওঠারই কথা।

হাজী শরীয়তুল্লাহকে দমন করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হলো হিন্দু জমিদারগণ। তাদের দলে যোগদান করলো কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী আধা-মুসলমান যারা ছিল হিন্দু জমিদারদের দাসানুদাস। অদূরদর্শী মোল্লা-মৌলবী ও পীর, যারা মুসলমানদের মধ্যে শিরক বিদআত প্রভৃতি কুসংস্কারের নামে দু'পয়সা কামাই করছিল, তারাও ফরায়েজী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। একদিকে বৃটিশ এবং অপরদিকে অত্যাচারী হিন্দু জমিদার মহাজনদের উপর্যুপরি অত্যাচার-নিষ্পেষণে মুসলমানরা অনন্যোপায় হয়ে মাথানত করে সবকিছু সহ্য করে যাচ্ছিল। শরীয়তুল্লাহর আহ্বানে নিপীড়িত মুসলমানগণ দলে দলে তার কাছে এসে জমায়েত হতে লাগলো এবং বৃটিশ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করলো।

হাজী শরিয়তুল্লাহ ফরজের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছিলেন বলেই ওনার ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ফরায়েজি নাম লাভ করে। তিনি যাবতীয় ইসলাম বিরোধী রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নবি মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের বিরোধী রীতিনীতি পরিত্যাগ করে নবি মুহম্মদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল আরবের মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী, সাইয়্যেদ

---

১৩২ হাজী শরীয়তউল্লাহ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/372hAgn / অ্যাকসেস ইন ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

আহমদ শহীদ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তীতুমীর প্রমুখ মনীষীদের আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এটিই ছিল বাংলায় প্রথম ইসলামী আন্দোলন তথা খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই আন্দোলন মুখ্যত ইংরেজবিরোধী না হলেও এর ফলে মুসলিমরা আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে যা শাসকরা ভালো চোখে দেখেনি।

ঢাকা জেলার নয়াবাড়ী নামক স্থানে প্রথমে শরীয়তুল্লাহর নতুন কর্মক্ষেত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের চরম বিরোধিতার ফলে তাকে আপন গ্রামে ফিরে গিয়ে তার প্রচারকার্য শুরু করতে হয়। তার আন্দোলন ঢাকা, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় বিস্তার লাভ করে। নিরক্ষর, চাষী, তাঁতী ও অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের নামাজ-রোজার প্রচলন, ধুতির পরিবর্তে তহবন্দ-টুপির ব্যবহার, মসজিদগুলির সংস্কার প্রভৃতি কাজ পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকে। হাজী শরীয়তুল্লাহ নিজে মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী ও গায়ে জামার ওপরে ছুদরিয়া পরতেন যে পোশাক সাধারণত: কোনো মুসলমান ব্যবহার করতো না। ১৮৪০ সালে তিনি পরলোক গমন করার পর তার যোগ্য পুত্র দুদু মিয়া তার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।

হাজী শরীয়তুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ মুহসীন ওরফে দুদু মিয়া ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ সালে তিনি হজ্ব পালনের জন্যে মক্কা গমন করে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর পিতার কাজে সাহায্য করেন।

পিতার ন্যায় দুদু মিয়াও অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। জমিদারদের সঙ্গে তাকে বার বার সংঘর্ষে আসতে হয়। ১৮৪২ সালে তিনি ফরিদপুরের জমিদার বাড়ী আক্রমণ করেন এবং মদন নারায়ণ ঘোষকে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। পুলিশ তাকেসহ ১১৭জন ফরায়েজীকে গ্রেফতার করে। বিচারে ২২ জনের কারাদণ্ড হয়। কিন্তু দুদু মিয়াকে প্রমাণের অভাবে খালাস দেওয়া হয়। ১৮৪৬ সালে এনড্রিও এন্ডারসন এর গোমস্তা কালি প্রসাদ মনিবের আদেশে সাত আটশ' লোক নিয়ে দুদু মিয়ার বাড়ী চড়াও করে এবং প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের অলংকারাদিসহ বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।[১৩৩]

জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়ে কোনো সুবিচার

---

[১৩৩]. দুদু মিয়া / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3jlDYWI / অ্যাকসেস ইন ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

না পেয়ে দুদু মিয়া এবার নিজ হাতে শত্রুদের উচিত শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। ১৮৪৬ সালের নভেম্বর মাসে, তার গৃহ লুণ্ঠিত হওয়ার একমাস পরে, তিনি শত্রুদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ইন্ধন সংযোগকারী নীলকর ডানলপের কারখানা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে দেন এবং গোমস্তা কালী প্রসাদকে হত্যা করেন। দুই বছর পর্যন্ত মামলা চলার পর দুদু মিয়া তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান। জনসাধারণের মধ্যে দুদু মিয়ার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে সরকার বিব্রত হয়ে পড়েন। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালে দুদু মিয়া উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেন এই অজুহাতে তাকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়। প্রথমে আলীপুরে এবং পরে তাকে ফরিদপুর জেলে রাখা হয়। ১৮৫৯ সাল মুক্তিলাভ করে তিনি ঢাকায় আসেন এবং এখানেই তার মৃত্যু হয়।

দুদু মিয়া পিতার আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করেছিলেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ যে ছয়টি বিষয়ের উপর তার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা হচ্ছে- মুসলমান শাসিত দেশ ব্যতীত অন্য কোথাও জুম'আ ও ঈদের নামায বৈধ নয়; মহররমের পর্ব ও অনুষ্ঠান পালন ইসলাম বিরুদ্ধ এবং পাপকার্য; 'পীর' ও 'মুরীদ' পরিভাষাদ্বয়ের স্থলে 'উস্তাদ' ও 'শাগরেদ' পরিভাষাদ্বয়ের ব্যবহার। কারণ 'মুরীদ' তার যথাসর্বস্ব 'পীরের' কাছে সমর্পণ করে যা ঠিক নয়। পক্ষান্তারে 'শাগরেদকে' তা করতে হয় না।

এ আন্দোলনে যারাই যোগদান করবে তাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, 'আশরাফ'-'আতরাফ' কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। তৎকালে পীরের হাতে হাত রেখে 'বায়াত' করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তে 'ফরায়েজী' আন্দোলনে যোগদানকারী শুধুমাত্র সকল পাপ কাজ থেকে খাঁটি দিলে 'তওবা' করে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করার শপথ গ্রহণ করবে। জেমস টেইলর বলেন যে, কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই ফরায়েজী আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং কুরআন যেসব অনুষ্ঠানাদি সমর্থন করে না তা সবই বর্জনীয়। মহররমের অনুষ্ঠান পালনই শুধু নিষিদ্ধ নয়, এ অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ দেখাও নিষিদ্ধ।

হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে দুদু মিয়া সমগ্র পূর্ববাংলা কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করেন যাদের কাজ ছিল আন্দোলনের দিকে মানুষকে আহ্বান

www.pathagar.com

করা, কর্মী সংগ্রহ করা ও সংগঠন পরিচালনার জন্যে অর্থ সংগ্রহ করা।

হাজী শরীয়তুল্লাহর জীবদ্দশায় যে আন্দোলন পরিচালিত ছিল, তা ছিল মুখ্যত: ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। অত্যাচারী জমিদারদের প্ররোচনায় দু'একটি সংঘর্ষ ব্যতীত কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, তার আন্দোলনের সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু দুদু মিয়ার সময়ে আন্দোলন অনেকটা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। সকল জমিদার ও নীলকরগণ তার আন্দোলনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। তাই দুদু মিয়ার সারা জীবন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কেটে গেছে। একদিকে গরীব প্রজাদের ওপর জমিদার-নীলকরদের নানাপ্রকার উৎপীড়ন এবং তাদের দুঃখ মোচনে দুদু মিয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তাদেরকে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ করে। দুদু মিয়ার সাংগঠনিক যোগ্যতাও ছিল অসাধারণ। বাংলার জমিদারগণ ছিল প্রায়ই হিন্দু এবং নীলকরগণ ছিল ইংরেজ খ্রিষ্টান ও তাদের গোমস্তা কর্মচারী ছিল সবই হিন্দু। এ কারণেও কৃষক প্রজাগণ জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়েছিল। দুদু মিয়াকে সারা জীবন জমিদার-নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই কেটে গেছে। নিত্য নতুন মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমায় তাকে জড়িত করা হয়। এসবের জন্যে তাকে শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্য বরণ করতে হয়।

ফরায়েজীগণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুশীলনে কতিপয় স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যসহ হানাফি মাযহাবের অনুসারী ছিল। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি ফরায়েজী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়:

১. তওবা অর্থাৎ আত্মার পরিশুদ্ধির লক্ষ্যে অতীত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া,

২. ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্যসমূহ কঠোরভাবে পালন করা,

৩. কুরআন নির্দেশিত তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ,

৪. ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' বিধায় এখানে জুম'আর ও ঈদের জামাত অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যকীয় নয়,

৫. কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত সকল লোকাচার ও অনুষ্ঠানকে 'বিদআত' বলে পরিহার করা। পীর ও 'মুরিদ' অভিধার পরিবর্তে ফরায়েজীদের নেতাকে 'ওস্তাদ' বা শিক্ষক এবং তার অনুসারীদের 'শাগরিদ' বা শিষ্য বলা। ফরায়েজী জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিকে 'মুসলিম' বা 'মুমিন' বলা।

www.pathagar.com

সংগঠন ফরায়েজীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে দুদু মিয়ার দু'টি লক্ষ্য ছিল:

১. হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকরদের অত্যাচার থেকে ফরায়েজী কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করা এবং

২. জনগণের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম লক্ষ্যটি অর্জনের জন্য দুদু মিয়া এক স্বেচ্ছাসেবক লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি অর্জনের জন্য তিনি ফরায়েজীদের নেতৃত্বে সনাতন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (পঞ্চায়েত) পুনঃপ্রবর্তন করেন। প্রথমোক্তটি 'সিয়াসতি' বা রাজনৈতিক শাখা এবং পরেরটি 'দীনি' বা ধর্মীয় শাখা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে এ দু'টি শাখা একীভূত করে 'খেলাফত' ব্যবস্থার রূপ দেওয়া হয়।

ফরায়েজী খেলাফত পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সকল ফরায়েজীকে দুদু মিয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের (খলিফা) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা। খলিফাদের এই পরম্পরায় সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন 'ওস্তাদ' দুদু মিয়া। তিনি তিন পদমর্যাদার খলিফা নিয়োগ করেন: উপরস্থ খলিফা, তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ও গাঁও খলিফা। দুদু মিয়া ফরায়েজী বসতি এলাকাকে ৩০০ থেকে ৫০০ পরিবারের এক একটি ছোট এককে বিভক্ত করেন এবং প্রতি এককে একজন গাঁও বা ওয়ার্ড খলিফা নিযুক্ত করেন। অনুরূপ দশ বা ততোধিক একক নিয়ে একটি সার্কেল বা গির্দ গঠিত হতো। প্রতিটি সার্কেল বা গির্দে একজন করে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা নিয়োজিত হতেন। তত্ত্বাবধায়ক খলিফাকে একজন পিয়ন ও একজন পেয়াদা বা পাহারাদার দেওয়া হতো। এই পিয়ন ও পেয়াদারা একদিকে তত্ত্বাবধায়ক খলিফার সঙ্গে গাঁও খলিফাদের এবং অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক খলিফা ও ওস্তাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতো। 'উপরস্থ খলিফা'গণ ছিলেন ওস্তাদের উপদেষ্টা এবং তারা ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কার্যালয় বাহাদুরপুরে ওস্তাদের সঙ্গে অবস্থান করতেন।

গাঁও খলিফা একজন সমাজপতির ভূমিকা পালন করতেন যার দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তার, ধর্মীয় কর্তব্য পালনে লোককে উদ্বুদ্ধ করা, খানকাহ ও মসজিদ সংরক্ষণ, নৈতিকতা পর্যবেক্ষণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিচারকার্য সম্পন্ন করা। কুরআন শিক্ষা এবং ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে

www.pathagar.com

একটি মক্তব পরিচালনাও তার দায়িত্ব ছিল। তত্ত্বাবধায়ক খলিফার প্রধান দায়িত্ব ছিল গাঁও খলিফাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা, তার অধীনস্থ গির্দের ফরায়েজীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা, ধর্মের মৌলনীতি প্রচার এবং সর্বোপরি গাঁও খলিফাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো আপিল মামলার নিষ্পত্তি করা। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি তার গির্দের খলিফাদের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদে বসে আপিল মামলার শুনানি গ্রহণ করতেন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সকল বিষয়ে দুদু মিয়ার সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত এবং ওস্তাদ হিসেবে তিনি চূড়ান্ত আপিল আদালত হিসেবে কাজ করতেন।[১৩৪], [১৩৫]

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর তার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র যথাক্রমে গিয়াসউদ্দীন হায়দার ও নয়া মিয়া ফারায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার তৃতীয় পুত্র আলাদীন আহমদ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনে নওয়াব সলিমুল্লাহর সাথে সহযোগিতা করেন। আলাদীনের পর তার পুত্র বাদশাহ মিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯২২ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এ সময়ে সরকার তাকে গ্রেফতার করে। তারপর ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। যে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন নিয়ে এ আন্দোলনের শুরু হয়েছিল তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে অন্য ধারায় প্রবাহিত হয়।

বাংলার প্রথম প্রতিরোধ জিহাদের সূচনা হয় যেভাবে

মাওলানা সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ১৮২১ সালে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, মিশর, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর সাথে সাক্ষাত এবং মুসলিম দুনিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে তিনি সাইয়েদ আহমদ শহীদের একজন খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় জিহাদ আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনের সামসময়িককালে পরিচালিত তিতুমীরের আন্দোলনের সামাজিক পটভূমি ছিল অভিন্ন।

---

১৩৪. ফরায়েজী আন্দোলন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/36L1VnU / অ্যাকসেস ইন ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২১

১৩৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ২০৩-২০৬

www.pathagar.com

মারাঠা-বর্গীদের দ্বারা লুণ্ঠিত, পশ্চিম বাংলায় হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের দ্বারা নিষ্পেষিত জনগণ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়েছিল। মুসলমানদের ওপর চেপে বসেছে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য। তহবন্দ-এর পরিবর্তে ধুতি, সালামের পরিবর্তে আদাব-নমস্কার, নামের আগে শ্রী ব্যবহার, মুসলমানী নাম রাখতে জমিদারের পূর্বনুমতি ও খারিজানা, হিন্দুদের পূজার জন্য পাঁঠা যোগানো ও চাঁদা দেওয়া, দাড়ির ওপর ট্যাক্স, মসজিদ তৈরি করলে নজরানা, গরু জবাই করলে ডান হাত কেটে নেওয়া প্রভৃতি জুলুম ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। এই পটভূমেই জিহাদ আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত মওলানা তিতুমীর কাজ শুরু করেন।[১৩৬]

বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করে তিনি জনগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। ধর্মীয় আদেশ পূর্ণরূপে অনুসরণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রেরণায় তিনি সকলকে উজ্জীবিত করেন। বিরান হয়ে যাওয়া মসজিদ সমূহ তিনি সংস্কারের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রচলন করেন। তিনি পূজার চাঁদা দান বা তাতে অংশগ্রহণের মতো কাজ বন্ধ করেন। তিতুমীরের আন্দোলনের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানগণ এবং বহু অমুসলমান কৃষক দ্রুত জোটবদ্ধ হলেন। তিতুমীরের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক বিরাট ইসলামী জামাত। তিতুমীরের সংগ্রাম ছিল জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে। তার স্লোগান ছিল 'লাঙ্গল যার জমি তার'। তার বক্তব্য ছিল 'প্রত্যেকের শ্রমের ফসল তাকে ভোগ করতে দিতে হবে'।

পলাশী যুদ্ধের পঁচিশ বছর পর এবং উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের সমগ্র ভারতব্যাপী আযাদী সংগ্রামের (১৮৫৭) পঁচাত্তর বছর পূর্বে ১৭৮২ সালে সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মীর (সাইয়েদ) হাসান আলী এবং মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন।[১৩৭]

ইংরেজ ইতিহাস লেখকগণ অবজ্ঞাভরে এবং তিতুমীরকে ছোট করে দেখাবার জন্যে তাকে এক অনুল্লেখযোগ্য কৃষক পরিবারের সন্তান বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রখ্যাত সাইয়েদ বংশে জন্মলাভ করেন। প্রাচীনকালে যে সকল ওলী-দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তাদের

---

১৩৬. আমাদের জাতিসত্ত্বা বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১০৪-১০৫
১৩৭. শহীদ তিতুমীর / আবদুল গফুর সিদ্দিকী / পৃ. ১

www.pathagar.com

মধ্যে সাইয়েদ শাহ্ হাসান রাজী ও সাইয়েদ শাহ জালাল রাজীর নাম পুরাতন দলীল দস্তাবেজে পাওয়া যায়। দুই সহোদর ভাই সাইয়েদ আব্বাস আলী ও সাইয়েদ শাহ শাহাদত আলী যথাক্রমে সাইয়েদ শাহ্ জালাল রাজী ও সাইয়েদ শাহ্ হাশমত আলীর ত্রিংশ অধস্তন পুরুষে জন্মগ্রহণ করেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।[১৩৮]

তৎকালীন মুসলিম সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিতুমীরের বয়স যখন চার বছর, তখন তার পিতা উস্তাদ মুন্সী লালমিয়াকে তার গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। আরবী, ফার্সী ও উর্দুভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে মুন্সী লালমিয়াকে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতিও তার পিতা-মাতা উদাসীন ছিলেন না মোটেই। সেজন্যে পার্শ্ববর্তী শেরপুর গ্রামের পণ্ডিত রারকমল ভট্টাচার্যকে বাংলা, ধারাপাত, অংক ইত্যাদি শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। এ সময়ে বিহার শরীফ থেকে হাফেজ নিয়ামতুল্লা নামে জনৈক পারদর্শী শিক্ষাবিদ চাঁদপুর গ্রামে আগমন করলে, গ্রামের অভিভাবকগণ তাকে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং তার কাছেই তিনি কুরআনের হাফেজ হন। উপরন্তু আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র, ফারায়েজ শাস্ত্র, হাদীস ও দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, তাসাউফ, এবং আরবী-ফার্সী কাব্য ও সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। যে যুগে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন, বাংলার কিশোর ও যুবকরা তখন নিয়মিত শরীরচর্চা করতো। চাঁদপুর ও হায়দারপুর গ্রামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা প্রাঙ্গনটি ছিল শরীরচর্চার উত্তম স্থান। হায়দারপুর নিবাসী শেখ মুহাম্মদ হানিফ শরীরচর্চা শিক্ষা দিতেন।

১৮২২ সালে তিতুমীর মক্কায় হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যান এবং সেখানেই সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। এখানেই মীর নিসার আলী তার হাতে জিহাদের শপথ নেন। হজ্জ ও অন্যান্য কাজ শেষে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী তার খলিফা মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসমাইল ও মওলানা ইসহাককে নিম্নরূপ নির্দেশ দেন "তোমরা আপন আপন বাড়ী পৌঁছে দিন পনেরো বিশ্রাম নিবে। তারপর তোমরা বেরেলী পৌঁছুলে তোমাদের নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান সফর করব। পাটনায় কয়েকদিন বিশ্রামের পর কোলকাতা যাব।

---

১৩৮. শহীদ তিতুমীর / আব্দুল গফুর সিদ্দিকী / পৃ. ৩-৪

www.pathagar.com

বাংলাদেশের খলিফাগণের প্রতি তার নির্দেশ ছিল এমন, আমি পাটনায় পৌঁছে মওলানা আদুল বারী খাঁ (মওলানা আকরাম খাঁর পিতা), মওলানা মুহাম্মদ হোসেন, মওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ, মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর), মওলানা সুফী খোদাদাদ সিদ্দিকী ও মওলানা কারামত আলীকে খবর দিবো। আমার কোলকাতা পৌঁছার দিন তারিখ তোমরা তাদের কাছে জানতে পারবে। কোলকাতায় আমাদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তাতে আমাদের চূড়ান্ত কর্মসূচী গৃহীত হবে।[১৩৯]

অতঃপর সকলে মক্কা থেকে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে নির্দিষ্ট সময়ে তারা কোলকাতার শানসুন্নিসা খানমের বাগানবাড়ীতে সমবেত হন। আলোচনার পর স্থিরীকৃত হয় যে পাটনা মুজাহিদগণের কেন্দ্রীয় রাজধানী হবে এবং প্রত্যেক প্রদেশে হবে প্রাদেশিক রাজধানী। প্রাদেশিক রাজধানী থেকে কেন্দ্রে জিহাদ পরিচালনার অর্থ প্রেরণ করা হবে।

এসব সিদ্ধান্তের পর মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী (তিতুমীর) উক্ত বৈঠকে যে ভাষণ দান করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন-

"বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদেরকে খাঁটি মুসলমান না করা পর্যন্ত জেহাদে পাঠানো বিপজ্জনক হবে। আমি তাদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছাবার দায়িত্ব নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আমাদের সংগ্রামে যোগদান করতে পারে।....কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির ওপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নয়। আমরা যদি মুসলমানদেরকে পাকা মুসলমান বানিয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি তাহলে ...কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হবে না।"

পরামর্শ সভায় অতঃপর স্থির হলো, বাংলা কেন্দ্রকে অপর সকল বিষয়ে গোপনে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করবে না। তবে যারা কেন্দ্রের সাথে যোগদান করার ইচ্ছা করবে, তাদেরকে বাধা দেয়া হবে না।[১৪০]

তিতুমীর কোলকাতায় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর পরামর্শ সভা সমাপ্তের পর

---

১৩৯. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ২১২

১৪০. শহীদ তিতুমীর / আব্দুল গফুর সিদ্দিকী / পৃ. ২২-৩৭

www.pathagar.com

নিজ গ্রাম চাঁদপুরে ফিরে এসে কিছুদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। তিতুমীরের দাওয়াতের মূলকথা ছিল ইসলামে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং প্রত্যেকটি কাজে কর্মে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ পালন। হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার উৎপীড়নকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। তাই বলেন যে, কৃষক সম্প্রদায়ের হিন্দুদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সারফরাজপুর নামক গ্রামবাসীর অনুরোধে তিনি তথাকার শাহী আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচারের জন্যে তার একটি খানকাহ্ স্থাপন করেন। এখানে জুমাআ'র নামাজের পর তিনি সমবেত হিন্দু-মুসলমানকে আহ্বান করে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি বলেন, "ইসলাম শান্তির ধর্ম। যারা মুসলমান নয় তাদের সাথে শুধু ধর্মের দিক দিয়ে পৃথক বলে, বিবাদ বিসম্বাদ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কিছুতেই পছন্দ করেন না। তবে ইসলাম এ কথা বলে যে, যদি কোনো প্রবল শক্তিশালী অমুসলমান কোনো দুর্বল মুসলমানের ওপর অন্যায় উৎপীড়ন করে, তাহলে মুসলমানরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন, মুসলমানদেরকে কথাবার্তায়, আচার-আচরণে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। তারা যদি অমুসলমানের আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কাজকর্ম পছন্দ করে তাহলে শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ তাদেরকে অমুসলমানদের সাথে স্থান দিবেন। তিতুমীর বলেন, ইসলামী আদর্শেই রয়েছে আমাদের ইহকাল পরকালের মুক্তি। এর প্রতি কেউ উপেক্ষা প্রদর্শন করলে আল্লাহ্ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা মুসলমানদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। যারা অমুসলমানদের আদর্শে এসব পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন।"

সরফরাজপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পুনঃসংস্কার, আবার জামায়াতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা, নামাজান্তে সমবেত লোকদের সামনে তিতুমীরের জ্বালাময়ী ভাষণ –পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল করে তুলেছে। তিতুমীরের গতিবিধি ও প্রচার-প্রচারণার সংবাদ সংগ্রহের ভার জমিদারের অনুগত ও বিশ্বস্ত মুসলমান পাইক মতির ওপর অর্পিত হলো। জমিদার মতিকে বললো, তিতু ওহাবী ধর্মাবলম্বী। ওহাবীরা তোমাদের হযরত মুহাম্মদের

www.pathagar.com

ধর্মমতের পরম শত্রু। কিন্তু তারা এমন চালাক যে, কথার মধ্যে তাদেরকে ওহাবী বলে ধরা যাবে না। সুতরাং আমার মুসলমান প্রজাদেরকে বিপথগামী হতে দিতে পারি না। আজ থেকে তিতুর গতিবিধির দিকে নজর রাখবে এবং সব কথা আমাকে জানাবে। মুসলিমদের মধ্যে মাযহাবগত পার্থক্যের সুযোগ এখনো মুশরিকরা নিচ্ছে তখনও নিয়েছিল।

অতঃপর কৃষ্ণদেব রায়, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিতুমীরের বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের নালিশ করার জন্যে কিছু প্রজাকে প্রস্তুত করলো। তারপর জমিদারের আদেশে মতিউল্লাহ, তার চাচা গোপাল, জ্ঞাতিভাই নেপাল ও গোবর্ধনকে দিয়ে জমিদারের কাচারীতে উপস্থিত হয়ে নালিশ পেশ করলো। তার সারমর্ম নিম্নরূপ-

চাঁদপুর নিবাসী তিতুমীর তার ওহাবী ধর্ম প্রচারের জন্যে আমাদের সরফরাজপুর গ্রামে এসে আখড়া গেড়েছে এবং আমাদেরকে ওহাবী ধর্মমতে দীক্ষিত করার জন্যে নানারূপ জুলুম জবরস্তি করছে। আমরা বংশানুক্রমে যেভাবে বাপদাদার ধর্ম পালন করে আসছি, তিতুমীর তাতে বাধা দান করছে। তিতুমীর ও তার দলের লোকেরা যাতে সরফরাজপুরের জনগণের ওপর কোনো প্রকার অত্যাচার করে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে না পারে, জোর করে আমাদের দাড়ি রাখতে, গোঁফ ছাঁটতে, গোহত্যা করতে, আরব দেশের নাম রাখতে বাধ্য করতে না পারে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাতে না পারে, হুজুরের দরবারে তার বিহিত ব্যবস্থার জন্যে আমাদের নালিশ। হুজুর আমাদের মনিব।

গোপাল, নেপাল, গোবর্ধনের টিপসইযুক্ত উক্ত দরখাস্ত পাওয়ার পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায় হুকুম জারী করলো।

১। যারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওহাবী হবে, দাড়ি রাখবে, গোঁফ ছাঁটবে তাদেরকে দাড়ির জন্যে আড়াই টাকা ও গোঁফ ছাঁটার জন্যে পাঁচ সিকা করে খাজনা দিতে হবে।

২। মসজিদ তৈরি করলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্যে পাঁচশ টাকা এবং প্রতি পাকা মসজিদের জন্যে এক হাজার টাকা করে জমিদার সরকারে নজরানা দিতে হবে।

www.pathagar.com

৩। বাপদাদা সন্তানদের যে নাম রাখবে তা পরিবর্তন করে ওহাবী মতে আরবী নাম রাখলে প্রত্যেক নামের জন্যে খারিজানা ফিস পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হবে।

৪। গোহত্যা করলে তার ডান হাত কেটে দেওয়া হবে –যাতে আর কোনোদিন গোহত্যা করতে না পারে।

৫। যে ওহাবী তিতুমীরকে বাড়ীতে স্থান দিবে তাকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হবে।[১৪১], [১৪২]

তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়কে একটি পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, তিনি কোনো অন্যায় কাজ করেননি, মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ করছেন। এ কাজে হস্তক্ষেপ করা কোনোক্রমেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছাঁটা প্রভৃতি মুসলমানের জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ। এ কাজে বাধা দান করা অপর ধর্মে হস্তক্ষেপেরই শামিল। তিতুমীরের জনৈক পত্রবাহক কৃষ্ণদেব রায়ের হাতে পত্রখানা দেওয়ার পর তার প্রতিক্রিয়া ছিল এ রকম...

পত্রখানা কে দিয়েছে জিজ্ঞেস করলে পত্রবাহক চাঁদপুরের মাওলানা সাইয়েদ তিতুমীর সাহেবের নাম বলেন। তিতুমীরের নাম শুনতেই জমিদার ক্ষেপে যান। রাগান্বিত হয়ে বললেন, কে সেই ওহাবী তিতু? আর তুই ব্যাটা কে? উপস্থিত মুচিরাম ভান্ডারী বললো, ওর নাম আমন মন্ডল। বাপের নাম কামন মন্ডল। ও হুজুরের প্রজা। আগে দাড়ি কামাতো, আর এখন দাড়ি রেখেছে বলে হুজুর চিনতে পারছেন না।

পত্রবাহক বললো, হুজুর আমার নাম আমিনুল্লাহ, বাপের নাম কামালউদ্দীন লোকে আমাদেরকে আমন-কামন বলে ডাকে। আর দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের আদেশ। তাই পালন করেছি।

কৃষ্ণদেব রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো, ব্যাটা দাড়ির খাজনা দিয়েছিস, নাম বদলের খাজনা দিয়েছিস? আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা। ব্যাটা

---

১৪১. শহীদ তিতুমীর / আব্দুল গফুর সিদ্দিকী / পৃ. ৪৮-৪৯

১৪২. স্বাধীনতা সংগ্রাসের ইতিহাস / আবু জাফর পৃ. ১১৯

www.pathagar.com

আমার সাথে তর্ক করিস এত বড়ো তোর স্পর্ধা? এই বলে মুচিরামের ওপর আদেশ হলো তাকে গারদে বন্ধ করে উচিত শাস্তির। বলা বাহুল্য, অমানুষিক অত্যাচার ও প্রহারের ফলে তিতুমীরের ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলো আমিনুল্লাহ। সংবাদটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

মুসলমানরা মর্মাহত হলো, কিন্তু সামর্থ্য ও সাক্ষী প্রমাণের অভাবে শক্তিশালী জমিদারের বিরুদ্ধে কিছুই করতে না পেরে তারা নীরবে ধৈর্য ধরেছেন। তবে শহীদ আমিনুল্লাহর শাহদাত তিতুমীরের দাওয়াতী প্রচেষ্টাকে খুব দ্রুতই সর্বাত্মক জিহাদে রূপান্তরিত করে। এভাবেই বাংলায় প্রথম প্রতিরোধ জিহাদের পটভূমি রচিত হয়।

মুশরিকদের বিরুদ্ধে মওলানা তিতুমীরের জিহাদ

শহীদ মওলানা তিতুমীরের পত্রবাহক আমিনুল্লাহর শাহদাতের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক জিহাদের প্রস্তুতি শুরু হয়। অথচ মওলানা তিতুমীর চেয়েছিলেন এই জিহাদ আরো কিছু সময় পরে শুরু করতে। কারণ বাংলার মুসলিমরা দীর্ঘদিনের নাসারা ও মুশরিকদের আগ্রাসনের কবলে পড়ে দূর্বল ঈমানদার হয়ে পড়েছিল। অনেক শিরক ও বিদআত তাদের কর্ম, চিন্তা ও আচরণে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। তাই মওলানা তিতুমীর চেয়েছিলেন আগে মুসলিমদের আকিদা ঠিক করতে। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনে তিনি জিহাদে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন।

কোলকাতায় জমিদারদের ষড়যন্ত্র সভা

তিতুমীর ও তার অনুসারীদের দমন করার উদ্দেশ্যে কোলকাতায় লাট বাবুর বাড়িতে এক সভায় হাজির হলেন, লাটু বাবু (কোলকাতা), গোবরডাঙার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যয়, গোবরা-গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায়, নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার, টাকীর জমিদারের সদর নায়েব, রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়, বশীরহাট থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তী, যদুর আটির দুর্গাচরণ চক্রবর্তী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।

সভায় সবাই একমত হলো যে, যেহেতু তিতুমীরকে দমন করতে না পারলে

www.pathagar.com

হিন্দুজাতির পতন অনিবার্য, সেজন্যে যে কোনো প্রকারেই হোক তাকে শায়েস্তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সকল জমিদারগণ সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। ইংরেজ নীলকরদেরও সাহায্য গ্রহণ করা হবে বলে স্থির হলো। তাদেরকে বুঝানো হবে যে, তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম শুরু করেছেন। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এ কথা প্রচার করতে হবে যে তিতু গো-মাংস গুঁজে দিয়ে জাতি নাশ করছেন। বশীরহাটের দারোগা চক্রবর্তীকে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করার অনুরোধ জানানো হলো। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যয় দারোগাকে বললেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আমরাও ব্রাহ্মণ। তাছাড়া আপনি আমাদের আত্মীয়। আমাদের এ বিপদে আপনাকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে হবে। দারোগা বললো, আমি আমার প্রাণ দিয়ে হলেও সাহায্য করবো এবং তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করবো।

কোলকাতার ষড়যন্ত্র সভার পর সরফরাজপুরের লোকদের নিকট থেকে দাড়ি-গোঁফের খাজনা এবং আরবী নামকরণের খারিজানা ফিস আদায়ের জন্যে কৃষ্ণদেব রায় লোক পাঠালো। কিন্তু তারা খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জমিদারের কর্মচারী ফিরে এসে জমিদারকে এ বিষয়ে অবহিত করে। অতঃপর তিতুমীরকে ধরে আনার জন্যে বারোজন সশস্ত্র বরকন্দাজ পাঠানো হয়। কিন্তু তারা ধরে আনতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাওলানা তিতুমীরের অনুসারীদের দ্বারা তাড়া খেয়েছে।

অতঃপর কৃষ্ণদেব নিম্নের ব্যক্তিগণকে পরামর্শের জন্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে :

১। অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যয়কে গোবর ডাঙ্গায়

২। খড়েশ্বর মুখোপাধ্যয়কে গোবরা-গোবিন্দ পুরে

৩। লাল বিহারী চট্টোপাধ্যয়কে শেরপুর নীলকুঠির মিঃ বেজামিনের কাছে

৪। বনমালী মুখোপাধ্যয়কে হুগলী নীলকুঠিতে

৫। লোকনাথ চক্রবর্তীকে বশীরহাট থানায়

উল্লেখযোগ্য যে, লোকনাথ চক্রবর্তী বশীরহাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর ভগ্নিপতি।

অতঃপর বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষ্ণদেবের সাহায্যার্থে সহস্রাধিক লাঠিয়াল, সড়কীওয়ালা ও ঢাল-তলোয়ারধারী বীর যোদ্ধা কৃষ্ণদেবের বাড়ি পুঁড়ায় পৌঁছে

www.pathagar.com

গেলো। পরদিন শুক্রবার সরফরাজপুরে তিতুমীর ও তার লোকজনদেরকে আক্রমণ করার আদেশ হলো। শুক্রবার সর্বাগ্রে ঘোড়ায় করে কৃষ্ণদেব রায় এবং তার পিছনে সশস্ত্র বাহিনী যখন সরফরাজপুর পৌঁছে, তখন জুমাআ'র খুৎবা শেষে মুসল্লীগণ নামাজে দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণদেবের সৈন্যরা বিভিন্ন মুসলিম বিরোধী ধ্বনি সহকারে মসজিদ ঘিরে ফেলে আগুন লাগিয়ে দিলো। অল্প বিস্তর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তিতুমীর এবং মুসল্লীগণ মসজিদের বাইরে এলে তাদেরকে আক্রমণ করা হলো। দু'জন বল্লমবিদ্ধ হয়ে শহীদ হলো এবং বহু আহত হলো।

অতঃপর মুসলমানগণ কলিঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে কৃষ্ণদেব রায় ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে খুন-জখম মারপিট প্রভৃতির মামলা দায়ের করলো। পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ইজাহার গ্রহণ করলো বটে। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হয়েই লাশ দাফন করার নির্দেশ দিলো। J.R. Colvin-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জমিদারের কর্মচারীগণ সরফরাজপুরে দাড়ি-গোঁফ ইত্যাদির খাজনা আদায় করতে গেলে তাদেরকে মারপিট করা হয় এবং একজনকে আটক করা হয়। তারপর কৃষ্ণদেব রায় সশস্ত্র বাহিনীসহ তাদেরকে আক্রমণ করে এবং মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়।[১৪৩]

এই ঘটনার আঠারো দিন পর কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীর ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে এই বলে মামলা দায়ের করে যে, তারা তার লোকজনকে মারপিট করেছে এবং তাকে ফাঁসাবার জন্যে তারা নিজেরাই মসজিদ জ্বালিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণদেব রায় তার ইজাহারে আরও অভিযোগ করে যে, 'নীলচাষদ্রোহী, জমিদারদ্রোহী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীদ্রোহী তিতুমীর নামক ভীষণ প্রকৃতির এক ওহাবী মুসলমান এবং তার সহস্রাধিক শিষ্য পুঁড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের দু'জন বরকন্দাজ ও একজন গোমস্তাকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে কয়েদ করিয়া গুম করিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহাদের পাইতেছিনা। আমাদের উক্ত পাইক ও গোমস্তা সরফরাজপুর মহলের প্রজাদের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য মহলে গিয়াছিল। খাজনার টাকা লেনদেন ও ওয়াশীল সম্বন্ধে প্রজাদের সহিত বচসা হওয়ায় তিতুমীরের হুকুম মতে তাহার দলের লোকেরা আমাদের গোমস্তা পাইকদিগকে জবরদস্তি করিয়া কোথায় কয়েদ করিয়াছে তাহা জানা যাইতেছে

---

১৪৩. British Policy and the Muslims in Bengal / Dr. A R Mallick / Colvin's Report-para 9 / P. 79)।

www.pathagar.com

না। তিতুমীর দম্ভভরে প্রচার করিতেছে যে, সে এদেশের রাজা। সুতরাং খাজনা আর জমিদারকে দিতে হইবে না'।[১৪৪]

মামলার প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে কলিঙ্গা ফাঁড়ির জমাদার। তার রিপোর্টে বলা হয় যে, উভয় পক্ষের অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গীন। সে আরও বলে, আমি মুসলমানদের অভিযোগের বহু আলামত দেখেছি। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নায়েব তিতুমীর ও তার দলের বিরুদ্ধে যে মোকাদ্দমা দায়ের করেছে সে সম্পর্কে তদন্ত করে জানা গেলো যে, যেসব কর্মচারীর অপহরণের অভিযোগ করা হয়েছে তারা সকলেই নায়েবের সঙ্গেই আছে। নায়েবের জবাব এই যে, সে মফঃস্বলে যাওয়ার পর তিতুমীরের লোকেরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। আমার মতে এ জটিল মামলা দু'টির তদন্ত ও ফাইনাল রিপোর্টের ভার বশীরহাটের অভিজ্ঞ দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর ওপর অর্পণ করা হোক। ওদিকে বারসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণদেব রায়কে কোর্টে তলব করে জামিন দেন এবং রামরাম চক্রবর্তীকে তদন্ত করে চূড়ান্ত রিপোর্টটি দেওয়ার আদেশ দেন।

রামরাম চক্রবর্তী তদন্তের নাম করে সরফরাজপুর আগমন করে তিতুমীর ও গ্রামবাসীকে অকথ্যভাষায় গালাগালি ও মারপিট করে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীতে কয়েকদিন জামাই আদরে কাটিয়ে যে রিপোর্ট দেয় তা নিম্নরূপ:-[১৪৫]

১। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তা ও পাইকারদেরকে তিতু ও তার লোকেরা বেআইনীভাবে কয়েদ করে রেখেছিল। পরে তারা কৌশলে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশের আগমনের পর তারা আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং এ মামলা অচল ও বরখাস্তের যোগ্য।

২। তিতুমীর ও তার লাঠিয়ালেরা জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ও তার পাইক বরকন্দাজদের বিরুদ্ধে খুন-জখম, লুট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

৩। তিতু ও তার লোকেরা নিজেরাই নামাজঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব এ মামলা চলতে পারে না।

---

১৪৪. শহীদ তিতুমীর / আবদুল গফুর সিদ্দিকী / পৃ. ৬০

১৪৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ২২৪

www.pathagar.com

ব্রিটিশদের আইন অনুসারেই অবৈধ খাজনা আদায়ের বিষয়টি হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি যা ছিল সংঘর্ষের মূল কারণ। তার ফলে জমিদার শুধু মামলায় জয়লাভই করেনি, বরঞ্চ তার অবৈধ খাজনা আদায়ের কাজকে বৈধ করে দেওয়া হলো। বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যে রায় দিলেন তার মধ্যে একদিকে জমিদারদের অবৈধ ও উৎপীড়নমূলক খাজনা বন্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না, অপরদিকে প্রতিপক্ষের উত্তেজনাকর মনোভাব লাঘব করারও কিছু ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেটের এ অবিচারমূলক রায়ের ফলে জমিদার প্রতারণামূলক ও উৎপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহসী হলো। ১৭৯৯ সালের ৭ নং রেগুলেশন অনুযায়ী বকেয়া খাজনার নাম করে প্রজাদেরকে ধরে এতে আটক করার ক্ষমতা লাভ করলো। এমনকি যারা জমিদারের প্রজা নয় অথচ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তাদেরকে মিছেমিছি ৩৮ টাকা বকেয়া দেখিয়ে ধরে এনে আটক করা হলো এবং তাদেরকে নানাভাবে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হলো। অতঃপর বকেয়ার একাংশ আদায় করে বাকী অংশ দেবার প্রতিশ্রুতিতে তাদের কাছে মুচলেকা লিখে নেওয়া হলো যাতে করে কোর্টের আশ্রয় নিতে না পারে।

সরফরাজপুর গ্রামের মসজিদ ধ্বংস হলো, বহু লোক হতাহত হলো, হাবিবুল্লাহ, হাফিজুল্লাহ, গোলাম নবী, রমজান আলী ও রহমান বখশের বাড়িঘর ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হলো, বহু ধনসম্পদ ভস্মিভূত ও লুণ্ঠিত হলো। কিন্তু ইংরেজ সরকার তার কোনোই প্রতিকার করলো না। সরফরাজপুর গ্রামবাসীর এবং বিশেষ করে মওলানা তিতুমীরের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল বলে সকলের পরামর্শে তিনি উপরোক্ত পাঁচজন গৃহহারাসহ সরফরাজপুর থেকে ১৭অক্টোবরে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানান্তরিত হলেন। সেখান থেকেই মওলানা তিতুমীর তার প্রতিরোধ জিহাদের ঘোষণা দেন। ২৯অক্টোবর ১৮৩১ সালে কৃষ্ণদেব রায় সহস্রাধিক লাঠিয়াল ও বিভিন্ন অস্ত্রধারী গুন্ডাবাহিনীসহ নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করে বহু নর-নারীকে মারপিট ও জখম করে। ৩০অক্টোবর পুলিশ ফাঁড়িতে ইজাহার হলো। কিন্তু কোনোই ফল হলো না। কোনো প্রকার তদন্তের জন্যেও পুলিশ এলো না।

জমিদার বাহিনীর আক্রমণে মুসলমানগণ দিশেহারা হয়ে পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। ৬নভেম্বর পুনরায় কৃষ্ণদেব

www.pathagar.com

রায় তার বাহিনীসহ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হয়। এরপর কৃষ্ণদেব রায় চারদিকে হিন্দু সমাজে প্রচার করে দেয় যে, মুসলমানরা অকারণে হিন্দুদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছে। তার এ ধরনের প্রচারণায় হিন্দুদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মোল্লাআঁটি নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিসকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। ডেভিস প্রায় চার'শ হাবশী যোদ্ধা ও বিভিন্ন মারণাস্ত্রসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। এবারও উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। ডেভিস পলায়ন করে। মুসলমানরা তার বজরা ধ্বংস করে দেয়। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এক বিরাট বাহিনীসহ নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। প্রচন্ড যুদ্ধে দেবনাথ রায় বল্লমের আঘাতে নিহত হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পর চতুনার জমিদার মনোহর রায় পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নিকট যে পত্র লিখেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেন, নীলচাষের মোহ আপনাদেরকে পেয়ে বসেছে। তার ফলেই আজ আমরা দেবনাথ রায়ের ন্যায় একজন বীর পুরুষকে হারালাম। এখনো সময় আছে। আর বাড়াবাড়ি না করে তিতুমীরকে তার কাজ করতে দিন আর আপনারা আপনাদের কাজ করুন। তিতুমীর তার ধর্ম প্রচার করছে, তাতে আপনারা জোট পাকিয়ে বাধা দিচ্ছেন কেন? নীলচাষের মোহে আপনারা ইংরেজ নীলকরদের সাথে এবং পাদ্রীদের সাথে একতাবদ্ধ হয়ে দেশবাসী ও কৃষক সম্প্রদায়ের যে সর্বনাশ করছেন তা তারা ভুলবে কি করে? আপনারা যদি এভাবে দেশবাসীর ওপর গায়ে পড়ে অত্যাচার চালাতে থাকেন তাহলে বাধ্য হয়ে আমি তিতুমীরের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবো। আমি পুনরায় বলছি নীলচাষের জন্যে আপনারা দেশবাসীর অভিসম্পাত কুড়াবেন না।-শ্রী মনোহর রায় ভূষণ[১৪৬]

১৮৩১ সালের ১৪নভেম্বর মিঃ আলেকজান্ডার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং পঞ্চাশজন বন্দুক ও তরবারিধারী সিপাহী নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ার তিনক্রোশ দূরে বাদুড়িয়া পৌঁছেন। বশিরহাটের দারোগা সিপাই-জমাদারসহ বাদুড়িয়ায় আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হয়। উভয়ের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল একশ' বিশজন। অতঃপর যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় তাতে উভয়পক্ষের লোক হতাহত

---

১৪৬. শহীদ তিতুমীর / আবদুল গফুর সিদ্দিকী / পৃ. ৭৯

www.pathagar.com

হয়, গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে মুসলমানদের বীরত্ব দেখে আলেকজান্ডার বিস্মিত হন এবং দারোগা ও একজন জমাদার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বেগতিক দেখে আলেকজান্ডার প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করে। বন্দুক নিয়েও সে যাত্রায় জিততে পারেনি ব্রিটিশ এই ম্যাজিস্ট্রেট। উভয় পক্ষের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হলেও শেষতক জান নিয়ে পালিয়ে যান আলেকজান্ডার। তিতুমীরের হাতে বন্দী হয় এক দারোগা ও জমাদার। পালিয়ে যাওয়ার সময় নদীতে ডুবে মৃত্যু হয় জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজান্ডার বারাসাত প্রত্যাবর্তন করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটে তিতুমীরকে শায়েস্তা করার আবেদন জানিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার কর্ণেল স্টুয়ার্টকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে তার অধীনে একশত ঘোড়-সওয়ার সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয় সৈন্য, দু'টি কামানসহ নারিকেলবাড়িয়ার অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। ১৯নভেম্বর রাত্রে কোম্পানী সৈন্য নারিকেলবাড়িয়া পৌঁছে গ্রাম অবরোধ করে রাখলো।

শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মওলানা তিতুমীর ও তার লোকেরা মজবুত বাঁশের খুঁটি দিয়ে নারিকেলবাড়িয়া ঘিরে ফেলেছিলেন যা ইতিহাসে "তিতুমীরের বাঁশেরকেল্লা" বলে অভিহিত আছে। বিশাল ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিতুমীর শাহাদত বরণ করেন। তার মৃতদেহকে ইংরেজ সৈন্যরা অমানবিকভাবে পুড়িয়ে দিয়েছিল। তিতুমীর ও তার শিষ্যদের বাড়ি-ঘর লুণ্ঠন করে সেদিন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সেনাপতি গোলাম মাসুমকে সরকার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। তাছাড়া ১১ জনের যাবজ্জীবন এবং ১২৮ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ঐতিহাসিক হান্টারের মতে, 'তিতুমীর তার অধিকৃত এলাকায় স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার প্রজা আন্দোলন একটি গণবিপ্লব ছিল। কৃষক ও তাঁতীরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। অত্যাচার, অবিচার ও অপমানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিতুমীরের নেতৃত্বে প্রজাগণ লড়াই করে আত্মসম্মান ও ন্যায় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল।[১৪৭]

---

১৪৭. তিতুমীর / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/36KHPaU / অ্যাকসেস ইন ৫ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়ায় তিতুমীর শহীদ হয়েছেন। তবে মওলানা সাইয়েদ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, গোলাম মাসুম ও তাদের দলীয় লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত না হয়ে অথবা প্রতিপক্ষের কাছে আনুগত্যের মস্তক অবনত না করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধীরস্থির যেভাবে শত্রুর মোকাবিলা করে শাহাদাতের অমৃত পান করেছেন তা একদিকে যেমন ইতিহাসের অক্ষয় কীর্তিরূপে চির বিরাজমান থাকবে, অপরদিকে অসত্য ও অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রামের প্রেরণা ও চেতনা জাগ্রত রাখবে ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠীর জন্যে। ইতিহাস স্বীকার করতে বাধ্য যে, ভারত থেকে ইংরেজদের তাড়ানো এবং উপমহাদেশে মুসলিমদের স্বাধীন ভূমি তিতুমীরদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। তিতুমীরেরা বাংলা ও ইসলামের জন্য এবং সর্বস্তরের মানুষের আত্মসম্মান-আত্মমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে যুগে যুগে লড়াই করেছেন, রক্ত এবং প্রাণ দিয়েছেন।

সাতান্ন সালের খালক-ই-খুদা, মুলক-ই-বাদশাহ, হুকুম-ই-সিপাহী

মোঘল সম্রাট বাবরের বিশতম বংশধর ও শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ ১৮৩৭ সালে ক্ষমতায় আরোহন করেন। এই ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ছিল না। তিনি ছিলেন মূলত ইংরেজদের অনুদানপ্রাপ্ত। তিনি প্রকৃত শাসক ছিলেন না। তিনি কোম্পানী থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ভাতা গ্রহণ করতেন। ইংরেজদের সাথে ভাতা ও উত্তরাধিকার নিয়ে তার মনোমালিন্য ছিল। এর মধ্যেই শুরু হয় সর্বাত্মক স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল নেতা হিসেবে ধারণা করা হয় সম্রাট বাহাদুর শাহকে। যদিও তিনি আসলে কতটুকু নেতৃত্ব দিয়েছেন তা প্রশ্নবিদ্ধ।

বাহাদুর শাহ সম্রাট হিসেবে আরোহণের ২০ বছর পর সূত্রপাত হয় ঐতিহাসিক স্বাধীনতা বিদ্রোহের। এটি পলাশীর যুদ্ধের ১০০ বছর পরের ঘটনা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছে। দেশবাসীর সাথে সাথে ইংরেজদের অধীনে থাকা এ দেশীয় সৈন্যদের ওপরও চলছে জুলুম, বঞ্চনা ও নির্যাতন। একের পর এক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ অধিকারে নিয়ে যাওয়া, লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, কারাগারে হিন্দু-মুসলমান সিপাহিদের জন্য একই খাবারের ব্যবস্থা, ঘিয়ের মধ্যে চর্বি ও আটার মধ্যে হাড়গুঁড়োর সংমিশ্রণ, গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ বিতরণ ইত্যাদি ভারতবর্ষের জনমনে এবং সৈনিকদের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

www.pathagar.com

ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে ধূমায়িত বিক্ষোভ ও অস্থিরতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের ২২জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের দমদম সেনাছাউনিতে। সিপাহীরা ইংরেজ অফিসারকে জানায়, এনফিল্ড রাইফেলের জন্য যে কার্তুজ তৈরি হয়, তাতে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো থাকে এবং এতে তাদের ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ সিপাহীদের বুঝিয়ে শান্ত করে। কিন্তু খবরটি একে একে বিভিন্ন সেনাছাউনিতে পৌঁছে যায় এবং তা সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর সেনাছাউনিতে ২৫-২৬ফেব্রুয়ারী। ১৯ নম্বর পদাতিক বাহিনীর সিপাহীরা কার্তুজ নিতে অস্বীকার করে, রাতে অস্ত্রাগারের দরজা ভেঙে পুরোনো মাসকেট বন্দুক ও কার্তুজ সংগ্রহ করে। তারা এনফিল্ড রাইফেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সিপাহীদের নিরস্ত্র ও বরখাস্ত করা হয়। এই সংবাদও দ্রুত পৌঁছে যায় বিভিন্ন সেনানিবাসে। ২৯মার্চ রোববার ব্যারাকপুরের দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। মঙ্গল পান্ডে নামের সিপাহী গুলি চালিয়ে ইংরেজ সার্জেন্টকে হত্যা করে।[১৪৮]

প্রহসনমূলক বিচারে মঙ্গল পান্ডে তাকে সহায়তার অভিযোগে জমাদার ঈশ্বরী পান্ডেকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ৮এপ্রিল সকাল ১০টায় তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়। এর পরিণতিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতের উত্তর থেকে মধ্যপ্রদেশ এবং জলপাইগুড়ি থেকে পূর্ববাংলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের চট্টগ্রাম পর্যন্ত। ৯মে উত্তর প্রদেশের মিরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লির পথে অগ্রসর হন। ১১মে সিপাহীরা দিল্লি অধিকার করে বহু ইংরেজকে হত্যা ও বিতাড়ন করেন। দেশপ্রেমিক সিপাহীরা এ দিন লালকেল্লায় প্রবেশ করে নামে মাত্র মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সিপাহীরা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নেন। এদিন গভীর রাতে লালকেল্লায় একুশবার তোপধ্বনির মাধ্যমে ৮২ বছরের বৃদ্ধ সম্রাটকে দেওয়ান-ই খানোস এ সম্মান জানানো হয়।

বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহীদের বিপ্লব তথা ভারতবর্ষের প্রথম সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এ সংবাদ কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বিহার, ঝাঁশি, বেরিলি

---

[১৪৮] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ২৯৬

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে পশ্চিম ও পূর্ববাংলার সর্বত্র সিপাহীরা গর্জে ওঠে 'খালক-ই খুদা, মুলক ই বাদশাহ, হুকুম ই সিপাহী।' অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়া, বাদশার রাজ্য, সিপাহীর হুকুম। একের পর এক সেনাছাউনিতে বিদ্রোহ হতে থাকে। ইংরেজরা অতি নির্মমভাবে বিদ্রোহ দমন করে। হাজার হাজার স্বাধীনতাকামীর রক্তে রঞ্জিত হয় ভারতবর্ষের মাটি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষও বিক্ষুব্ধ ছিল। তারাও এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে।[১৪৯]

কিন্তু ভারতীয়দের এই সংগ্রাম সফল হতে পারেনি। ইংরেজরা দিল্লি দখল করে নেয় এবং সম্রাট ২১সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করেন। ইংরেজ সৈন্যরা মীর্জা মোঘল, মীর্জা খিজির সুলতান, মীর্জা আবু বকরসহ ২৯ জন মোঘল শাহজাদাসহ বহু আমির ওমরাহ, সেনাপতি ও সৈন্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সম্রাটকে বিচারের নামে প্রহসনের আদালতে দাঁড় করানো হয়। হাজির করা হয় বানোয়াট সাক্ষী। বিচারকরা রায় দেন, দিল্লির সাবেক সম্রাট ১০মে থেকে ১অক্টোবর পর্যন্ত বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠনের দায়ে অপরাধী। তার শাস্তি চরম অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু তার বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে প্রাণ দণ্ডাদেশ না দিয়ে নির্বাসনে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়। অবশেষে বাহাদুর শাহকে ইয়াঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৫০]

বাংলাদেশে প্রাক্তন ভিক্টোরিয়া পার্ককে "বাহাদুর শাহ" পার্ক নামকরণ করা হয়। বাংলাদেশের প্রধান নৌ-বন্দর সদরঘাটে এই পার্ককে ঘিরে রয়েছে সাতটি রাস্তা। সিপাহী বিদ্রোহের সাথে সংশ্লিষ্ট সৈনিক ও দেশপ্রেমিক জনতার একটি অংশকে এই পার্কের গাছগুলিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান আমলে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শহীদদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয় এবং এই পার্কের নাম পরিবর্তন করে "বাহাদুর শাহ" পার্ক নামকরণ করা হয়। এই কাজটি করে ডিআইটি তথা ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। ডিআইটির বর্তমান নাম রাজউক তথা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।[১৫১]

---

১৪৯. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ২৯৮

১৫০. The Last Mughal / William Dalrymple / P. 343-347

১৫১. বাহদুর শাহ পার্ক / বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন / https://bit.ly/3tzVMlL / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সাতান্ন সালের বিদ্রোহ ও তার আফটারম্যাথ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ আসলে কেমন যুদ্ধ ছিল তা একটু আলোচনা করা যেতে পারে। আগের বিদ্রোহগুলোর সাথে এই বিদ্রোহের একটি বেসিক পার্থক্য আছে। ১৮৫৭ সালের আগে যে বিদ্রোহগুলো হয়েছিল সে তার সবগুলোই হয়েছে তাদের দ্বারা যারা ইংরেজদের বিরোধী ছিল। আর এই বিদ্রোহ হয়েছে ইংরেজদের দালাল দ্বারা। যারা ইংরেজদের সৈনিক ছিল, ইংরেজদের অধীনে চাকরি করতো এবং ইংরেজদের নিরাপত্তায় ছিল। পলাশীর ট্রাজেডির বরাবর ১০০ বছর পর এমন একটি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। প্রচুর সাধারণ মানুষও সিপাহীদের সাথে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে। শুরুতে এদেশের অনেকে ইংরেজদেরকে অন্যান্য বিদেশি শাসকদের মতোই মনে করেছিল। কিন্তু তারা ছিল অত্যাচারী ও জুলুমবাজ। তাই তাদের সৈনিকরাই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

প্রথমত : ইংরেজদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন। উপমহাদেশ দখলের শুরু থেকেই তারা দেশীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করে তার ওপর উপনিবেশিক অর্থনীতি চাপিয়ে দেয়। তারা এদেশের প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করে, কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস এবং দেশের যাবতীয় মূলধন ও সম্পদ হস্তগত করে এদেশের অর্থনীতির ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এবং কুটির শিল্পগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। দেশে বেকার ও দারিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় । প্রজাসাধারণ কৃষির ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কোম্পানীর ভ্রান্ত নীতির ফলে একদিকে যেমন জমিদার ও মহাজন শ্রেণির উদ্ভব হয়, তেমনি অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর কর্মচারী এবং জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ইংরেজদের দালালশ্রেণির আগ্রহের বাড়াবাড়িতে বৃটিশ শাসকবর্গ সামাজিক কুপ্রথা এবং কুসংস্কারের অবসান কল্পে একের পর এক বিধি প্রণয়ন করতে থাকে। সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি, বিধবাবিবাহ প্রচার, স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ নিবারণ প্রভৃতি ব্যবস্থা রক্ষণশীল হিন্দুদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন হয়। এতে

www.pathagar.com

রক্ষনশীল ভারতীয়দের মনে ইংরেজদের উদ্দেশ্যে সন্দেহ জাগে। তাদের ধারণা হয়, সমগ্র ভারতবর্ষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য ইংরেজগণ পরিকল্পিতভাবে তোড়জোড় শুরু করছিল। তদুপরি সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশদের অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা তাদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের জন্ম দেয়। ভারতীয়দের সেই বিরূপ মনোভাব সিপাহী বিদ্রোহে পরোক্ষ ইন্ধন জোগায়। সামাজিক এই সংস্কারের ফলে হিন্দু সমাজ যারা শুরু থেকেই মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করেছিল তারা বেঁকে বসে।

তৃতীয়ত : ইংরেজরা একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো গ্রাস করতে থাকে এবং রাজবংশের উচ্ছেদ করতে থাকে, তাতে দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাদের কর্মচারিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দু'চার জন বাদে ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড ডালহৌসি পর্যন্ত সকলেই সমস্ত প্রকার রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় রাজ্যগুলি অধিকার করেন। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগের ফলে বহু রাজবংশের উচ্ছেদ হয়। মোঘল বাদশাহের অপসারণ মুসলিমদের মনে দারুন আঘাত হানে। পেশোয়ায় নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে ইংরেজগণ মারাঠাদের উত্তেজিত করে তোলেন। ফলে বৃটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত রাজন্যবর্গের সঙ্গে এইসব অসন্তুষ্ট মানুষ হাত মেলালে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে।

চতুর্থত : ভারতের খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ সামগ্রিকভাবে রক্ষনশীল ভারতীয়দের মনে বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের জন্ম দেয়। তাদের মিশনারি কার্যকলাপ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত হানে। মুসলিমগণ যারা দীর্ঘকাল রাজ্যশাসনের দায়িত্বে ছিলেন তারা অপসারিত হওয়ায় ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ও বৃটিশের প্রতি চাপা অসন্তোষ পোষণ করতে থাকেন । তাদের ক্ষমতাচ্যুতি এবং দুরাবস্থার জন্য তারা ইংরেজদের দায়ী করেন। আর মুসলিমরা তো গোড়া থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং একের পর এক বিদ্রোহ করেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তারাও দেখেছিল যে ইংরেজদের দমননীতির ফলে বন্ধ হয়ে যায় মাদরাসাগুলো। ফলে মুসলিমদের মধ্যে শির্ক ও বিদআতের প্রচলন শুরু হয়। এজন্য এদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন জমে উঠেছিল। তারই প্রেক্ষিতে জিহাদী মানসিকতা তৈরি হয় মুসলিমদের মধ্যে।

www.pathagar.com

পঞ্চমত : সেনাবিভাগে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বেতন, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতের সৈন্যদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। সিন্ধু ও আফগানিস্তানে নিযুক্ত সেনাদলকে বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও ভারতীয় সেনাগণ তা থেকে বঞ্চিত হতেন। তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে মর্যাদা না দিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের যত্রতত্র বদলি ও নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। জাত ও ধর্ম হারাবার ভয়ে সিপাহীগণ কালাপানি পার হয়ে ব্রহ্মদেশ বা অন্যত্র যেতে অস্বীকৃত হন। অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে যখন তারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত তখনই লর্ড ক্যানিং -এর প্রবর্তিত সামরিক নিয়োগ বিধি আগুনে ঘি ঢালার ব্যবস্থা করে। এই নিয়মানুসারে ভারতীয় সিপাহীদের যে কোনো কাজ করতেও বাধ্য করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬ সাল) ইংল্যান্ডের জয়লাভ সত্ত্বেও বৃটিশ সামরিক বিভাগের দুর্বলতা ভারতীয় সেনাদের উৎসাহিত করে তোলে। তাদের ধারণা হয়, ভারতে অনুরূপ ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটাতে পারলে সেই অভ্যুত্থান দমন করা ইংরেজ বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে তারা গোপনে প্রস্তুত হতে থাকেন। অন্য একটি বদ্ধমূল ধারণা এক্ষেত্রে কাজ করেছিল, যে ভারতে বৃটিশ শাসন একশো বছর স্থায়ী হবে। ১৮৫৭ সালে সেই শাসনেরই শতবর্ষ পূর্তির বছর। অতএব সেই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্যেও ভারতীয় সিপাহীগণ তৎপর হন।

ষষ্ঠত : ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল এনফিল্ড রাইফেল। বিভিন্ন কারণে সিপাহীদের মধ্যে যখন ক্ষোভ ক্রমশ পূঞ্জীভূত হচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে এনফিল্ড রাইফেল নামে এক নতুন ধরনের রাইফেলের প্রবর্তন তাদের ক্ষোভকে বিদ্রোহে পরিণত করে। এনফিল্ড রাইফেলে যে কার্তুজ (Cartridge) ব্যবহার করা হতো, তার খোলসটি দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হতো । গুজব রটে যায় যে, এই কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে । ধর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় কোম্পানীর সেনাবাহিনীর হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং এই টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে।

তবে মূল কথা হলো এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও একে প্রধান কারণ বলা যায় না। কারণ, চর্বি মাখানো টোটাই যদি এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ হতো, তাহলে টোটা ব্যবহার নিষিদ্ধ করে

www.pathagar.com

সরকারি নির্দেশ জারি করার পরেই এই বিদ্রোহের অবসান ঘটতো। কিন্তু তা না হয়ে বিদ্রোহ চলতে থাকে এবং ইংরেজদের হটানোই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহীরা চর্বি মাখানো এই টোটাই ব্যবহার করেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ প্রথমে শুরু হয় মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে কোলকাতার উত্তরে ব্যারাকপুরে। এই বিদ্রোহের সংবাদ লক্ষ্ণৌ-এর সিপাহিদেরও সংক্রামিত করেছিল। লক্ষ্ণৌ-এর পরে বিদ্রোহ মীরাটে প্রসারিত হয়। ১৮৫৭ সালের ২৪এপ্রিল মীরাট সেনা ছাউনিতে ৮০ জন সৈনিক প্রকাশ্যে ওই কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মীরাট থেকে এই বিদ্রোহ দ্রুত গতিতে দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে । দিল্লীতে সিপাহীরা স্ত্রী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে ইংরেজদের হত্যা করে । দিল্লি পৌঁছে বিদ্রোহীরা লাল কেল্লা দখল করে । পরে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে দিল্লির বাদশা রূপে ঘোষণা করেন। এর পর বিদ্রোহ গাঙ্গেয় প্রদেশগুলিতে ও মধ্যভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ফিরোজপুর, মোজাফফর নগর ও আলিগড়ে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। এরপর পাঞ্জাবে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করে। অযোধ্যা ও উত্তর প্রদেশের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। অযোধ্যার সম্পত্তিচ্যুত তালুকদাররা বিদ্রোহে যোগ দেন। রোহিলাখণ্ডের সর্দাররা এই বিদ্রোহে যোগ দেন। এদের মধ্যে বেরিলির খান বাহাদুর, নাজিরাবাদের মহম্মদ খাঁ, গোরখপুরের মহম্মদ হাসান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে বাংলার চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহী হন। কিন্তু সেখানে জনসাধারণের সমর্থন না পাওয়ায় সিপাহীরা পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

নর্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি এক রকম অক্ষুন্নই ছিল, যদিও সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার অভাব ছিল না। রাজস্থানেও বিদ্রোহ সংক্রমিত হয়। কিন্তু রাজপুত শাসকরা বৃটিশদের প্রতি অনুগত থাকায় সেখানে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারেনি। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ভারতীয় সিপাহীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংগ্রামে নামা ছিল ১৮৫৭ সালের গণবিদ্রোহের একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রামাঞ্চলে কোম্পানী প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্ব আইন দ্বারা সুরক্ষিত সুদখোর মহাজন ও নতুন জমিদারদের বাড়িঘর ও কাছারি লুট করা হয় । যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

স্থানীয় ডাকাতরাও এই সব লুঠতরাজে অংশ নিয়েছিল। ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ওপর কর বসিয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের খাদ্যশস্য ও যুদ্ধের রসদপত্র কেনা হয়।

তারপরও ব্যর্থ এই বিদ্রোহ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে পুঞ্জিভূত নানান ক্ষোভ ও অসন্তোষকে কেন্দ্র করেই ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সূচনা হয় । বিদ্রোহে সেনাবাহিনীর সমর্থন, জনগণের সক্রিয় সমর্থন ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মহাবিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার মূলে একাধিক কারণ ছিল।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো এই বিদ্রোহের কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও পরিকল্পনা ছিল না। সিপাহীরা যার যার ইচ্ছেমতো বিদ্রোহ করেছে। কোনো দিক-নির্দেশনা ও গাইডলাইন ছিল না। বিদ্রোহের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকায় প্রথম থেকেই এর সাফল্য লাভের সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। সিপাহী বা জনগণের নেতৃবর্গ কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য তুলে ধরতে পারেননি। বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ায় বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজ প্রশাসনের বিশেষ কোনো অসুবিধার সন্মুখীন হতে হয়নি। সিপাহীরা বাহাদুর শাহকে নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছে কিন্তু সিপাহী ও বাহাদুর শাহের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সিপাহীরা বেশিরভাগ ছিলেন হিন্দু অপরদিকে মুসলিম বাহাদুর শাহকে করা হয়েছে নেতা।

সমগ্র ভারতে বিদ্রোহ প্রসারিত হলেও মূলত উত্তর ও মধ্য ভারতের বিহার, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিদ্রোহের বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না। ভারতের সমস্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ না হওয়ায় কোম্পানী শান্তিপূর্ণ অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী সরিয়ে নিয়ে এসে তাদের অন্যত্র বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত করে। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও দেশীয় রাজারা বিদ্রোহের বিরোধিতা করে বৃটিশদের সমর্থন করেন। এর মধ্যে রয়েছে হায়দ্রাবাদের নিজাম, কাশ্মীরের মহারাজা, সিন্ধিয়া, পাতালিয়া ও গুর্খা বীর স্যার জঙ্গবাহাদুর প্রভৃতি দেশীয় রাজা ও অসংখ্য ছোটো-বড়ো জমিদার বিদ্রোহ দমনে বৃটিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তী অবস্থা

ইংরেজরা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমাতে সক্ষম হলেও তাদের টনক নড়ে। তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যেভাবে লুটতরাজ চালাচ্ছে তাতে ভারত শাসন কঠিন হয়ে যাবে। তাই বিদ্রোহ দমনের পর ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ১নভেম্বর থেকে নিজের হাতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং কোম্পানী শাসন বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ভারতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে শুরু করে। এছাড়া তিনি আরো ঘোষণা সহ এক ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। যার মাধ্যমে তিনি ভারতীয়দের নানানভাবে আশ্বস্ত করেন।

এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় — [১৫২]

১. দেশীয় অপুত্রক রাজাদের দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে।

২. কোম্পানীর সঙ্গে পূর্বে সম্পাদিত সব চুক্তি ও সন্ধিপত্রের শর্ত বৃটিশ সরকার পালন করে চলবেন।

৩. ভারতীয়দের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির ওপর সরকার আর হস্তক্ষেপ করবেন না।

৪. স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যাক্ত হবে।

৫. বৃটিশ সরকার ভারতে রাজ্যবিস্তার নীতি বর্জন করবেন।

৬. জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে সমান মর্যাদা দেওয়া হবে।

৭. দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব বৃটিশ সরকার গ্রহণ করবেন।

৮. জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গুণানুযায়ী ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা হবে।

৯. বিদ্রোহ চলাকালে একমাত্র বৃটিশ নাগরিক ও প্রজাদের হত্যাকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অপরাধী ছাড়া অপর সকল সিপাহীকে মুক্তি দেওয়া হবে।

---

[১৫২] মহাবিদ্রোহের ফল ও মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা / https://bit.ly/36Oo95Q / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

প্রশাসনিক পরিবর্তন

বিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ভিক্টোরিয়া ভারত শাসন আইন পাশ করেন। বৃটিশ সরকারের মন্ত্রিসভার ও পার্লামেন্ট মহাসভার অধীনে ভারতের শাসনকে আনা হয়। বৃটিশ মন্ত্রীসভায় একজন ভারত বিষয়ক মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তার খেতাব হয় "ভারত সচিব"। তিনি বৃটিশ মন্ত্রীসভার পক্ষে ভারতবাসীর প্রধান হন। ভারত সচিবকে পরামর্শ দানের জন্য ১৮৫৮ সালের আইনে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। আগের মতো বড়লাট তার ক্ষমতায় থাকেন। তবে তার উপাধি হয় গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়। প্রথম ভাইসরয় হয় লর্ড ক্যানিং।

আগের ডিরেক্টর সভা ও বোর্ড অব কন্ট্রোল-এর যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া হয় ভারত সচিব নামে বৃটিশ মন্ত্রীসভার এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে। ভারত সচিবকে সাহায্যের জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল। ১৮৬১ সালের কাউন্সিল আইন পাশ করে ভাইসরয়ের আইন পরিষদে ৬-১২ জন সদস্যের মধ্যে বেসরকারি ইংরেজ ও ভারতীয়দের সংখ্যা অর্ধেক হয়। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো, ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন ও ১৮৮২ সালে লর্ড ক্যানিং বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করে প্রাদেশিক শাসন পরিষদ ও আইনসভাগুলিকে কিছু কিছু ক্ষমতা দান করেন।

প্রদেশগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান করায় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় উন্নতি হয়। স্থানীয় পৌরসভা ও জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের বন্দোবস্ত প্রভৃতি উন্নতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উন্নতিতে লর্ড রিপনের নাম স্মরণীয়। ১৮৭৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়াকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে ভারতীয় রাজন্যবর্গ হন তার অধীনস্থ সামন্ত বা প্রজা।

সামরিক বিভাগের পরিবর্তন

ভারতের সামরিক বিভাগকে নতুন করে গঠন করা হয়। দেশীয় সৈন্যসামন্তের সংখ্যা হ্রাস করে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। প্রেসিডেন্সি সেনাবাহিনীকে পৃথক করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। সীমান্তরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের ওপর অর্পণ করা হয়। বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে মোঘল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। শেষ মোঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ বন্দি অবস্থায় রেঙ্গুনে প্রেরিত হন

www.pathagar.com

এবং তার পুত্র ও পৌত্রগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে মোঘল বংশের অবসান ঘটে। একই সাথে অনেক মুসলিম স্বাধীনতাকামী নেতাদের নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ইংরেজ সরকার।

ভারতে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ

বিদ্রোহ ও তার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে সাধারণ ভারতবাসী তার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলো এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ক্রমশ বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করে। ভারতবাসীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়ে। ডাক-তার-রেল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেলো। জেগে উঠলো সংঘ চেতনা। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী রাজনীতি সম্প্রসারিত হওয়া শুরু করেছিল। একই সাথে ইংরেজদের পক্ষের সুবিধাভোগী শিক্ষিত শ্রেণিও তৈরি হয়েছিল।

আব্দুল লতিফ ও মুসলিমদের রাজনৈতিক উত্থান

বাঙালি মুসলিমরা ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে তাদের মেনে নেয়নি। একের পর এক বিদ্রোহ করেছে। সর্বশেষ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের পর এদেশের মুসলিমদের অনেকেই উপলব্ধি করেন সশস্ত্র আন্দোলন/ বিদ্রোহ করে ইংরেজ দুঃশাসন ঠেকানো কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই মুসলিমদের বাঁচতে হলে এখন রাজনৈতিক আন্দোলন করা জরুরী। এমন ধারণা থেকে সিপাহী বিদ্রোহের ছয় বছর পর ১৮৬৩ সালের ২এপ্রিল নওয়াব আব্দুল লতিফ কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন ‘মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি’। সশস্ত্র সংগ্রামোত্তর মুসলিম জাতীয় জীবনে এ ধরনের সংস্থা, সমিতি গঠন এই প্রথম। সমিতির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতার নওয়াব আব্দুল লতিফের ১৬নং তালতলা লেনস্থ বাড়িতে ২এপ্রিল তারিখে।[১৫৩]

---

১৫৩. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3jsI8fB / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

নওয়াব আব্দুল লতিফ উনিশ শতকে বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত ও সমাজসেবক। জন্ম ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে। তার পিতা ফকির মাহমুদ ছিলেন কোলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের আইনজীবী। আবদুল লতিফ কোলকাতা মাদরাসা থেকে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন।

আবদুল লতিফ ১৮৪৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় আরবি ও ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৭৭ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন।

আবদুল লতিফ সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত অবস্থায় সেখানকার কৃষকদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নির্যাতন ও শোষণ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সেখানকার কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হতে এবং তাদের অভিযোগের কথা সরকারকে অবহিত করতে উৎসাহ দেন। তিনি নিজেও এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। অবশেষে তার উদ্যোগেই নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৮৬০ সালে ইংরেজ সরকার নীল কমিশন গঠন করে।

১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং-এর শাসনামলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হলে আবদুল লতিফ এ সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ সিভিল ও মিলিটারি সার্ভিস সমূহের পরীক্ষক বোর্ডের সদস্য এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ সালে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হলে তিনি এর 'জাস্টিস অব দি পিস' নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৮৬৫ সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে আনীত একটি প্রস্তাবে মুসলিম সমাজে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিলে আবদুল লতিফ একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে ইংরেজ সরকারকে এ বিল সংশোধনের পক্ষে যুক্তি প্রদান করেন।[১৫৪]

বাংলার মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আবদুল লতিফের অবদান

---

১৫৪. নওয়াব আব্দুল লতিফ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/39WPRzh / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন যে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হচ্ছে মুসলিমরা। ইংরেজি শিক্ষা বর্জন এবং সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতির কারণে মুসলমান জাতি সবক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তিনি মুসলিমদের শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

প্রথমত, বৃটিশদের নতুন শাসন পদ্ধতির সুফল ভোগ করার জন্য মুসলিমদেরকে প্রস্তুত করা।

দ্বিতীয়ত, উপনিবেশিক সরকারের প্রতি তাদের মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি করা এবং এভাবে মুসলিমদের প্রতি ইংরেজদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষিত মুসলিমগণ সরকারের উদ্দেশ্য, শক্তি ও কৌশল বুঝতে পারলে তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আনুগত্যের মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি শাসক শ্রেণির সঙ্গে যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ পরিহার করার পক্ষপাতি ছিলেন।

১৮৫৩ সালে 'কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা' সমস্যাদি তদন্তের জন্য সরকার এফ. হেলিডের সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। আবদুল লতিফ এ তদন্ত কমিটি ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট মাদরাসা উন্নতির জন্য দাবী জানান। তার সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ সালে কোলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি ও ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আবদুল লতিফ বরাবরই সরকারের নিকট মুসলিমদের জন্য ইংরেজি উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। ফলে ১৮৫৪ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরকে এ কলেজে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

বৃটিশ সরকার সন্দেহ করে যে, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার ছাত্ররা জড়িত ছিল। এ কারণে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এফ. হেলিডে মাদরাসা একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। ১৮৬৭ সালে ব্রিটিশ সরকার আরও একবার কোলকাতা মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু আবদুল লতিফের তৎপরতায় দু'বারই মাদরাসাটি রক্ষা পায়। ১৮৭১ সালে মাদরাসার কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হলে আবদুল লতিফ এর অবৈতনিক সচিব নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

আবদুল লতিফ হুগলি কলেজ ও স্কুলে মুসলিম ছাত্রদের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মোহসিন ফান্ডের টাকায় এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রতিষ্ঠানটি কার্যত হিন্দু ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানেই পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে এ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য একটি মাদরাসা চালু থাকলেও এর ব্যবস্থাপনায় অনেক অনিয়ম চলছিল। ছোটলাট জে.পি. গ্রান্ট-এর নির্দেশে আবদুল লতিফ মাদরাসা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ করে ১৮৬১ সালে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। মূলত এটি ছিল হুগলি মাদরাসা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন। এর ওপর ভিত্তি করেই হুগলি মাদরাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং ছাত্রদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে আবদুল লতিফ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবী জানান যে, দাতার ইচ্ছানুযায়ী মোহসিন ফান্ডের টাকা কেবল মুসলিমদের জন্য ব্যয় করা হোক। তিনি এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অবশেষে ১৮৭৩ সালে হুগলি কলেজ একটি সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মোহসিন ফান্ডের টাকা শুধু মুসলিমদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হয়।

আবদুল লতিফের প্রচেষ্টায় ১৮৭৪ সালে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদরাসা স্থাপিত হয়। তিনি দরিদ্র ও মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য নানাভাবে প্রচেষ্টা চালান এবং বিত্তশালী মুসলিমদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি তহবিল সৃষ্টি করেন। বাংলার মুসলিমদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলিমদের প্রভাব বিস্তার এবং পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কোলকাতায় 'মুসলিম সাহিত্য সমিতি' (Mohammedan Literary Society of Calcutta) গঠন ছিল আবদুল লতিফের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। তিনি মুসলিমদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও সমকালীন চিন্তা ধারার অনুকূলে জনমত এবং শিক্ষিত মুসলিম, হিন্দু ও ইংরেজদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ সমিতি গঠন করেন। এটি ছিল ভারতে মুসলিমদের সর্বপ্রথম সমিতি। এই সমিতির কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই ভারতে মুসলিমগণ প্রথম স্বনামে একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করে। তাছাড়াও এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে সভা, বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে মুসলিমদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা হতে থাকে।

www.pathagar.com

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ রহিমুদ্দীন এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা জাহান কাদের বাহাদুর ও মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার। কমিটির মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ বাহাদুর ও প্রিন্স মুহম্মদ জাহ আলী বাহাদুর এবং মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ হরমুজ শাহ ও প্রিন্স মুহম্মদ বখতিয়ার শাহ। বাংলার ছোটলাটকে সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের পাঁচ শতেরও বেশি মুসলমান সোসাইটির সাধারণ সদস্যভুক্ত ছিল। সোসাইটির মাসিক সভার কার্যক্রম উর্দু, ফারসি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হতো।

আবদুল লতিফ এর ভাষায় 'মুসলমানদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদানে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলাই ছিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞান, কলা ও চলমান সমস্যা সংক্রান্ত এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সোসাইটি মুসলমানদের ক্ষয়িষ্ণু আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার দ্বারা সমাজ উন্নয়নের নতুন ধারার প্রবর্তন এবং এভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক নির্ভরশীল সেতু স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুসলমানদের এই ধরনের সর্বপ্রথম সংগঠন হিসেবে "মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি" কালক্রমে মুসলমানদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির প্রথম সভা কোলকাতার ১৬নং তালতলায় অনুষ্ঠিত হয়। মৌলভী মুহম্মদ ওয়াজির এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে মত বিনিময়ই ছিল এ ধরনের নিয়মিত সভার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বছরে একবার কোলকাতা টাউন হলে সোসাইটির সদস্যদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সান্ধ্য আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হতো। কোলকাতা শহরের দেশী-বিদেশী প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানী-গুণীরা এই অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শন করতেন। ১৮৬৫ সালে কোলকাতা টাউন হলে সোসাইটির এক জনাকীর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার ছোটলাট এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের মধ্য থেকে প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি এই সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। মোহামেডান লিটারেরি

www.pathagar.com

সোসাইটি এভাবে প্রখ্যাত পন্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির বিভিন্ন সভায় ইন্দোরের মহারাজা, ভূপালের বেগম এবং জয়পুর, পাতিয়ালা ও কুচবিহারের রাজারা সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।[১৫৫]

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি বিরাট এক দুঃসময়ে মুসলিম জাতি-স্বার্থকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। ভারতীয় স্বার্থের সাইনবোর্ডে হিন্দুরা যখন সব অধিকার একাই কুক্ষিগত করছিল, তখন মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রথমবারের মতো মুসলিম স্বার্থের প্রয়োজন আলাদাভাবে তুলে ধরে। মোহসীন ফান্ডের টাকা লুটেপুটে খাওয়া হচ্ছিল। যাদের জন্যে এই টাকা এবং যাদের জন্যে এটা বেশি প্রয়োজন, সেই মুসলমানরা মোহসীন ফান্ডের টাকা পাচ্ছিল না। নওয়াব আব্দুল লতিফ তার অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা বাংলার গভর্নর স্যার ক্যাম্পবলকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, মোহসীন ফান্ডের টাকা দাতার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলস্বরূপ বাংলার বৃটিশ প্রশাসন ১৮৭৩ সালের ২৯জুলাই গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে মোহসীন ফান্ডের টাকা শুধু মুসলমানদের জন্যে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন থেকে হুগলী কলেজ সরকারি হয়ে গেলো এবং মোহসীন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়। এই টাকায় হুগলী ও কোলকাতা মাদরাসার উন্নতি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদরাসা স্থাপন এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলো। সরকার ৯টি জিলা স্কুলে আরবী ও ফার্সির শিক্ষক রাখার নির্দেশ দিলেন। এত বড় কাজ সম্ভব হয়েছিল বৃটিশ প্রশাসনের সাথে নওয়াব আব্দুল লতিফের সুসম্পর্কের ফলেই। উল্লেখ্য, মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির দ্বিতীয় আলোচনা সভাতেই নওয়াব আব্দুল লতিফ গভর্নর জেনারেল স্যার লরেন্সকে প্রধান অতিথি করে আনতে সমর্থ হন। এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালের ৬মার্চ।

মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির মাধ্যমে নওয়াব আব্দুল লতিফের চেষ্টায় জাতি হিসেবে মুসলমানরা উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই আরও কিছু সুবিধা অর্জনে সমর্থ হলো। ১৮৭১ সালের ৭আগস্ট ভারতের বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক

---

১৫৫. মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3jsI8fB / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সরকারগুলোকে নির্দেশ দিলো যে, [১৫৬]

(ক) সকল সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজে মুসলমানদের ধর্মীয় ও মাতৃভাষা শিখবার উৎসাহ দিতে হবে,

(খ) মুসলিম অধ্যুষিত জিলাসমূহে স্থাপিত ইংরেজি বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর যোগ্য মুসলমান ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে,

(গ) নিজেদের মাতৃভাষা শিক্ষায় বিদ্যালয় ও ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুসলমানদের অধিকতর অর্থ সাহায্য দিতে হবে,

(ঘ) নিজেদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার জন্যে মুসলমানদের অধিকতর উৎসাহ দিতে হবে।'

আজকের বিচারে এই পাওয়াগুলো হয়তো খুব বড় নয় কিংবা এর অন্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। যখন বৃটিশ শাসন বিদ্রোহী জাতি মুসলমানদের পিষে ফেলতে ব্যস্ত এবং হিন্দুরা যখন জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলতে মরিয়া, তখনকার সেই ঘোর অমানিশার দিনগুলোতে জাতি হিসেবে মুসলমানদের এই আলাদা প্রাপ্তি মোটেই ছোটো ঘটনা ছিল না। এই সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের আলাদা জাতীয় স্বীকৃতি ও স্বার্থ চিহ্নিত হয়েছিল। মুসলিম জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য লিটারেরি সোসাইটি ছিল প্রথম কার্যকর ধাপ।

সৈয়দ আহমদ এবং তার আলিগড় আন্দোলন

আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায়কে যুক্তিবাদী আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য স্যার সৈয়দ আহমেদ খান উত্তর প্রদেশের আলিগড়ে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তা আলিগড় আন্দোলন নামে খ্যাত। ইতোপূর্বে ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলন হলেও তা সাধারণ মুসলিম সমাজকে স্পর্শ করেনি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর অনগ্রসর মুসলিম সমাজে কিছু কিছু সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয় । হিন্দুদের তুলনায় অনগ্রসর পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদাসীন

১৫৬. একশ' বছরের রাজনীতি / আবুল আসাদ / বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি / পৃ.৩৪-৩৫

www.pathagar.com

মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কথা সৈয়দ আহমেদ খান অবগত ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রগতির যথার্থ সোপান বলে মনে করতেন, তাই তিনি মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগী হন।

সৈয়দ আহমদ খান বৃটিশ সরকারের অধীনে উচ্চপদের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, মোঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপরে ভারতে এক সুশৃংখল বৃটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায়ও ইউরোপিয়ানরা মুসলমানদের চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তাই এদেশ থেকে সহসা তাদেরকে উৎখাত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। বিদ্রোহ না করে রাজনৈতিকভাবে তাদের মোকাবেলা করাকেই তিনি উত্তম মনে করতেন। ইংরেজদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের আত্মহত্যারই শামিল হবে বলে তিনি মনে করতেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সকল দোষ শুধুমাত্র মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাদের ওপর পাইকারী হারে যে অমানুষিক নিষ্পেষণ চালানো হচ্ছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তার প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'আসবাব-ই-বাগাওয়াতে হিন্দু' ও 'ভারতীয় মুসলমান' নামক পুস্তিকার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশের কঠোর মনোভাব দূর করার চেষ্টা করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানদের পশ্চাদপদতাকেই তিনি তাদের পরাজয়ের মূল কারণ বলে উল্লেখ করেন। তার বাণী ছিল –'আগে মূলকে রোগমুক্ত কর। তাহলেই বৃক্ষ বর্ধনশীল হবে'। ১৮৬৫ সালে তিনি আলীপুরের গাজীপুরে একটি অনুবাদ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সমিতির মাধ্যমে বহু বিদেশী গ্রন্থ অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[১৫৭]

তিনি মুসলমানদের মন থেকে পাশ্চাত্যের ভয় ভীতি দূর করার জন্য ও মুসলমানদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা প্রচারের জন্য 'তাহজিব-উল-আখলার্ক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে কমিটি ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ লার্নিং নামে একটি সংস্থাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে ১৮৭৫ সালে মে মাসে আলিগড়ে তিনি মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজটিই পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ শিক্ষাবিদগণের তত্ত্বাবধানে

---

১৫৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩০৪-৩০৫

www.pathagar.com

এই কলেজে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও প্রগতিমূলক মনোভাবের উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে এই কলেজের অবদান অস্বীকার করা যায় না। তৎকালে সরকারি ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় মুসলমানরা সেখানে তাদের সন্তানকে পাঠাতে সংকোচ বোধ করতো। আধুনিক শিক্ষালাভের পথ থেকে সে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয় আলীগড় কলেজের মাধ্যমে।

এ কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে খ্যাতি লাভ করে। এ মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে কবি হালী, মুহসিনুল মুলক, নাজির আহমদ, চেরাগ আলী প্রমুখ মনীষীবৃন্দ যোগদান করে আন্দোলনের অগ্রগতি সাধিত করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আলীগড় আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। আলীগড় আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। মুসলিমরা তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন ও সচেষ্ট হয়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতাই মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্রের কথা ভাবতে শেখায়।

মুসলিম স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের জন্যে পৃথক সরকারি মনোনয়ন প্রথার দাবী জানান। তিনি বলেন এসব প্রতিষ্ঠানে সাধারণ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলে মুসলমানদের স্বার্থ পদদলিত হবে। ১৮৮৩ সালের ১২জানুয়ারী গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের নিকটে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নমিনেশন প্রথার সমর্থনে তিনি বলেনঃ "সাধারণ যুক্ত নির্বাচন প্রথার দ্বারা শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করা হয়। যে দেশে শুধুমাত্র একজাতি ও এক ধর্মের লোক বাস করে সেখানে এ প্রথা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন জাতির বাস, কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠ, কেউ সংখ্যালঘু এবং তাদের মধ্যে জাতিভেদ ও ধর্মভেদ বিদ্যমান। এমতাবস্থায় যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তন করলে কুফল দেখা দিতে বাধ্য। এ প্রথা প্রবর্তন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ পদদলিত হবে। তাতে জাতি বিদ্বেষ ও ধর্ম বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারণ করবে। এর জন্যে সরকারকেই দায়ী হতে হবে"।[১৫৮]

---

১৫৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩০৫

www.pathagar.com

তার এ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব মুসলিম সমাজের জন্যে এক চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে এবং তার এ প্রস্তাব কার্যকর হয় ছাব্বিশ বছর পর। ১৯০৬ সালের ১অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের বিশিষ্ট ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টের কাছে পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবীতে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে এ দাবী স্বীকৃতি লাভ করে। এতে করে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। কারণ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিঘোষিত নীতি ছিল এক জাতীয়তাবাদ। এই নিয়ে বহু বৎসর ধরে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বাকবিতন্ডা ও তিক্ততা চলে।

অবশেষে ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে উভয় প্রতিষ্ঠানের যথারীতি ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এটাই ঐতিহাসিক "লক্ষ্ণৌ চুক্তি" নামে অভিহিত। চুক্তিটি কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনাধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। এভাবে হিন্দু কংগ্রেস ভারতে একজাতীয়তার পরিবর্তে দ্বিজাতিত্ব স্বীকার করে নেয়, যা ছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

সৈয়দ আহমদের প্রতিটি নীতি ও কথায় একমত হওয়া কঠিন। তবে তিনি তার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির দ্বারা ভারতীয় মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগাদান করতে নিষেধ করেছেন এবং এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস শুধুমাত্র ভারতের হিন্দু স্বার্থেরই প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মুসলমানদের স্বার্থ হবে উপেক্ষিত। এ সত্যটি প্রথমে মওলানা মুহাম্মদ আলী ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো ঝানু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা উপলব্ধি করতে না পারলেও সৈয়দের সাবধান বাণীর সত্যতা তাদের কাছে পরবর্তীকালে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছিল। যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তার প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং মুসলিম নেতারা এ পথেই অগ্রসর হয়। তাই বলতে হয়, ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলীগড় আন্দোলন এবং স্যার সৈয়দ আহমদের হাত ধরেই।

www.pathagar.com

মুসলিমদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের ইতিকথা

সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন ইংরেজদের সাথে উদারনৈতিক আচরণে বিশ্বাসী। আর আব্দুল লতিফ ছিলেন ইংরেজদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণে বিশ্বাসী। আর আমীর আলী ছিলেন ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার মানুষ।

বাংলার মুসলমানদের পুনঃজাগরণে ও সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মে সৈয়দ আমীর আলী অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তার চিন্তাধারার উদারনৈতিক প্রভাব তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সৈয়দ আমীর আলী সম্পর্কে বিপুল রঞ্জন নাথ বলেন, "তিনি মুসলমানদের গৌরবময় অতীতকেই রেনেসাঁ আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং রাজনীতি কৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁহাদের অতীত অবদান নূতনভাবে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াসী হন।"[১৫৯]

১৮৪৯ সালে সৈয়দ আমীর আলী উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পরিবার অত্যন্ত উদারপন্থী হওয়ায় তিনি ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের সুযোগ পান। তিনিই ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম ব্যারিস্টার। এছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন।

ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সৈয়দ আমীর আলীর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম মুসলিম নেতা যিনি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য গঠনতান্ত্রিক সংগ্রাম করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করতেন। ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমদের ১ম রাজনৈতিক সংগঠন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন।

আমীর আলী বিশ্বাস করতেন যে, একজন নেতার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে সংগঠনের মাধ্যমে দলগত প্রচেষ্টা অধিক ফলপ্রসূ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলমানরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাব ছিল এবং তারা হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা শাসিত এবং কিছু ক্ষেত্রে শোষিত হতো। তৎকালীন ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয়

---

১৫৯. বাংলার মুসলমানদের পুনঃজাগরণে সৈয়দ আমীর আলী / ইসলামী বার্তা / ৪-৮-২০১৮

www.pathagar.com

জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনে ছিল হিন্দুদের প্রাধান্য। কাজেই এসব সংগঠন তার ধর্মের লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারবে না। তাই মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি গড়ে তোলেন একটি সংগঠন। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের মাঝে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রবণতা সৃষ্টি করতে, যাতে তাদের প্রতি বৃটিশ সরকারের সন্দেহ দূর হয়। দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি সম্প্রীতি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মুসলমানদের কল্যাণ সাধনই ছিল সংগঠনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক মূল্যবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের চেতনা ফিরিয়ে এনে মুসলমানদের পুনরুজ্জীবিত করা।[১৬০]

সৈয়দ আমীর আলীর উদ্যোগে লন্ডনে সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের লন্ডন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনেও ভূমিকা পালন করেন। তিনি লর্ড মর্লির নিকট জোরালোভাবে নিজের মতামত তুলে ধরেন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক পন্থার ওপর গুরুত্ব দিতেন।

১৮৭৭ সালে মাত্র ২০০ সদস্য নিয়ে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' যাত্রা শুরু করলেও পাঁচ বছরের মধ্যে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ছয়শ-তে পৌঁছে। আমীর আলী তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা, বিহার, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, এমনকি লন্ডনে এর প্রায় ৫০টি শাখা খোলেন। সচরাচর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরাই এই সংগঠনের সদস্য হতেন। সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও এর সদস্য হতে পারতেন। এটি মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে যেকোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল। তার এই সংগঠনের সদস্যরাই পরবর্তীতে মুসলিমলীগের কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মুসলমানদের আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধকরণ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সংগঠনের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল; অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সভা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা, সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে মুসলমানদের সমস্যা ও অধিকার সম্বন্ধে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করা

---

১৬০. সৈয়দ আমীর আলী / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2YUhhj6 / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

প্রভৃতি। সৈয়দ আমীর আলী নিজে সংগঠনের ব্যানারে স্মারকলিপি পেশ করতেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতেন। তাছাড়াও গভর্নর জেনারেল ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরদের সংবর্ধনা প্রদান করতেন। অ্যাসোসিয়েশন মূলত মুসলমানদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করতো।

১৮৮১ সালে মুসলমানদের শিক্ষার সমস্যাবলি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ ছিল অ্যাসোসিয়েশনের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। আমীর আলীর নেতৃত্বে অ্যাসোসিয়েশন ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের নিকট একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করে। এ বক্তব্যে বলা হয়, মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাদের পূর্ব অনুসৃত ঘৃণা পরিত্যাগ করেছে এবং এখন তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু চরম দারিদ্র্যতা এ পথে তাদের সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে "A cry from the Indian Muhamedans' শীর্ষক একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে আবেদন করা হয় যে, মুসলমানরা বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত, কিন্তু তাদের দুরবস্থার কারণে তারা অসন্তুষ্ট। তারা চাকরির সুযোগ এবং সমাজে সম্মানজনক অবস্থান হতে বঞ্চিত। এভাবে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগে অ্যাসোসিয়েশন একটি বড় রকমের সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। ১৮৮৫ সালে সরকার মুসলিম শিক্ষার ওপর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সৈয়দ আমীর আলী এই সিদ্ধান্তকে মুসলমানদের জন্য ম্যাগনাকার্টা রূপে গণ্য করেন।[১৬১]

ভারতে ও ইংল্যান্ডে যুগপৎ আই.সি.এস পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং মনোনয়ন পদ্ধতি বলবৎ রাখার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর দাবীর বিরোধিতা করে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের দাবী ছিল ব্যাপক হারে মুসলমানদের নিয়োগ, নির্বাহি পরিষদের সম্প্রসারণ ও ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ। স্থানীয় পরিষদসমূহে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবী করা হয়েছিল। সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলন ফলপ্রসু হয় যখন ১৮৯২ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলের স্বার্থ রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

---

১৬১. সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3tKLOy6 / অ্যাকসেস ইন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মুসলমানদের ইতিহাস ও কৃষ্টিগত ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো The Spirit of Islam এবং A Short History of Saracens। এছাড়া তিনি মুসলিম আইনবিষয়ক প্রচুর গ্রন্থও রচনা করেন।

সৈয়দ আমীর আলী দেশের অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন অবস্থা নিয়ে সোচ্চার হন। তিনি রাজস্ব আদায়ে কঠোরতার নিন্দা করেন। তিনি সুতি বস্ত্রের আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস, আফগান যুদ্ধে ব্যয় হ্রাস এবং কর্মক্ষেত্রে দেশী কর্মচারীদের নিয়োগের ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালান। তিনি জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। ১৯০৬ সালে মুসলিমলীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে আমীর আলীর রাজনৈতিক সংগঠন ভূমিকা রাখে। মুসলিমলীগ গঠন হওয়ার পর সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। সংগঠনটি বিলুপ্ত হয়। সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৮ সালে মুসলিমলীগ লন্ডন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলিম ও মুশরিকদের দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি

বাংলার ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে বাংলায় চলে আসা হাজার বছরের তাওহীদবাদী ও মুশরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব পুনরায় চরমে পৌঁছে যায়। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবনার একেবারে শুরুতে মুসলিমরা এর বিরোধীতা করে, ইংরেজরা তাদের শোষণ আরো জোরদার করবে মনে করে। তখন হিন্দু সমাজ চুপ ছিল। কিন্তু যখন লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কিছু সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেন আর এতে সন্তুষ্ট হয়ে মুসলিম সমাজ বঙ্গভঙ্গ মেনে নেয়।

এতেই বাধে বিপত্তি। মুসলিমদের উপকার হবে আর মুশরিকরা তা মেনে নিবে এটা তো হতে পারে না! সর্বাত্মক আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গকে রুখে দেয় হিন্দুরা। এই ঘটনাকে ইস্যু করে মুসলিমরা বুঝতে পারে কংগ্রেস[১৬২] ভারতীয়দের জন্য নয় সেটা কেবল হিন্দুদের স্বার্থ বিবেচনা করে। এর প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে মুসলিমলীগ[১৬৩] গঠন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

---

১৬২. ১৮৮৫ সালে গঠিত সর্বভারতীয়দের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন।

১৬৩. ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানের মুসলিমদের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন

www.pathagar.com

লর্ড কার্জন ভাইসরয় থাকাকালীন ১৯০৫ সালের ১৬অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। এইদিন থেকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশের জন্ম হয়। এই প্রদেশের প্রথম গভর্নর হলেন ব্যামফিল্ড ফুলার।[১৬৪] ১৭৬৫ সাল থেকে বিহার ও উড়িষ্যা সমন্বয়ে গঠিত বাংলা বৃটিশ ভারতের একটি একক প্রদেশ হিসেবে বেশ বড় আকার ধারণ করেছিল। এর ফলে প্রদেশটির প্রশাসনকার্য পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে এবং এজন্য এটিকে বিভক্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বলা চলে এই বিশাল প্রদেশ শাসন করা ইংরেজদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল বলেই এখানে বারংবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭ কোটি ৮৫ লক্ষে দাঁড়ায়। এর ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলার অনেকগুলি জেলা কার্যত বিচ্ছিন্ন এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে অবহেলিত ছিল। ফলে এতদঞ্চলের সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোলকাতা ও এর নিকটস্থ জেলাসমূহ সরকারের আওতাধীন ছিল। অন্যান্য অঞ্চলে জমিদারদের শোষণের ভারে চাষীদের অবস্থা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিক্ষা ছিল অবহেলিত। প্রদেশের প্রশাসনিক যন্ত্রকে প্রয়োজন অপেক্ষা কমসংখ্যক কর্মচারী নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হতো। বিশেষত নদ-নদী ও খাঁড়িসমূহ দ্বারা অত্যধিক বিচ্ছিন্ন পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলে পুলিশী কাজ চালানো অসুবিধাজনক হলেও উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত সেখানে আলাদা মনোযোগ প্রদান করা হয়নি। জলপথে সংঘবদ্ধ জলদস্যুতা অন্তত এক শতাব্দীকাল বিদ্যমান ছিল।[১৬৫]

প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা সমূহের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষ, প্রতিরক্ষা অথবা ভাষাগত সমস্যাবলির কারণে ইংরেজরা বাংলাকে ভাগ করে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করার চিন্তা করে। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ ১৯০৩ সালে প্রথম বিবেচনা করা হয়। লর্ড কার্জন মূলত প্রসাশনিক ও প্রতিরক্ষামূলক কাজের সুবিধার জন্যই নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলার জেলাগুলি সফর করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেন এবং বিভক্তির ব্যাপারে সরকারের অবস্থান

---

১৬৪. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১২১

১৬৫. বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ / বিকাশপিডিয়া / https://bit.ly/2N6f1CM / অ্যাকসেস ইন ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বক্তৃতা দেন। প্রথমে মুসলিমরা বিরোধীতা করলেও তার এই সফরে মুসলিমরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নেন।

বঙ্গভঙ্গ অনুসারে নতুন প্রদেশটি গঠিত হবে পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগসমূহ এবং মালদা জেলাকে আসামের সাথে একত্র করে। বাংলাকে যে শুধু পূর্বদিকে এ বৃহৎ ভূখণ্ডসমূহ ছেড়ে দিতে হবে তাই নয়, তাকে হিন্দি-ভাষাভাষী পাঁচটি রাজ্যও মধ্য প্রদেশকে ছেড়ে দিতে হবে। পশ্চিম দিকে সম্বলপুর এবং মধ্য প্রদেশ থেকে উড়িয়া-ভাষাভাষী পাঁচটি রাজ্যের সামান্য ভূখণ্ড বাংলা লাভ করবে। বাংলার নিজের দখলে যে ভূখণ্ড থেকে যায় তার আয়তন ১, ৪১, ৫৮০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ, যাদের মধ্যে চার কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু ও নব্বই লক্ষ মুসলমান।

নতুন প্রদেশটি অভিহিত হবে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে, যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অতিরিক্ত সদর দপ্তর হবে চট্টগ্রামে। এর আয়তন হবে ১, ০৬, ৫৪০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ। এর মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান ও এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু।[১৬৬] এর প্রশাসন গঠিত হবে একটি আইন পরিষদ ও দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি রাজস্ব বোর্ড নিয়ে। নতুন প্রদেশটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এটা এর নিজস্ব চৌহদ্দির মধ্যে এ যাবৎ বাংলার তুচ্ছ ও অবহেলিত প্রতিনিধিত্বমূলক সমপ্রকৃতির মুসলমান জনগণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিবে। অধিকন্তু, চা শিল্প এবং পাট উৎপাদনকারী এলাকার বৃহদংশ একক প্রশাসনের অধীনে নিয়ে আসা হবে।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলাকে নিজের পক্ষে টানতে লর্ড কার্জন ঢাকাকে রাজধানী করে মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। সেই সাথে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, পৃথক আইন পরিষদ ও রাজস্ব বোর্ডের ঘোষণাও দেন কার্জন। প্রথমদিকে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা ভেবেছিল তাদের ওপর ইংরেজ শাসন আরো জেঁকে বসবে তাই তারা বিরোধীতা করেছিল। কিন্তু পরে বিভিন্ন সুবিধার কথা চিন্তা করে বেশিরভাগই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে চলে যায়। নবাব সলিমুল্লাহও বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জনমত গঠনে ভূমিকা রাখেন। জমিদার, আইনজীবী ও কিছু ব্যবসায়ী ছাড়া মুসলমানদের অধিকাংশই বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নেন। তবে

১৬৬. Struggle for Freedom / R C Majumdar / P. 20

www.pathagar.com

আসামের চিফ কমিশনার হেনরি কটন নিজেও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এসব পক্ষ-বিপক্ষ মতের মধ্যেই ১৯০৫ সালের ৯জুন ভারত সচিব ব্রডরিক এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন ও ১০জুলাই সরকারি গেজেট হিসেবে তা প্রকাশিত হয়। একই বছর ১৬অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়।

প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য হলেও বঙ্গভঙ্গের পেছনে কাজ করেছিল কিছু রাজনৈতিক ব্যাপারও। বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়া শিক্ষিত সমাজ এক সময় নিজেদের পরাধীনতার কষ্টটা অনুভব করতে থাকে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় আর এর কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। বাংলাকে বিভক্ত করে এই জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার কথা যে বৃটিশরা একেবারেই ভাবেনি সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য না। এছাড়া সরকারি চাকরিতে বৃটিশদের তুলনায় দেশীয়দের বৈষম্য বাঙালিদের ক্ষুব্ধ করে রেখেছিল অনেক দিন ধরেই। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ তৈরি করে ভারতীয়দের ঐক্য নষ্ট করে বৃটিশদের শাসকরা সুবিধা নিবে এটাই স্বাভাবিক। আর এই সুবিধা নেওয়ার মূল কারণ হিন্দুদের হিংসা।

বঙ্গভঙ্গের শুরুতে হিন্দু সমাজের তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কিন্তু যখন ঢাকাকে রাজধানী করা, মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সেই সাথে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, পৃথক আইন পরিষদ ও রাজস্ব বোর্ডের ঘোষণা দেন, তখনই মূলত হিন্দু সমাজ ও কংগ্রেসের বিরোধীতা পরিলক্ষিত হয়। এদিকে লর্ড কার্জন পূর্ব বাংলা সফরে মুসলমানদের ঐক্যের ওপরেই জোর দেন বেশি। এটি ধর্মকে সরাসরি ব্যবহার করা দুই বাংলাতেই প্রভাব ফেলে। কোলকাতার হিন্দুদের আচরণে পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব বাড়তে থাকে। এছাড়া পূর্ব বাংলায় প্রচুর হিন্দু থাকলেও তাদের অধিকাংশই ছিলেন নিচু বর্ণের হিন্দু। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দের মতো উঁচু বর্ণের হিন্দুরা থাকতেন কোলকাতায়। ফলে মুসলমানদের সাথে সাথে পূর্ব বাংলার হিন্দুরাও নিজেদের সুবিধার কথা ভেবে বঙ্গভঙ্গের পক্ষেই অবস্থান নেন।

মুসলমানগণ নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার-কে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। মুসলেম ক্রনিকল সংবাদপত্র বঙ্গভঙ্গের পক্ষে অবস্থান নেয়। কোলকাতার মুসলমানরাও নতুন প্রদেশটির সৃষ্টিকে স্বাগত জানায়। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ১৯০৫ সালে সাতজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান ব্যক্তিত্ব কর্তৃক

www.pathagar.com

স্বাক্ষরিত একটি প্রকাশ্য লিখিত ঘোষণা বের করে। ঘোষণাটি পশ্চিম ও পূর্ব উভয় বাংলার বিভিন্ন মুসলমান সোসাইটিগুলির নিকট বিলি করা হয় এবং এর মাধ্যমে বিভক্তি ব্যবস্থার প্রতি তাদের শর্তহীন সমর্থন দানের জন্য মুসলমানদের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। নতুন প্রদেশটির সৃষ্টি মুসলমানদেরকে একটি সঙ্ঘবদ্ধ দলে পরিণত এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার অভিপ্রায়ে একটি সংঘ গঠন করতে উৎসাহিত করে। ১৯০৫ সালের ১৬অক্টোবর 'মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিরাজমান সকল প্রতিষ্ঠান ও সমিতিকে এ নতুন ইউনিয়নটির সাথে নিজেদেরকে অধিভুক্ত করতে আহ্বান জানানো হয় এবং খাজা সলিমুল্লাহকে সর্বসম্মতিক্রমে এর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনোনীত করা হয়।

আবার একদল শিক্ষিত মুসলিম পণ্ডিত ছিল যারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ ও স্বদেশী আন্দোলন-এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যদিও তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, তবুও তাদের ভূমিকা মুসলমানদের চিন্তাধারায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এই দলটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন ও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। মুসলমানদের মধ্যকার এ ধারার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন নওয়াব সলিমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ।[১৬৭] কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশনে (১৯০৬) তিনি বঙ্গভঙ্গকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

মুসলিমলীগ গঠন ও মুসলিমদের রাজনৈতিক যাত্রা

বঙ্গভঙ্গের ব্যাপক ঘটনা প্রবাহে কোলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে ঢাকা কেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের যে দ্বন্দ্ব, তার পটভূমিতে গঠিত হয় মুসলিমলীগ, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দুদের সাথে যে মানসিক বিচ্ছেদ তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়, "যদিও তারা একই দেশের মানুষ ছিল, তবুও এক ভাষা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তারা বিভিন্ন ছিল। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আটশ' বছর ধরে তারা বাস করেছে যেন দু'টি ভিন্ন পৃথিবীতে"।[১৬৮]

---

১৬৭. বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ / বিকাশপিডিয়া / https://bit.ly/2N6f1CM / অ্যাকসেস ইন ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১

১৬৮. অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান / নিরোদচন্দ্র চৌধুরী / পৃ. ৫০৪

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনের শুরু থেকে কয়েক শতাব্দী বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ, অভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচরণ পদ্ধতি নিয়ে ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনে আপাতদৃষ্টিতে বড় রকমের কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেনি। কিন্তু বৃটিশ শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্তার লাভ করে। বৃটিশ শাসনকে হিন্দুরা নিছক শাসক-বদলের ঘটনারূপে গ্রহণ করে। ইংরেজদের আস্থা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। রাতারাতি তাদের একটি শ্রেণী বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। তারা এই শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে 'রাণীর বিদ্রোহী প্রজা' রূপে অভিহিত হয়। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। হিন্দুরা ইংরেজদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। মুসলমানদের সংগ্রামে হিন্দুদের কোনো সহানুভূতি ছিল না।[১৬৯]

বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়। মুসলমানদের শত্রুরূপে চিহ্নিত করে তাদের ওপর তারা নানামুখী হামলা পরিচালনা করে। কুড়ি শতকের শুরুতে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে হিন্দুদের মারমুখী সংগ্রাম হিন্দু-মুসলিম জাতি-স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে আরো প্রকটভাবে উপস্থিত করে।

সৈয়দ আমীর আলী সর্বপ্রথম তার বক্তৃতা ও লেখায় মুসলমানদেরকে একটি 'স্বতন্ত্র জাতি' (Nationality, Nation) নামে অভিহিত করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। এর আগে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে 'কওম' নামে অভিহিত করলেও আমীর আলীর দাবী ছিল অধিকতর রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত। ১৮৮৩ সালে আমীর আলী 'মিউনিসিপ্যালিটি বিলে' সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন। এ সময় থেকেই মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন কায়েমের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল। ১৯০১ সালের অক্টোবরে নওয়াব ওয়াকার উল

---

১৬৯. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১৪১

www.pathagar.com

মূলক লাখনৌতে মুসলমানদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯০৩ সালে সাহারানপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে ফযল-ই-হুসাইন 'মুসলিমলীগ' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।[১৭০]

এ সময় ভারত সচিব লর্ড মর্লি পার্লামেন্টে আভাস দেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করছেন। এই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দাবী নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ১অক্টোবর সিমলায় বড় লাট মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তার প্রতিনিধি হিসেবে সিমলা ডেপুটেশনে যোগ দেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও আবুল কাসেম ফজুলল হক। তারা নওয়াব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেসী গঠনের খসড়া পরিকল্পনা সাথে নিয়ে যান। একই বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দ আমীর আলী তার কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে বেরিয়ে এসে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের উদাত্ত আহ্বান জানান।

মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে সলীমুল্লাহর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ সিমলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তারা ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা সম্মেলনে কনফেডারেসী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবল আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের এক বিশেষ সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিমলীগ' গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আটশ' প্রতিনিধির এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবেই ভারতীয় মুসলমানগণ একটি নতুন রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করেন। এ রাজনীতির ভিত্তি হলো জাতি স্বাতন্ত্রভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

---

১৭০. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১৪২

www.pathagar.com

সর্ব ভারতীয় মুসলিমলীগের উদ্দেশ্যাবলি ছিল মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য রেখে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করা, ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়, বিশেষ করে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলা। একটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের জন্য নওয়াব সলীমুল্লাহর পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য হিন্দুদের শক্তিশালী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এটাই ছিল মূল এবং প্রধান কারণ।[১৭১]

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ একটি দুর্বল সংগঠন হিসেবে মুসলিমলীগকে বাতিল করে দেয়। এসব সংবাদপত্র দ্রুত মুসলিমলীগের বিলুপ্তি ঘটবে বলে প্রচার চালায়। এটা সত্য যে প্রথম দিকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে লীগের গতিশীলতার অভাব ছিল। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসা এবং বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তরুণ প্রজন্মের মুসলমানগণ মুসলিমলীগের রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন। তারা বৃটিশ উপনিবেশিক শাসকদের বিরোধিতা তো করেনই, অধিকন্তু ভারতে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠারও দাবী করতে থাকেন।

১৯১০-এর দশকে মুসলিমলীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদলে একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬) এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি ঘটলে মুসলিমলীগ জড় ও স্থবির অবস্থায় পড়ে। ১৯২০-এর পর থেকে কয়েক বছর খেলাফত সংগঠনই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সকল কাজ পরিচালনা করে।

১৯৩৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেতৃত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সংগঠনটি রাজনৈতিকভাবে খুব বেশি সফলতা পায়নি। অনেক মুসলমান নেতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডন হতে ভারতে ফিরে আসেন এবং মুসলিমলীগের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জিন্নাহ মুসলিমলীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখাসমূহ পুনর্গঠিত করে নতুন কাঠামো প্রদান করেন। নতুন কমিটিসমূহকে জনসংযোগ এবং আসন্ন নির্বাচনী রাজনীতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

---

১৭১. মুসলিমলীগ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2N0mzH3 / অ্যাকসেস ইন ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিমলীগ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। মোট নয়টি প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে লীগ ১০৪টি আসন লাভ করে। মোট প্রাপ্ত আসনের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক (৩৬টি) শুধু বাংলাতেই অর্জিত হয়েছিল। মুসলিমলীগ আইন সভায় কংগ্রেসের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ধারণা করা হয় যে, বাংলায় মুসলিমলীগের বিজয় ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান পেশাদার ও মুসলমান ভূমি মালিক সম্প্রদায়ের যৌথ সমর্থনের ফল। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো তা হলো আলেম শ্রেণি বিশেষত দেওবন্দি ধারার আলেমরা মুসলিমলীগের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকাতেই আগ্রহী ছিল।

১৯৩৭ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক মুসলিমলীগে যোগদান করেন এবং এর ফলে তার মন্ত্রিসভা কার্যত মুসলিমলীগের মন্ত্রিসভায় পরিণত হয়। শেরে বাংলা ফজলুল হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ব্যবহার করে বাংলাকে মুসলিমলীগের দুর্গে পরিণত করা হয়। বাংলার মুসলমানদের নেতা হিসেবে ফজলুল হক মুসলিমলীগের মঞ্চ থেকে উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি দাবী করে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

গর্ভনর জন হার্বার্ট-এর পরামর্শে ফজলুল হক পদত্যাগ করলে খাজা নাজিম উদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে মুসলিমলীগ একটি যথার্থ জাতীয় সংগঠনে পরিণত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম এর নেতৃত্বে মুসলিমলীগ এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের মধ্যে ১১০টি আসন অর্জন করে।[১৭২] ফলে একথা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুসলিমলীগই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একক সংগঠন। তখন পর্যন্ত কংগ্রেস প্রভাবাধীন একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য মুসলমান প্রধান প্রদেশসমূহে লীগের সাফল্য সমভাবে উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিমলীগের সাফল্যের নায়ক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। বৃটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক সকল আলোচনা ও চুক্তিতে মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জিন্নাহর মতামত গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবের ছয় বছর

---

[১৭২] মুসলিমলীগ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2N0mzH3 / অ্যাকসেস ইন ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

পরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইন সভায় মুসলমান সদস্যদের দিল্লি কনভেনশনে 'একটি মুসলমান' রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪আগস্ট স্বাধীনতা অর্জিত হলে মুসলিমলীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলের সংগঠনে পরিণত হয়।

হিন্দু সমাজে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ও স্বদেশী (সন্ত্রাসবাদী) আন্দোলন

শিরোনামে স্বদেশী আন্দোলনের পাশে সন্ত্রাসবাদী শব্দটা লেখার কারণ ইচ্ছেকৃত। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্বদেশী আন্দোলনকে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন ও মহান বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখানো হয়। সেভাবেই ইতিহাস লিখিত হয়েছে। অথচ এই আন্দোলন ছিল মুসলিম বিরোধী। ইংরেজরা কেন মুসলিমদের উপকার করলো এই ক্ষোভ থেকে এই আন্দোলন চলে।

বাংলার হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের ফলে উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এটাকে হিন্দুরা প্রথমত 'জাতীয় ঐক্যের' প্রতি আঘাত বলে অভিহিত করে। অতঃপর নানাভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে থাকে, যথা তাদের 'রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার শাস্তি', 'মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্ব'-এবং অবশেষে এটাকে 'মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' নামে অভিহিত করে। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিলেন। 'জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করা হলো', 'পবিত্র বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করা হলো', 'বৃটিশ সরকার এবং দেশদ্রোহী মুসলমানদের মধ্যে এক অশুভ আঁতাত' প্রভৃতি উত্তেজনাকর উক্তির দ্বারা বাংলার পরিস্থিতি ভয়ংকর করে ফেললো বাংলার হিন্দু সমাজ।

হিন্দু আইনজীবীগণ এর আইনগত বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, বাংলা ভাষার সাহিত্যিকগণ প্রচার শুরু করলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হলো। ব্যবসায়িরা জানালেন তাদের কী রূপ ক্ষতি হলো। এ ধরনের অসংগত ও অবাস্তব প্রচারণার কারণ কি ছিল? মুসলমানদের উপরে হঠাৎ এ আক্রমণ ও অশোভন উক্তি শুরু হলো কেন? আব্বাস আলী খান বলেন প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে বঙ্গভঙ্গে কায়েমী স্বার্থ বিপন্ন ও বেসামাল হয়ে পড়েছিল। যে সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংগালী হিন্দুগণ উভয় বাংলার চাকুরী বাকুরী ও জীবন জীবিকার ওপর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল, তা বঙ্গভঙ্গের

www.pathagar.com

ফলে বিনষ্ট হয়ে গেলো। নতুন বাংলায় মুসলমানরা হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর বশ্যতা ও পরাভব থেকে মুক্তি লাভ করলেন এবং তাদের মনে এ আশার সঞ্চার হলো যে, এখন স্থানীয় সমস্যাদির উপর তাদের কথা বলার অধিকার থাকবে। সামসময়িক লেখক সরদার আলী খান বলেন, "যত সব হৈ হল্লা এবং হঠাৎ রাতারাতি যে দেশপ্রেমের আন্দোলন শুরু হলো মাতৃভূমি অথবা ভারতের কল্যাণের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যে প্রদেশে হিন্দুগণ সুস্পষ্ট সংখ্যালঘু সেখানে তাদের শ্রেণীপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা ব্যতীত অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য এ আন্দোলনের নেই।[১৭৩]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বলেন, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায়। যে ১৬অক্টোবর নতুন বাংলার (পূর্ব বাংলা ও আসাম) সূচনা হয়, সেদিন কোলকাতায় হিন্দুগণ জাতীয় শোকদিবস পালন করেন। ঐ দিন তারা কালো ব্যাজ পরিধান করেন, মাথায় ভস্ম মাখেন, পানাহার পরিত্যাগ করে নানারূপ বিক্ষোভ ধ্বনি সহকারে মিছিল করে গঙ্গাস্নান করেন। অপরাহ্নে এক জনসভায় মিলিত হয়ে তারা বঙ্গভঙ্গ রদের শপথ গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তার 'আমাদের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেন, "যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা একই লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনধীন ছিল। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য পূর্ব বাংলাকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের বিষয় বৃটিশ সরকার অনেকদিন হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। বড়লাট লর্ড কার্জন অবশেষে ভারত সচিবের সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গ বিভাগের অনুকূলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ হওয়া মাত্রই বাংলার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠে। দূর মফঃস্বলেও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিয়া সভাসমিতিতে প্রস্তাব গৃহীত হইতে থাকে"।[১৭৪]

কিছু মুসলমান হিন্দুদের প্রচার ও তথাকথিত দেশপ্রেম আন্দোলনে বিভ্রান্ত হয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে,

---

১৭৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩১৫

১৭৪. আমাদের মুক্তি সংগ্রাম / মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ / পৃ. ১৭৭

www.pathagar.com

বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ শিবাজীকে আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে উপস্থিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুজাতির সুপ্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগ্রত করতে লাগলেন, তখন তারা বঙ্গভঙ্গের সুদূরপ্রসারী মঙ্গল ও তার বিরোধিতার মূল রহস্য উপলব্ধি করে আন্দোলন পরিত্যাগ করেন। এ প্রসংগে আবদুল মওদূদ তার "মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর" গ্রন্থে বলেন –"কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় যে তুমুল আন্দোলন করে, তার প্রতিধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল বৃটেনের সংবাদপত্রগুলি ও বেতনভুক্ত সাংবাদিকরা। নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র ও ডিসপ্যাচ সমূহে যেসব পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হতে লাগলো 'দি টাইমস' ও 'মানচেষ্টার গার্জেনে' তাতে বৃটিশ জনমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অসমর্থ হয়ে। টাইমস পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করে ও কার্জনের কার্যাবলীকে পূর্ণ অনুমোদন জানিয়ে সুন্দর সুন্দর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মানচেষ্টার গার্জেনে বঙ্গভঙ্গকে নিন্দা করে গরম গরম প্রবন্ধ বের হ'তে থাকে, নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ প্রকাশিত হতে থাকে আন্দোলন সম্পর্কে ও বিক্ষোভকে সমর্থন জানিয়ে। কটন, নেভিন্সন ও হার্ডি বিক্ষোভকে সমর্থন করে বিবৃতি প্রচার করতে থাকে।

কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের বিক্ষোভকে নতুন মাত্রা দিতে 'স্বদেশী' নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। সে আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে বিলাতী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের ১৭জুলাই বাগেরহাটে এক জনসভায় বিলাতি পণ্য বর্জন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যতদিন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হবে, ততদিন বৃটিশ পণ্য বর্জন করা হোক। পরবর্তী ছয় মাস সব ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। কোলকাতার রিপন কলেজে দু'দিনব্যাপী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলাতি পণ্য পোড়ানের আহ্বান জানানো হয় এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার প্রতিষ্ঠিত 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন সংঘটিত করে। মহারাজা গিরিজা নাথের সভাপতিত্বে দিনাজপুরে এক সভায় বছরব্যাপী জাতীয়

www.pathagar.com

শোক পালন এবং জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সকল সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাতে যুদ্ধ-মন্ত্রের মতো 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয় এবং বিভক্ত 'বাংলা-মা'- এর পুনঃসংযোজন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।

১৯০৫ সালের ৭আগস্ট কোলকাতার টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে মনীন্দ্রনাথ নন্দীর সভাপতিত্বে বাংলার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ৪৬ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, "বঙ্গ বিচ্ছেদ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ পণ্য ব্যবহার হবে না"। বিলাতি পণ্য বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কর্মচারীদের অফিস বর্জন, সরকারের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাবু অন্নদা চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন। এর কয়েক দিন পর বড়লাটের কাছে বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু নেতাদের সর্বাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫), তার সহযোগী ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯০৫), মোমেনশাহীর অনাথবন্দু গুহ, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অশ্বিনা কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), সিলেটের বিপিন চন্দ্র পাল, কোলকাতার অরবিন্দু বোস (১৮৭২-১৯৫৯), আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।[১৭৫]

১৯০৫ সালের ১৬অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার প্রথম দিনে ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নর্থব্রুক হলের সভাস্থলে মিলিত হয়ে যখন নতুন প্রদেশের উন্নয়নে তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কোলকাতার চেহারা সেদিন সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ সম্পর্কে এম আর আখতার

---

১৭৫. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১২৮

www.pathagar.com

মুকুল লিখেছেন :

"১৬অক্টোবর এদের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখী বন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কোলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগ-জর্জর আনন্দ মোহন বসু 'মিলন মন্দিরের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের জন্য ইংরেজিতে যে ভাষণ লিখে এনেছিলেন তা পড়ে শুনালেন আশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ"।[১৭৬]

হিন্দুদের এইরূপ আন্দোলন বৃটিশদের কাছে ছিল অভাবনীয়। তারা চিন্তাও করতে পারেননি সদা অনুগত হিন্দুরা একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এতটা ক্ষেপে যাবে। হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ শুধু একটাই। চিরশত্রু মুসলিমদের উপকার। এই উপকার সহ্য করতে সক্ষম ছিল না হিন্দুরা। তাদের এই হিংসাত্মক মনোভাব বাংলার শুরু থেকে চলে আসা মুশরিক ও মুসলিমদের মধ্যকার বিভেদকে জাগিয়ে তুলে। রাজনীতিতে উদাসীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমগণও হিন্দুদের মানসিকতার সাথে পরিচিত হয়।

ক্রমেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বর্ণহিন্দু চরমপন্থি নেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯০৬ সালে এসে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। চিত্তরঞ্জন দাসের ইঙ্গিতে অনুশীলত সমিতি এ সময় পুরাপুরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। চিত্তরঞ্জন দাসকে এ সময় হিন্দুরা দেশবন্ধু উপাধি দেয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস আর স্বামী বিবেকান্দের 'নব্য হিন্দুবাদের' দীক্ষাপ্রাপ্ত বর্ণহিন্দুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন এবং কালী মন্দিরকে ঘিরে শক্তি সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। হিন্দুদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে উগ্রমূর্তি নিয়ে হামলা চালাতে থাকে। চরমপন্থিরা ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে নরমপন্থিদের সাথে উত্তপ্ত পরিবেশ

---

১৭৬. কোলকাতা কেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবী / এম আর আখতার মুকুল / পৃ. ২১৩

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্ম-রাজ্যে বিশ্বাসী মারাঠা ব্রাহ্মণ বাল গঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে ১৯০৭ সালে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে মারামারি হয়।[১৭৭]

১৯০৭ সাল ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চরম পর্যায়। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৯১০ সালে এসে এই আন্দোলনের উম্মত্ততা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বর্ণহিন্দু লেখক, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক রচনা ও প্রচারণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সরকার বিরোধীতার সাথে সাথে মুসলিম বিরোধী আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রাখী বন্ধন, কালী মন্দীরে শপথ গ্রহণ, বন্দে মাতরম শ্লোগান, এমনি অসংখ্য হিন্দু আচার এই আন্দোলনের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। রাস্তাঘাটে সর্বত্র বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের সহপাঠি মুসলমান ছাত্রদের মুখ থেকে 'পিঁয়াজের গন্ধ আসে' বলে অভিযোগ তুলে তাদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে। ক্লাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়।[১৭৮]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিমলীগ নামে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিলো। ঐ বছরই অক্টোবরে আগা খানের নেতৃত্বে নেতৃস্থানীয় ৩৬ জন মুসলমানের একটি প্রতিনিধিদল বড়োলাটের সাথে সাক্ষাত করে মুসলমানের জন্যে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানান। বড়োলাট সম্মত হন এবং তারপরও বহু চাপ সৃষ্টির ফলে এবং সৈয়দ আমীর আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'মুসলিমলীগ' এবং মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা –এ দু'টি অর্জন সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে সন্ত্রাসবাদী ও 'স্বদেশী' আন্দোলন এক সাথেই সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

---

১৭৭. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১২৯

১৭৮. অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান / নিরোদচন্দ্র চৌধুরী / পৃ. ২৩৭

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের প্রথম লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ বানচাল করা। দ্বিখন্ডিত 'বাংলা মা'কে পুনর্জীবিত ও সন্তুষ্ট করার জন্যে মানুষের মারণাস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। বোমা বিস্ফোরণে সরকারি অফিস আদালত ধ্বংস করা, সভা সমিতি বানচাল করা, খুন জখম, লুটতরাজ প্রভৃতি চলতে থাকলো পূর্ণ উদ্যমে। মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম ও বগুড়ার প্রফুল্ল চাকী এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও হত্যাকান্ডে আত্মনিয়োগ করলো। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কেউ সমর্থন না করলে তার আর রক্ষা ছিল না। গুন্ডামী ও হত্যাকান্ডের সমালোচনা করলেও তার মুণ্ডুপাত করা হতো। এ কারণে জনৈক হিন্দু সরকারি উকিলকে ১৯০৯ সালে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯১০ সালে ডিএসপি শামসুল আলমকেও হত্যা করা হয়। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে চারবার আক্রমণ করা হয়। ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এলেনের ওপর হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়।[১৭৯]

বঙ্গভঙ্গ সমর্থনকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসবাদীরা ছিল খড়গহস্ত। আবার নিরীহ ও সরল প্রকৃতির কিছু মুসলমানদেরকে তাদের আন্দোলনে ভিড়াবার জন্যে হিন্দুরা অন্যপথ অবলম্বন করলো। 'বঙ্গভঙ্গের ইতিকথায়' ইবনে রায়হান বলেন, হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হিন্দু মুসলিম দু'টি প্রাণ তথা দুই বাংলার মিলনের প্রতীক রাখী বন্ধনী পরিয়ে দিতো মুসলমানদের হাতে, তাদের হৃদয় মন জয় করার জন্যে চারদিক হতে ভেসে আসতো সুললিত কণ্ঠের সুমধুর সুর-

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক
হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক
হে ভগবান।[১৮০]

---

১৭৯. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৩০-৩৩১
১৮০. বঙ্গভঙ্গের ইতিকথা / ইবনে রায়হান / পৃ. ১০-১১

www.pathagar.com

এভাবেও কিছু মুসলিম বিভ্রান্ত হয়েছিল। তবে যখন কালী মন্দিরে শপথ নেওয়া শুরু হয়েছে এবং মুসলিম ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে বোমা হামলা শুরু হয়েছে তখন ফিরে এসেছে। বোমা হামলা করার জন্য সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়া হয়। অথচ এই ক্ষুদিরামকে বাংলাদেশের পাঠ্যবইসহ মূলধারার ইতিহাসে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী হিসেবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসবাদ, নাগরিকদের বিশেষ করে ইংরেজদের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা যতোটা বৃটিশ সরকারকে বিব্রত করে তুলেছিল, সম্ভবত তার চেয়ে অধিক বিব্রত করেছিল –বিলাতী বস্ত্রাদি বর্জননীতি। ম্যানচেষ্টারের কলকারখানাগুলি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। ম্যানচেষ্টার চ্যাম্বার অব কমার্সের কাছে হিন্দু বণিক সমিতির পক্ষ থেকে অনবরত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে বলা হচ্ছিল, 'যদি এ দেশে তোমাদের বস্ত্রাদি চালাতে চাও, তবে বঙ্গভঙ্গ রদ করো'।

বঙ্গভঙ্গ রদ ঠেকাবার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে খাজা সলিমুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে উক্তি করেন তাতে বাংলার মুসলমানদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে অনুন্নত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে চরম আঘাত লেগেছে এবং তাদের ঘরে ঘরে বিষাদের সঞ্চার হয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ফলে অনুন্নত পূর্ব বাংলা ও আসামের অবহেলিত অধিবাসীগণ যে সুযোগ পেয়েছিল এবং বিশেষ করে মুসলমানদের উন্নতির যে সুযোগ পেয়েছিল তা সহ্য করতে না পেরে বিভাগ বিরোধীরা বঙ্গভঙ্গ বানচাল করার জন্যে রাজদ্রোহিতামূলক ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে করে বৃটিশ সরকার এ আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। নবাব সলিমুল্লাহ বৃটিশ সরকারের সমালোচনা করে বলেন "এতদিন সমগ্র প্রাচ্যে মনে করা হতো যাই ঘটুক না কেন বৃটিশ সরকার কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যদি কোনো কারণে এ বিশ্বাস খর্ব হয়, তাহলে ভারতে ও প্রাচ্যে বৃটিশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে"।

নিজের নাক কেটে মুসলিমদের যাত্রা ভঙ্গ করলো মুশরিকরা

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর থেকে এদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন হতে শুরু করে। ঢাকাকে রাজধানী করার জন্য যা যা করা দরকার তার প্রস্তুতি শুরু হয়। যদিও ঢাকা পূর্বেই শহর ছিল তবে প্রায় ১৫০ বছরে এর কোনো

www.pathagar.com

উন্নয়ন হয়নি। ফলে এর অবস্থা ছিল শোচনীয়। এখানে আরেকটি তথ্য বলে রাখা দরকার গোড়া থেকেই ইংরেজদের রাজধানী ছিল বাংলায় তথা কোলকাতায়। কোলকাতা থেকেই সারা ভারতবর্ষ শাসন করতো তারা। ফলে স্বভাবতই কোলকাতা বড় শহরে পরিণত হলো এবং কোলকাতা কেন্দ্রীক ইংরেজদের পোষ্য সিভিল সোসাইটি ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তৈরি হলো। ঢাকাকে রাজধানী করার জন্য অনেকক্ষেত্রেই সেই সিভিল সোসাইটির সাহায্য ইংরেজ সরকার পায়নি। এর মধ্যে কোলকাতায় শুরু হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। সব সমস্যা উত্তরণ করে ঢাকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো ইংরেজরা।

তাই বাংলায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দেওয়া হলো। আরেক বড় সন্ত্রাসী প্রফুল্ল চাকী নিজেই আত্মহত্যা করলো। ফলে এ আন্দোলন ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। ১৯১০ সালের শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে ফিরে আসছিল। আন্দোলনের যোদ্ধারা এক রকম রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ বৎসরেই জনৈক বাঙালি হিন্দু ব্যবস্থাপক সভায় বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরে তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন আন্দোলনের উদ্যোক্তা। তিনিও সবশেষে তার 'বাঙালী' পত্রিকার মাধ্যমে বলেন, "আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে এ বিভাগ টিকে থাকার জন্যে হয়েছে এবং আমরা একে বানচাল করতে চাই না"।[১৮১] সুরেন্দ্রনাথ বাবুর এই কথার পর আর বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু তারপরও হয়েছিল। এর কারণ ছিল কোলকাতা কেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবী। যেটা সন্ত্রাসবাদীরা পারেনি সেটাই পেরেছে বুদ্ধিজীবীরা।রাজা পঞ্চম জর্জ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণের প্রাক্কালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় উপনিবেশকে নিজের মতো সাজাতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন। সেক্ষেত্রে তিনি এই অঞ্চলের মানুষের প্রিয়ভাজন হওয়ার চেষ্টা করলেন। তারই সূত্রে বুদ্ধিজীবীরা তাকে নানান পরামর্শ দিয়েছিল। রাজাও তার কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি তার অভিষেক নিজের মুখে ঘোষণা করার জন্য ১৯১১ সালে ভারতে আগমন করেন। ওনার আসার সময় ভারতবর্ষ স্থিতিশীল ছিল না। বস্তুত ইংরেজদের অপশাসনের কারণে হিন্দুস্থানে কখনোই স্থিতিশীল অবস্থা ছিল না।

১৮১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৩৫

www.pathagar.com

বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা স্থিমিত হলেও তারা পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। সুযোগের অপেক্ষা করছিল। ভারতে তখন দুর্ভিক্ষ বিরাজমান। ইতালী-তুর্কী যুদ্ধের কারণে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ। এসব কারণে পঞ্চম জর্জের মন্ত্রীরা ভারত সফর উচিত হবে না বলে পরামর্শ দেন। কিন্তু রাজা সকল পরামর্শ উপেক্ষা করে ভ্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। নভেম্বর মাসে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ডিসেম্বরের শুরুতে তিনি বোম্বাই বর্তমানে মুম্বাই পৌঁছান। ভারতবাসীর জন্য তিনি কিছু পুরস্কার ঘোষণা করতে চাইলেন। জাঁকজমকপূর্ণ সমাবেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে রাজা পঞ্চম জর্জ রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করলেন। সাথে সাথে তিনি ভারতবর্ষের আস্থা অর্জন করার জন্য কিছু ঘোষণা দেন।

১. সকল রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন
২. শিক্ষার উন্নয়নে মোটা রকমের অংক বরাদ্দ করেন;
৩. ভারতীয় সৈনিকদের জন্যে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' সম্মান লাভের অযোগ্যতা দূর করা হলো,
৪. অল্প বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারীদেরকে অতিরিক্ত অর্ধ মাসের বেতন দেওয়া হলো;
৫. ভারতের রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তরিত করা হলো।
৬. সর্বশেষে বলা হলো 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করা হলো।[১৮২]

বাংলার হিন্দুগণ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়লো। বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা দ্বারা তাৎক্ষণিক সুবিধা এই হলো যে, ভারত সাম্রাজ্যের হিন্দু সাম্প্রদায়িক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির মধ্য দিয়ে রাজদম্পতির নিরাপদ ভ্রমণের নিশ্চয়তা পাওয়া গেলো। কিছুদিন পর যখন রাজা কোলকাতায় এলেন, তখন হিন্দুরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে রাজা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের অসীম আনুগত্য প্রদর্শন করে বিরাট বিরাট শোভাযাত্রা করে। হিন্দু সংবাদপত্র এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, হিন্দু মন্দিরে রাজা ও রাণীর মুর্তি স্থাপনের প্রস্তাব করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়।

---

[১৮২] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৩৬

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গের ফলে তাদের যতটুকু ক্ষতি তার চাইতে বড় ক্ষতি হয়ে গেলো এখন। কিন্তু তারপরও তারা খুশি কারণ মুসলিমদের কোনো উপকার হয়নি। নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো হিংসুক জাতি বাংলার এই মুশরিকরা। কোলকাতা ছিল পুরো ভারতবর্ষের রাজধানী। সেখান থেকে হয়ে গেলো শুধু বাংলার রাজধানী। লাভ হলো শুধু বাংলার আয়তন একটু বেড়েছে। আবার আগের মতো বড় হয়নি। তাদের এত বড় ক্ষতি হওয়ার পরও তারা রাজার সাথে এরকম সিদ্ধান্তে সম্মত হয় শুধুমাত্র মুসলমানদের উন্নতি ঠেকানোর জন্য। কার্যত এটা মুসলিমদের জন্য অকল্যাণ মনে হলেও এর প্রভাব হয়েছে সুদূর প্রসারী। এটা মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্য আলাদা করে ভাবতে শিখিয়েছে। পাশ্চাত্যে পড়াশোনা করা মুসলিম নেতারা হিন্দুদের সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। হিন্দুদের সাথে এক রাষ্ট্রে থাকা সম্ভবপর নয় এই চরমসত্য তাদের উপলব্ধি হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন আলাদাভাবে করতে হবে এটা তারা বুঝে নিয়েছেন। যদিও পাশ্চাত্য ভাবধারার মুসলিমরা বুঝেছেন কিন্তু দেওবন্দ আন্দোলনের মুসলিমরা এক অজানা প্রলোভনে সারা সময় মুশরিকদের সাথেই জোট করেছিলেন। দেওবন্দ আন্দোলনের মুসলিমরা মুসলিমলীগে যোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে তারা মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছেন।

রাজা পঞ্চম জর্জের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলাকে সংযুক্ত করে যুক্তবঙ্গীয় প্রদেশ সৃষ্টি করা হলো। এ প্রদেশ থেকে আসামকে সরিয়ে নেওয়া হলো। বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো বিহার ও উড়িষ্যাকে। এই দুই এলাকা নিয়ে গঠন করা হলো একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। ফলে দেখা গেলো বাংলা প্রদেশ আদতে ছোট হয়ে গেলো। আর বৃটিশ-ভারতের দেড়শ' বছরের পুরোনো রাজধানী স্থানান্তর করা হলো কোলকাতা থেকে দিল্লীতে। কোলকাতার বর্ণহিন্দুরা নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলেন এবং 'জনগণ-মন-অধিনায়ক হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা' বলে পুরোনো সুরে বৃটিশ-প্রভুর জয়গান গাইলেন। ইংরেজ শাসকরাও অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, কোলকাতার বাইরে ভারতের আর কোথাও তাদের জন্য 'অভয়াশ্রম' ছিল না। ১৯১২ সালের ৩০ডিসেম্বর দিল্লীতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন উপলক্ষে চকবাজার থেকে মিছিল বের হলো বড়লাটের নেতৃত্বে। এই মিছিলে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। প্রাচীন রাজধানী দিল্লী এভাবেই ইংরেজদেরকে পুষ্পরেণুর বদলে বারুদ ছিটিয়ে স্বাগত জানালো।

www.pathagar.com

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা ভারতের মুসলমানগণ স্তম্ভিত হলেন। দারুণভাবে আহত হলেন ঢাকার নবাব সলীমুল্লাহ্‌। বাংলার বাইরের মুসলিম নেতাদের সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন নবাব ওয়াকার উল মুলক। তিনি উত্তর প্রদেশের মীরুটের নবাব ছিলেন। দিল্লীর দরবার থেকে ফিরে এসে বঙ্গভঙ্গ রদের মাত্র এক সপ্তাহ পর ১৯১১ সালের ২০ডিসেম্বর তিনি আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেটে 'ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্থা' নামে এক আবেগময় প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি বলেন,

"বঙ্গভঙ্গ রদ করে সরকার মুসলমানদের প্রতি অন্যায় উদাসীনতা দেখিয়েছেন। তাই আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প কর্মপন্থার কথা ভাবতে হবে। মধ্যদিনের আলোকিত সূর্যের মতোই এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানদেরকে সরকারের ওপর নির্ভরশীল থাকার পরামর্শ দেওয়া অর্থহীন। কারোর ওপর ভরসা করার সময় এখন উত্তীর্ণ। নিজেদের শক্তির ওপরই আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে। আমাদের গৌরবান্বিত পূর্ব-পুরুষগণ আমাদের জাতির জন্য সে নজির রেখে গেছেন"। দিল্লীর দরবারে উপস্থিত উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে নবাব সলীমুল্লাহ্‌ ওয়াকার উল মূলক-এর প্রবন্ধ প্রকাশের একই তারিখে অর্থাৎ ১৯১১ সালের ২০ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আট দফা দাবী সম্বলিত একটি পত্র পেশ করেন। সেই আট দফা দাবী হলো, [১৮৩]

১. বঙ্গ প্রেসিডেন্সির গভর্নর কোলকাতা ও ঢাকা এই উভয় রাজধানীতে সমভাবে অবস্থান করবেন;

২. বঙ্গ প্রেসিডেন্সির মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যানুপাতিক হারে ব্যবস্থাপক পরিষদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাসমূহে সুযোগ দিতে হবে;

৩. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে অথবা পূর্ববঙ্গের রাজস্ব এখানকার জেলাসমূহের শাসন-ব্যবস্থা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে হবে;

৪. সরকারি চাকরিতে আরো অধিকহারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে এবং পালাক্রমে একজন হিন্দুর পর একজন মুসলমান সদস্য বঙ্গ প্রেসিডেন্সির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নিয়োগ করতে হবে;

---

১৮৩. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১৩৭-১৩৮

www.pathagar.com

৫. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এমন একজন অফিসার থাকতে হবে, যিনি পূর্ববাংলার প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;

৬. ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে এমন দু'জন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে, যাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য একজন যুগ্ম পরিচালক বা সহ-পরিচালক নিয়োগ করতে হবে;

৭. মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা খাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

৮. মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৯১২ সালে মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নবাব খাজা সলিমুল্লাহ্ বলেন, "বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেমে যাওয়ার পর প্রসঙ্গটি পুনরায় উত্থাপনের কোনো ন্যায়সংগত কারণ কোনো দায়িত্বশীল বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি আবিষ্কার করতে পারেনি। এ বিভাগ ১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে ১৯১১ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা দেখে আমাদের শত্রুগণ ব্যথিত হয়ে পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে বিভাগের ফলে আমরা তেমন বিশেষ কিছুই লাভ করিনি। যতটুকুই লাভ করেছিলাম আমাদের প্রতিবেশী অন্যসম্প্রদায় স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন সৃষ্টি করে তাও আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নিলো। হত্যা ও দস্যুবৃত্তি করে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করলো, তারা বিলাতী দ্রব্যাদি বর্জন করলো। সরকার এতে কিছুই মনে করলেন না। এসব হত্যাকান্ডে মুসলমানগণ অংশগ্রহণ না করে সরকারের প্রতি অনুগতই রইলো। বিভাগের ফলে মুসলমান কৃষককুল লাভবান হলো। হিন্দু জমিদারগণ তাদেরকে আন্দোলনে টেনে নামাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তারা কর্ণপাত করলো না। এতে করে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ শুরু হলো। সরকার দমননীতি অবলম্বন করলেন। তাতে ফল হলো না। একদিকে ছিল সম্পদশালী বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায় এবং অপরদিকে দরিদ্র মুসলমান এবং এরা ছিল সরকারের সাথে। এভাবে কয়েক বছর অতিবাহিত হলো। আকস্মিকভাবে সরকার বিভাগ রদ করে দিলেন। এ বিষয়ে আমাদের সাথে কোনো আলাপ আলোচনাও করা হলো না"।[১৮৪]

---

১৮৪. Muslim Separatism in India / Abdul Hamid / P. 92

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে বাংলার মুসলিম নেতা এ কে ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৩-১৪ সালের বাজেট অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, *ভারত সরকারের ২৫আগস্টের প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, বঙ্গভঙ্গ রদের দরুন যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তার দ্বারা মুসলিম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না, তারপর আঠার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং এখন দেখার সময় এসেছে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি কতখানি পালন করেন। দিল্লী দরবারের ঘোষণার অল্পদিন পর বড়লাট যখন ঢাকায় পদার্পণ করেন, তখন প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে, মুসলমানদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি কোনো একটা ঘোষনা করবেন। অবশ্য আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো যে আমরা যা আশা করেছিলাম, সেদিক দিয়ে এ অতি তুচ্ছ। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বকে ছোট করতে চাই না। কারণ, পূর্ব বাংলার শিক্ষার উন্নয়নে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল, তা এর দ্বারা বিদূরিত হবে। একটি মুসলিম কেন্দ্রে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অশেষ সুযোগ সুবিধার কথাও অস্বীকার করি না।*

কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধু মুসলমানদের উপকারার্থে করা হচ্ছে অথবা এটা হচ্ছে মুসলমানদের খুশী করার একটা বিশেষ পদক্ষেপ, আমি এসবের প্রতিবাদ করছি। বড়লাট সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জন্যে এবং তাই হওয়া উচিত'। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরিকল্পিত একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজ – এটাকে মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহ করার অভিপ্রায় বলেও ধরা যেতে পারে না। কারণ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে ষোল আনা শিক্ষক-কর্মচারী ও প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জামাদিসহ সরকার কোলকাতায় একটি একচেটিয়া হিন্দু-কলেজ চালিয়ে আসছেন এবং ঢাকায় একটি মুসলিম কলেজ হলে তা হবে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের অবহেলিত দাবীর দীর্ঘসূত্রী স্বীকৃতি।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সম্পর্কে কথা এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবত আরবী ও ফার্সী শিক্ষার বাসনা পোষণ করে আসছে, সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামের শুধু স্বাভাবিক ফলমাত্র এই ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ। এটা সকলের জানা না থাকতে পারে যে, পূর্ব বাংলার জেলাগুলি থেকে অধিক সংখ্যক ছাত্র বাংলাদেশের মাদরাসাগুলিতে পড়াশুনা করে এবং এই

www.pathagar.com

শ্রেণীর অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের কোনো ব্যবস্থা ব্যতীত একটি বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হতো না। আমি আশা করি সরকারি কর্মকর্তাগণ এ কথা উপলব্ধি করবেন যে, যদিও মুসলমানগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই রায় দিয়েছে, কিন্তু এটাকে এমনকি একটি মুসলিম কলেজ এবং ফ্যাকাল্টি অব ইসলামিক স্টাডিজকেও তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ বলে তারা মনে করে না।[১৮৫] [১৮৬]

ফজলুল হকের উপরের বক্তব্যে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তথা মুসলমানদের কোনো সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে হিন্দু ভারত ও ইংরেজদের মানসিকতা ও আচরণ কী ছিল। শুধু তাই নয় অসন্তুষ্ট মুসলিমদের শান্ত করার জন্য ইংরেজরা যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে, তা ঘোষণার সাথে সাথেই শুরু হয় এর বিরুদ্ধে আন্দোলন। যদিও এই আন্দোলন ধোপে টিকে নাই তবুও মুশরিকদের নীচু মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানেও ইংরেজরা তাদের আজ্ঞাবহ হিন্দুদের খুশি করেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এই যেহেতু শিক্ষা রিলেটেড বিষয়, তাই এর জন্য সবচেয়ে বেশি লড়েছেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো চারটি নতুন সাবজেক্ট যোগ করা, কোলকাতা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পাঠানো হবে, সিন্ডিকেটে আশুতোশ থাকবে এমন কিছু শর্তে তারা আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে আনে।

মুশরিকদের সাথে ঐক্যের কিছু ব্যর্থ চেষ্টা

বঙ্গভঙ্গ ইস্যুতে হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিকবৃন্দ একেবারে দুই মেরুর বাসিন্দা হয়ে পড়লেন। মুসলিম রাজনীতিবিদরা মনে করেছেন হিন্দুদের সাথে আর যুগপৎ রাজনীতি করার সুযোগ নেই। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এবং যুগপৎভাবে আন্দোলন করে ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতা আদায় করার লক্ষ্যে কিছু মানুষ উদ্যোগী হন। এর মধ্যে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ও তার অনুসারীদের একজন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন অন্যতম। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আগে

১৮৫. Bangladesh Historical Studies Speech ni the budget for 1913-14 / P.149-50

১৮৬. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৪১-৩৪২

www.pathagar.com

থেকেই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯১২ সালে মুসলিমলীগের কনফারেন্সে তিনি যোগ দেন কিন্তু লীগের সদস্য হননি। যদিও মুসলিমলীগ নেতারা চেয়েছেন তার মতো একজন মেধাবী ও দূরদর্শী লোক মুসলিমলীগের নেতৃত্বে আসুক। কিন্তু জিন্নাহ্ চাইতেন অন্যকিছু। তিনি ধর্মীয় ভাবধারার মানুষ ছিলেন না। আপাদমস্তক সেকুল্যার ছিলেন। তাই তিনি মুসলিমলীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমন্বয় করতে চাইলেন।

এদিকে ১৯০৫ সালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এরপর তিনি তার এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে তার দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী তিলকের ক্ষমতা খর্ব করার কাজে ব্যবহার করেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির মনোনয়ন থেকে তিলকের নাম বাদ দেওয়া হয়। ফলে কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। গোখলে ও তিলক যথাক্রমে নরমপন্থী ও চরমপন্থী গোষ্ঠীর নেতৃত্বদান করতে থাকেন। এই চরমপন্থীদেরই পরবর্তীকালে বলা হতো উগ্র জাতীয়তাবাদী। তিলক গণআন্দোলন ও প্রত্যক্ষ বিপ্লবের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের ডাক দেন। অন্যদিকে গোখলে সংস্কারপন্থীই থেকে যান। কংগ্রেস দলও এই বিবাদের জেরে দু'টি শাখায় ভেঙে গিয়ে এক দশকের জন্য অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১৯১২ সালে মুসলিমলীগ কাউন্সিললীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯১৩ সালে মুসলিমলীগের নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯১৩ সালেই মুসলিমলীগ স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং হিন্দু মুসলিম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব রাখে। কংগ্রেস ও লীগের পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে একই স্থানে দুই দলের অধিবেশন ডাকা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় বৃটেনের তুরস্ক বিরোধী নীতি ভারতীয় মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী করে তোলে। এই সময়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করার আগ্রহ দেখা দেয়। এই আগ্রহের ফলেই ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। হিন্দু চরমপন্থি নেতা বালগঙ্গাধর তিলক মুসলিমদের সাথে চুক্তি করতে রাজি হলে কংগ্রেসের দুই অংশের মধ্যেও দূরত্ব ঘুঁচে যায়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও এ, কে, ফজলুল হকসহ ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের

www.pathagar.com

চেষ্টায় ১৯১৬ সালে মুসলিমলীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটি শাসনতান্ত্রিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। 'লক্ষ্মৌ চুক্তি' নামে পরিচিত এই চুক্তিতে মুসলিমলীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা ও আইনসভাগুলোর আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিধান স্বীকৃত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এই চুক্তির পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল। তখন বাংলার লোকসংখ্যার ৫৪ শতাংশ ছিল মুসলমান। সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদের অতিরিক্ত আসন দেওয়ার স্বার্থে ফজলুল হকসহ মুসলিম নেতাগণ বাংলাদেশের আইন সভায় মুসলমানদের জন্য মাত্র শতকরা ৪০টি আসন নিতে সম্মত হন। বাকী আসনগুলো বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ছেড়ে দেন। পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ। পাঞ্জাবের মুসলমান নেতাগণ শতকরা ৫০টি আসন রেখে বাকি পাঁচ ভাগ আসন অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানদের সুবিধার জন্য ছেড়ে দেন। ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে বাংলার মুসলমানদের ত্যাগ ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা।[১৮৭]

যে বিষয়গুলোতে মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস ঐক্যমত পোষণ করে তা হলো,

(ক) মুসলিমলীগ কংগ্রেসের 'স্বরাজ' বা স্বায়ত্তশাসনের নীতি মেনে নেবে।

(খ) কংগ্রেসও মুসলিমলীগের পৃথক নির্বাচন নীতির স্বীকৃতি জানাবে।

(গ) প্রতিটি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য হবেন মুসলিম প্রতিনিধি।

(ঘ) মুসলিমলীগ ও কংগ্রেসের সদস্যরা যৌথভাবে স্বরাজ আদায়ের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে। চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে, উভয় দলই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট দিন, তারিখ, প্রভৃতি ঘোষণার দাবী জানাবে।[১৮৮]

এরপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র রচিত হয়। রাউলটি বিলের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের এপ্রিলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে কয়েক'শ লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে সারা দেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফজলুল হক, সিআর দাস, মতিলাল নেহেরু ও তাইয়েবজীকে নিয়ে

---

১৮৭. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১৪৬-১৪৭

১৮৮. লখনউ চুক্তি (Lucknow Pact) / https://bit.ly/3p1t2in / অ্যাকসেস ইন ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

এ উপলক্ষে এক বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সে বছরই মওলানা আবদুল বারীর নেতৃত্বে লক্ষৌতে তুরস্কের অখণ্ডত্ব ও খলীফার মর্যাদা রক্ষার দাবীতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ১৪ নভেম্বর দিল্লীতে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশনে খিলাফত সংক্রান্ত দাবীর ভিত্তিতে মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের সাথে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।

১৯২০ সালের জুন মাসে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ৩১আগস্ট মুসলমানরা খিলাফত দিবস পালন করে। সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস, মুসলিমলীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কোলকাতায় এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু অসহযোগ উপলক্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে স্কুল-কলেজ বয়কটের যে কর্মসূচি গৃহিত হয়, জিন্নাহ, ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ তার বিরোধিতা করেন। তারা উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানরা এর ফলে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফজলুল হক স্পষ্টতই ঘোষণা করেন যে, অসহযোগের নামে স্কুল-কলেজ বয়কট করলে শিক্ষায় শত বছর ধরে এগিয়ে যাওয়া হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু মুসলমানরা, যারা নতুন করে মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তারা আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

১৯২০ সালের ১২ডিসেম্বর সি আর দাস (চিত্ত রঞ্জন দাস) ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে ছাত্রদেরকে স্কুল কলেজ বর্জনের আহ্বান জানান। পরদিনই ফজলুল হক একই ময়দানে সভা করে ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজ বর্জন না করার পরামর্শ দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগে অগ্রণী মুসলিম নেতৃবৃন্দও সে সময় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ঐক্যবব্ধ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে মুসলিম জনগণকে দমিয়ে দেওয়ার একটি কারসাজি কাজ করছে।

স্কুল-কলেজ বয়কটের ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে মতদ্বৈততার কারণে ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত অসহযোগ কর্মসূচি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। উগ্রবাদী হিন্দুদের কারণে অসহযোগ আন্দোলন কার্যত মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সময় হিন্দুদের ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী উত্থান ঘটে। হিন্দুরা ‘শুদ্ধি আন্দোলন’ শুরু করে। তা ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীর হাত থেকে কার্যত

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়। যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরায় একটি থানা আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের ফলে ২২ জন পুলিশ মারা যাওয়ার পর গান্ধী হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন।

বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩

কংগ্রেসের সাতে মতানৈক্যের কারণে সি আর দাস ১৯২২ সালে সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। সি আর দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'স্বরাজ পার্টি' গঠিত হয়। এই দুই নেতা মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংগ্রাম ছাড়া বাংলার স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয়। এ জন্য তারা দীর্ঘ অবহেলিত মুসলমানদের সঙ্গত অধিকারসমূহের প্রতি কিছু সহানুভূতি দেখানো অপরিহার্য বিবেচনা করেন। এ পটভূমিতেই সি আর দাস তৎকালীন বাংলার নেতা সোহরাওয়ার্দীর সাথে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামক রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন।

সি.আর দাস তার রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন সভার মুসলিম সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বাংলার বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের সঙ্গে যুগপৎ আলোচনা চালান এবং এর ফলশ্রুতিতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তাদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। চুক্তিটির (যা সাধারণত বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত) শর্তাবলি (বিধানসমূহ) ১৯২৩-এর ১৬ডিসেম্বর স্বরাজ্য দলীয় সদস্যদের সভায় অনুমোদিত হয়। এ সভায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয় যে, প্রদেশে সত্যিকারের স্ব-নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই এ চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ১৯২৩ সালের ১৮ডিসেম্বর তারিখের সভায়ও অনুমোদন লাভ করে। চুক্তিটির বিভিন্ন শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ : [১৮৯]

১. বঙ্গীয়-আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

২. স্থানীয় পরিষদসমূহে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শতকরা ৬০ ভাগ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শতকরা ৪০ ভাগ।

---

১৮৯. বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3a1cUJa / অ্যাকসেস ইন ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

৩. সরকারি চাকরির শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ পদ পাবে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে।

৪. কোনো সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৭৫ শতাংশের সম্মতি ব্যতিরেকে এমন কোনো আইন বা সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা যাবে না, যা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বার্থের পরিপন্থী।

৫. মসজিদের সামনে বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করা যাবে না।

৬. আইন সভায় খাদ্যের প্রয়োজনে গো-জবাই সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে না।

চুক্তিটি প্রচারিত হওয়ার পরপরই বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করে। এ চুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে প্রবল বিরোধিতা করে। হিন্দু নেতাদের মধ্যে যারা চুক্তিটির বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন এস.এন ব্যানার্জী ও বি.সি. পাল। এ চুক্তির বিরুদ্ধে, যা তাদের ভাষায় এক-তরফা ছিল, হিন্দু জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে বাংলার হিন্দু গণমাধ্যম এর বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে। সি.আর দাশের নিজ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা তাকে সুবিধাবাদী ও মুসলিম পক্ষপাতদোষে দুষ্ট বলে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি কিন্তু সকল বিরোধিতার মুখেও অটল থাকেন। চুক্তিটির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ সম্ভবপর নয়।

এরপর ১৯২৮ সালের নেহেরু-কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কংগ্রেস কোনো কারণ ছাড়াই লক্ষ্ণৌ চুক্তিতে স্বীকৃত মুসলমানদের সকল দাবী অস্বীকার করে। কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যাবতীয় আয়োজন ধ্বসে পড়ে।[১৯০] এখানে বলে রাখা জরুরী গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে মতবিরোধ তৈরি হলে ১৯২০ সালে জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এরপর মুসলিমলীগে জয়েন করেন। কিন্তু দৃশ্যত রাজনীতি থেকে দূরে চলে যান। এরপর মুসলিম নেতাদের অনুরোধে তিনি মুসলিমলীগের পক্ষে রাজনীতি করতে সম্মত হন এবং লন্ডন থেকে পুরোপুরি ভারতে চলে আসেন।

১৯২৯ সালে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জিন্নাহ চৌদ্দ দফা দাবী উত্থাপন

---

১৯০. আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা / মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ১৪৯

www.pathagar.com

করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সব দাবী অগ্রাহ্য করেন। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু করে লণ্ডনে তিন দফা গোলটেবিল বৈঠকেও ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের দাবী-দাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়নি। এরপরও 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩৫ সালে জিন্নাহ্ লীগের সভাপতি হন। একই বছর কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সাথে তার আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি গান্ধীর সাথে পত্র বিনিময় করেন। গান্ধী মুসলিমলীগকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিতেই অস্বীকার করেন। জিন্নাহ্‌র সাথে পত্রালাপে জওহরলাল নেহেরু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনায় মুসলিমলীগকে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ্ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে পত্র বিনিময় করেও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হন। এভাবেই হিন্দু-মুসলিম একের পর এক চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে জিন্নাহ্‌র বোধোদয় হয় এবং তিনি নিশ্চিত হন এই মুশরিকদের সাথে মুসলিমরা এক দেশে থাকতে পারবে না।

রেশমি রুমাল আন্দোলনের ইতিকথা

উসমানীয় সুলতান আব্দুল হামিদ খান দ্বিতীয়। উপমহাদেশে ওনার এক ব্যর্থ পরিকল্পনার কাহিনী হলো এই আন্দোলন।

আব্দুল হামিদের মূল শত্রু ছিল বৃটিশরা। বৃটিশরা বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চল তাদের উপনিবেশে পরিণত করছে। এমনকি তুর্কি সালতানাতের অঞ্চলগুলো দখলের চেষ্টা চালায়, বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ উস্কে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা গোটা তুর্কি সালতানাতই দখলের প্রচেষ্টা চালায় আব্দুল হামিদের সময়। আব্দুল হামিদও তাদের ষড়যন্ত্র দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে থাকে।

এই মোকাবেলার অংশ হিসেবে আব্দুল হামিদ বৃটিশ শাসিত হিন্দুস্থানে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করে। তার এই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয় দেওবন্দি আলেম শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একটি বিপ্লবী দল গঠন করে মাহমুদুল হাসান তার ছাত্রদের দ্বারা।

www.pathagar.com

এদিকে তুরস্কে বৃটিশদের তত্ত্বাবধানে তরুণ তুর্কি নামে একদল সেক্যুলার যুবকদের উত্থান হয়। ১৯০৯ সালে তারা বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীনতার নামে সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আব্দুল হামিদ তার ছোট ভাইয়ের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ফলে এদেশের স্বাধীনতাকামীদের সাথে তুরস্কের যোগাযোগে ফাটল সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

বৃটিশদের বিরুদ্ধে অবস্থান হেতু তুরস্ক মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। তুরস্ক ভারতে বিদ্রোহ তৈরি করে বৃটিশদের চাপে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু স্বাধীনতার মূল দাবীদার কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ আগেই বৃটিশদের সাথে সমঝোতা করে যেন তারা বৃটিশদের অনুগত থাকবে যুদ্ধের সময়। বিনিময়ে ভারতে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে। এজন্য তারা চুপ থাকে।

তুরস্ক বাধ্য হয়ে দেওবন্দি আলেম মাহমুদুল হাসানের সাথে যোগাযোগ করে আবার তাদের সংগঠিত করে। ভারতীয়দের মধ্যে স্বাধীনতাকামীর সংখ্যা কম ছিল না। তুর্কিরা জার্মানিতে অধ্যায়নরত কিছু ভারতীয় ছাত্র ও স্বাধীনতাকামী কিছু বুদ্ধিজীবীর মাধ্যমে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য আফগানিস্তানের আমীরের সাথেও তারা যোগাযোগ করে। আফগানিস্তান যদিও স্বাধীন ছিল তথাপি তারা বৃটিশদের সাথে নানা চুক্তি ও ঘেরাও-এর মধ্যে ছিল। কার্যত অনেকটাই বৃটিশ অনুগত থাকতে হতো।

তুরস্ক এ সময় মওলানা মাহমুদুল হাসানকে তুর্কি ও আফগান সরকারের সাথে প্রত্যক্ষ আলাপ আলোচনার জন্য দায়িত্ব দেয়। তাদের এই কার্যক্রম বৃটিশ সরকার টের পেয়ে যায়। মাহমুদুল হাসান ও সঙ্গীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। মাহমুদুল হাসান তার ছাত্র ওবাইদুল্লাহ সিন্ধিকে পাঠিয়ে দেন কাবুলের পথে এবং নিজে রওনা হন মক্কার পথে। কাবুলে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল আফগান সরকারের সহযোগিতা নিশ্চিত করা ও আফগান সীমান্তে থাকা স্বাধীনতাকামীদেরকে সংগঠিত করে ভারতের আজাদী আন্দোলনের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা।

ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি কাবুল পৌঁছেন। কাবুল আমীরকে সহযোগিতায় রাজি করান। তিনি তুর্কি ও জার্মানি মিশনের সাথে কাজ করতে রাজি হন। ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি সেখানে গিয়ে অনেক স্বাধীনতাকামীদের দেখতে পান এবং সেখানে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন। তুর্কি- জার্মান মিশনের সমন্বয়কারী প্রতিনিধি

www.pathagar.com

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে এই সরকারের প্রেসিডেন্ট, বরকতুল্লাহ্ প্রধানমন্ত্রী এবং ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন।

এদিকে মাহমুদুল হাসান মক্কা পৌঁছেন। মক্কা মদিনা তখন ছিল তুর্কি খেলাফতের অংশ। তিনি গিয়ে তুর্কি গভর্নর গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করেন। গালিব পাশার তখন ধর্মীয় প্রভাব ছিল অনেক। তিনি দু'টি পত্র লিখেন। একটি পাঠানো হয় মদিনার গভর্নর বসরী পাশার কাছে আরেকটি আফগান গোত্রপতি মুসলমানদের কাছে। এতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান ছিল।

সে সময় তুর্কি যুদ্ধ মন্ত্রী আনোয়ার পাশা মদিনায় এসেছিলেন। মাহমুদুল হাসান তার সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। তিনি শায়খুল হিন্দকে তিনটি চিঠি লিখে দিলেন। একটি ছিল অস্থায়ী ভারত সরকার ও তুর্কি সরকারের মধ্যকার চুক্তিনামা। দ্বিতীয়টি মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে শায়খুল হিন্দকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান। তৃতীয়টি ছিল আফগান সরকারের প্রতি।

আনোয়ার পাশার সাথে সাক্ষাতের সময় সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আফগান সরকার সম্মত থাকলে তুর্কি বাহিনী সীমান্তে অবস্থান নিবে। সুযোগ মতো সেই বাহিনী ভারতে প্রবেশ করবে এবং অভ্যুত্থান ঘটাবে। সেই সময় শায়খুল হিন্দ আফগানিস্তান থেকে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা দিবেন এবং তুর্কি বাহিনীর রসদের যোগান দিবেন এক্ষেত্রে সাহায্য করবেন আফগান আমীর।

ওবাইদুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে এই পত্র আফগান সরকারের নিকট পৌঁছানো হলো। কিন্তু তিনি বৃটিশদের চাপের কথা তুলে প্রথমে সম্মতি দিতে চাইলেন না। পরে এই মর্মে চুক্তি হলো আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবে, সাহায্য যা করার গোপনে করবে এবং তুর্কি বাহিনী আফগান সীমান্ত দিয়েই ভারতে প্রবেশ করবে। আর যদি কোনো আফগানী এই যুদ্ধে যেতে চায় তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো নিষেধ থাকবে না। ইংরেজদেরকে দেওয়ার জন্য কৈফিয়তও প্রস্তুত রাখা হলো, "সীমান্তের স্বাধীনতাকামীদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আফগান সরকার"।

ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি মাহমুদুল হাসানের বার্তা পাঠান হিন্দুস্থানে অবস্থানরত দেওবন্দীদের কাছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই চিঠি ধরা পড়ে যায় বৃটিশ

www.pathagar.com

গোয়েন্দাদের কাছে। পুরো প্ল্যান ফাঁস হয়ে যায়। কওমী নেতাদের এরেস্ট করা শুরু করে বৃটিশ সরকার। তুর্কিদের একটি প্ল্যান এভাবে ভেস্তে যায়। ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি আফগানিস্তান থেকে তুর্কিতে পালিয়ে যায়। ফলে তাকে এরেস্ট করা সম্ভব হয়নি। তবে মূল নেতা মাহমুদুল হাসান মক্কায় এরেস্ট হন। মক্কায় তখন শরীফ হুসেইন নামে এক হাশেমীয় নেতা বৃটিশদের সহায়তায় বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে থাকে। শরীফ খুব জনপ্রিয় ছিল আরবদের কাছে। বৃটিশরা শরীফের সাহায্যে মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে এরেস্ট করে।

এরপর মাহমুদুল হাসান, হোসাইন আহমেদ মাদানীসহ অপরাপর দেওবন্দী নেতাদের দ্বীপরাষ্ট্র মাল্টায় নির্বাসন দেন। তিন বছর পর ১৯২০ সালের শুরুতে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি পেয়ে তারা খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। তবে মাহমুদুল হাসান আর বেশিদিন বাঁচেননি। ওই বছরই নভেম্বরে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের আগে আজাদি আন্দোলনে কংগ্রেসকে সহায়তা ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির সাথে দেওবন্দীদের আন্দোলন করার পরামর্শ দেন।

তার সিদ্ধান্ত অনুসারে দেওবন্দীদের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ সব সময় মুশরিকদের সংগঠন কংগ্রেসকে সাপোর্ট করে এবং মুসলিমলীগের বিরোধীতা করে। তবে এই মতের বিরোধী ছিলেন আরেক দেওবন্দী আলেম হাকিমুল উম্মত আশ্রাফ আলী থানবী রহ.। পাকিস্তান আন্দোলন যখন চরমে তখন মওলানা থানবী'র অনুসারী সাব্বির আহমেদ ওসমানী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ থেকে আলাদা হয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে আলাদা আরেকটি সংগঠন তৈরি করেন। এই সংগঠন পাকিস্তান আন্দোলনকে সাপোর্ট করেন এবং মুসলিমলীগের পক্ষে কাজ করেন।

মওলানা মাহমুদুল হাসানের এই বিদ্রোহ "রেশমি রুমাল আন্দোলন" নাম দিয়েছে মূলত ইংরেজরা। কারণ ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি বার্তাটি লিখে পাঠান একটি রুমালে করে যা রেশমি কাপড়ের ছিল। অর্থাৎ ইংরেজ গোয়েন্দারা যে চিঠিটি পায় তা লেখা রেশমি কাপড়ের রুমালে। সেখান থেকেই এই আন্দোলনের এরূপ নাম হয়।

রেশমি রুমাল আন্দোলন হিন্দুস্তানে ইংরেজের সাথে যুদ্ধ করার সেনাদল তৈরি করে তার নাম দেয় 'জুনুদে রব্বানিয়া'। নিম্নোক্ত নেতৃবর্গ ছিলেন এ সেনাদলের প্রথম সারিতে :

www.pathagar.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : তুরস্কের সুলতান মেহমেদ খান পঞ্চম, ইরানের সুলতান আহমদ শাহ কাচার, আফগানিস্তানের আমীর হাবিবুল্লাহ খান।

সহকারী পৃষ্ঠপোষক : আনোয়ার পাশা, তুরস্কের যুবরাজ, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী, আফগানিস্তানের সহকারী রাষ্ট্রপ্রধান সরদার নসরুল্লাহ খান, হায়দরাবাদের নিজাম, ভূপালের নওয়াব, রামপুরের নওয়াব, বাহাওয়ালপুরের নিজাম, ইয়াগিস্তানের মুজাহিদ দলের প্রধান।

প্রধান সেনাপতি : শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান এবং সহকারী সেনাপতি : মওলানা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি।

বিভাগীয় সেনাপতিবৃন্দ : মওলানা আবদুর রহীম, মওলানা গোলাম মুহাম্মাদ দীনপুরী, মওলানা তাজ মাহমুদ আনরুজ, মওলবী হুসাইন আহমদ মাদানী, মওলবী হামদুল্লাহ, হাজী তরঙ্গ যই, ডা. মুখতার আহমদ আনসারী, মুল্লা সাহেব বাবড়া, জান সাহেব বাজোড়, মওলবী মুহাম্মাদ মিয়া, হাকিম আবদুর রাজ্জাক, মওলবী ওবাইদুল্লাহ গাজীপুর, মওলবী আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহলী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর, মওলানা শওকত আলী, মওলানা জাফর আলী খান, মওলানা হাসরাত মোহানী, মওলবী আবদুল কাদের কাসুরী ও পীর আসাদুল্লাহ শাহ সিন্ধি।

রেশমি রুমাল আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবর্গের সংখ্যা দু'শো বাইশের মতো। সাধারণ লোকেরাও এর মধ্যে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে চলছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শুরু করে সিন্ধু, পাঞ্জাব, দিল্লী, অযোধ্যা পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। [১৯১]

খেলাফত আন্দোলন

বাংলা এবং উপমহাদেশের মুসলিমরা ইংরেজদের কাছে ক্ষমতা হারিয়ে ও নির্যাতিত হয়ে দারুণভাবে হতাশ ছিল। সেই হতাশার মধ্যে একটু আশার প্রদীপ ছিল তুর্কি সালতানাত। বিশাল সালতানাত মুসলিমদের বুকে সাহস যোগাতো। এদেশের মুসলিমরা তাদের মনোবেদনায় কিছুটা সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছিল তুরস্কের সুলতানকে অবলম্বন করে।

১৯১. মওলানা মাহমুদ হাসান: রেশমি রুমাল আন্দোলনের নেতা / কে. এস. সিদ্দিকী / দৈনিক ইনকিলাব / ৩ নভেম্বর, ২০১৭

www.pathagar.com

তুরস্ক শুধু মুসলিম রাষ্ট্র মাত্র ছিল না, বরঞ্চ তুরস্কের সুলতানকে মুসিলম জাহানের খলিফা ও মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক মনে করা হতো। অবশ্য যতদিন ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য শক্তিশালী ছিল, ততোদিন তুরস্কের সুলতানকে এ মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

যাই হোক, পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে প্যান ইসলামী চেতনা জাগ্রত হয়। এজন্য জামালুদ্দিন আফগানীর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন তুরস্কের শেষ কার্যকর সুলতান আব্দুল হামিদ দ্বিতীয়। জামালুদ্দিনের বিশ্বব্যাপী প্রচারের ফলে তুরস্কের সুলতানকেই এদেশের মুসলিমরা ঐক্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশের বিপক্ষ দলে যোগদান করে। ভারতীয় মুসলমান আশা করেছিল, বৃটিশকে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে তুরস্ককে কোনো প্রকার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। লয়েড জর্জ সে ধরনের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল বৃটিশদের উদ্দেশ্য। তার জন্যেই লরেন্সকে পাঠানো হয় আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তার বিষাক্ত মন্ত্রপ্রচারক হিসেবে। মক্কার শরীফ হুসাইন হাশেমী লরেন্সের প্রচারণায় প্রভাবিত হয়ে 'আরবদের জাতীয় স্বাধীনতার' নামে বিশ্বমুসলিম ঐক্য উপেক্ষা করে মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে। সে ছিল কুরাইশ বংশের বনু হাশেমের বংশধর। তুর্কি সালতানাতে ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণ আঞ্চলিক জাতীয়তার বিষবাষ্পে তুরস্কের সুলতানাত তথা মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতীক বিনষ্ট করাই ছিল বৃটিশের লক্ষ্য এবং তা ফলপ্রসূ হলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সম্মিলিত বৃটিশ-আমেরিকা শক্তির জয় হলো এবং তারা যুদ্ধে জয়ী হবার সাথে সাথেই একটি গোপন চুক্তির মাধ্যমে বিরাট তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ বন্টন করে ফেলে। ১৯১৯ সালের মে মাসে উসমানী রাজধানীতে নামসর্বস্ব সুলতান রয়ে গেলো। আলজেরিয়া থেকে বাহরাইন পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল খন্ডবিখন্ড করে ফ্রান্স, গ্রীস ও বৃটেনের মধ্যে বিতরণ করা হলো।

এভাবে উসমানীয় রাষ্ট্রকে খন্ডবিখন্ড করার কারণে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভারতের ভাইসরয়ের কাছে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর এবং সাইয়েদ সুলাইমান নদভী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডন গমন করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকটে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। প্রত্যুত্তরে বলা হলো যে, শুধু তুরস্কের

www.pathagar.com

ভূখন্ড ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চল তুরস্ককে দেওয়া যাবে না। মুসলিম নেতারা তুরস্কে খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতে শুরু করে প্রচণ্ড আন্দোলন। যা 'খেলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়।

একটি খেলাফত কমিটি গঠিত হলো। সারা ভারতে বিশেষত বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ তৈরি হলো। মুসলিমদের এই জাগরণ প্রচেষ্টার পথিকৃৎ ছিলেন মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর। তিনি ছিলেন 'মুক্ত ভারতে মুক্ত ইসলাম' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নদিশারী। তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ও বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সঞ্চারে সক্ষম হন। খেলাফত আন্দোলনে সাড়া দেওয়াকে তিনি প্রতিটি মুসলমানের ফরজ বলে উল্লেখ করেন।

তিনি এতোটাই আন্দোলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কংগ্রেস সমর্থক দেওবন্দী আলেমদের সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ খেলাফত আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করলো। ১৯১৯ সালের ১০আগস্ট সারা দেশে খেলাফত দিবস পালনের আহ্বান জানানো হলো।

সারাদেশে হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সভাসমিতির মাধ্যমে অভূতপূর্ব ও অপ্রতিহত প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হলো। এক মাসের মধ্যে বিশ হাজার মুসলমান কারাদণ্ডের জন্যে নিজেদেরকে পেশ করলো।

১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে খেলাফত কমিটির অধিবেশন শুরু হয়। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে মোহনদাস, করম চাঁদ, গান্ধী এতে যোগদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় বৃটিশ সরকারের সাথে 'অসহযোগিতার' নীতি অবলম্বনের পরামর্শ দেন। ১৯২০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত খেলাফত কমিটির সম্মেলনে 'অসহযোগ আন্দোলন' করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তীব্রতর হতে থাকে।

কিন্তু এত কিছুর পরেও এ প্রানবন্ত খেলাফত আন্দোলন অপমৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এর জন্য অবশ্য তুরস্কে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো দায়ী। তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশা অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে ইংরেজদের হাত হতে বহু অঞ্চল পুনর্দখল করেন। তুর্কিজাতিকে করেন ঐক্যবদ্ধ এবং তুরস্ককে পুনরায় গৌরবের মর্যাদায় ভূষিত করেন। বৃটিশ ও তাদের দালালদের পরাজিত করে তিনি তুরস্কের শাসন ক্ষমতা পুনর্দখল করেন। যদিও বিশাল তুর্কি সালতানাতের অন্যান্য অঞ্চল

www.pathagar.com

অধিকার করতে সক্ষম হননি। তুরস্ক বৃটিশদের থেকে মুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে খেলাফত আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে ওঠে।[১৯২]

কিন্তু ক্ষমতা লাভ করার পর মোস্তফা কামাল পাশা ১৯২২ সালের নভেম্বরে সুলতান মুহাম্মদ হাশেমকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তুরস্কের সর্বশেষ ও ক্ষমতাহীন পুতুল খলিফা সুলতান আবদুল মজিদকে দেশ থেকে নির্বাসিত করে খেলাফত ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে। তুরস্ক থেকে যখন মুসলিম নামধারীরাই খেলাফত ব্যবস্থা অকার্যকর করেছে এবং বৃটিশরা তুরস্ক থেকে সরে এসেছে তখন ভারতে আর খেলাফত আন্দোলনের যৌক্তিকতা থাকে না। কামাল পাশার কার্যক্রমের কারণে হিন্দুস্থানে খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মুসলমাদের মধ্যে নেমে আসে হতাশা।

উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের অন্তরে চরম আঘাত করে কামাল আতাতুর্কের পদক্ষেপ। সকলের চেয়ে বেশি প্রাণে আঘাত পান মওলানা মুহাম্মদ আলী। কারণ তিনিই ছিলেন এ আন্দোলনের উৎস ও প্রাণকেন্দ্র। যে আরবীয় শরীফ হুসাইন ছিল বৃটিশের তাঁবেদার এবং যে তার কার্যকলাপের দ্বারা মুসলিম বিশ্বের নিকটে ঘৃণার পাত্র হয়েছিল, সে শরীফ হুসাইন এখন নিজেকে খেলাফতের দাবীদার বলে ঘোষণা করলো। এ ব্যাপারে বৃটিশ তাকে কোনো প্রকার সাহায্য করলো না। ওদিকে ওহাবী নেতা আব্দুল আজিজ ইবনে সউদের অভিযান ব্যাহত করার শক্তিও তার হলো না। বছর শেষ হবার সাথে সাথেই ইবনে সউদ মক্কা ও তায়েফের ওপর অভিযান চালিয়ে তা হস্তগত করেন এবং এভাবে হেজাজের অধিকাংশ অঞ্চলের ওপরে তিনি অধিকার বিস্তার করেন এবং সৌদি আরব প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ বর্তমান সৌদি বাদশাহ সালমানের পিতা।

হিজরত আন্দোলন

খেলাফত আন্দোলনের সময়ে হিন্দুস্থানে হিজরত আন্দোলনও শুরু হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯২০ সালে রাঁচী জেল থেকে মুক্তিলাভের পর হিজরত আন্দোলন শুরু করেন। তার অনুসারী কওমী আলেমগণ ফতোয়া

---

১৯২ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৪৯-৩৫০

www.pathagar.com

দিতে শুরু করেন, ‘ভারত দারুল হারব এবং এখান থেকে হিজরত করে কোনো দারুল ইসলামে যেতে হবে’। অথচ তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে এতদিন মুসলিমলীগের বিরোধীতা করে আসছিলেন। জেলখানায় গিয়ে তার জাতীয়তাবাদ ছুটে যায়।

মওলানা আজাদের আহ্বানে বহু মুসলমান হিজরতের জন্যে বদ্ধ পরিকর হয়। দিল্লীতে হিজরত কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যথারীতি অফিস খোলা হলো। এই আন্দোলন যেহেতু মওলানা আজাদ আহ্বান করেছেন তাই আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলিম প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলো, তারা তাদের সকল সহায় সম্পত্তি বিক্রি করে দেশত্যাগের জন্য প্রস্তুতি নিলো। ১৯২০ সালের কেবল আগস্ট মাসেই আঠারো হাজার মুসলিম হিজরত করে চলে যায়। এই মানুষগুলোর কোনো ব্যবস্থা হয় না আফগানে। তারা অবর্ণনীয় জিল্লতির শিকার হয়।

এদিকে প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান আফগানে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে তাদের ভিটেমাটি বিক্রয় করেছিল। এ আন্দোলনের পেছনে ছিল মূলত মওলানা আবুল কালাম আজাদের হুজুগ বা ঝোঁক প্রবণতা। কোনো একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়াই এবং হিজরতের ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ না করেই এ আন্দোলনে ঝাঁপ দেওয়া হয়েছিল।

হিজরত কমিটির সেক্রেটারি তাজাম্মল হোসেন ছিলেন মওলানা মওদূদীর আত্মীয়। তিনি মওলানাকে হিজরতের জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। মওলানা হিজরত কমিটির সাথে আলোচনা করে দেখেন তাদের কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। দলে দলে লোক আফগানিস্তানে চলে গেলেও আফগান সরকারের সাথে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলা হয়নি। মুফতী কেফায়েতুল্লাহ ও মওলানা আহমদ সাঈদ এ ব্যাপারে ছিলেন দায়িত্বশীল। মওলানা মওদূদী এ দু’জনের সাথে দেখা করে একটি পরিকল্পনাহীন আন্দোলনের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দেখিয়ে দেন।

তারা ত্রুটি স্বীকার করে মওলানা মওদূদী সাহেবকে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে অনুরোধ করেন। মওদূদী বলেন সর্বপ্রথম আফগান সরকারের নিকটে শুনতে হবে যে তারা হিন্দুস্তান থেকে হিজরতকারীদের পুনর্বাসনের জন্যে রাজী আছেন কিনা এবং পুনর্বাসের পন্থাই বা কি হবে? আফগান রাষ্ট্রদূতের সংগে আলাপ করা হলো। তিনি বলেন, তার সরকার বর্তমানে খুবই বিব্রত বোধ করছেন। যারা ইতোমধ্যে আফগানিস্তানে চলে গেছে তাদেরকে ফেরৎ

www.pathagar.com

পাঠাতে অবশ্য সরকার দ্বিধাবোধ করছেন। কিন্তু তথাপি তাদের বোঝা বহন করা সরকারের সাধ্যের অতীত'।

এরপর হিজরত কমিটি হতাশ হয়ে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। আফগানিস্তানের আমীরও মুসলিমদের আফগানিস্তানে যাওয়া রুখতে বলেন। সবমিলিয়ে এই আন্দোলন চরমভাবে ব্যর্থ হয়। উদ্বাস্তু হয় পনের থেকে বিশ লক্ষ মুসলিম। তাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছায়। কিন্তু আন্দোলন আহ্বানকারী মওলানা আজাদের খুব একটা ভ্রুক্ষেপ দেখা যায় না। এরপর ১৯২৩ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে ভুলে যান মুসলিমদের অধিকার ও দুঃখ দুর্দশার কথা। তিনি থাকেন ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা নিয়ে।[১৯৩]

ইংরেজদের থেকে স্বাধীনতার প্রথম ধাপ 'ভারত শাসন আইন-১৯৩৫'

দীর্ঘ আন্দোলন ও অরাজক পরিস্থিতির কারণে ইংরেজরা ভারতে তাদের শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল। তার ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে সেনা সংকট, অর্থ সংকট ইত্যাদি পরিস্থিতি বৃটিশদের সক্ষমতাকে দূর্বল করে। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ও বৃটিশদের পক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' নামে একটি আইন বৃটিশ সরকার তৈরি করে। এটা ছিল নামকাওয়াস্তে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের আইন। শুরুতে কংগ্রেস নেতারা এই আইন মেনে না নিলেও পরবর্তীতে এই আইনের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তারা মেনে নেয়।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট। এতে বলা হয়, ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে বৃটিশ শাসিত প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশগুলিকে নিয়ে এক সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক হন গভর্নর জেনারেল । গভর্নর জেনারেল তার মনোনীত তিনজন সদস্য নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করবেন। এই তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের সাহায্যে গভর্নর জেনারেল ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, খ্রিস্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত

---

১৯৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৫০-৩৫২

www.pathagar.com

বিষয় পরিচালনা করবেন। অন্যান্য বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকবেন। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা ইত্যাদি ব্যাপার গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ নাও করতে পারবেন।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের আইনসভা দু'টি পরিষদ নিয়ে গঠিত হবে। উচ্চকক্ষের নাম হবে রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States) এবং নিম্নকক্ষের নাম হবে ব্যবস্থা পরিষদ (Federal Assembly)। রাষ্ট্রীয় পরিষদ একটি স্থায়ী সংসদ হবে এবং এর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রতি তিন বছর অন্তর কার্যকাল শেষ হবে এবং সেই জায়গায় নতুন সদস্য নেওয়া হবে। অবসর গ্রহণকারী সদস্যরা পুনর্নির্বাচিত হতে পারবেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ২৬০। এদের মধ্যে ১৫৬ জন বৃটিশ শাসিত ভারত থেকে নির্বাচিত হবেন এবং অনধিক ১০৪ জন দেশীয় রাজ্যের শাসকদের দ্বারা মনোনীত হবেন। নিম্নকক্ষ ব্যবস্থা পরিষদ (Federal Assembly) পাঁচ বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হবে। এর সদস্য সংখ্যা হবে অনধিক ৩৭৫ । বৃটিশ শাসিত ভারত থেকে ২৫০ জন এবং দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে ১২৫ জন সদস্য পরিষদের জন্য নির্বাচিত হবেন।

আইনটিকে বিশ্লেষন করলে যা পাওয়া যায়-

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে-

১- যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত গঠন। এই আইনে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়া ঐচ্ছিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

২- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। কেন্দ্রে পাঁচ বছর মেয়াদি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিম্নকক্ষ ফেডারেল এসেম্বলি ৩৭৫ জন এবং উচ্চকক্ষ কাউন্সিল অব স্টেট ২৬০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে বলে ঘোষিত হয়।

৩- গভর্নর জেনারেলের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রি পরিষদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার দেওয়া হবে। মন্ত্রীরা কাজের জন্য আইন সভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন বলে জানানো হয়।

৪- গভর্নর জেনারেল তার কাজের জন্য সরাসরি ভারত-সচিব ও বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন।

www.pathagar.com

৫- শাসন ক্ষমতা বিভক্তিকরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতাকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক, ব্যাংক ইত্যাদি সংরক্ষিত বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের হাতে দেওয়া হয়।

৬- গভর্নর জেনারেল শাসন পরিচালনায় চূড়ান্ত ক্ষমতা লাভ করেন। এছাড়া 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' ও 'স্ববিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতা' ভোগ করতেন।

৭- কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতার তালিকা। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের উদ্দেশ্যে তিনটি পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়। ক) কেন্দ্রীয় তালিকা, খ) প্রাদেশিক তালিকা, গ) যুগ্ম তালিকা।

প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে-

১- প্রদেশগুলিতে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২- বাংলাসহ ছয়টি প্রদেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং অবশিষ্ট পাচঁটিতে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রাখা হয়।

৩- প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা তাদের কাজের জন্য প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৪- কেন্দ্রের অনুকরণে প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা, ধর্ম ইত্যাদির দায়িত্ব গভর্নরের হাতে দেওয়া হয়।

৫- গভর্নরকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রদেশের গভর্নর আইন প্রণয়ন ও নাকচ করার অধিকারী হবেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বৃটিশ ভারতের জনগণের জাতীয়তাবোধের উত্তরোত্তর উন্মেষ, রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ, দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশ ও ১৯১৯ সালের আইনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার শ্বেতপত্র নামক সংস্কার ঘোষণা করে। এটাই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। এ আইনই পরবর্তীকালে ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি এবং ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ভিত্তি রচনা করে। এসব দিক থেকে বিচার করলে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯১৯ সালের মন্টফোর্ড আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিফল

www.pathagar.com

হয়। ফলে এ আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে তীব্র সমালোচনা আসে। এছাড়া ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০-৩৫ সালের আইন অমান্য আন্দোলন দ্বারা কংগ্রেস যথাক্রমে স্বরাজ ও পূর্ণ স্বরাজ দাবী করে। এতে বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করে নতুন সংবিধান প্রবর্তন না করা পর্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন দমানো যাবে না। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তদন্ত করার জন্য বৃটিশ সরকার ১৯২৮ সালের সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। কিন্তু কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ উভয় দল এ কমিশন বাতিল করে। সাইমন রিপোর্টের পাশাপাশি মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে একটি বেসরকারি কমিটির নেহেরু রিপোর্ট পেশ করে। এতে কংগ্রেসের আন্দোলনের কথাই প্রতিফলিত হলেও হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য বড় আকারে দেখা দেয়।

১৯২৯ সালের ২৩ডিসেম্বর গান্ধী-ডারউইন বৈঠকে ভারতের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ব্যাপারে আলোচনা হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ভাইসরয় কোনো আশ্বাস দিতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে ২৯ জন অনুসারিকে নিয়ে ১৯৩০ সালের ১২মার্চ গান্ধী সমুদ্র সৈকতের দিকে যাত্রা শুরু করেন। ২৪ দিনে ২০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেন। এ মিছিল ডান্ডি মিছিল নামে পরিচিত। লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে গান্ধী দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন শুরুর ইঙ্গিত দেন। আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে ছিল-[১৯৪]

(ক) লবণ আইন ভঙ্গ করা

(খ) ছাত্রদের শিক্ষালয় এবং কর্মচারীদের সরকারি অফিস বর্জন

(গ) মদ, আফিম ও বিদেশি পণ্য বর্জন

(ঘ) কর খাজনা প্রদান বন্ধ ইত্যাদি।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য তিনটি গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩০-৩২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ সালের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ সকল বৈঠকের অনেক প্রস্তাব ও সুপারিশ ১৯৩৫ সালের আইনে রূপ লাভ করে। বৃটিশ সরকার

---

১৯৪. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের পটভূমি / ইবনে সাঈজ উদ্দীন / দৈনিক সংগ্রাম / ২৩ এপ্রিল ২০১১

www.pathagar.com

ভারতের সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে তাদের সকল সিদ্ধান্ত ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে এক পার্লামেন্টারী শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সালে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রকাশিত হয়। এই খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৪ সালে সুবিখ্যাত ৩২টি ধারা সম্বলিত ভারত শাসন আইন প্রণীত হয়। সবশেষে আমরা বলতে পারি, ভারতের জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক দাবীর মুখে বৃটিশ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়। এই আইনের ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে উপমহাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলার ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন ও তার ফলাফল

১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকার প্রণীত 'ভারত শাসন আইনে'র ভিত্তিতে সমগ্র ভারতের ১১টি প্রদেশে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন সম্পন্ন হয় ১৯৩৭ এর ফেব্রুয়ারীতে। ১৯৩৬ সালের শেষভাগে মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করে। উভয় মেনিফেস্টোর সামাজিক পলিসি ছিল প্রায় একই রকমের। রাজনৈতিক ইস্যুতেও কেউ একে অপর থেকে বেশি দূরে অবস্থান করছিল না।

শুধু দু'টি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। একটি এই যে, মুসলিমলীগ ওয়াদাবদ্ধ ছিল উর্দু ভাষা ও বর্ণমালার সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধি সাধন করতে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর ছিল হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জন্যে। অপরটি হলো মুসলিমলীগ অটল ছিল পৃথক নির্বাচনের ওপর। কিন্তু কংগ্রেস ছিল তার চরম বিরোধী।[১৯৫] ১৯১৬ সালে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচন মেনে নিয়ে মুসলিমলীগের সাথে এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যা লক্ষ্ণৌ চুক্তি নামে খ্যাত ছিল। অনেক কংগ্রেস নেতা লক্ষ্ণৌ চুক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং এটাকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের সেতুবন্ধন মনে করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেস এ চুক্তি অমান্য করে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা শুরু করে।

হিন্দু-মুসলিম মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কোনো কথা মুসলিমলীগ মেনিফেস্টোতে ছিল না। বরং তাদের ছিল সহযোগিতার সুস্পষ্ট আহ্বান। কংগ্রেস মুসলিমলীগের এ সহযোগিতার আহ্বান ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যাখ্যান

---

[১৯৫] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৭২

www.pathagar.com

করে। কংগ্রেসের দাবী ছিল যে, সকল ভারতবাসী এক জাতি এবং ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। সুতরাং মুসলিমলীগ নামে আরেকটি সংগঠনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ১৯৩৭ সালের নির্বাচন তাদের এ দাবীকে ভুল প্রমাণিত করে।

নির্বাচনের যে ফল প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় সর্বমোট ১৭৭১টি প্রার্থীর মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে মাত্র ৭০৬ টি যা অর্ধেকেরও কম। মুসলিমলীগ ৪৮২টি মুসলিম আসনের মধ্যে পায় ১০৬ টি। মুসলিমলীগের ফলাফল খারাপ হলেও মুসলিমদের ফলাফল খুব একটা খারাপ হয়নি। কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে জয়লাভ করে, ৪টি তে মুসলিমরা ও ১টিতে ননকংগ্রেস হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

এই নির্বাচনে কংগ্রেস নিজেদের একমাত্র দল হিসেবে যে দাবী করতো তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সাড়ে তিন কোটি ভোটারের মধ্যে তারা ভোট পেয়েছে দেড় কোটি। আর কোনো প্রদেশেই মুসলিমলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বলে এটা নিশ্চিত হয়েছে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য তৈরি হয়নি। আর এই অনৈক্যের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে দেওবন্দী আন্দোলন ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। দেওবন্দী আন্দোলনের ফলে বহু মুসলিম কংগ্রেসের পক্ষাবলম্বন করেছে। দেওবন্দের উলামাদের রাজনৈতিক সংগঠনের নাম ছিল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। তারা অখণ্ড ভারত ও কংগ্রেস মুশরিকদের পক্ষে অবস্থান নেয়। এসময় উলামায়ে হিন্দের নেতা হুসাইন আহমেদ মাদানী 'মুত্তাহিদা কওমিয়াত আওর ইসলাম' নামে একটি বই লিখে মুসলিমলীগের বিপক্ষে ও কংগ্রেসের পক্ষে অবস্থান নেন।

মুসলিমরা যে কয়টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা। বাংলায় ২৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৫৪, মুসলিমলীগ ৪০, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬, স্বতন্ত্র মুসলিম ৪৭, স্বতন্ত্র হিন্দু ৪২, অন্যান্য ৩১।[১৯৬] বাংলায় মুসলিমলীগের বাইরে দলীয়ভাবে সফলতা লাভ করেছে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি। বাংলায় কোয়ালিশন ব্যতীত মন্ত্রীসভা গঠনের অন্য কোনো পথ ছিল না। অতএব ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে মুসলিমলীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, তফসিলী সম্প্রদায় এবং স্বতন্ত্র মুসলিম ও হিন্দুদের নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, যার নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। তিনি দশ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন যার মধ্যে পাঁচজন মুসলমান

১৯৬. The Muslims of British India / Thomas Hardy / P- 224-225

www.pathagar.com

এবং পাঁচজন হিন্দু ছিলেন। ফজলুল হক হিন্দু ও মুসলিমদের সহযোগে সম্প্রীতির সাথে বাংলা প্রদেশ চালানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ফজলুল হক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় সহজে কাজ করতে পারেনি। কারণ কংগ্রেস পদে পদে এ মন্ত্রীসভার চরম বিরোধীতা করে। কিন্তু এর ফলে সংসদের ভেতরে ও বাইরে মুসলিম ঐক্য সংহত ও সুদৃঢ় হয়। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিমলীগের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়। ১৮৩৭ সালের সেপ্টেম্বরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিমলীগ অধিবেশনে ফজলুল হক যোগদান করে ঘোষণা করেন যে, তার দলের সদস্যগণ মুসলিমলীগে যোগদান করবেন। তার মন্ত্রীসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্থান পেয়েছিলেন।

ফজলুল হক সাহেবের সাড়ে চার বছরের প্রধান মন্ত্রীত্ব অবিভক্ত বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিতে বিপ্লব এনে দেয়। তার মন্ত্রীসভা জনগণের মধ্যে বিরাট আশার সঞ্চার এবং মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাদের এতদিনের হীনমন্যতা দূরীভূত হয় এবং হিন্দুদেরকে তারা সমকক্ষ মনে করে। সংসদে ফজলুল হক-সোহরাওয়ার্দীর ভাষন, প্রতিপক্ষের কথার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দান এবং তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কংগ্রেস ও হিন্দু সহাসভা নেতৃবৃন্দের তুলনায় অধিকতর উচ্চমানের ছিল। তাদের প্রাণশক্তি ও প্রজ্ঞা, জ্ঞানবুদ্ধির প্রখরতা, অনর্গল বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং কঠোর পরিশ্রম ও ধীশক্তির দ্বারা তারা সংসদে হিন্দু সদস্যদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন।

বাংলার মুসলিমদের এই অগ্রগতি শুধু রাজনৈতিকভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তা সাহিত্য সংস্কৃতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। বৃটিশ শাসনের সুবাদে বাংলা সাহিত্যের ওপর হিন্দু কবি সাহিত্যিক তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলেন। বাংলায় মুসলিমদের বিজয়ের ফলে মুসলিম সাহিত্যিকরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হন। কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসিম উদ্দীন, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ প্রমুখের সাহিত্যাঙ্গনে দৃপ্ত পদচারণা মুসলিমদের মধ্যে আশার আলো জাগিয়ে তোলে। সংগীত সম্রাট আব্বাস উদ্দিনের মনমাতানো সুরে গাওয়া ইসলামী, মুর্শেদী, ভাটিয়ালী সংগীত মুসলমানদের মনে ইসলামী প্রেরণা জাগ্রত করে।[১৯৭]

---

১৯৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৭৮

www.pathagar.com

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা বাংলার সংসদীয় সরকারের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ে তিনি বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশগুলোতে সফর করে মুসলিমলীগ সংগঠিত করেন এবং একে একটি শক্তিশালী সংগঠনে রূপান্তরিত করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে, ১৯৩৮ সালে করাচীতে এবং ১৯৩৯ সালে কটকে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগ সম্মেলনগুলোতে ভাষণ দান করেন। ১৯৪০ সালে কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে লাহোরে ২২, ২৩ ও ২৪মার্চ মুসলিমলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৩মার্চের অধিবেশনে তিনি ঐতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন।

শিক্ষা খাতে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ফজলুল হক তার কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় নিজে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতির জন্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। কোলকাতায় লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, ঢাকায় ইডেন গার্লস কলেজ, তেজগাঁতে কৃষি কলেজ, ঢাবিতে ফজলুল হক মুসলিম হল, বরিশালে ফজলুল হক কলেজ।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষায় হিন্দুদের আধিপত্য ও অধিকতর হস্তক্ষেপ তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রবেশিকা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো। অতএব উচ্চশিক্ষার ওপর তার প্রভাব ছিল শিক্ষামন্ত্রী ও তার বিভাগ অপেক্ষা অনেক বেশি। এ প্রভাব থেকে পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করার জন্যে তিনি সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে আইন পরিষদে একটি বিল উত্থাপনের চেষ্টা করেন। ফলে গোটা হিন্দু সম্প্রদায় ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে উক্ত প্রস্তাবিত বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে এরকম সম্মিলিত প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর দেখা যায়নি।

১৯৪০ সালে কোলকাতায় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো এক বিদ্বান ব্যক্তির সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র প্রদেশ থেকে প্রায় দশ হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি উক্ত সম্মেলনে তার নাম ও মর্যাদা ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনি যে বাণী পাঠান তার

www.pathagar.com

শেষাংশে বলেন, আমার বার্ধক্য এবং স্বাস্থ্য আমাকে সম্মেলনে যোগদানে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু যে বিপদ আমাদের প্রদেশের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে ভয়ানক বিচলিত করেছে। সে জন্যে আমি আমার রোগশয্যা থেকে সম্মেলনে একটি কথা না পাঠিয়ে পারলাম না। [১৯৮]

হিন্দুদের চরম বিরোধিতার কারণে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ড গঠনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা কার্যকর করা হয়নি। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা ফজলুল হক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা এই যে, প্রদেশের সকল সরকারি চাকুরি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু ও পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান লাভ করবে। সরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে হিন্দুদের চিরাচরিত একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের প্রতি যে চরম অবিচার করা হচ্ছিল, উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়।

বাংলা ছাড়া যে কয়টি প্রদেশে মুসলিমরা মন্ত্রীসভা গঠন করেছে তার মধ্যে ছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু ও আসাম। পাঞ্জাবে ১৭৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৮, মুসলিমলীগ ১, ইউনিয়নিস্ট পার্টি ৯৫, খালসা বোর্ড ১৪, হিন্দু বোর্ড ১১, অন্যান্য ১৪ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২২টি আসন লাভ করে।

ইউনিয়নিস্ট পার্টি ছিল পাঞ্জাবের মুসলিমদের একটি দল যার প্রধান ছিল সিকান্দার হায়াত খান। খালসা ন্যাশনালিস্ট শিখ দলও স্যার সেকেন্দার হায়াতের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে। তাদের সহযোগে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৪২ সালে তার মৃত্যুর পর মালিক খিজির হায়াত খান প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৪৫ সালে সকল প্রাদেশিক পরিষদ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত এ মন্ত্রীসভা বলবৎ থাকে।

সিন্ধুতে ৬০ টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৮, অকংগ্রেসী হিন্দু ১৪, মুসলিম স্বতন্ত্র ৯, অন্যান্য মুসলমান দল ৭, সিন্ধু ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ১৮, ইউরোপিয়ান ৪ জন নির্বাচিত হন। এখানে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় কোয়ালিশন করে মন্ত্রীসভা গঠন করতে হয়। ফলে এই মন্ত্রীসভা স্থিতিশীল হতে পারেনি। ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়েই এখানে মন্ত্রীসভাগুলো চলতে থাকে।

---

১৯৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৩৭৯

www.pathagar.com

প্রথমে স্যার গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পরে আল্লাহ বখশ ও মীর বন্দে আলী খানের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীত্বের পালাবদল হতে থাকে। উল্লেখ্য সিন্ধুতে মুসলিমলীগ কোনো আসন পায়নি।

আসামে ১০৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৩৩, মুসলিমলীগ ১০, আসাম মুসলিম পার্টি ২৪, ননকংগ্রেস হিন্দু ১৪, মুসলিম স্বতন্ত্র ২৭টি আসন লাভ করে। এখানেও কোনো স্থিতিশীল সরকার গঠিত হতে পারেনি। স্যার মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। অতঃপর গভর্ণরের আমন্ত্রণে কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বারদলই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর গোপীনাথ মন্ত্রীসভাও পদত্যাগ করে। অতঃপর পুনরায় স্যার মুহাম্মদ সা'দুল্লাহ মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ পান। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষভাগে তার মন্ত্রীত্বের পতন ঘটে এবং গভর্নর ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ৯৩ ধারার বলে প্রদেশের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

বিহারে ১৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৯২ , মুসলিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ২০, মুসলিম ইউনাইটেড পার্টি ৫, আহ্‌রারে ইসলাম ৩ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩২টি আসন লাভ করে। এখানে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। বোম্বেতে ১৭৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৮৬, মুসলিমলীগ ১৮, অন্যান্য দল ২৯, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪২টি আসন লাভ করে। মধ্য প্রদেশে ১১২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৭০, মুসলিমলীগ ৫, মুসলিম বোর্ড ৮, অন্যান্য দল ৮ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২১টি আসনে জয়লাভ করে।

মাদ্রাজে ২১৫টি আসনের মধ্যে ১৫৯টি কংগ্রেস, মুসলিমলীগ ৯, জাস্টিস পার্টি ২১, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৬টি আসন লাভ করে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৫০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৯টি, হিন্দু-শিখ কোয়ালিশন ৭ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৪টি আসন লাভ করে। উড়িষ্যাতে ৬০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৩৬টি, মুসলিমলীগ ১৪ এবং স্বতন্ত্র ১০টি আসন পায়। সর্বশেষ যুক্তপ্রদেশে ২২৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৩৩টি, মুসলিমলীগ ২৬, এগ্রিকালচারিস্টরা ২২ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৪৭টি আসন লাভ করে।

www.pathagar.com

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও তার রাজনীতি

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের রাজনীতি শুরু হয় মুসলিমলীগের হাত ধরে। তিনি মুসলিমলীগের তারকা নেতা। কিন্তু উপমহাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনি মুসলিমলীগের বিরুদ্ধেই নির্বাচন করেন। নির্বাচনে ভালো ফলাফল করে সরকার গঠন করেন এবং আবারো পুরনো দল মুসলিমলীগের হয়ে কাজ করেন। এটা কেন? এর উত্তর তালাশের চেষ্টা করবো আমরা।

'শেরে বাংলা' বা হক সাহেব রূপে পরিচিত আবুল কাশেম ফজলুল হক বাকেরগঞ্জ জেলার সাটুরিয়ায় ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন।[১১১] তবে তার পূর্বপুরুষদের বাড়ি ছিল বরিশাল শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে চাখার গ্রামে। তিনি ছিলেন মুহম্মদ ওয়াজিদ ও সায়িদুন্নিসা খাতুনের একমাত্র পুত্র। হক সাহেবের পিতা বরিশাল আদালতের দীউয়ানি ও ফৌজদারি উকিল ছিলেন এবং তার পিতামহ কাজী আকরাম আলী ছিলেন আরবি ও ফারসিতে দক্ষ পণ্ডিত ও বরিশালের একজন বিশিষ্ট মোক্তার।

এ.কে ফজলুল হক ১৮৯০ সালে ফজলুল হক বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ এবং ১৮৯৪ সালে বি.এ পরীক্ষায় (রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা তিনটি বিষয়ে অনার্সসহ) উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিত শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

১৮৯৭ সালে কোলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ল কলেজ' থেকে বি.এল ডিগ্রি লাভ করে ফজলুল হক আশুতোষ মুখার্জীর অধীনে শিক্ষানবিশ হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বরিশাল শহরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯০৩-১৯০৪ সময়কালে তিনি এ শহরের রাজচন্দ্র কলেজে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ফজলুল হক সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্ব ভারতীয় মুসলিমলীগের প্রতিষ্ঠাতেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯০৮ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত হক ছিলেন সমবায়ের

---

১১১. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের জন্ম / ইতিহাসের এই দিনে / বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম / https://bit.ly/3jyuJCz

www.pathagar.com

সহকারী রেজিস্ট্রার। এরপর সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোদস্তুর আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। [২০০]

ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ও টাঙ্গাইলের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তার হাতেখড়ি হয়। তাদের সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে তিনি তার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে পরাজিত করে ঢাকা বিভাগ থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৩ সালে হক সাহেব বাংলার প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সম্পাদক হন এবং ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এ পদে বহাল থাকেন। সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের যুগ্ম সম্পাদক রূপেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯১৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ফজলুল হক ছিলেন সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের সভাপতি।

হক সাহেব একই সাথে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য রূপে সে সংগঠনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ চুক্তি প্রণয়নে সহায়কদের অন্যতম। ১৯১৭ সালে হক সাহেব ছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক এবং ১৯১৮-১৯১৯ সালে তিনি এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯১৯ সালে হক সাহেব খেলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু অসহযোগের প্রশ্নে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তার মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেস-গৃহীত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্কিত বৃটিশ পণ্য ও উপাধি বর্জনের তিনি সমর্থন করেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করে তিনি স্কুল ও কলেজ বর্জনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। বর্জনের সিদ্ধান্ত মুসলমান ছেলেমেয়েদের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করবে এটা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই ইস্যুতে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯২০ সালে ফজলুল হক, কাজী নজরুল ইসলাম ও মোজাফফর আহমদ মিলে নবযুগ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর সরকার বিরোধী নীতির কারণে এ পত্রিকার জামানত বহুবারই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ফলে দীর্ঘদিনব্যাপী এ দৈনিক পত্রিকা চালানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

---

২০০. ফজলুল হক / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2N8bynh / অ্যাকসেস ইন ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সর্বভারতীয় রাজনীতিতে হক সাহেব অংশগ্রহণ করলেও তার মনোযোগ প্রধানত বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৪ সালে এম.এ জিন্নাহ সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের সভাপতি হন। মুসলিমলীগের কর্মসূচিতে হক সাহেব খুশি ছিলেন না। জিন্নাহর সঙ্গে তার পার্থক্য তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে নির্বাচনের সময় এটা বিশেষভাবে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। মুসলিমলীগের ইশতেহারে প্রান্তিক কৃষক সমাজ ও স্বাধীনতার বিষয়ে কোনো ধারণা না থাকায় হক সাহেব আলাদাভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩৬ সালে ফজলুল হক তার নির্বাচনী ইশতেহারের খসড়া তৈরি করেন এবং তার নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় তিনি জিন্নাহর নেতৃত্বাধীন মুসলিমলীগের তীব্র বিরোধিতা করেন। ফজলুল হক এক নতুন বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন বলে তার নির্বাচনী ইশতেহার বাংলার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি দলের ব্যানারে তিনি নির্বাচন করেন। এই দলটির আত্মপ্রকাশ হয় নির্বাচনের ঠিক আগের বছরে।

কৃষক প্রজা পার্টির পটভূমি :

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ সালে। স্যার আব্দুর রহিম এ সমিতির সভাপতি এবং আরও পাঁচজন সহ-সভাপতি ছিলেন। ফজলুল হক ছিলেন এ পাঁচজনের মধ্যে প্রথম সহ-সভাপতি। প্রজা সমিতির সভাপতির পদ পূরণ নিয়ে একটি বিবাদের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৪ সালে ভারতের আইন সভার সভাপতি নির্বাচিত হলে স্যার আব্দুর রহিম নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর সমিতির সদস্যরা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা-এ দুই আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে ফজলুল হক সভাপতির পদের প্রত্যাশী ছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিম বাংলা দলের পক্ষ থেকে খান বাহাদুর এ. মমিন এ পদের জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ পরিস্থিতিতে বিতর্ক মীমাংসার জন্য উভয় দল বিদায়ী সভাপতির মধ্যস্থতা মেনে নিতে সম্মত হয়। তিনি খান বাহাদুরের প্রতি সমর্থন দেন। এ প্রেক্ষাপটে ফজলুল হক পূর্ব বাংলায় তার সমর্থকদের নিয়ে প্রজা সমিতি ত্যাগ করলেন।

www.pathagar.com

একই সাথে দুইটি সংগঠনের সাথে বিরোধ তৈরি হয় ফজলুল হকের মুসলিমলীগের সাথে ইশতেহার নিয়ে। প্রজা সমিতির সাথে নেতৃত্ব পাওয়া নিয়ে। আবার সামনে প্রাদেশিক নির্বাচন। সবগুলো বিষয় মিলে ১৯৩৬ সালে ফজলুল হক নিজেই নিয়মিত রাজনৈতিক দল কৃষক প্রজা পার্টি (কে.পি.পি.) গঠন করেন।[২০১] গ্রামীণ সমাজের নেতা হিসেবে ফজলুল হক আসন্ন নির্বাচনে জনগণের মন জয় করার জন্য একটি কৃষি-ভিত্তিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টির কর্মসূচিতে কৃষককে জমির একচ্ছত্র মালিকানা দিয়ে জমিদারি প্রথা বিলোপ, খাজনার হার হ্রাস, কৃষক সম্প্রদায়ের ঋণ মওকুফের মাধ্যমে মহাজন শ্রেণির শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তিদান, কৃষকের মাঝে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ, দেশব্যাপী খাল খননের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সৃষ্টি, সর্বগ্রাসী কচুরীপানা পরিষ্কার করে নৌচলাচল সচল করা, বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষা চালু ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কৃষককুলের কাছে ফজলুল হকের বক্তৃতা ছিল তার কর্মসূচির মতই আকর্ষণীয়। ফজলুল হকের আবেদন ছিল অসম্প্রদায়িক এবং সে কারণে তিনি নিম্নবর্ণের হিন্দু কৃষক সমাজের কাছেও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতাহার শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য 'ডাল ভাত' এ একটি শ্লোগানে পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কে.পি.পি-র প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মুসলিমলীগ। কৃষক ভোটাররা ফজলুল হকের প্রতি বিশাল সমর্থন জানায়। যদিও তার দল মাত্র এক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু নির্বাচনে প্রাপ্ত আসন হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কে.পি.পি তৃতীয় স্থান দখল করে। কংগ্রেস পায় ৫৪টি আসন, মুসলিমলীগ ৪০টি, কে.পি. পি ৩৬টি এবং অন্যান্য খন্ডিত দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২৫০ আসনের বাকিগুলি দখল করে। কে.পি.পি-র টিকেটে নির্বাচিত ৩৬ আসনের ৩৩টি আসে পূর্ব বঙ্গ থেকে। এর ফলে কে.পি.পি পূর্ব বঙ্গের একটি দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো অভাবনীয় নির্বাচনী বিজয়ের পর পরই কে.পি.পির পতন শুরু হয়। কংগ্রেস কোয়ালিশনে একমত না হওয়ায় মুসলিমলীগ ও কে.পি.পি প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কে.পি.পির পতনে মূল ভূমিকা রাখেন জিন্নাহ।

---

২০১. কৃষক প্রজা পার্টি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3rAiuZ9 / অ্যাকসেস ইন ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

তিনি চাইলে বাংলায় মুসলিমলীগের নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে পারতো। কিন্তু তিনি বিরোধ দূর করার লক্ষ্যে ফজলুল হককেই প্রধান করে সরকার গঠন করতে বলেন। এতে ফজলুল হক জিন্নাহর অনুগত হয়ে পড়েন। এ.কে ফজলুল হক মুসলিমলীগ ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দল ও স্বতন্ত্র সদস্যের সমর্থনে ও অংশগ্রহণে একটি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

কে.পি.পি এবং মুসলিমলীগের দূরত্ব ঘুঁচে যায়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফজলুল হক দলকে সংহত করার পরিবর্তে ক্ষমতার রাজনীতিতে বেশি মনোযোগী হতে দেখা যায়। তার মন্ত্রিসভার ১১ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন কে.পি.পি এবং বাকিরা মুসলিমলীগ ও সংখ্যালঘু দলগুলি থেকে। দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট কে.পি.পি নেতৃবৃন্দ সংসদে আলাদা দল হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। বিদ্রোহী গ্রুপটি ১৯৩৭ সালের ১১সেপ্টেম্বর গাইবান্ধায় দলের সাধারণ সভা ডাকেন এবং হক ও তার অনুসারীদের দল থেকে বহিষ্কার করেন। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে ফজলুল হকও বিদ্রোহীদের বহিষ্কার করেন।

আভ্যন্তরীণ কোন্দল :

১৯৩৭ সালের ২৯জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম বাজেট অধিবেশনে ভোট গ্রহণের সময় কৃষক প্রজা পার্টির বেশ কয়েকজন সদস্য শামসুদ্দীনের নেতৃত্বে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিলে প্রজা পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। কিছুদিন পর ফজলুল হক কর্তৃক নির্বাচনী অঙ্গীকার ভঙ্গের অজুহাতে প্রজা পার্টির বাম আদর্শ লালনকারী ২১ জন সদস্য কোয়ালিশন ত্যাগ করেন। দলত্যাগের এ নাটকে লীগ সুবিধা লাভ করে এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সমর্থনের জন্য ফজলুল হক লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফজলুল হক দলত্যাগীদের ইসলামের স্বার্থের বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। [২০২]

বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ও মুসলিমলীগের খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে ফজলুল হক কিছু শর্তে জোট গঠনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখাত হলে ফজলুল হক মুসলিমলীগের আরও বেশি নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েন। ১৯৩৭ সালের ১৫অক্টোবর লক্ষ্মৌতে হক সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায়

---

[২০২] ফজলুল হক / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2N8bynh / অ্যাকসেস ইন ৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

মুসলিমলীগের মতবাদ গ্রহণ করেন। তিনি বাংলার কোয়ালিশনের সকল মুসলিম সদস্যকে লীগে যোগদানের এবং লীগের পতাকাতলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। প্রকাশ্যে প্রজাপার্টির সঙ্গে ফজলুল হক সম্পর্ক ছেদ না করলেও তার নেতৃত্ব ছাড়া বস্তুত পার্টি মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

১৯৩৮ সালে দু'টি ভাঙ্গনের মুখে পড়ে কে.পি.পি। আইনসভায় প্রজা পার্টির উপনেতা ও মন্ত্রী নওশের আলী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ না করেও কোয়ালিশনের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে লীগের ওপর ফজলুল হকের নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যায়। কালক্রমে প্রজা পার্টির অবক্ষয় ঘটলে লীগের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না। বিরোধীদলের রাজনৈতিক কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কংগ্রেস-প্রস্তাবিত বেশ কয়েকটি অনাস্থা প্রস্তাব আইনসভায় পেশ করা হয়। অবশ্য ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্যের দৃঢ় সমর্থন লাভ করে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা টিকে যায়। বিনিময়ে ইউরোপীয়রা পাটশিল্পে বহু সুবিধা আদায় করে নেয় যা মূল উৎপাদনকারীদের স্বার্থের পরিপন্থি হয়েছিল।

নতুন এ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ফজলুল হক তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রজা পার্টির সহকর্মীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। আলোচনার পর হক সাহেব ১৯৩৮ সালের ১৭নভেম্বর শামসুদ্দীন ও তমিজউদ্দীনকে মন্ত্রিসভায় যোগদানে রাজি করাতে সক্ষম হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ফজলুল হক এক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে জিন্নাহর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ফজলুল হক ভাইসরয়ের প্রতিরক্ষা পরিষদে যোগদান করলে জিন্নাহ্ তাকে মুসলিমলীগ থেকে বহিষ্কার করেন এবং কোয়ালিশন দল থেকে লীগকে প্রত্যাহার করে এর পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অথচ এর আগের বছর জিন্নাহ্ ফজলুল হকের মাধ্যমে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (পাকিস্তান প্রস্তাব) পেশ করান এবং এই সুবাদে ফজলুল হক 'শেরে বাংলা' উপাধি পান।

শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা :

১৯৪১ সালের ২ডিসেম্বর ফজলুল হক পদত্যাগ করেন, তবে তিনি প্রজা পার্টির প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গ, কংগ্রেসের বসু গ্রুপসহ অধিকাংশ হিন্দু সদস্য এবং হিন্দু মহাসভার রক্ষণশীল সংস্কারবাদীদের নিয়ে বিস্তৃত ভিত্তির একটি প্রগতিশীল কোয়ালিশন গঠন করতে সক্ষম হন। নতুন মন্ত্রীসভা শ্যামা-

www.pathagar.com

হক গঠিত হয় এবং ১৯৪১ সালের ১২ডিসেম্বর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।[২০৩] এই মন্ত্রীসভাকে শ্যামা-হক হিসেবে নামকরণ করে মূলত মুসলিমলীগ।

এই রকম এক জটিল পরিস্থিতিতে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পথ অবশ্যই মসৃণ ছিল না। ফজলুল হকের একমাত্র মূলধন ছিল তার নিজস্ব জনপ্রিয়তা। সেটাতে ধ্বস লাগে যখন তিনি হিন্দুদের নিয়ে মন্ত্রীসভা করেন। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও তমিজদ্দিনের মতো দক্ষ নেতা ও সংগঠক সারা প্রদেশ চষে বেড়িয়ে অসংখ্য জনসভায় হক সাহেবের মুণ্ডুপাত করতে থাকেন, তাকে বিশ্বাসঘাতক ও মুসলমানদের শত্রু বলে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। তিনি বাঙালি ও অবাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন বলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। মন্ত্রিসভায় হিন্দু মহাসভার মাত্র একজন প্রতিনিধি থাকলেও এই মন্ত্রিসভাকে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে নাটোরের যে উপনির্বাচন হয় তাতে ফজলুল হকের মনোনীত প্রার্থী লীগের প্রার্থীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। লীগের প্রার্থী পেয়েছিলেন ১০, ৪৮৩টি ভোট। হক সাহেবের মনোনীত প্রার্থী পান মাত্র ৮৪০টি ভোট। তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

পায়ের তলায় মাটি পেতে হক সাহেব উঠে পড়ে লাগেন। তিনি "প্রগতিশীল মুসলিমলীগ" নামে লীগের একটি পাল্টা সংগঠন গড়ে তুলতে সক্রিয় হন। ইসলামের স্বার্থ এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারও রক্ষিত হবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তিনিও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তার এই সব প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। আসলে বাংলার মুসলমানরা তখন সর্বভারতীয় মুসলিমলীগের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ফজলুল হকের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নীতি অবশ্যই কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা পার্টি ও হিন্দু মহাসভার মনঃপূত ছিল। কিন্তু মুসলিমরা এই নীতি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

১৯৪২ সালের ১০মে হিন্দু মহাসভা বাংলার বিভিন্ন স্থানে "পাকিস্তান বিরোধী দিবস" পালন করে। বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় এতে গভীরভাবে আহত হয় এবং হিন্দু মহাসভার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখার জন্য তারা ফজলুল হককে দায়ী করে। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ পদ সংরক্ষিত হলেও সেই অনুযায়ী মুসলমানদের নিয়োগ করা হয়নি বলেও হক সাহেবের বিরুদ্ধে

---

২০৩. জননায়ক শেরে বাংলা / রুহুল আমিন বাবুল / পৃ.২৯-৩০

www.pathagar.com

অভিযোগ ওঠে। প্রতিকূল এই পরিস্থিতিতে হক সাহেব জিন্নাহর সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ২৮মার্চ ফজলুল হক আর মন্ত্রীসভা কন্টিনিউ করতে সক্ষম হননি।

লাহোর প্রস্তাব থেকে পাকিস্তান আন্দোলন

পাকিস্তানের চিন্তাভাবনা অথবা পরিকল্পনা কোনো অভিনব রাজনৈতিক দর্শন নয়। এটি হুট করে হিন্দুস্থানে নাজিল হয়নি। ধারাবাহিকভাবে এর একটি প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। লর্ড কার্জন কর্তৃক শুধুমাত্র প্রশাসনিক কারণে ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভেঙে আরেকটি প্রদেশ তৈরি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুশরিকদের বঙ্গভঙ্গরদ আন্দোলন এবং ১৯১১ সালে তা রহিতকরণ থেকে শুরু। এরপর উপমহাদেশের যত্রতত্র এবং যখন তখন মুসলমাদের গায়ে পড়ে হিন্দুদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি এবং মুসলমানদের জানমালের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে মুশরিকরা। মুসলিমলীগের পক্ষ থেকে বার বার সমঝোতা করার চেষ্টা করা হলেও কংগ্রেস তথা হিন্দুত্ববাদীদের হটকারিতায় সেটা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর সাতটি প্রদেশে আড়াই বছর কংগ্রেসের কুশাসন মুসলিমদের আলাদা রাষ্ট্রের কথা তীব্রভাবে ভাবতে শেখায়।

হিন্দুস্থানে মুশরিকরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ও শক্তিশালী হওয়ার কারণে মুসলিম জাতিকে হয় তাদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখতে অথবা নির্মূল করতে চায়। এ লক্ষ্য হাসিলের জন্যেই কংগ্রেসের দাবী ছিল এই যে এ উপমহাদেশের অধিবাসীদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকারকে তার হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণ এবং হিন্দু রামরাজ্য স্থাপনই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ও তার কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আচরণে এ বিশ্বাস মুসলমানদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং এ কারণেই মুসলমানগণ পাকিস্তান আন্দোলন করতে বাধ্য হন।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, পাকিস্তানের সূচনা তখন থেকে হয় যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজয়ীর বেশে হিন্দুস্থানে পদার্পণ করেন।[২০৪] অতঃপর

২০৪. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪১৩

www.pathagar.com

এ উপমহাদেশে কয়েকশত বছর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। বৃটিশ শাসনের শেষের দিকে পুনরায় বৃটিশ ভারতে মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাভাবনা ও প্রচেষ্টা শুরু হয়। উপমহাদেশে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলোতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা আলাদা রাষ্ট্রের ব্যাপারে প্রেরণা দিয়েছিল। তাই বিশ্ব ইসলামী ঐক্যের অগ্রদূত সাইয়েদ জামালুদ্দিন আগগানী আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে একটি মুসলিম রিপাবলিক গঠনের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রথম চিন্তাভাবনা করেন।

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিমলীগের বার্ষিক সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই অথবা বাইরে মুসলমানদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আল্লামা ইকবাল তার প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য কোনো নাম প্রস্তাব করতে পারেননি। এ কাজটি করেছেন চৌধুরী রহমত আলী। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে চৌধুরী রহমত আলী “নাও অর নেভার” (Now or Never) শীর্ষক একটি লিফলেট প্রকাশ করেন।[২০৫] [২০৬] চৌধুরী রহমত আলী তার লিফলেট ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে, লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানকারী মুসলিম ডেলিগেটদের কাছে এবং ইংল্যান্ডের প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকটে প্রেরণ করেন। এই প্রচার পত্রেই তিনি ‘পাকিস্তান’ শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি পাকিস্তান বলতে হিন্দুস্থানের উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি প্রদেশ তথা পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে বুঝিয়েছেন। এই প্রচার পত্রের মূল বিষয় ছিল মুসলিমদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র। ‘পাকিস্তান’ নামটি চৌধুরী রহমত আলীরই উদ্ভাবন- যা লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং প্রায় সাত বছর পর তা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়।

লাহোর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

প্রথমত : নিখিল ভারত মুসলিমলীগ দৃঢ়তার সাথে পুনঃঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ভারত শাসন আইন-এ যে যুক্তরাষ্ট্রের (Federal)

---

২০৫. Rahmat Ali: A Biography / Khurshid Kamal Aziz / P 303-306

২০৬. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪২৮

www.pathagar.com

পরিকল্পনা রয়েছে, তা এ দেশের উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে অসঙ্গত ও অকার্যকর বিধায় তা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত : সমস্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে বিবেচনা না করা হলে মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে এবং মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে সংবিধান রচিত হলে কোনো সংশোধিত পরিকল্পনাও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

তৃতীয়ত : নিখিল ভারত মুসলিমলীগের সুচিন্তিত অভিমত এরূপ যে, ভারতে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না যদি তা নিম্নবর্ণিত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত না হয়:

ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলো 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) গঠন করতে পারে, 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের' সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম।

চতুর্থত : এ সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানের কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান রাখতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমান জনগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথেও আলোচনা সাপেক্ষে সংবিধানে কার্যকর বিধান রাখতে হবে।

২৪মার্চ প্রবল উৎসাহের মধ্য দিয়ে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। হিন্দু সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহ লাহোর প্রস্তাবকে ক্যামব্রিজে বসবাসরত দেশত্যাগী ভারতীয় মুসলমান রহমত আলী কর্তৃক উদ্ভাবিত নকশা অনুযায়ী 'পাকিস্তানের জন্য দাবী' হিসেবে আখ্যায়িত করে। হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ লাহোর প্রস্তাবকে 'পাকিস্তান' ট্যাগ দিয়ে একটি রাষ্ট্রের ধারণা দেয়। মুসলমান নেতাদের পক্ষে সাধারণ মুসলিম জনগণের নিকট লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রদান এবং এর প্রকৃত অর্থ ও গুরুত্ব বুঝাতে হয়তো দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারতো। কিন্তু হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ কর্তৃক প্রস্তাবটিকে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে নামকরণ করাতে সাধারণ জনগণের

www.pathagar.com

মাঝে এর পূর্ণ গুরুত্ব জনে জনে প্রচার করার ব্যাপারে মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনেক বছরের পরিশ্রম কমিয়ে দেয়। বিরোধীতা করতে গিয়ে পাকিস্তানের প্রচার হিন্দুরাই বেশি করে। যদিও লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ ছিল না।

এরপর ১৯৪১ সালের ১৫এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাবকে নিখিল ভারত মুসলিমলীগের গঠনতন্ত্রে একটি মৌল বিষয় হিসেবে সন্নিবেশ করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত এটি লীগের প্রধান বিষয় ছিল। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে যখন মন্ত্রী মিশন ভারতে পৌঁছে, তখন ৭এপ্রিল দিল্লিতে নিখিল ভারত মুসলিমলীগ তাদের 'পাকিস্তান দাবী'র পুনরাবৃত্তি করতে মুসলিমলীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের তিন-দিনব্যাপী এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে মুসলিমলীগের ওয়ার্কিং কমিটি চৌধুরী খালিকুজ্জামান, হাসান ইস্পাহানি ও অন্যান্যদের সমন্বয়ে একটি উপ-কমিটি নিয়োগ করে। চৌধুরী খালিকুজ্জামান প্রস্তাবের একটি খসড়া তৈরি করেন। অন্যান্য সদস্যদের সাথে খসড়াটি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সামান্য পরিবর্তনের পর উপ-কমিটি এবং অতঃপর সাবজেক্ট কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

পাকিস্তান দাবী ভারতের মুসলিমদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর পিছনে অনেক সুস্পষ্ট কারণ ছিল। বাংলা ও পাঞ্জাবের কৃষকদের নিকট 'পাকিস্তান'কে হিন্দু জমিদারদের শোষণের অবসান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বেঙ্গল মুসলিমলীগের সচিব আবুল হাশেম ১৯৪৪ সালে এক ঘোষণার মাধ্যমে জমিদারি উচ্ছেদের অঙ্গীকার করেন। আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল যে, প্রস্তাবিত পাকিস্তান ভারতের অংশ বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ব্যবসায়ী বা পেশাজীবীদের প্রভাব বলয় থেকে পৃথক করবে বলে অঙ্গীকার করে। এতে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ এবং নতুন গড়ে ওঠা মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ চাকরি গ্রহণ করতে পারবে। তুলনামূলকভাবে বড় মুসলিম পুঁজিপতিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯৪৭ সালের পূর্বে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে বড় ধরনের কোনো শিল্পকারখানা ছিল না বললেই চলে। অবশ্য এতদ্‌অঞ্চলে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার সাথে জড়িত ক্ষুদ্র মাপের কিছু উদ্যোক্তার আবির্ভাব ঘটে। প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বড় পুঁজিবাদের প্রতিযোগিতার কবল থেকে রক্ষা করে পাকিস্তান এ সকল লোকের জন্য আর্থিক সুবিধাদি লাভের ব্যবস্থা করে দেয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনের আদর্শিক লড়াই

রাজনীতির পাশাপাশি পাকিস্তান আন্দোলনকে আদর্শিকভাবেও লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৩৫ সালে মুসলিমরা নিজেদের জন্য আলাদা আবাসভূমির কথা ভাবছিল। তার প্রেক্ষিতে লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়। তখন হিন্দু নেতাদের সাথে সুর মিলিয়ে কিছু মুসলমান ব্যক্তিত্বও পাকিস্তান আন্দোলনের সমালোচনায় নেমে পড়লেন। মুসলমান ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন দেওবন্দি মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী।

তিনি 'মুত্তাহিদা কওমিয়াত আওর ইসলাম' বা 'যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম' শিরোনামে একটি বই লিখেন। তিনি যুক্ত জাতীয়তার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে পুস্তিকায় লেখেন, "যুক্ত জাতীয়তার বিরোধীতা ও তাকে ধর্ম বিরোধী আখ্যায়িত করা সংক্রান্ত যে সব ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার নিরসন করা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হলো।

১৮৮৫ সাল থেকে কংগ্রেস ভারতের জনগণের কাছে স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে জাতিগত ঐক্য গড়ার আবেদন জানিয়ে অব্যাহতভাবে জোরদার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। আর তার বিরোধী শক্তিগুলি সেই আবেদন অগ্রহণযোগ্য, এমনকি অবৈধ ও হারাম সাব্যস্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য এ জাতিগত ঐক্যের চাইতে ভয়ংকর আর কিছুই নেই, এ কথা সুনিশ্চিত। এ জিনিসটা ময়দানে আজ নতুন আবির্ভূত হয়নি, বরং ১৮৮৭ সাল বা তার পূর্ব থেকে আবির্ভূত। বিভিন্ন শিরোনামে এর ঐশী তাগিদ ভারতীয় জনগণের মন মগজে কার্যকর করা হয়েছে। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, " আমাদের যুগে দেশ থেকেই জাতির উৎপত্তি ঘটে থাকে। অতএব হিন্দু মুসলিম এক জাতি, আমরা সবাই ভারতীয়"।

মওলানা সাহেবের এই বই প্রকাশিত হওয়ার পর তাত্ত্বিক দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদের বিষয়ে আদ্যোপান্ত গবেষণা নির্ভর বই লিখেন মওলানা মওদূদী (রহ.)। সেই বইটি বাংলায় "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সেই বইতে হিন্দু-মুসলিম এক জাতি এই ধারণার সব যুক্তি খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে, সমগ্র পৃথিবীর গোটা মানব বসতিতে মাত্র দু'টি দলের অস্তিত্ব রয়েছে; একটি আল্লাহর দল অপরটি শয়তানের দল। তাই এই দুইদল মিলে কখনো এক জাতি হতে পারে না, যেমন পারে না তেল ও পানি মিশে এক হয়ে

www.pathagar.com

যেতে। মওলানার এই বই তখন রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

মওলানা মওদূদী (রহ.) বলেন, অমুসলিম জাতি সমূহের সাথে মুসলিম জাতির সম্পর্কের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি এইযে, মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে মুসলিম-অমুসলিম সকলেই সমান। আর দ্বিতীয়টি এইযে, ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য হেতু আমাদেরকে তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম সম্পর্কের দিক দিয়ে মুসলিমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, দয়া, ঔদার্য ও সৌজন্যের ব্যবহার করবে।

কারণ মানবতার দিক দিয়ে এরূপ ব্যবহারই তারা পেতে পারে। এমনকি তারা যদি ইসলামের দুশমন না হয়, তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব, সন্ধি এবং মিলিত হবার উদ্দেশ্যে (Common Cause) সহযেগিতাও করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকার বস্তুগত ও বৈষয়িক সম্পর্ক তাদেরকে ও আমাদেরকে মিলিত করে 'একজাতি' বানিয়ে দিতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, যেসব গন্ডীবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির ওপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে আল্লাহ ও তাঁর রসুল তা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, অর্থনীতি ও রাজনীতিক অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুণ মানবতাকে বিভিন্ন ও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র খন্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম তার সবগুলোকে আঘাতে চূর্ণ করে দেয় এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদা সম্পন্ন ও সমানাধিকার প্রধান করেছে।

ইসলামী জাতীয়তায় মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে, কিন্তু জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণে নয়। করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে এক স্বাভাবিক সত্য বিধান পেশ করা হয় যার নাম ইসলাম। আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয়মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা, সততা ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানবজাতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

যারা এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারা এক জাতি হিসেবে গণ্য হবে আর যারা তা অগ্রাহ্য করবে, তারা সম্পুর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ মানুষের একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সমস্ত ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি

www.pathagar.com

উম্মাহ। অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। মুসলিম ও মুশরিক কখনো এক জাতি হতে পারে না।

দ্বি-জাতি তত্ত্ব হঠাৎ করে তৈরি হওয়া কোনো তত্ত্ব নয়। এ তত্ত্ব মানুষের সৃষ্টি থেকে, বিশেষ করে ইসলামের আবির্ভাব থেকে সমাজে সুস্পষ্ট ছিল। রসুল (সা.) বলেছেন "আল কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহেদা"- সমস্ত কুফর জাতি এক জাতি এবং "আল মুসলেমু আখুল মুসলিম" এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। এ এক চরম সত্য। যেহেতু মুসলিম ধর্মের মূল শিরক বিবর্জিত ওহ্দানিয়াতের প্রতি বিশ্বাস ও তদানুযায়ী জীবনাচার। এই বিশ্বাসের রূপরেখা প্রতিফলিত হয় মুসলিম সংস্কৃতিতে ও এরই সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্র দিয়ে। কোরআন ধর্মের একত্বের ওপরে জোর দিয়ে একে ঈমানের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে। যে কারণে দেশের, ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও গোটা বিশ্বের মুসলিম সংস্কৃতিতে ঐক্যের সুর বিরাজমান। সব মুসলমান এক জাতি।[২০৭]

ভারতের স্বাধীনতায় আরেকটি ব্যর্থ সুযোগ 'ক্রিপস মিশন'

১৯৪১ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সাঁড়াশি আক্রমনের চাপে মিত্রশক্তির অন্যতম সদস্য বৃটেন নাজেহাল হয়ে পড়ে। একই সাথে একই বছরের শেষদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং তা আমাদের উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জাপানের হাতে বৃটেন ও তার মিত্রশক্তির দুর্গ সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। এর কিছুদিন পর জাপান মিয়ানমার ঘিরে ফেলে। চট্টগ্রাম বন্দর, কোলকাতা বন্দর জাপানির আক্রমনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই বৃটেন ও তার শত্রুকে একই চোখে দেখতেন। গান্ধী বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ ভগবান হিটলারকে পাঠিয়েছেন। কংগ্রেস মনে করতো যুদ্ধে বৃটেন কোণঠাসা হয়ে পড়লে তার থেকে বেশি বেশি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা যাবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জয় করে জাপান বার্মার ভিতর দিয়ে দ্রুত ভারতের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে বৃটিশ সরকার বুঝতে পারেন যে, এই সংকটের সময় ভারতবাসীর সাহায্য ছাড়া ভারতে জাপানকে বাধা দেওয়া যাবে না । আর

২০৭. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪১৩ - ৪২০

www.pathagar.com

ভারতে বৃটিশ অধিকার রক্ষা করা যাবে না। জাপানি আক্রমণের ফলে উদ্ভূত এই জটিল পরিস্থিতিতে এশিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপানি আক্রমণের মোকাবিলা করতে হলে ভারতের সামরিক শক্তি ও সম্পদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও বৃটিশ সরকারকে ভারত সম্পর্কে নমনীয় মনোভাব নিতে বাধ্য করে। এই সময়ে চীনের রাষ্ট্রপতি চিয়াং-কাই শেক ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট উভয়েই ভারত সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। এরই সঙ্গে সঙ্গে আটলান্টিক সনদে পরাধীন জাতিগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই অর্থে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ভারতের পক্ষে অনুকূল ছিল।

সাতই মার্চ ১৯৪২, জাপান বার্মা দখল করে। তার মাত্র চার দিন পর ১১মার্চ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল হাউস অব কমন্সে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দানের পর ওয়ার কেবিনেটে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো একটি খসড়া ঘোষণায় সন্নিবেশিত হয়। সেই খসড়া ঘোষণা নিয়ে স্টাফোর্ড ক্রিপস ২৯মার্চ ভারতে আগমণ করেন। খসড়ার ভুমিকায় বলা হয় যে, একটি নতুন ভারতীয় ডমিনিয়ন গঠন এ ঘোষনার উদ্দেশ্য।[২০৮]

১৯৪২ সালের ২৪মার্চ স্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতে এসে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে একগুচ্ছ প্রস্তাব ঘোষণা করেন। তিনি মূলত কংগ্রেস ও মুসলিমলীগসহ অন্যান্য দলের নেতাদের সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর নিচের প্রস্তাবগুলি পেশ করেন:-[২০৯]

ক. যুদ্ধের অবসানে ভারতকে কানাডার মতো অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion Status) দেওয়া হবে।

খ. যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে এবং সেই সভাকে ভারতের নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

গ. নতুন সংবিধান কোনো প্রদেশের পছন্দ না হলে সেই প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংবিধান রচনা

---

[২০৮] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৪১

[২০৯] ক্রিপসের দৌত্য / https://bit.ly/3aOZ100 / অ্যাকসেস ইন ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

করতে পারবে। ভারতের যে কোনো প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য ইচ্ছে করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও থাকতে পারবে।

ঘ. সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা বহাল রাখা।

ঙ. প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক আইনসভা সংবিধান সভার সদস্যদের নির্বাচন করবে, অন্যদিকে দেশীয় রাজ্যের রাজারা তাদের সদস্যদের মনোনীত করবেন।

চ. নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বৃটিশ সরকার নিজের হাতে রাখবে এবং বড়লাটের কার্যনির্বাহক কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা বাতিল করার অধিকার বড়লাটের থাকবে।

ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া

স্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বিশেষত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখেন। তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই এ আলোচনা চলতে থাকে।

এক. প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নের প্রদেশে যোগদান না করার স্বাধীনতা।
দুই. শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদের দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব এবং
তিন. সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন।

খসড়া ঘোষণার সময় প্রদেশগুলোকে এ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করা থেকে তারা চাইলে বিরত থাকতে পারে। এ সম্পর্কে তাদের কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ানক তীব্র। ধারণা, এতে ভারতের অখন্ডতার প্রতি চরম আঘাত হানা হবে। তাই তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেসের দাবী হলো যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। এতে কংগ্রেসের সুবিধা এই যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। এ ব্যবস্থা কিন্তু মুসলিমলীগ মেনে নিতে পারে না। কংগ্রেসের জোর দাবী এই কেন্দ্রে সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হোক। এতে মুসলিমলীগ ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে বলে তারা এ দাবী মেনে নিতে পারে না।[২১০]

২১০. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৪২-৪৪৩

www.pathagar.com

স্টাফোর্ড ক্রিপসের সাথে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কিছুদিন যাবত পত্র বিনিময় হয়। কিন্তু কংগ্রেসের দাবী মেনে নেওয়া হয়নি বলে ১১এপ্রিল কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা করে। মুসলিমলীগ তো আগেই ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। মুসলিমলীগের কথা এই যে, যতক্ষণ না পাকিস্তান প্রস্তাবের মূলনীতি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং মুসলিম ভারতে সত্যিকার রায় প্রতিফলিত হয়, এমন কোনো পদ্ধতিতে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেওয়া না হয়েছে, সে পর্যন্ত ভবিষ্যতের কোনো প্রস্তাব মুসলিমলীগ মেনে নিতে পারবে না।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার কারণ

ক্রিপসের প্রস্তাবগুলো ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, কারণ-

১. ক্রিপসের প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারের সদিচ্ছার অভাব প্রকাশ পায়, তাই কংগ্রেস ও মুসলিমলীগসহ ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই ক্রিপস-এর প্রস্তাব একযোগে প্রত্যাখ্যান করে।

২. এই প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবীকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় অর্থাৎ ক্রিপস প্রস্তাবে দেশ বিভাগের পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকায় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে।

৩. ভারতের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে বৃটিশ সরকার রাজি ছিল না।

৪. ক্রিপস প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারকে বৃটিশ মন্ত্রীসভার মতো সম-মর্যাদা ও ক্ষমতা দেওয়ার কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না।

৫. মুসলিমলীগ ক্রিপস প্রস্তাবে আপাত খুশি হলেও সরাসরি দেশ বিভাগ মেনে না নেওয়ায় তা বর্জন করে। ফলে ক্রিপস তার প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহার করে দেশে ফিরে যান।[২১১]

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেস চরম ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়। কংগ্রেস চেয়েছিল একটি জাতীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে উপমহাদেশের

---

২১১. ক্রিপসের দৌত্য / **https://bit.ly/3aOZ100** / অ্যাকসেস ইন ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ওপর তার শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে। এ ছিল ভারতীয় মুসলমানদের পদদলিত করে রাখার এক নির্মম দুরভিসন্ধি। যাহোক বৃটিশ সরকার তাদের স্বার্থেই কংগ্রেসের এ অন্যায় আবদার মেনে নিতে পারেননি। বৃটেন যুদ্ধে হেরে গেছে এটাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করে গান্ধী ১৯৪০ সালের মে মাসে ভাইসরয়কে লিখিত এক পত্রে বলেন, "এ নরহত্যা বন্ধ করতে হবে। তোমরা তো হেরে যাচ্ছ। এরপরও যদি জিদ ধরে থাকো, তাহলে অধিকতর রক্তপাত ঘটবে। হিটলার একজন মন্দ লোক নয়। তোমরা আজ যুদ্ধ বন্ধ করলে, সেও তোমাদের অনুসরণ করবে"।

ভাইসরয় এ জবাবে বলেন, আমরা এখন যুদ্ধরত আছি। আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বে আমরা নড়চড় করবো না। আমাদের জন্যে আপনার উৎকণ্ঠা বুঝতে পারছি। তবে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। গান্ধী ভাইসরয়ের জবাবে তুষ্ট না হয়ে ৬জুলাই প্রত্যেক ইংল্যান্ডবাসীর প্রতি এক আবেদনে বলেন, অস্ত্র সংবরণ করো। কারণ এ তোমাদের নিজেদেরকে এবং মানবতাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তোমরা হিটলার ও মুসোলিনিকে ডেকে আনবে এবং তারা তোমাদের সব কিছুই কেড়ে নেবে। ঠিক আছে, তাদেরকে তোমাদের মনোরম অট্টালিকাদিসহ তোমাদের সুন্দর দ্বীপ দখল করতে দাও।

স্টাফোর্ড ক্রিপস ২৬জুলাই বেতার ভাষণে, তার ভারত ভ্রমণের সময় থেকে সর্বশেষ ভীতিপ্রদর্শন পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনীতির পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, কোনো দায়িত্বশীল সরকার কংগ্রেসের দাবী বিবেচনা করতে পারে না। কংগ্রেস আধিপত্যের চরমবিরোধী মুসলমানগণ এবং কয়েক কোটি অনুন্নত সম্প্রদায়ও এ দাবী মানতে পারে না। গান্ধীর দাবী মেনে নেওয়ার অর্থ চরম অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। তিনি আরও বলেন, আমরা একজন কল্পনা প্রবণকে প্রাচ্যে জাতিসংঘের বিজয় প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে দিতে পারি না, তিনি অতীতে যতো বড়োই স্বাধীনতা সংগ্রামী থাকুন না কেন।

জওহরলাল নেহেরু উক্ত বেতার ভাষণের প্রতিবাদে স্টাফোর্ড ক্রিপসকে 'শয়তানের উকিল' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, বৃটেন ভারতের যে অনিষ্ট করেছে এবং এখনও করছে, তার জন্য তার উচিত ছিল অনুতপ্ত হয়ে অতি বিনীতভাবে আমাদের নিকটে আবেদন পেশ করা। মুসলমানদের কংগ্রেস দাবীর বিরোধিতাকে নেহেরু প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমার মুসলমান দেশবাসীকে

www.pathagar.com

আমি স্টাফোর্ড ক্রিপস অপেক্ষা ভালোভাবে জানি এবং তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা অপবাদ মাত্র।[২১২]

জওহরলাল নেহেরু ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে ভারতীয়দের সমর্থন সংগঠিত করার জন্য জোরালোভাবে মত প্রকাশ করলেও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং গান্ধী নিজেও এ ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন। ফলে কংগ্রেস-বৃটিশ সম্পর্ক তিক্ত হয় এবং অন্যান্য ঘটনা 'ভারত ছাড় আন্দোলন' এর মতো সম্পূর্ণ সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মিশনের ব্যর্থতার জন্য ক্রিপস কংগ্রেসকে দায়ী করে, অন্যদিকে কংগ্রেস এ দায়ভার চাপায় বৃটিশ সরকারের ওপর। এভাবে অবিভক্ত স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার একটি বড় সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

জাপানের জোরে গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপান একের পর এক বৃটিশ দুর্গ দখল করে ভারতকে প্রায় ঘিরে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন আদায়ে ক্রিপসকে ভারতে পাঠায় বৃটেন। কিন্তু ক্রিপসের মিশন ব্যর্থ হয়। এদিকে কংগ্রেস নিশ্চিত ছিল জাপান যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে ভারত দখল করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর ভারতে জাপানিদের হাতে বৃটিশদের পতন হলে তারাই শাসন ক্ষমতা দখলে নিবে। তাই জাপানিদের কাছে নিজেদের বৃটিশ বিরোধী অবস্থান নিশ্চিত করতে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে যুদ্ধে মিত্র শক্তির পরাজয় অবধারিত। এই সুযোগে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সমগ্র দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেস। এভাবেই মুসলমানদের সকল দাবী দাওয়া প্রত্যাখ্যান করে উপমহাদেশে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কংগ্রেসের এ পরিকল্পনার স্বীকৃতি পাওয়া যায় মওলানা আবুল কালাম আযাদ-এর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' বইয়ে। তিনি বলেন, তার মনে এ পরিকল্পনা ছিল যে, যেই মাত্র জাপানিরা বাংলায় পৌঁছে যাবে এবং বৃটিশ সৈন্য বিহারে পিছু হটে আসবে,

[২১২] The Struggle for pakistan / Ishtiaq Husain Qureshi / P. 47-48

www.pathagar.com

কংগ্রেস গোটা দেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে।[২১৩] কিন্তু কংগ্রেসের এ পরিকল্পনা অমূলক ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়।

ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পরপরই বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতের বোঝাপড়া শেষ করে দিয়ে গান্ধী তীব্র বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা করতে শুরু করে। গান্ধী ১৯৪২ সালে ২৬এপ্রিল 'হরিজন' পত্রিকাতে 'ভারত ছাড়' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন "ভারতে বৃটিশ শাসনের অবিলম্বে অবসান চাই। ভারতের স্বাধীনতা চাই কেবল ভারতের স্বার্থে নয় — চাই বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ এবং একজাতির ওপর অন্যজাতির আক্রমণের অবসানের জন্য।" এরপর ১৯৪২ সালের ১৪জুলাই মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধা অধিবেশনে 'কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি' গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব অনুমোদন করে। ১৯৪২ সালের ৮আগস্ট কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সমিতি গান্ধীর ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের আইনগত স্বীকৃতি জানায় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, ৯আগস্ট ১৯৪২ সালে সকালে আন্দোলন শুরু হবে।

এই প্রস্তাবে বলা হয় ভারতের মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য, নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, বৃটিশ ভারত ছেড়ে চলে গেলে ভারতীয় জনপ্রতিনিধিরা একটি সামরিক সরকার গঠন করবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান রচনা করবেন। প্রস্তাব অনুমোদনের পর গান্ধী দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' । অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করব, না হয় মৃত্যুবরণ করব । গান্ধীর এই উদাত্ত আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ছাড় আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের রণধ্বনি ছিল 'করেঙ্গা ইয়ে মরেঙ্গে'। সারাজীবন কুসুম কোমল আন্দোলন করা ও বৃটিশদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে অধিকার আদায়ের কথা বলা গান্ধী হুট করেই জাপানের জোরে খুবই সহিংস হয়ে উঠলেন। সারা ভারতে কংগ্রেস কর্মীদের দিয়ে জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন শুরু করলেন।

বৃটিশ সরকার ১৯৪২ সালের ৯আগস্ট গান্ধীকে গ্রেফতার করে। এরপর একে

---

২১৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৪৫

www.pathagar.com

একে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, জে. বি. কৃপালনী সমেত বহু প্রথম সারির নেতা গ্রেফতার হন। বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি সংগঠন রূপে ঘোষণা করে। সারা হিন্দুস্তানে কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হয়। সরকারি দমন নীতির প্রতিবাদে দেশের আপামর জনসাধারণ ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

দেশব্যাপী ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের কর্মীরা আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। রেললাইন ধ্বংস, স্কুল-কলেজ বর্জন, বিভিন্ন অফিস-আদালতে অগ্নি-সংযোগ, ট্রেন ও টেলিফোন সংযোগ বিছিন্নকরণ, থানা, ডাকঘর, রেজিস্ট্রি অফিস, রেলস্টেশন দখল ইত্যাদি কর্মসূচি চলতে থাকে।

ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল মহারাষ্ট্রের সাতারা, মেদিনীপুরের তমলুক, কাঁথি, দিনাজপুরের বালুরঘাট, উত্তর প্রদেশের বালিয়া, আজমগড়, আসামের নওগাঁ, ওড়িশার তালচের, বালাশোর ইত্যাদি। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে সাতারার শ্রীনাথ লালা, নানা পাতিল, বালিয়ার চৈতু পান্ডে, সরযূ পান্ডে, তমলুকের মাতঙ্গিনী হাজরা, সুশীল ধাড়া, পাঞ্জাবের গৃহবধু ভোগেশ্বরী ফকোননি, আসামের স্কুল ছাত্রী কনকলতা বড়ুয়া অন্যতম। এছাড়া অরুণা, আসিফ আলি, সুচেতা কৃপালিনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্রদেব, রামমনোহর লোহিয়া, যোগেশ চ্যাটার্জি, উষা মেহেতা, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অজয় মুখার্জি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

জাপানের জোরে গান্ধী এতোটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ভারত ছাড় আন্দোলনকে আন্দোলন শুরু করার আগেই বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার এই ঘোষণা ইংরেজদের আগেই সচেতন করে তোলে এবং কংগ্রেস নিষিদ্ধ সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে। সারা দেশে আন্দোলনের শুরুতেই দমননীতি চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। অবশেষে মাত্র চার মাসে আন্দোলন পুরো নিয়ন্ত্রণে চলে আসে বৃটিশ সরকারের।[২১৪]

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারত ছাড় আন্দোলনকে গৃহযুদ্ধের ঘোষণা আখ্যা দিয়ে

---

[২১৪]. ভারত ছাড় আন্দোলন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/৩rG১QHz / অ্যাকসেস ইন ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

এধরণের হটকারি সিদ্ধান্ত থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। জনগণের নিরাপত্তা ও বৃটিশদের দমননীতি থামাতে তিনি কংগ্রেসকে এই আন্দোলন থামানোর আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে মুসলিমলীগ ও অন্যান্য অকংগ্রেসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।[২৬৫] ১৯৪২ এর ডিসেম্বরে ভারত ছাড় আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়।

যেসব কারণে ভারত ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হয়

১. আন্দোলনের শুরুতেই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রেফতার হয়ে যাওয়া এবং সারাদেশে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বৃটিশদের কঠিন দমননীতি।

২. আন্দোলনের সঠিক পরিকল্পনা ও রূপরেখা না থাকা এবং স্থানীয় নেতৃত্ব আত্মগোপনে চলে যাওয়া।

৩. কংগ্রেস এই আন্দোলনে অন্য কোনো রাজনৈতিক সংগঠনকে সাথে তো রাখেনি, অধিকন্তু অন্যান্য দলের করা বিভিন্ন সময়ের সমঝোতা ও চুক্তি বাতিল করেছে। তাদের চিন্তা ছিল জাপানের আক্রমণে বৃটিশরা পিছু হটলে তারাই হবে ভারতের একমাত্র ক্ষমতার দাবীদার। তাই আন্দোলন চলাকালে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে পাশে তো পায়নি উল্টো বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছে।

৪. গান্ধীর উস্কানীতে আন্দোলন শুরু থেকে সহিংস আকার ধারণ করেছে। শিক্ষালয়, রেললাইন, ডাক ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে আন্দোলনকারীরা। ফলে জনসাধারণ এই আন্দোলনের বিপক্ষে চলা যায়।

৫. যাদের ওপর আস্থা করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত সেই জাপানীরা বাংলা দখল করতে ব্যর্থ হয়। জাপানিদের টার্গেট ছিল কোলকাতা বন্দর দিয়ে ভারত আক্রমণ করে তারা ভারতে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারা তা করতে ব্যর্থ হয়।

কোণঠাসা কংগ্রেসের সাথে মুসলিমলীগের কতক ঐক্য প্রচেষ্টা-

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের হিংসাত্মক মনোভাব এবং তাদের নির্মূল করে অথবা অন্তত অধীনস্ত করে রেখে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য,

---

২৬৫. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৪৬

www.pathagar.com

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের পলিসি অনেকটা এরকম ছিল, যে কোনো ব্যাপারে যদি দেখা যায় যে মুসলমানগণ সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করছে, তখন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার ন্যায় কংগ্রেস তা কিছুতেই হতে দেবে না। ক্রিপসের প্রস্তাবে কিছুটা পাকিস্তান বা ভারত বিভাগের গন্ধ আবিস্কার করে কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করেছে। অতঃপর যুদ্ধে বৃটিশের পরাজয় অবধারিত মনে করে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তথা ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলোতে চরম ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড শুরু করে।

তারা আশা করেছিল, জাপানীরা ভারতের একাংশ দখল করে নিতে পারলে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী মানতে বাধ্য হবে এবং সারা ভারতে সে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এই বিষয়ে তারা অত্যন্ত আশাবাদী ছিল। তাই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা দূরে থাক উল্টো সমঝোতা যা হয়েছে পূর্বে তা বাতিল করে দিলো গান্ধি-নেহেরুরা। কিন্তু এর ফল হয়েছে উল্টো। পুরো বিষয়টা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেছে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কোনো মহলই সমর্থন করেনি। এমনকি হিন্দু মহাসভা ও কমিউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত এর তীব্র সমালোচনা করেছে। আজীবন ইংরেজদের অনুকূলে থাকা কংগ্রেস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে বৃটিশ সরকার কর্তৃক। গান্ধীসহ সকল কেন্দ্রীয় নেতাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আর যাদের ওপর ভরসা করে এতো আয়োজন সেই জাপানিরা ভারত দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কংগ্রেসের এই পরিস্থিতিতে মুসলিমলীগ মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিমলীগের মন্ত্রীসভা বলবৎ ছিল। পাঞ্জাবে মুসলিম ইউনিয়নিষ্ট পার্টির মন্ত্রীসভাও মুসলিমলীগ ও ভারত বিভাগ সমর্থন করতেন। ফলে জনগণের সাথে গভীর যোগাযোগ থাকার কারণে মুসলিমলীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং পাকিস্তান আন্দোলনও শক্তিশালী হতে থাকে। এতে করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে গান্ধী ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের কাছে লিখিত এক পত্রে বলেন, তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বৃটিশদের পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্যে কংগ্রেসকে পরামর্শ দিতে চান। এর অর্থ হলো

www.pathagar.com

কংগ্রেস আগের মতো বৃটিশদের সহায়তা করতে প্রস্তুত। তবে গান্ধী শর্ত জুড়ে দেন, সহযোগিতা করা হবে যদি দ্রুতই ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং যুদ্ধ চলাকালে ভারতের ওপর কোনো আর্থিক বোঝা চাপানো না হয়।

ভাইসরয় এ পত্রের জবাব দেন ১৫আগস্টে। বলা হয়, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে প্রস্তুত আছেন। তার পূর্বে বৃটেনের সাথে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হতে হবে। গান্ধীর দাবী অনুযায়ী কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের নিকট দায়ী একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে হলে বর্তমান শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে হবে। তা এখন কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ভাইসরয় বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের অধীন একটি পরিবর্তনকালীন সরকার গঠনে সহযোগিতা করার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সকল দল ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পন্থা পদ্ধতি নিয়ে নীতিগতভাবে একমত হলে প্রস্তাবিত সরকার ভালো কাজ করতে পারবে। গান্ধী তার স্বভাবসুলভ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, বৃটিশ সরকার ৪০ কোটি মানুষের ওপর যে শাসন ক্ষমতা লাভ করে আছেন, তা ততোক্ষণ পর্যন্ত হস্তান্তর করতে রাজী নন, যতোক্ষণ না ভারতবাসী তা ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। [২১৬]

গান্ধীর এ কথায় আরো একটি সহিংস আন্দোলনের হুমকি প্রচ্ছন্ন ছিল। ভাইসরয়ের নিকট থেকে হতাশাজনক জবাবে কতিপয় কংগ্রেস নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাদের ধারণা, কংগ্রেস তার প্রচেষ্টায় সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসতে পারলে তো খুবই ভালো হতো। কিন্তু তা যখন সম্ভব নয়, তখন মুসলিমলীগের সাথেই একটি সমঝোতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

সি আর ফর্মুলা

কংগ্রেসের এ ধরনের মনোভাব পরিবর্তনের পূর্বে প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারিয়া এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থায় অবসানের জন্যে ভারত বিভাগ অপরিহার্য। তিনি এ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে

---

২১৬. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৪৮

www.pathagar.com

সম্মত করার জন্যে জনসভায় তার মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। ৪৩ সালের এপ্রিলে মাদ্রাজের এক জনসভায় তিনি বলেন, আমি পাকিস্তানের পক্ষে। কারণ আমি এমন রাষ্ট্র চাই না, যেখানে আমাদের হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের কোনো মান সম্মান নেই। মুসলমান পাকিস্তান লাভ করুক। বৃটিশ সরকার অসুবিধা সৃষ্টি করলে তার মোকাবিলা আমরা করবো। ...আমি পাকিস্তানের পক্ষে, তবে আমি মনে করি কংগ্রেস এতে রাজী হবে না।

রাজা গোপালাচারিয়া আরও বলেন, আমরা বৃটিশ শাসনের অবসান চাই। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক মতানৈক্যও আমরা মিটাতে চাই। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল হিসেবে মুসলিমলীগকে আমাদের মেনে নিতে হবে। তারা চায় যে আমরা তাদের দাবী মেনে নেই। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবী পাকিস্তান। রাজা গোপালচারিয়া ১৯৪৩ সালে একটি ফর্মূলা তৈরি করেন যা সি আর ফর্মূলা নামে অভিহিত। ফর্মূলাটি কংগ্রেস লীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি মনে করেন। কারাগারে গান্ধীর অনশনরত অবস্থায় তার সাথে সাক্ষাৎ করে ফর্মূলাটি তাকে দেখানো হয় এবং গান্ধী তা অনুমোদন করেন। অতঃপর ১০জুলাই ১৯৪৩, ফর্মূলাটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।[২১৭]

কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিস্বরূপ ফর্মূলাটি মোহনদাস করমচাঁদ, গান্ধী এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মেনে নিয়ে তারা যথাক্রমে কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগকে মেনে নেওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাবেন। ফর্মুলার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ : [২১৮]

১। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে মুসলিমলীগ ভারত স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করছে এবং পরিবর্তনশীল সময়ে একটি সাময়িক মধ্যবর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করবে।

২। ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে সীমানা নির্ধারণের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে। তারপর সে সব অঞ্চলে বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং গণভোট দ্বারা ভারত থেকে পৃথক হওয়ার বিষয়টি মীমাংসা হবে। ভারত থেকে পৃথক

---

২১৭. The Struggle for pakistan / Ishtiaq Husain Qureshi / P. 204-205

২১৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৫০

www.pathagar.com

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সপক্ষে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাওয়া যায় তাহলে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে সীমান্তের জেলাগুলোর যে কোনো রাষ্ট্রে যোগদানের অধিকার থাকবে।

৩। গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্বে সকল দলের বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৪। ভারত থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্তের পর প্রতিরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে।

৫। অধিবাসী স্থানান্তর হবে সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত ও ঐচ্ছিক।

৬। ভারত শাসনের জন্যে বৃটেন কর্তৃক সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের বেলায় ফর্মুলার শর্তাবলী অবশ্য পালনীয় হবে।

মুসলিমলীগ ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মুলাটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব জিন্নাহর ওপর অর্পিত হয়। বিষয়টি নিয়ে গান্ধী-জিন্নাহর মধ্যে বহু পত্রবিনিময় হয়। জিন্নাহ কতকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেন। গান্ধী সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হন। অবশেষে চক্রবর্তী রাজা গোপালচারিয়ার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

সি আর ফর্মুলার ব্যর্থতার কারণ

এই সমঝোতা চেষ্টার ব্যর্থতার মূল কারণ গান্ধী ও তাদের পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব। গান্ধী মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। টু-নেশন থিওরি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং একমাত্র কংগ্রেসকেই তিনি সকল ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন বলে বিশ্বাস করেন। আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববাসীকে দেখানো যে তিনি একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর সি আর ফর্মুলায় অনুমোদন করার কারণ আগের মতোই মুসলিমলীগের সাথে ঠুনকো চুক্তি করা। যাতে প্রয়োজনের সময় মুসলিমলীগকে কাছে পাওয়া যায় আর প্রয়োজন শেষে সমঝোতা বাতিল করা যায়। কিন্তু জিন্নাহ যখন প্রতিটি পদক্ষেপ যাচাই করছিলেন তখন গান্ধীর পাকিস্তান মেনে না নেওয়ার বিষয়টি সামনে চলে আসে ও আলোচনা ভেস্তে যায়।

www.pathagar.com

সাপ্রু প্রস্তাব

সি আর ফর্মূলা ব্যর্থ হওয়ার পর তেজবাহাদুর সাপ্রু কতিপয় প্রস্তাব পেশ করেন এবং কংগ্রেস-মুসলিমলীগের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। সাপ্রু নির্দলীয় সম্মেলনের স্ট্যান্ডিং কমিটি ১৯৪৪ সালের ৩ডিসেম্বর এলাহাবাদে মিলিত হয় এবং একটি কমিটি গঠন করেন। তার সদস্য হলেন, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু (চেয়ারম্যান), এম, আর জয়াকর (তিনি হাজির হননি), বিশপ ফস ওয়েস্টকট, এস রাধাকৃষ্ণ, স্যার হোসি মোদী, স্যার মহারাজ সিংহ, মুহাম্মদ ইউনুস, এন আর সরকার, ফ্ল্যাংক এন্টনী এবং সন্ত সিংহ। অতঃপর সাপ্রু ১০ডিসেম্বর জিন্নাহর নিকটে লিখিত পত্রে গঠিত কমিটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সাক্ষাতপ্রার্থী হন।

জিন্নাহ্ ১৪ডিসেম্বর পত্রের জবাবে বলেন, তিনি কোনো নির্দলীয় সম্মেলন অথবা তার স্ট্যান্ডিং কমিটিকে কোনোরূপ স্বীকৃতি দানে নারাজ। সাপ্রু পরের বছর ১৯৪৫ সালের ৮এপ্রিল তার কমিটির প্রস্তাবগুলির ঘোষণা দেন। কমিটির প্রস্তাবগুলোতে তার মনোভাবই পরিস্ফুট হয়েছে। প্রস্তাবের প্রথম দফায় দৃঢ়তার সাথে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করা হয়েছে। পৃথক নির্বাচন রহিত করারও প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রস্তাবগুলো মুসলমানদের নিকটে যে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। জিন্নাহ্ এ কমিটিকে কংগ্রেসের গৃহ চাকরানীর সাথে তুলনা করে বলেন, এ কমিটি গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়েই কথা বলছে। [২১১]

দেশাই-লিয়াকত চুক্তি

১৯৪৫ সাল। ভারত ছাড় আন্দোলনের দায়ে তখনও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারাগারে। কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেস সদস্যগণ কয়েক মাস ধরে নিয়মিত আইনসভায় যোগদান করতে থাকেন এবং আইনসভার মুসলিমলীগ সদস্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে থাকেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ভুলা ভাই দেশাই লীগ দলের নেতা লিয়াকত আলী খানের সাথে পুরোপুরি একমত হয়ে কাজ করছেন বলে শোনা যায়। একটি সাময়িক জাতীয় সরকারের সংবিধান নিয়ে উভয় নেতা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছেন বলেও শোনা যায়। দেশাই ১৩জানুয়ারী ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ইভান জেনকিন্সের

---

২১১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৫১

www.pathagar.com

সাথে এবং ২০জানুয়ারী ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে দেশাই-লিয়াকতের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে বলে ভাইসরয়কে অবহিত করা হয়। দেশাই বলেন, এ চুক্তির প্রতি গান্ধীর সমর্থন আছে। তিনি আরও বলেন যে, লিয়াকত আলীর সাথে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জিন্নাহ অবহিত আছেন এবং তিনি এ কথিত চুক্তি অনুমোদন করেন।

কথিত চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস এবং লীগ একমত যে তারা কেন্দ্রে একটি মধ্যবর্তী সরকারে যোগদান করবেন। সরকার গঠিত হওয়ার পর তা ভারত সরকার আইনের (১৯৩৫) অধীন কাজ করতে থাকবে। মন্ত্রীসভা যদি কোনো বিশেষ কর্মপন্থা বা ব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা পাশ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে গভর্ণর জেনারেল বা ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতার শরণাপন্ন হয়ে তা বলবৎ করতে যাবে না। এতে করে ভাইসরয়ের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ হবে।

এ বিষয়েও কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐকমত্য হয় যে, এ ধরনের সাময়িক সরকার গঠিত হলে তার প্রথম কাজ হবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে কারামুক্ত করা। এ চুক্তির ভিত্তিতে গভর্ণর জেনারেলকে অনুরোধ করা হবে তিনি যেন সরকারের নিকটে এ ধরনের প্রস্তাব পেশ করেন যে, কংগ্রেস ও লীগের চুক্তির ভিত্তিতে একটি সাময়িক সরকার গঠনে তিনি আগ্রহী।

গভর্ণর জেনারেল দেশাই-লিয়াকত চুক্তির প্রস্তাবগুলো ভারত সচিবকে জানিয়ে দেন। তিনি এ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে তার ব্যাখ্যা দাবী করেন। গভর্ণর জেনারেল দেশাই ও লিয়াকত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এমন সময় জিন্নাহ এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, তিনি চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। দেশাই হতাশ না হয়ে চুক্তির বৈধতা সম্পর্কে দৃঢ়তা প্রকাশ করতে থাকেন। গভর্ণর জেনারেল বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্যে বোম্বাই এর গভর্ণর স্যার জন কোলভিনকে জিন্নাহর সাথে দেখা করে অনুরোধ করতে বলেন যে জিন্নাহ তার সাথে দিল্লীতে দেখা করলে খুশি হবেন। জিন্নাহ বলেন, তিনি দেশাই-লিয়াকত চুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং এ চুক্তি মুসলিমলীগের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা হয়েছে। এদিকে গান্ধীর অনুমোদন থাকলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশাই-এর সমালোচনা করেন। কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ উভয়েই চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করে। [২২০]

---

২২০. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৫২

www.pathagar.com

ওয়াবেল পরিকল্পনা

দেশাই-লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ হওয়ার পর বৃটিশ সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার জন্যে ভাইসরয় মে মাসে লন্ডন গমন করেন। অতঃপর তিনি সরকারের পক্ষ থেকে অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্যে একটি প্রস্তাব নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। ভারত সচিব ১৪জুন হাউস অব কমন্সে এক বিবৃতির মাধ্যমে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান কল্পে একটি প্রস্তাব পেশ করেন।

প্রস্তাবে বলা হয়, ভাইসরয় তার কার্যকরী কাউন্সিল এমনভাবে পুনর্গঠিত করবেন যাতে তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে কিছু লোককে তার কাউন্সিলর মনোনীত করতে পারেন। এতে প্রধান সম্প্রদায়গুলোর ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব থাকবে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সমানুপাতে। এ কাউন্সিলে ভাইসরয় ও সেনাপ্রধান ব্যতীত সকলে হবেন ভারতীয়। এ কাউন্সিল পুনর্গঠনে সকলের সহযোগিতা লাভের পর সকল প্রদেশ থেকে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা হবে যাতে জনপ্রিয় মন্ত্রীসভা গঠিত হতে পারে। একই দিনে এ প্রস্তাব ব্যাখ্যা করে ভাইসরয় লর্ড ওয়াবেল দিল্লী থেকে এক বেতার ভাষণ দান করেন। গান্ধী এবং কংগ্রেস কাউন্সিলে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুর সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

শিমলা সম্মেলন

ভাইসরয় তার চেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্যে ২৫জুন শিমলার সকল দলের সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনে কংগ্রেস, মুসলিমলীগ এবং অন্যান্য দলের একুশ জন যোগদান করেন। যাদের মধ্যে মুসলিমলীগের জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলীসহ ছয় জন ছিলেন। সম্মেলনে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে চরম মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, এমন কোনো ব্যবস্থা, সাময়িক বা স্থায়ী হোক, কংগ্রেস মেনে নিতে পারে না, যা তার জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, এক জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করে এবং কংগ্রেসকে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত করে।

জিন্নাহ্ বলেন, পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ভিত্তিতে গঠিত শাসনতন্ত্র মুসলিমলীগ মেনে নিতে পারে না। ২৬ এবং ২৭ তারিখেও আলোচনা অব্যাহত থাকে। ইউপি এর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জিবি পন্তের সাথে জিন্নাহ্র আলাপ

www.pathagar.com

আলোচনা চলছিল বিধায় ২৭ তারিখের বৈঠক অল্প সময় পর মুলতবী করা হয়। অতঃপর ২৮ ও ২৯ তারিখে সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। জিন্নাহ পর্যন্ত আলেচনা ব্যর্থ হয় বলে জানা যায়। ভাইসরয় আলোচনার একটা ভিন্ন পথ অবলম্বন করে সম্মেলনে যোগদানকারী প্রত্যেক দলকে একটি করে নামের তালিকা দাখিল করতে অনুরোধ করেন যারা হবেন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেস এবং মুসলিমলীগ উভয়েরই ৮ জন থেকে ১২ জনের নামের একটি করে তালিকা পেশ করবেন।

৩জুলাই কংগ্রেস তার নামের তালিকা ভাইসরয়ের নিকটে প্রেরণ করে। ৬জুলাই মুসলিমলীগ ওয়ার্কিং কমিটির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে পরদিন জিন্নাহ ভাইসরয় এর কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন : [২২১]

১। মুসলিমলীগের পক্ষ থেকে নামের তালিকা গ্রহণ করার পরিবর্তে ভাইসরয় এর সাথে জিন্নাহর ব্যক্তিগত আলোচনার পর কাউন্সিলের জন্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হবে।

২। কাউন্সিলের সকল মুসলিম সদস্য মুসলিমলীগ বেছে নেবে।

৩। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্ত থেকে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ফলপ্রসূ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শেষবারের মতো ১১জুলাই ভাইসরয় ও জিন্নাহর মধ্যে আলাপ আলোচনার পর জিন্নাহ যখন বুঝতে পারেন ভাইসরয় কংগ্রেসের চাপে পাকিস্তান দাবীর পক্ষে না, তখন তিনি বলেন মুসলিমলীগ বৃটিশ সরকারের সাথে কাউন্সিল গঠনে সহযোগিতা করতে পারে না। অতএব ভাইসরয় এর শিমলা সম্মেলনও ব্যর্থ হয়।

শিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার কারণ বলতে গিয়ে আব্বাস আলী খান বলেন, শিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার একই কারণ যা কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী মানুষ, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত অস্বীকারকারীর সাথে মিলে এক জাতি হতে পারে না কিছুতেই। তাই মুসলমানগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি–মুসলিমলীগ এ দাবী অকাট্য সত্য যা এ উপমহাদেশের বুকে অসংখ্য ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত।

---

[২২১]. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৫৫

www.pathagar.com

অতএব জিন্নাহ যদি দাবী করেন যে, যেহেতু মুসলমানগণ একটা স্বতন্ত্র জাতি, সেহেতু ভাইসরয় এর কাউন্সিলে মুসলিম প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার মুসলিম জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন মুসলিমলীগের, তাহলে তা নীতিগতভাবে সকলের মেনে নেওয়া উচিত। আর মুসলমাগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি হওয়ার কারণেই তাদের জন্যে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী করা হয়েছে এবং তার জন্যে সংগ্রাম অব্যাহত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যায় ও অবাস্তব দাবী হচ্ছে উপমহাদেশের সকল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক জাতি এবং তার প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেস। দেশের ভবিষ্যৎ শাসন ক্ষমতা কংগ্রেস দাবী করে এবং তা হতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু শাসনের অধীনে মুসলমানদের নির্মূল করা যাবে। মুসলমানদের এ আশংকা কল্পনা প্রসূত নয়, প্রমাণিত সত্য। এ সত্য কংগ্রেস মেনে নিতে রাজী নয়। ভাইসরয় ও কংগ্রেসের দাবীর সমর্থনে জিন্নাহর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হলে সম্মেলন ব্যর্থ হয়। [২২২]

১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিমদের গণরায়

জাপানের হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় আমেরিকা। এক মহা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় জাপান। সারা পৃথিবীতে জাপানের বেপরোয়া অভিযান থমকে যায়। আত্মসমর্পন করে জাপান। জাপানের আত্মসমর্পণের পর ১৫আগস্ট, ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তার কিছুদিন আগে অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষ দিকে ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে লেবার-পার্টি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বহু পূর্ব থেকেই লেবার পার্টির সাথে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এবারের নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসকে খুবই আনন্দিত করে। এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য কংগ্রেস তৎপরতা শুরু করে।

বৃটিশ পলিসিই ছিল ভারতে অখন্ডতার পক্ষে এবং এ ইস্যুটিতে লেবার পার্টির বেশি সমর্থন কংগ্রেস লাভ করবে বলে আশা করে। আর এ ইস্যুটিই কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছিল। কংগ্রেসের দাবী মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে এক জাতি এবং অখন্ড ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন। পক্ষান্তরে মুসলিমলীগের দাবী মুসলমানগণ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি

---

[২২২] বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৫৬

www.pathagar.com

এবং সে কারণেই তাদের জন্যে হতে হবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র। এ দুই বিপরীতমুখী দাবীর চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে বছরের শেষে শীতের মওসুমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে মুসলিমলীগের দাবী পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার সকল মুসলিম আসন মুসলিমলীগ লাভ করে। প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর ৪৯৫ মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ লাভ করে ৪৪৬টি আসন। হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং তা ছিল অতি স্বাভাবিক। বাংলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিমলীগ লাভ করে ১১৩টি। শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মুসলিমলীগের ছয়টি আসন হাতছাড়া হয়। বাংলায় মুসলিমলীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা গঠন করেন। পাঞ্জাবে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৭৯টি মুসলিমলীগের হস্তগত হয়। সিন্ধুতেও মুসলিমলীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী নামে অভিহিত কংগ্রেসপন্থী আবদুল গাফফার খানের প্রচন্ড প্রভাবের দরুন মুসলিমলীগ ৩৬টি আসনের মধ্যে ১৭টি লাভ করে এবং ডা. খান মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[২২৩]

তবে এ নির্বাচনে মুসলিমলীগের প্রতি প্রায় সকল মুসলিমের রায় ঘোষিত হয়েছে। কংগ্রেসের এক জাতি-নীতি মেনে নেয়নি মুসলিমরা। অথচ ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এতটা ভালো সাফল্য পায়নি মুসলিমলীগ। তখন অনেক মুসলিমই ভেবেছে হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের সাথে থাকা সম্ভব। এ সাধারণ নির্বাচনে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, একমাত্র মুসলিমলীগই মুসলিমদের জন্য ভারতের প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এতে কংগ্রেসের মুসলিমলীগ বিরোধিতা তীব্রতর আকার ধারণ করে। মুসলিমলীগের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য মেনে নিয়ে তার সাথে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পরিবর্তে কংগ্রেস মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির পলিসি অবলম্বন করে এবং মুসলমানদের আস্থাশীল প্রতিনিধিদের হাতে, এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক মতভেদ তীব্রতর হয় এবং উভয়ের মধ্যে আপোস নিষ্পত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

---

২২৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৫৭

www.pathagar.com

অখন্ড বাংলার মূল নেতা ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের রাজনৈতিক ইস্যুতে মত পার্থক্য দেখা দিলে মুসলিমলীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ১৯৪১ সালের ৭ডিসেম্বর ফজলুল হক মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৪৩ সালের ২৯মার্চ ফজলুল হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে পূর্ব বাংলার মুসলিমলীগ নেতা ২৪এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেখা দেয়। এ দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় ৫০ লাখ লোক মারা যায়। ১৯৪৫ সালের ৮মার্চ খাজা নাজিমুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মুসলিমলীগ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে সাথে নিয়ে মুসলিমলীগ সুসংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এ সময় তারা শেরে বাংলার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার করে এবং প্রচারে কৃষক প্রজা পার্টির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হয়। ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসীদের মুসলিম বিদ্বেষ মুসলিমলীগের প্রতি জনমত তৈরি করে। শেরে বাংলার অপরাধ ছিল তিনি হিন্দু নেতা শ্যামা প্রসাদের সঙ্গে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। এই কারণে মুসলিমলীগ তাকে মুসলিম বিদ্বেষী হিসেবে প্রচার করে। ফলে শেরে বাংলার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে পড়ে। শেরে বাংলা আর কখনো রাজনীতিতে ভালো করতে পারেননি। অথচ তিনিই অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১০-১২ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুসলিমলীগ ৩০টি মুসলিম আসনে জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান ইস্যুর ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সোহরাওয়ার্দীর মুসলিমলীগ ১২০টি আসনের মধ্যে ১১৪টিতে বিজয়ী হয়। এ নির্বাচনে শেরে বাংলার প্রজা পার্টির ভরাডুবি ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে কেবল বাংলায় মুসলিমলীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৪৬ সালের ৮এপ্রিল দিল্লীতে মুসলিমলীগ আইনসভার সদস্যদের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। জিন্নাহর নির্দেশে সোহরাওয়ার্দী ওই কনভেনশনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালের ২৪এপ্রিল

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি বাংলার প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন।

মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৬ সালের ১৬আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ সময় কোলকাতায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এ দাঙ্গায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয় এবং অসংখ্য বাড়িঘর ভস্মীভূত হয়। সোহরাওয়ার্দী সাহসের সাথে এ দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সব সময় বিভক্ত ভারতের অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখতেন। বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভাগের ঘোষণা দিলে তিনি ১৯৪৭ সালের ২৭এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার দাবী পেশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের বিরোধিতার কারণে সোহরাওয়ার্দী শরৎ বসুর অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার দাবী প্রত্যাখ্যাত হয়।

ক্যাবিনেট মিশন ও লীগ-কংগ্রেসের কোয়ালিশন সরকার-

১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডের নবনিযুক্ত লেবার পার্টি থেকে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি বরাবরই ভারত থেকে ইংল্যান্ডকে গুটিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ১৯৪৬ সালের মার্চে তিন সদস্য বিশিষ্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভার একটি প্রতিনিধি দলকে হিন্দুস্থানে পাঠান। এটি ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন নামে পরিচিত। এই দলে ছিলেন পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ.ডি. আলেকজান্ডার। ক্যাবিনেট মিশনের রিপোর্টে যে সব সুপারিশের কথা বলা হয়—[২২৪]

(১) বৃটিশ শাসিত ভারত ও আঞ্চলিক রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে এবং ক্ষমতা বন্টননীতি গৃহিত হবে।

(২) ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত প্রদেশগুলি ‘ক’, মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলি ‘খ’ এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশকে ‘গ’ শ্রেণিভুক্ত করা হবে।

(৩) এই প্রদেশগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে।

---

২২৪. ক্যাবিনেট মিশন / https://bit.ly/3rBxcz9 / অ্যাকসেস ইন ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

(৪) সাম্প্রদায়িক নীতির ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠন ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন হবে।

(৫) কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে নতুন সংবিধান রচনা করতে পারবে।

(৬) এ ছাড়া নতুন সংবিধান রচনা না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে।

ক্যাবিনেট মিশন তাদের পরিকল্পনায় কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এই মিশনের প্রস্তাব অনুসারে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে মুসলিমগণ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য সব বিষয়ে সম্মতি থাকলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রদেশগুলির শ্রেণিবিভাগ ও চিহ্নিতকরণ কংগ্রেসের মনঃপুত হয়নি। কিন্তু বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তী সরকার ও সংবিধান সভাকে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এরপরই ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আহ্বান জানান। এর মানে হলো ভারতের ভাগ্য কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করা। এতে মুসলিমলীগ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পাকিস্তান দাবী আদায়ের জন্য ১৯৪৬ সালের ১৬আগস্ট ডাইরেক্ট একশন ডে এর ডাক দেয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ওই দিনটি শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হলেও কোলকাতা এবং ত্রিপুরায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বেধে যায়।[২২৫]

অসংখ্য জীবনহানি, সম্পত্তি নাশ, লুঠতরাজের মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়। বাংলার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠে। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়। সবচেয়ে লক্ষনীয় বিষয় ছিল, কেন্দ্রে ওয়াভেল সরকার কিংবা বাংলায় মুসলিমলীগ সরকার কেউই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণে কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি বা নেওয়ার চেষ্টা করেনি।

---

২২৫. প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3q7KH9p / অ্যাকসেস ইন ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ হলো পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী। এ ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী যা কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার মেনে নিতে মোটেই রাজি ছিল না। কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে কংগ্রেস মুসলিমলীগকে ফাঁদে ফেলে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা করেছে। তাদের ফাঁদে ফেলার এ চক্রান্তটি বুঝতে পেরে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব শর্তসাপেক্ষে গ্রহন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কারণে সকল চেষ্টাই ভেস্তে যায়।

মুসলিমলীগের অধিবেশনে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাকিস্তান হাসিল করার উদ্দেশ্যে এবং বৃটিশের গোলামী এবং বর্ণহিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রাধান্য থেকে মুক্তি লাভের জন্যে মুসলিম জাতির পক্ষে ডাইরেক্ট অ্যাকশন অবলম্বন করার সময় এসেছে। মুসলমানদের সংগঠিত করে প্রয়োজনীয় সময়ে সংগ্রাম করার লক্ষ্যে কর্মসূচী প্রণয়নের অনুরোধ জানানো হয়। উপরন্তু বৃটিশের মনোভাব ও আচরণের প্রতিবাদে বিদেশী সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব পরিত্যাগ করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

জিন্নাহ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা নয়। তিনি বলেন, একমাত্র মুসলিমলীগই সংবিধানের আওতায় থেকে সাংবিধানিক পন্থায় কাজ করেছে। কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনাকালে মুসলিমলীগ বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেসের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে পায়। তাদের ভয় ছিল এই যে, কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তারা এমন এক সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে যা ১৯৪২ সালের সংগ্রাম অপেক্ষা সহস্র গুণে মারাত্মক হবে। বৃটিশের মেশিন গান আছে যা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারে। কংগ্রেস আর এক ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত এবং তাকে তুচ্ছ মনে করা যায় না। অতএব আমরা এখন আত্মরক্ষা ও সংরক্ষণের জন্যে সাংবিধানিক পন্থা পরিহার করতে বাধ্য হচ্ছি। সময় মত সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[২২৬]

ডাইরেক্ট অ্যাকশনের জন্যে ১৬আগষ্ট নির্ধারিত হয়। তার দু'দিন পূর্বে জিন্নাহ

---

২২৬. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৬৬

www.pathagar.com

তার প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, দিনটি ছিল ভারতের মুসলিম জনসাধারণের কাছে ২৯জুলাই মুসলিমলীগ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করা, কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়ার জন্যে নয়। অতএব আমি মুসলমানদের প্রতি এ আবেদন জানাই তারা যেন আমদের নির্দেশ পুরোপুরি মেনে চলেন, নিজেদের অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃংখলভাবে পরিচালিত করেন এবং শক্রর হাতের খেলনায় পরিণত না হন।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন নিয়ে কংগ্রেসের মুসলিম নেতা আবুল কালাম আজাদ বলেন, আমি জনসাধারণের মধ্যে এ অনুভূতি লক্ষ্য করলাম যে, ১৬আগস্ট মুসলিমলীগ কংগ্রেসীদের ওপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। ১৬আগস্ট ভারতের ইতিহাসে একটি কালো দিবস। এ দিনে শত শত মানুষের জীবন হানি হয় এবং কোটি কোটি টাকার ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়। মুসলিমলীগের মিছিলগুলি লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ শুরু করে।

তিনি আরো বলেন, বাংলার সরকার কর্তৃক ১৬আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণার ফলে অধিক মাত্রায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার আইন পরিষদের কংগ্রেস দল এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদে কোনো ফল না হওয়ায় তারা সংসদ ভবন থেকে ওয়াক আউট করেন। কোলকাতার জনমনে ভয়ানক উদ্বেগ বিরাজ করছিল এবং সে উদ্বেগ এ কারণে বেড়ে চলেছিল যে মুসলিমলীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী।[২২৭]

আব্বাস আলী খান বলেন, আসলে আবুল কালাম আযাদ তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে কংগ্রেসীদের মনোভাবকেই তুলে ধরেছেন এবং মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি স্বরূপ একটি যুদ্ধাবস্থার জন্য কংগ্রেস কর্মীদের উস্কে দেন।

মওলানা আবুল কালাম আজাদের উপরোক্ত বক্তব্যে কোলকাতার লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রকৃত কারণ চিহ্নিত হয়েছে। কারণগুলো হচ্ছে-[২২৮]

১। বাংলায় মুসলিমলীগ মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত যা হিন্দুদের জন্য ছিল অসহনীয়।

২। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যাকে হিন্দুগণ মনে করতো হিন্দুবিদ্বেষী।

---

২২৭. India Wins Freedom / Abul Kalam Azad / P. 168-169

২২৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৬৭

www.pathagar.com

৩। ১৬আগস্টের ক'দিন পূর্ব থেকেই এ মিথ্যা গুজন ছড়ালো যে মুসলিমলীগ তথা কোলকাতার মুসলমানগণ হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালাবে এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবে। এ গুজব ছড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল না যেন হিন্দুগণ কোলকাতার শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ মুসলমান নির্মূল করার জন্য তৈরি হয়।

আব্বাস আলী খান বলেন, আমি সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি চাকুরীতে নিয়োজিত থাকলেও পাকিস্তান আন্দোলন মনে প্রাণে সমর্থন করতাম। মুসলিমলীগ মহলের হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালানো হবে এরূপ কোনো পরিকল্পনার বিন্দু বিসর্গও কানে আসেনি। আমি তখন ফ্যামিলিসহ কোলকাতায় থাকতাম, বাসায় আমার সাথে আমার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা মাত্র। গোলযোগের কোনো আশঙ্কা থাকলে তাদেরকে একাকী ফেলে ১৬আগস্টে মুসলিমলীগের জনসভায় নিশ্চিন্ত মনে কিছুতেই যেতে পারতাম না।

গড়ের মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমার মতো আরো অনেকেই যোগদান করেন। আমরা জনসভায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম রাজা গজনফর আলী খান ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন। মুসলিমলীগ কর্মীদের হাতে কোনো অস্ত্র তো দূরের কথা, কোনো লাঠি-সোটাও দেখতে পাইনি। তবে পাকিস্তান লাভের আশায় সকলকে হর্ষোৎফুল্ল ও উজ্জীবিত দেখতে পেয়েছিলাম।

রাজা সাহেবের পর সোহরাওয়ার্দী সাহেব মঞ্চে উঠে পর মুসলিমলীগ মিছিলের এবং জনসভায় আগমনকারীদের ওপর হিন্দুদের সশস্ত্র আক্রমণের সংবাদ আসতে থাকলো। অতঃপর আক্রান্ত মুসলমানদের অনেকেই রক্তমাখা জামা কাপড় নিয়ে সভায় হাজির হয়ে হিন্দুদের সশস্ত্র হামলার বিবরণ দিতে লাগলো। শ্রোতাদের হর্ষ বিষাদে পরিণত হলো। ভয়ানক উত্তেজনা, ভীতি ও আশঙ্কা বাড়তে থাকলো। কোলকাতায় শতকরা বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ মুসলমান। প্রায় সকলেই দরিদ্র। তাদের শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ বহিরাগত, বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে।

জনসভায় যোগদানকারীগণ কিভাবে নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাবে, তাদের অরক্ষিত পরিবারের অবস্থাই বা কি –এমন এক আশঙ্কা সকলের চোখে মুখে দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারলেন তার বক্তৃতার কোনো কথাই আমার মনে নেই। তবে জনতাকে সান্তনা দেবার জন্যে 'হাম সব দেখ লেংগে'

www.pathagar.com

বলে সকলকে শৃঙ্খলার সাথে ঘরে ফিরে যেতে বললেন। আমরা কোনো রকমে 'আল্লাহ্ আল্লাহ' করে বাসায় ফিরলাম। কোলকাতার মুসলিম পল্লী পার্কসার্কাসে থাকতাম বলে বেঁচে গিয়েছি, নতুবা হিন্দুদের আক্রমণের শিকার অবশ্যই হতে হতো। [২২৯]

এ লোমহর্ষক ঘটনা সম্পর্কে তৎকালীন কোলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক –Lan Stepens বলেন –'সম্ভবত প্রথম দিনের মারামারিতে এবং নিশ্চিতরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে মুসলমানদের জানমালের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

এসব ঘটনার দ্বারা এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ১৬আগস্ট হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করার কোনো পরিকল্পনা মুসলিমলীগের ছিল না। বরঞ্চ লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশনকে নিজেদের হীন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস মুসলিম নিধনের নিখুঁত পরিকল্পনা তৈরি করে। তবে এর সুফল হয়েছে মুসলমানদের জন্যে। পাকিস্তান সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়েছে –যার সম্ভাবনা কিছুটা ক্ষীণ হয়েছিল কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবের পর। জিন্নাহ্ খোলাখুলি ও অপকটে কোলকাতার নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন এবং নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নতুন কিছু নয়। প্রায়ই এখানে সেখানে দাঙ্গা হয়। কিন্তু ১৬আগস্টের কোলকাতায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গা ছিল নজিরবিহীন। মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করতে কংগ্রেসীদের এক আগ্রাসী চেষ্টা ছিল সেই দাঙ্গায়।

এদিকে ভাইসরয় ২৪আগস্ট মধ্যবর্তী সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন। তাদেরকে ২সেপ্টেম্বর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভাইসরয় ৬ আগস্ট নেহেরুকে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের আহ্বান জানান। ৭আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সরকার গঠনে সম্মতি দান করে। ১৭আগস্ট নেহেরু ভাইসরয়কে বলেন যে, তিনি মুসলিম আসনগুলো লীগ বহির্ভূত লোকদের দ্বারা পূরণ করে একটি শক্তিশালী সরকার গঠন করতে চান। ভাইসরয় এতে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে, আপাতত কিছু সময়ের জন্যে মুসলিম আসনগুলো উন্মুক্ত রাখা হোক। নেহেরু এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তার নিজের প্রস্তাবে অবিচল থাকেন।

---

২২৯. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৬৮

www.pathagar.com

কংগ্রেস মধ্যবর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের প্রাক্কালে ভাইসরয় বৃটিশ সরকারকে বলেন যে, মুসলিমলীগ সরকারে যোগদান করতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত শপথ অনুষ্ঠান মুলতবি রাখা হোক। প্রধানমন্ত্রী এটলী ভাইসরয়ের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে, এখন যে কোনো বিলম্বকরণ প্রক্রিয়া কংগ্রেস নেতাদের বিক্ষুব্ধ করবে এবং কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করবে। অতঃপর দিল্লী থেকে জারিকৃত এক সরকারি ইশতাহারে বলা হয় যে, নতুন কাউন্সিল ২সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহন করবে।

মধ্যবর্তী সরকার গঠনের পর ভাইসরয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কোলকাতা পরিদর্শন করেন। কোলকাতা ভ্রমণের পর তিনি নিশ্চিত হন যে, কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কোনো সমঝোতা না হলে সমগ্র ভারত ভয়ংকর গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে পড়বে। কোলকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কংগ্রেস নেতাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে ২৭আগস্ট গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলার এবং কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন এবং একটা ফর্মূলা পেশ করেন। ২৮আগস্ট নেহেরু ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মূলাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল একটি মীমাংসায় পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার এ প্রচেষ্টা কংগ্রেস ভিন্নভাবে গ্রহন করে। উপমহাদেশের ওপর কংগ্রেসের একচেটিয়া প্রভূত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে ওয়াভেলকে তার প্রতিবন্ধক মনে করেন এবং তার শাস্তি বিধানের জন্য উঠে পড়ে লাগেন। ওয়াভেলের সাথে আলাপ আলোচনার পর ফিরে এসে গান্ধী এবং নেহেরু উভয়ে পত্র লিখতে বসে যান। গান্ধী প্রথমে এটলীর নিকট এ মর্মে তারবার্তা প্রেরণ করেন যে, ভাইসরয়ের মনের অবস্থা এমন যে শিগগির প্রতিকার হওয়া দরকার। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, কোলকাতার ঘটনায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

গান্ধী তার স্থলে একজন যোগ্যতর ব্যক্তির দাবী জানান। গান্ধী ওয়াভেলকেও পত্রের দ্বারা শাসিয়ে দেন যে, তিনি ভীতি প্রদর্শন করে কংগ্রেসকে তার মতে আনতে চান। তিনি আরও বলেন যে, ভাইসরয় যদি সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতিতে ভীত হয়ে পড়েন এবং তা দমন করার জন্যে শক্তি প্রয়োজন করতে চান, তাহলে বৃটিশের শিগগির ভারত ত্যাগ করা উচিত এবং ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপর অর্পণ করা উচিত।

www.pathagar.com

অপরদিকে নেহেরু বৃটেনে তার কতিপয় প্রভাবশালী বন্ধুকে পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন যে, ভাইসরয় অত্যন্ত দুর্বল লোক এবং মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। জিন্নাহকে খুশি করার জন্যে তিনি ভারতকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি বলেন যে, ভাইসরয় স্যার ফ্রান্সিস মুডি এবং জর্জ এবেল এর পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন এবং নেহেরুর মতে এ দু'জন হচ্ছেন প্রকট মুসলিম মনা (Rabidly pro-Muslim)। নেহেরু তাদেরকে ইংলিশ মোল্লা বলেও অভিহিত করেন।

২সেপ্টেম্বর ১৯৪৬, কংগ্রেস সরকার কার্যভার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস খুবই উল্লসিত। তারা ঘোষণা করেন, ক'বছরের মধ্যেই ভারতে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। মুসলিমলীগ আসুক না আসুক –তাতে কিছু যায় আসে না। কাফেলা চলতেই থাকবে। এখন আমাদেরকে এ ভূখন্ডের শাসক মনে করতে হবে।

ভারতে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম ভারত এবং বৃটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন। জিন্নাহ ২৫আগস্ট অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এক বিবৃতি দান করেন। তিনি ভাইসরয়ের সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, মুসলিমলীগকে যে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছিল এবং যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার সিদ্ধান্ত সে সবের সাথে অসামঞ্জস্যশীল। নতুন সরকার যে দিন কার্যভার গ্রহণ করেন সেদিন মুসলমানগণ সমগ্র ভারতে তাদের গৃহে ও দোকানে কালো পতাকা উড়ায়। কারণ মুসলিমরা বুঝেছিল শত্রুতায় ও হিংসায় ইংরেজদের থেকে অনেকগুণ বেশি হবে মুশরিকরা।

উইনস্টোন চার্চিল সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গৃহযুদ্ধ ব্যতীত সফল হবে না। অন্তবর্তী সরকার গঠনের পর এক মাস অতিক্রান্ত হতে না হতে মুসলিমলীগ উপলব্ধি করে যে, সরকারের বাইরে অবস্থান মুসলিম স্বার্থের চরম পরিপন্থী। নীতিগতভাবে মুসলিমলীগ সরকারে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এ নীতি বলবৎ থাকবে। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজন এবং সেই সাথে দেশে শত্রু ভাবাপন্ন একটি হিন্দু সরকার প্রতিষ্ঠা মুসলিমলীগকে তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে।

যতদিন মুসলিমলীগ সরকারের বাইরে থাকবে, ততদিন মুসলমানগণের দুর্গতি আরো বাড়বে বলে তাদের আশঙ্কা হয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে এবং

www.pathagar.com

বহু অঞ্চল থেকে মুসলমানদের নির্মূল হওয়ার আশঙ্খা রয়েছে। কংগ্রেসের কোনো মাথা ব্যথা নেই। হিন্দু সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে দুষ্কৃতিকারিগণ উৎসাহিত বলে মনে হচ্ছে। অতএব এমতাবস্থায় মুসলিম ভারত রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিমলীগকে অবশ্যই সরকারে যোগদান করতে হবে। জিন্নাহ্র মতে কোয়ালিশন সরকারের বাইরে থাকার চেয়ে ভেতরে থেকে ভালোভাবে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে পারবেন।

কোয়ালিশন সরকারে মুসলিমলীগকে পাওয়ার জন্যে ভাইসরয় আগ্রহী ছিলেন। কারণ তিনি ভবিষ্যৎ সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এ কারণে দীর্ঘ জটিল আলাপ আলোচনা চলতে থাকে একদিকে জিন্নাহ্ ও নেহেরুর মধ্যে এবং অপরদিকে জিন্নাহ্ ও ভাইসরয়ের মধ্যে। অবশেষে ২৫অক্টোবরে মুসলিমলীগ কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করে।

নেহেরু কোয়ালিশন সরকারে মুসলিমলীগের যোগদান ভালো চোখে দেখেননি। তদুপরি দপ্তর বন্টনেও তিনি চরম একগুঁয়েমির পরিচয় দেন। ভাইসরয় চাচ্ছিলেন তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যথা External Affairs, Home and Defense –এর যে কোনো একটি মুসলিমলীগকে দেওয়া হোক। নেহেরু এর চরম বিরোধিতা করেন। অবশেষে যে পাঁচটি দপ্তর মুসলিমলীগকে দেওয়া হয় তার মধ্যে অর্থ (Finance) একটি। কংগ্রেস অর্থ বিভাগের দপ্তরটি মুসলিমলীগকে দিতে এ জন্যে রাজী হয়েছিল যে, তাদের বিশ্বাস ছিল এ দপ্তর চালাতে মুসলিমলীগ অপারগ হবে –বরঞ্চ চালাতে গিয়ে বোকা সাজবে। মওলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তার সহকর্মীদের এ এক ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আবুল কালাম আযাদ তার 'India Wins Freedom' গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন,

যেহেতু লীগ সরকারে যোগদান করতে সম্মত হয়েছে, কংগ্রেসকে সরকার পুনর্গঠিত করতে হবে এবং এতে মুসলিমলীগ প্রতিনিধিদের স্থান করে দিতে হবে। এখন প্রশ্ন কে কে সরকার থেকে সরে দাঁড়াবেন। মনে করা হলো যে, শরৎ চন্দ্র বসু, স্যার শাফায়াত আহমদ খান এবং সৈয়দ আলী জহির লীগ নমিনীদের স্থান করে দেওয়ার জন্যে ইস্তাফা দেবেন। ভাইসরয়ের প্রস্তাব ছিল যে স্বরাষ্ট্র বিভাগ মুসলিমলীগকে দেওয়া হোক। সর্দার প্যাটেল এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা

www.pathagar.com

করেন। আমার ধারণা মতে আইন শৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী রূপে একটি প্রাদেশিক বিষয় কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার যে চিত্রটি সামনে রয়েছে তাতে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সামান্য কিছুই করার আছে। অতএব নতুন সরকার কাঠামোতে কেন্দ্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। এ কারণে আমি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু প্যাটেল একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, আমি বরঞ্চ সরকার থেকে বেরিয়ে যাবো কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়বো না।

আমরা তখন বিকল্প চিন্তা করলাম। রফি আহমদ কিদওয়াই প্রস্তাব করেন যে অর্থ মন্ত্রণালয় মুসলিমলীগকে দেওয়া হোক। তিনি আরও বলেন, এ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। কিন্তু এটি একটি উচ্চমানের টেকনিক্যাল বিষয় এবং মুসলিমলীগের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, এ বিভাগ ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবে। কিদওয়াইয়ের ধারণা মুসলিমলীগ এ দপ্তর গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। এতে কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি নেই। আর এ দপ্তর গ্রহণ করলে পরে তারা বোকা প্রমাণিত হবে।

প্যাটেল লাফ মেরে প্রস্তাবটির প্রতি তার অতি জোরালো সমর্থন জানান। আমি এ কথা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যে অর্থ মন্ত্রণালয় হলো একটি সরকারের চাবিকাঠি এবং এটি মুসলিমলীগের নিয়ন্ত্রণে থাকলে আমাদেরকে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। প্যাটেল আমার বিরুদ্ধাচারণ করে বললেন যে, লীগ এ বিভাগ চালাতে পারবে না এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে বাধ্য হবে। আমি এ সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারিনি। তবে সকলে যখন একমত, আমাকে তা মেনে নিতে হলো।

লর্ড ওয়াভেল জিন্নাহকে প্রস্তাবটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি পরের দিন জবাব দেবেন বলেন। জিন্নাহরও সংশয় ছিল যে কেবিনেটে লীগের প্রধান প্রতিনিধি লিয়াকত আলী এ বিভাগটি চালাতে পারবেন কী না। অর্থ বিভাগের কতিপয় মুসলমান অফিসার এ বিষয়টি জানার পর জিন্নাহর সাথে দেখা করেন। তারা বলেন যে, কংগ্রেসের এ প্রস্তাব অচিন্তনীয় পাকা ফলের মতো এবং এতে লীগের বিরাট বিজয় সূচিত হয়েছে। ...অর্থ বিভাগ নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারের প্রতিটি বিভাগে লীগের কর্তৃত্ব চলবে। তারা জিন্নাহকে এ নিশ্চয়তা দান করেন যে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই। লিয়াকত আলীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি তারা দেন যাতে যথাযথভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন

www.pathagar.com

করতে পারেন। কংগ্রেস শীঘ্রই উপলব্ধি করেছিলেন যে অর্থ বিভাগ লীগকে দিয়ে বিরাট ভুল করা হয়েছে। [২৩০] [২৩১]

এ প্রসঙ্গে মুসলিমলীগ নেতা চৌধুরী মুহাম্মদ আলী বলেন,

জুন মাসে যখন সর্বপ্রথম একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন কায়েদে আজম লীগের সম্ভাব্য দপ্তরগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করেন। তিনি স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিভাগ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি বললাম, আইন শৃঙ্খলা ও পুলিশ প্রাদেশিক বিষয় যার ওপর কেন্দ্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কংগ্রেস প্রদেশগুলো লীগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনো পরোয়াই করবে না। অনুরূপ মুসলিমলীগ প্রাদেশিক সরকারগুলো তার উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করবে না।

আমি বললাম যে প্রতিরক্ষা দপ্তর অবশ্যই লাভজনক। কিন্তু যদি লীগ প্রতিটি বিভাগে সরকারের নীতি-পলিসি প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে তার অর্থ বিভাগ নেওয়া দরকার। আমি তখন তাকে অর্থ বিভাগের কৌশলগত গুরুত্ব বুঝাতে পারিনি। কিন্তু এখন ঘটনাচক্রে অর্থদপ্তর লীগের ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমাকে যখন পুনরায় ডেকে পাঠানো হয় তখন অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার পূর্ব পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করি। লীগের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে লিয়াকত আলীর ওপর অর্থ বিভাগ অর্পিত হওয়ায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আমি সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতার প্রস্তাব দিলাম এবং কায়েদে আজম ও লিয়াকত আলী খান উভয়কেই সাফল্যজনক পরিণামের নিশ্চয়তা দান করলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং লিয়াকত আলী অর্থমন্ত্রী হলেন। [২৩২]

১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের দাঙ্গা রাজনীতি

সুলতানি ও নবাবি শাসনের পর ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে ভারত বরাবরই ধর্মীয় সহিংসতার দেশ হিসেবে পরিচিতি পায়। মুসলিম সম্ভ্রান্ত আলেম ও জমিদারদের হটিয়ে ইংরেজ ও হিন্দুরা মিলে এদেশের মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার

---

২৩০. India Wins Freedom / Abul Kalam Azad / P. 177-179

২৩১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৭৪-৪৭৬

২৩২. The emergence of Pakistan / Choudhury Mohammad Ali / P. 84

www.pathagar.com

মিশনে নেমে পড়ে। কোম্পানী শাসনের অবসান হয়ে যখন ইংরেজদের সরাসরি শাসন শুরু হয় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুটা হ্রাস পায়।

১৯০৫ সালে যখন প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইংরেজরা বাংলা ভেঙে দুইটি প্রদেশে ভাগ করার পর থেকে আবারো দাঙ্গা হিন্দুস্থানে নিয়মিত ঘটনা হয়ে পড়ে। হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এর একটাই কারণ, আর তা হলো বঙ্গভঙ্গের কারণে ঢাকা বাংলার আরেকটি রাজধানী হবে এবং এতে মুসলিমরা উপকৃত হবে। এরপর হিন্দু প্রভাবাধীন কংগ্রেস এমন সাম্প্রদায়িক আচরণ শুরু করে যে, মুসলিমদের আলাদা রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। একের পর এক হিন্দুদের অমানবিকতা, চুক্তি ভঙ্গ ও হটকারিতার ফলশ্রুতিতে মুসলিমরা হিন্দুস্থানে একই সাথে থাকার ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

মুসলিমদের প্রাণের দাবী হয়ে ওঠে পাকিস্তান রাষ্ট্র। এর দাবীতে মুসলিমলীগ নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে এগিয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন যখন মুসলিমলীগের সাথে প্রতারণা করে তখন মুসলিমলীগ পাকিস্তানের দাবীতে ১৬আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পালন করে। এই দিবসের কর্মসূচী ছিল তারা রাষ্ট্রকে সহায়তা করবে না; অফিস আদালত, দোকান-পাট বন্ধ রাখবে।

তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আযাদকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেদিন যেসব অঞ্চলে মুসলিমরা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পালন করেছিল সেসব অঞ্চলে উগ্রবাদী হিন্দুদের উস্কে দিয়েছিল। এর ফলে হিন্দুরা মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থা হয় কোলকাতায়। অথচ কোলকাতায় প্রাদেশিক শাসনভার ছিল মুসলিমলীগের হাতে। মুসলিমলীগ সরকার সেদিন বাংলায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে।

আগস্টের ১৬ তারিখ শুরু হয়েছিল এ দাঙ্গা। দিনটি ছিল বসন্তকালের অত্যন্ত উত্তপ্ত ও কষ্টকর দিন। সেদিন কোলকাতায় মুসলমানরা তাদের বিরাট সমাবেশে যখন নেতাদের বক্তব্য শুনছিল, তখনই শুরু হয় এ গণহত্যা। হিন্দুরা আক্রমণ করে সেই সমাবেশে। হিন্দু ও মুসলমানরা ধারালো ছুরি নিয়ে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ায়। কোলকাতায় মুসলমানদের হত্যার খবর পূর্ববাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এতে বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা তৈরি হয়। এর কিছুদিন পর সেপ্টেম্বরে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা শুরু হয়। এরপর অক্টোবরে নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়।

www.pathagar.com

কোলকাতার এ ভয়ঙ্কর নরহত্যা ও ধ্বংসকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে স্টিফেনস লিখেছেন, শ্যামপুর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মানুষের মৃতদেহের স্তূপ নিকটবর্তী বাড়িগুলোর দোতলার মেঝে বরাবর উঁচু হয়ে উঠেছিল। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর হিসেব মতে প্রায় ৫০ হাজার লোক সে সময় হতাহত হয়েছিল। মেননের মতে, ৫০ হাজার নিহত ও ১৫ হাজার আহত হয়েছিল। স্টেটসম্যানের হিসেব অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা ২০ হাজার কিংবা কিছু বেশি ছিল। প্রথম বাহাত্তর ঘন্টায় একচেটিয়া মুসলিমরা আক্রান্ত হয়।

এরপর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে বিশেষভাবে শেখ মুজিব ও তাদের দল পাড়ায় পাড়ায় মুসলিম যুবকদের সংগঠিত করে পাল্টা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সাম্যবস্থা তৈরি হয়। যদিও কোলকাতায় মুসলিমদের অপ্রস্তুত অবস্থায় রেখে প্রচুর নিরীহ মুসলিমকে হত্যা করা হয় তারপরও মুসলিমদের পাল্টা প্রতিরোধে কোলকাতায় লড়াইটা অনেকটাই সমানে সমান হয়। কিন্তু বিহার, উত্তর প্রদেশ, আসাম ও পাঞ্জাবে মুসলিমরা প্রচুর হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়। সেপ্টেম্বরে বিহারে আর্য সমাজের সদস্যদের নেতৃত্বে ৩০, ০০০ হিন্দুর একটি দল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরের মাস থেকে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ চালানো শুরু করে। লক্ষ লক্ষ বিহারি বাড়িহারা হয়ে পড়ে। কোলকাতা থেকে দাঙ্গা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে এবং উদ্বাস্তুদের ঢল পূর্ব বাংলায় নামতে থাকে।

যেহেতু বাংলায় মুসলিমলীগ ক্ষমতায় তাই বেশিরভাগ উদ্বাস্তু মুহাজির মুসলিম এসেছিল পূর্ববাংলায়। দাঙ্গা বন্ধ ও শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদার ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ হয় বাংলার সোহরাওয়ার্দী সরকার। এর পাশাপাশি কংগ্রেসের উগ্র বর্ণহিন্দুরা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়েই যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কাজ শুরু করেন তৎকালীন নোয়াখালীর সাবেক এমএলএ (এমপি) গোলাম সরওয়ার হুসেইনী। তিনি ১৯৩৭ সালে শেরে বাংলার রাজনৈতিক দল কৃষক প্রজা পার্টির নমিনেশনে নির্বাচিত হন। পরে ১৯৪৬ সালে শেরে বাংলার রাজনৈতিক ইমেজ ধ্বংস হওয়া এবং পাকিস্তান দাবীর প্রতি মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুবাদে সরওয়ার হুসেইনী পরাজিত হন মুসলিমলীগের কাছে।

www.pathagar.com

সরওয়ার হুসেইনী শাহ মখদুমের অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তাই তার পরিবার পীর বংশ হিসেবে আলাদাভাবে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ছিল। এছাড়া সরওয়ার সাহেব কোলকাতা বারের এডভোকেট ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে কৃষকের খাজনা মওকুফ, ঋণ সালিশি বোর্ড থেকে সুদখোর ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা এবং জমিদারি বাজার বয়কট করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তৎকালীন নোয়াখালীর ক্ষমতাধর হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। একই সাথে দরিদ্র হিন্দু ও মুসলিমদের কাছে জনপ্রিয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। [২৩৩]

যাইহোক, সরওয়ার হুসেইনী দাঙ্গা বন্ধ ও শরণার্থীদের অবর্ণনীয় মানবেতর জীবন যাপনের চিত্র তুলে ধরে ও এর আশু সমাধানের জন্য মুসলিমলীগের প্রাদেশিক নেতা সোহরাওয়ার্দী, কেন্দ্রীয় নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা নেহেরু এবং মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর কাছে পত্র পাঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার চিঠির গুরুত্ব কেউ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। এদিকে তৎকালীন রায়পুরের জমিদার রায় চৌধুরী কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। রায় চৌধুরীও দাঙ্গার সময় নতুন করে ঝামেলা শুরু করেছেন। তিনি নোয়াখালীতে শরণার্থীদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছিলেন ও মুসলিমদের নানানভাবে উত্যক্ত করছিলেন।

এই প্রসঙ্গে গোলাম সরওয়ার হুসেইনী কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা এবং মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর কাছেও চিঠি পাঠিয়ে জমিদারের অত্যাচারের কথা জানান এবং তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। এর বাইরে পত্রিকায় বক্তব্য বিবৃতি ও পার্টি প্রধান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে সাথে নিয়ে কংগ্রেসের সন্ত্রাসী ও সোহরাওয়ার্দী তথা মুসলিমলীগের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে জনসমাবেশে সোচ্চার হন। শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি সেচ্ছাসেবক বাহিনী মিয়ার ফৌজ তৈরি করেন।

এদিকে অক্টোবর মাসে খোদ নোয়াখালীতেই সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলিমদের

---

২৩৩. নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায় / মাসুদ হাসান খান / বিবিসি বাংলা / ২ অক্টোবর ২০১৯

www.pathagar.com

ওপর নির্যাতনের পরিকল্পনা করে। সরওয়ার হুসেইনী নিজের এলাকা রামগঞ্জে ঘটে এক নজিরবিহীন ঘোষণা। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে রামগঞ্জের জমিদার রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর বাড়িতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের এক সন্ন্যাসী এসে উঠেছেন। তার নাম সাধু ত্রিয়াম্বাকানন্দ। তিনি ঘোষণা করেছেন, পূজার জন্য ছাগবলির বদলে এবার তিনি মুসলমানের রক্ত দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করবেন। সাধু রামগঞ্জের মুসলিমদের আক্রমণ করতে ও পূজার আগেই রক্ত সংগ্রহের আদেশ দেন।

এই খবর শুনে সরওয়ার হুসেইনী দ্রুতই রামগঞ্জের মুসলিমদের পাশে থাকতে নিজের বাড়িতে চলে আসেন। ১০অক্টোবর ভোরবেলা চৌকিদারের মারফৎ রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর কাছে একটি চিঠি পাঠান এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী সরওয়ার হুসেইনীকে পাত্তা দেননি। উল্টো তার অনুসারীদের মুসলিম উচ্ছেদের আহ্বান জানান।

কারো থেকে সাহায্য ও সাড়া না পেয়ে গোলাম সারোয়ার হুসেইনী পরদিন শাহ্পুর বাজারে তার অনুগত ভক্ত, রাজনৈতিক কর্মী এবং সাধারণ মুসলমানদের এক সমাবেশ ডাকেন। বস্তুত নোয়াখালীর মুসলিমরা এমন একটি সমাবেশের জন্য আগ্রহী ছিল। কারণ তারা নিরাপত্তা সংকটে ভুগতে ছিলেন। জনসভায় বক্তৃতাকালে সরওয়ার সাহেব মুসলমানদের সেই সময়কার অবস্থান তুলে ধরেন এবং হিন্দু জমিদারকে উৎখাত করার ডাক দেন।

সমাবেশ চলাকালে আক্রমণ করে জমিদার ও তার অনুগত পাইক পেয়েদারা। তারা জনসভায় গুলি করে এবং কয়েকজন মুসলিমকে হত্যা করে। কিন্তু অল্প সময় পরেই ঘুরে দাঁড়ায় মুসলিমরা। ইট, পাথর, লাঠি ইত্যাদি ছিল মুসলিমদের অস্ত্র। উত্তেজিত মুসলিম জনতা জমিদারের লোকদের পরাস্ত করে। জমিদারের লোকদের গুলি ফুরিয়ে গেলে পালাতে থাকে তারা। অল্প সময়ে রামগঞ্জের জমিদার বাড়ির নিয়ন্ত্রণ উত্তেজিত মুসলিমদের হাতে চলে আসে। জমিদার রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী উত্তেজিত জনতার হাতে নিহত হন। সাধু ত্রিয়াম্বাকানন্দ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।[২৩৪]

---

২৩৪. নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায় / মাসুদ হাসান খান / বিবিসি বাংলা / ২ অক্টোবর ২০১৯

www.pathagar.com

রায়পুরের জমিদার চিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরীর সাথে তো আগে থেকে বিরোধ চলে আসছিল সরওয়ার হুসেইনীর সাথে। তিনি নোয়াখালীতে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তিকে গোড়া থেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজেন্দ্রলাল হত্যার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসেন রায়পুরের জমিদার রায় চৌধুরী। এদিকে সরওয়ার হুসেইনীকে সহায়তা করেন রায়পুরের স্থানীয় মুসলিমলীগ নেতা আবুল কাশেম।

সরওয়ার হুসেইনীর অনুসারীরা 'মিয়ার ফৌজ' নামে এবং আবুল কাশেম অধীন 'কাশেম ফৌজ'র সদস্যদের সাথে খন্ডযুদ্ধ হয় রায় চৌধুরীর সাথে। এখানেও জমিদার পরাজিত হন। দুই বাহিনী জমিদার বাড়ি অবরোধ করেন। রায় চৌধুরী পরাজয় নিশ্চিত জেনে আত্মহত্যা করেন। তার আগে তিনি নিজে তার পরিবারের সদস্যদের খুন করেন।[২৩৫]

সরওয়ার হুসেইনীর কার্যক্রম এই দুইটি ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এসব ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়লে নোয়াখালী জেলার রায়পুর, রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া এবং পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা (বৃহত্তর কুমিল্লা) জেলার চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ এবং লাকসাম থানার বিশাল এলাকাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। হিন্দুরা তাদের দুই প্রভাবশালী জমিদারের করুণ কাহিনী শুনে এসব এলাকা থেকে পালাতে থাকে।

বিহার, কোলকাতা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের উল্টো ঘটনা ঘটে নোয়াখালীতে। এই প্রথম হিন্দুরা শরণার্থী হতে শুরু করে। এতদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হলেও টনক নড়েনি গান্ধীর। কেবল নোয়াখালীর ঘটনায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন ৬ নভেম্বর। পরদিন নোয়াখালীর চৌমুহনীতে যোগেন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে দুই রাত কাটিয়ে ৯ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তার শান্তির লক্ষ্যে পদযাত্রা শুরু করেন।

নোয়াখালীতে এসে গান্ধী গোলাম সরওয়ার হুসেইনীর সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু গোলাম সরওয়ার হুসেইনী ততদিনে গান্ধীর ওপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা

---

২৩৫. নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায় / মাসুদ হাসান খান / বিবিসি বাংলা / ২ অক্টোবর ২০১৯

www.pathagar.com

হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই তিনি প্রথম দিকে সাক্ষাতে রাজী ছিলেন না। পরে গান্ধীর অনুরোধে নোয়াখালীর চাটখিলে দু'জনের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে সরওয়ার হুসেইনী গান্ধীকে বলেন যে, দাঙ্গার সূত্রপাত নোয়াখালীতে নয়। তিনি বলেন, বার বার চিঠি দিয়েও এর প্রতিকার পাইনি। কোলকাতা ও বিহারে যখন দাঙ্গা থেমে যাবে তখন নোয়াখালীতেও হানাহানি বন্ধ হবে উল্লেখ করেন সরওয়ার সাহেব। গোলাম সরওয়ার নোয়াখালীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ নিতে রাজি হন তবে তার আগে শর্ত হিসেবে কোলকাতা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে দাঙ্গা বন্ধ হওয়া ও মুসলিমদের নিরাপত্তার দাবী জানান।[২৩৬]

গান্ধী রাজি হন ও দাঙ্গা বন্ধ করতে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। অল্প দিনের মধ্যে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই হলো করম চাঁদ গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের নমুনা। যতদিন মুসলিমরা আক্রান্ত হচ্ছিল ততদিন তার কোনো বিকার ছিল না। তিনি এরপরও নোয়াখালী থেকে চলে যাননি। প্রায় তিনমাস তিনি নোয়াখালী অবস্থান করেছেন। এখানেও ছিল তার রাজনীতি। তিনি নোয়াখালী থেকে বিশ্ববাসীদের জানান দিচ্ছিলেন দাঙ্গায় হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছে। দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার পর তার এই অবস্থান ও নানান বক্তব্য বিবৃতি আবারো বর্ণহিন্দুদের উত্তেজিত করে। আবারো উগ্রবাদী হিন্দুরা বিহারে দাঙ্গা তৈরি করে।

এবার মুসলিমলীগের নেতৃবৃন্দ গান্ধীকে নোয়াখালী ত্যাগ করতে বলেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক গান্ধীকে নোয়াখালী থেকে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এরপর গান্ধী বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। যদিও হিন্দুরা এক ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য এমন দাঙ্গা বাঁধায়। তারা ভেবেছিল তাদের আক্রমণে মুসলিমলীগ ভয়ে পাকিস্তান আন্দোলন থেকে দুরে সরে যাবে। তবে বাস্তবে এটা তাদের জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে। মুসলিম ও হিন্দুরা একসাথে থাকা যে অসাধ্য এবং কংগ্রেসের এই দাবী যে অবাস্তব তা দাঙ্গার ঘটনায় আরো স্পষ্ট হয়। এই দাঙ্গার ফলে পাকিস্তান দাবী আরো যৌক্তিক হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তান সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়।

---

২৩৬. নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায় / মাসুদ হাসান খান / বিবিসি বাংলা / ২ অক্টোবর ২০১৯

www.pathagar.com

গান্ধীর ছাগল

গান্ধী যেখানেই যান সেখানেই একটি ছাগল নিয়ে যান ছাগলের দুধ পান করার জন্য। খাওয়া দাওয়ায় তিনি খুব নিয়ম করে চলতেন। তিনি ভেজিটেরিয়ান ছিলেন। নোয়াখালীতে তিনি হুসেইনীর সাথে মিটিং করার আগেই কাশেম ফৌজের লোকজন ছাগলটিকে হস্তগত করেছিল।

তারা ভেজিটেরিয়ান গান্ধীকে তারই ছাগল জবাই করে ও রান্না করে তার সামনে উপস্থাপন করে। এতে তিনি হতচকিত হয়ে যান। এর মাধ্যমে সরওয়ার হুসেইনীর লোকেরা গান্ধীকে একটি বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেন যে, তারা খুবই ক্ষেপে আছে। গান্ধীও উপলব্ধি করতে পারেন এরা সহজে টলবে না।[২৩৭] তিনি ভেবেছিলেন তার মতো বড় নেতাকে দেখে নোয়াখালীর মুসলিমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। উল্টো নোয়াখালীর লোকেরা তাকে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তাই তিনি দাঙ্গা বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন। পরবর্তীতে মুশরিকরা ও গান্ধীর অনুসারীরা এই ঘটনাকে 'গান্ধীর ছাগল চুরি করেছে নোয়াখালীর লোকেরা' এমন গুজব ছড়িয়েছে।

অবশেষে পাকিস্তানের মাধ্যমে মুসলিমদের স্বাধীনতা ঘোষিত হলো

১৯৪৬ সালে ভারতীয় সংবিধান সভার প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। এই সভার প্রতিনিধি ছিলেন ২৯৬ জন। ৯টি আসন ব্যতীত সকল সাধারণ আসনে কংগ্রেস জয়ী হয় এবং ৫টি আসন ছাড়া বাকী সকল মুসলিম আসনে মুসলিমলীগ জয়ী হয়। সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশন ৯ডিসেম্বর ১৯৪৬ হওয়ার কথা। কিন্তু মুসলিমলীগ এতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি একে বৈধ বলে স্বীকার করতে রাজি হচ্ছিল না যতক্ষণ না মুসলিমদের জন্য আলাদা ভূমি, আলাদা রাষ্ট্র কংগ্রেস মেনে না নিচ্ছে। কারণ গত দশ বছরের কংগ্রেসের আচরণে মুসলিমরা একথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল ইংরেজদের অধীনে থাকার চেয়েও খারাপ পরিণতি হবে মুশরিকদের অধীনে থাকা। মুসলিমদের আলাদা ভূমি মেনে নেওয়ার জন্য ভাইসরয় কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন।

---

২৩৭. নোয়াখালীতে গান্ধী: সাম্প্রদায়িক হত্যাযজ্ঞের রক্তাক্ত অধ্যায় / মাসুদ হাসান খান / বিবিসি বাংলা / ২ অক্টোবর ২০১৯

www.pathagar.com

এ অনুরোধের পুরস্কার এভাবে দেওয়া হলো যে গান্ধী ও নেহেরু ভাইসরয়কে অপসারণের জন্যে বৃটিশ সরকারের নিকটে তারবার্তা ও পত্র প্রেরণ করেন। উপায়ান্তর না দেখে ভাইসরয় কেবিনেট মিশন পরিকল্পনার অধীন সংবিধান সভায় যোগদানের জন্য ২০নভেম্বর মুসলিমলীগকে আমন্ত্রণ জানান। সঙ্গে সঙ্গেই জিন্নাহ্ এটাকে মারাত্মক ধরনের ভুল পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, ভাইসরয় ভয়ংকর পরিস্থিতি ও তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং কংগ্রেসকে খুশি করার চেষ্টা করছেন। ৯ডিসেম্বর সংবিধান সভার অধিবেশনে কোনো লীগ প্রতিনিধি যোগদান করেননি।

এরূপ পরিস্থিতিতে শেষ চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার দু'জন কংগ্রেস এবং দু'জন লীগ নেতাকে লন্ডন আমন্ত্রণ জানান। ভাইসরয়ের পরামর্শক্রমে একজন শিখ প্রতিনিধিকেও আমন্ত্রণ জানান হয়। লর্ড ওয়াভেল নেহেরু, জিন্নাহ্, লিয়াকত আলী এবং বলদেব সিংসহ লন্ডন যাত্রা করেন। চারদিন যাবত আলাপ আলোচনা চলে। তবে সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। চরম রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় তখন।

কোনো আপোস মীমাংসা না হওয়ায় বৃটিশ সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়, সর্বসম্মত কার্যধারার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত ব্যতীত সংবিধান সভার সাফল্য আশা করা যায় না। সংবিধান সভা যদি এমন কোনো সংবিধান রচনা করে যার রচনাকালে ভারতবাসীর বিরাট সংখ্যক লোকের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই, তাহলে বৃটিশ সরকার এ ধরনের কোনো সংবিধান অনিচ্ছুক জনগোষ্ঠীর ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে না।[২৩৮]

নেহেরু ও বলদেব সিং সংবিধান সভার অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। জিন্নাহ্ ও লিয়াকত আলী আরও কিছুদিন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। লন্ডনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্নাহ্ বলেন,

পাকিস্তানের জনসংখ্যা পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আমরা ভারতের তিন চতুর্থাংশের ওপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিচ্ছি। পাকিস্তান মেনে নিতে কংগ্রেসের আপত্তি এ জন্যে যে তারা সমগ্র ভারত চায়। তাহলে আমরা আর থাকি কোথায়? এখন সমস্যা এই যে, বৃটিশ সরকার কি

---

২৩৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৮০-৪৮১

www.pathagar.com

তাদের বেয়নেটের বলে হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান? তা যদি হয় তাহলে বলবো, তোমরা তোমাদের মানসম্ভ্রম, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার ও সভ্য আচরণের সর্বশেষ কণাটুকুও হারিয়ে ফেলেছ।[২৩৯]

এদিকে ভারতে কংগ্রেস তীব্র কণ্ঠে ঘোষণা করে, মুসলিমলীগ সংবিধান সভায় যোগদান না করলে তাদেরকে অন্তবর্তী সরকার থেকে বহিষ্কার করা হোক, অপরদিকে বৃটিশ সরকারের ৬ডিসেম্বরের ঘোষণা অদূর ভবিষ্যতে এক নতুন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। এ সময় সারা ভারতে কংগ্রেসী মুশরিকদের দাঙ্গায় জর্জরিত হচ্ছে ভারত। পরের বছর ১৩ফেব্রুয়ারী নেহেরু ভাইসরয়কে লিখিত পত্র দ্বারা মুসলিমলীগকে বহিস্কারের দাবী জানান। ১৫ফেব্রুয়ারী প্যাটেল বৃটিশ সরকারকে হুমকি দিয়ে বলেন, মুসলিমলীগকে সরকার থেকে বহিষ্কার না করলে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করবে।

রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতিতে ২০ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ সালে প্রধানমন্ত্রী এটলী একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ ধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতি আর দীর্ঘায়িত হতে দেওয়া যায় না। বৃটিশ সরকার পরিষ্কার বলে দিতে চান যে, জুন মাসের ভেতরেই দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পূর্ণ প্রতিনিধিত্বশীল সংবিধান সভা কর্তৃক সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র এ সময়ের মধ্যে প্রণীত না হলে, সরকার বিবেচনা করবে বৃটিশ ভারতে ক্ষমতা কার কাছে যথা সময়ে হস্তান্তর করা হবে। বিবৃতির শেষে এ কথাও ঘোষণা করা হয় যে, ওয়াভেলের স্থলে মাউন্ট ব্যাটেনকে ভাইসরয় করা হচ্ছে।[২৪০]

চারদিন পর ভারত সচিব হাউস অব লর্ডস এ ঘোষণা করেন যে, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ভারতের দায়িত্বশীল মহলের পরামর্শে। আর উদ্দেশ্য ছিল একটি চাপ সৃষ্টি করা যাতে ভারতীয় দলগুলো একটা সমঝোতায় পৌঁছে। এখানে ভারতের দায়িত্বশীল মহল বলতে যে গান্ধী আর নেহেরুকে বুঝানো হয়েছে এবং সমঝোতা বলতে কংগ্রেসের দাবী মুসলিমলীগকে মেনে নেওয়া বুঝানো হয়েছে তা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

---

২৩৯. The emergence of Pakistan / Choudhury Mohammad Ali / P. 91-92

২৪০. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার / পৃ. ৪৮৩

www.pathagar.com

মাউন্টব্যাটেন ইংল্যান্ড থেকে সযত্নে ও সাবধানতা সহকারে তার সহযোগী বেছে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন লর্ড ইসমে যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চার্চিলের ব্যক্তিগত সাধারণ উপদেষ্টা ছিলেন। আরও ছিলেন এরিক সিভিল, লর্ড উইনিংডনের প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং ৬ষ্ঠ জর্জের এসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি, এ দুইজন ছিলেন ভাইসরয়ের সাধারণ ও বেসামরিক দিকের প্রধান উপদেষ্টা এবং লর্ড ইসমে ছিলেন চীফ অব স্টাফ।

ভপ্পালা পাঙ্গুনি মেনন ছিলেন সাংবিধানিক পরামর্শদাতা। প্রায়ই স্টাফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হতো। প্রথমত মাঝে মাঝে মেননকে বৈঠকে ডাকা হতো। পরে প্রত্যেক বৈঠকে তাকে ডাকা হতো। ভাইসরয় এবং অন্যান্য সকলের জানা ছিল যে মেনন ছিলেন কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। এর ফলে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ সকল গোপন তথ্যই শুধু প্যাটেল জানতেন না, বরঞ্চ তার এ মুখপাত্রকে দিয়ে তিনি ভাইসরয়ের পলিসি প্রভাবিত করতেন। মেননের স্থলে যদি কোনো মুসলমান হতেন এবং তিনি জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন, তাহলে কি কংগ্রেস তাকে বরদাশত করতে পারতো?

কেবিটেন মিশন পরিকল্পনার ভিত্তিতে অখন্ড ভারতের জন্য সর্বসম্মত সমাধান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতে পৌঁছার পর ঘটনা প্রবাহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করার পর সর্বসম্মত সমাধান এবং অখন্ড ভারতের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না। অতএব প্রধানমন্ত্রীর ২০ফেব্রুয়ারীর ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পনা তৈরির প্রতি ভাইসরয় মনোনিবেশ করেন।

তিনি তার পরামর্শদাতাগণের সাথে পরামর্শের পর ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। ১এপ্রিল ইসমে পরিকল্পনার খসড়া মেননকে দেন তার সংশোধনীসহ সময়সূচী তৈরির জন্য। মেনন আদেশ পালন করেন এবং সেই সাথে তার অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এ একটি মন্দ পরিকল্পনা এবং এটি কার্যকর হবে না। গভর্নরদের সম্মেলনে চূড়ান্ত পরিকল্পনা পেশ করা হয় এবং তা অনুমোদিত হয়। ২মে লর্ড ইসমে এবং জর্জ এবেল হোয়াইট হলের অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনাটি নিয়ে লন্ডনে যান। ভাইসরয় আশা করছিলেন ১০মে'র ভেতরে অনুমোদন পেয়ে যাবেন এবং ১৭মে দলীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্য একত্রে মিলিত হওয়ার আবেদন জানাবেন।

www.pathagar.com

অতঃপর মাউন্টব্যাটেন এরিক সিভিল ও মেননসহ শিমলা গমন করেন। এখানে মেনন ভাইসরয়ের সাথে নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ পান এবং লন্ডনে প্রেরিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, এ পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। মেননের সকল যুক্তি শুনার পূর্বে হঠাৎ নেহেরু এবং ভি.কে. কৃষ্ণ মেনন ভাইসরয়ের সাথে আলোচনা করার জন্য ৮মে শিমলা পৌঁছেন। ঐদিনই লন্ডন থেকে কিছু সংশোধনীসহ অনুমোদিত পরিকল্পনা ভাইসরয়ের হাতে আসে। ডিনারের পর ভাইসরয় নেহেরুকে ডেকে পরিকল্পনাটি দেখান যা অনুমোদিত হয়ে এসেছে। পরিকল্পনাটি পড়ার পর নেহেরু ভয়ানক রেগে গিয়ে বলেন, আমি, কংগ্রেস এবং ভারত কারো কছেই এ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য নয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন উভয়পক্ষকে খুশি রাখতে চেয়েছিলেন এবং উভয়পক্ষকে বুঝিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের সৃষ্টি না হয়ে উপায় নেই। মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের সিনিয়র নেতাদের মনে পাকিস্তান সৃষ্টির বীজ বপন করার চেষ্টা করেছিলেন। আর ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সরদার প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের এ ধারণা সবার আগে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ভাগ করার জন্য প্যাটেল আগে থেকেই মানসিকভাবে অর্ধেক তৈরি ছিলেন। প্যাটেল ধরে নিয়েছিলেন, মুসলিমলীগের সাথে একত্রে কাজ করা যাবে না।

কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, সরদার প্যাটেল এক পর্যায়ে জনসম্মুখে বলেই ফেললেন, মুসলিমলীগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি ভারতবর্ষ ভাগ করতেও রাজী আছেন। এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে সরদার প্যাটেলই ছিলেন ভারতবর্ষ ভাগের স্থপতি।[২৪১]

ভারতবর্ষ বিভক্ত করার ফর্মুলা বিষয়ে সরদার প্যাটেল মনস্থির করার পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন মনোযোগ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরুর দিকে। এ ধরনের ফর্মুলার কথা শুনে প্রথমে নেহেরু খুবই রাগান্বিত হন।কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন জওহরলাল নেহেরুকে ভারতবর্ষ ভাগ করার বিষয়ে ক্রমাগত বোঝাতে থাকেন। এ বিষয়ে মি: নেহেরুর রাগ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন তার তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

---

২৪১. নেহেরু যে কারণে ভারত ভাগ করতে রাজী হলেন / আকবর হসেন / বিবিসি বাংলা / ৩০ আগাস্ট ২০১৭

www.pathagar.com

কিন্তু ভারত ভাগ করার বিষয়ে জওহরলাল নেহেরু শেষ পর্যন্ত কীভাবে রাজী হলেন?

মওলানা আবুল কালাম আযাদ মনে করেন, এর দু'টি কারণ আছে।[২৪২]

প্রথমত; জওহরলাল নেহেরুকে রাজী করানোর বিষয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রীর একটি বড় প্রভাব ছিল। লেডি মাউন্টব্যাটেন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। এছাড়া তার মধ্যে আকর্ষণীয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ছিল যার মাধ্যমে সে অন্যদের আকৃষ্ট করতে পারতো। লেডি মাউন্টব্যাটেন তার স্বামীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং অনেক সময় যারা প্রথমে তার স্বামীর কাজের সাথে একমত হতে পারতেন না, তাদের কাছে স্বামীর চিন্তা-ভাবনা পৌঁছে দিয়ে তাদের সম্মতি আদায় করতেন।

দ্বিতীয়ত ভারত ভাগ করার পেছনে নেহেরুর রাজী হবার আরেকটি কারণ ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। এ ভারতীয় ব্যক্তি ১৯২০'র দশক থেকে লন্ডনে বসবাস করতেন। কৃষ্ণ মেনন ছিলেন জওহরলাল নেহেরুর একজন বড় ভক্ত এবং নেহেরুও কৃষ্ণ মেননকে খুবই পছন্দ করতেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারত ভাগ করার বিষয়ে কৃষ্ণ মেননের মাধ্যমে নেহেরুকে রাজী করানো যাবে এবং সেটাই হয়েছে।

সরদার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মওলানা আযাদ তার বইতে লিখেছেন, “আমরা পছন্দ করি কিংবা না করি, ভারতবর্ষে দু'টো জাতি আছে। হিন্দু এবং মুসলমানরা একজাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। যখন দুই ভাই একসাথে থাকতে পারে না, তখন তারা আলাদা হয়ে যায়। তাদের পাওনা নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার পরে তারা আবার বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু তাদের যদি একসাথে থাকতে বাধ্য করা হয় তাহলে তারা প্রতিদিন ঝগড়া করবে।প্রতিদিন মারামারি করার চেয়ে একবার বড় ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ভালো।" [২৪৩]

ভারত ভাগ করার বিষয়ে সরদার প্যাটেল যেভাবে প্রকাশ্যে কথা বলতেন,

---

২৪২. নেহেরু যে কারণে ভারত ভাগ করতে রাজী হলেন / আকবর হসেন / বিবিসি বাংলা / ৩০ আগাস্ট ২০১৭

২৪৩. নেহেরু যে কারণে ভারত ভাগ করতে রাজী হলেন / আকবর হসেন / বিবিসি বাংলা / ৩০ আগাস্ট ২০১৭

www.pathagar.com

জওহরলাল নেহেরু সেভাবে বলতেন না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাহী পরিষদে মুসলিমলীগের সাথে একত্রে কাজ করতে গিয়ে নেহেরুর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রতিদিনই ঝগড়া হতো। সেজন্য জওহরলাল নেহেরু মওলানা আযাদকে বলেছিলেন ভারতবর্ষ ভাগ না করে কোনো উপায় নেই। একপর্যায়ে নেহেরু মওলানা আযাদকে অনুরোধ করলেন, তিনি যাতে ভারত ভাগের বিরোধিতা না করেন এবং বাস্তবতা মেনে নেন।

এক পর্যায়ে বৃটিশ সরকারের সাথে আলোচনার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন লন্ডন চলে যান। ১৯৪৭ সালের ৩০মে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ২জুন তিনি কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু, প্যাটেল, কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুর রব নিশতার এবং বলদেব সিং। সেখানে ৩জুন মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা সম্বলিত 'হোয়াইট পেপার' বা 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করেন। সেখানে ভারতবর্ষ বিভক্তির রূপরেখা তুলে ধরা হয়।

পাকিস্তান ঘোষণা :

৩জুনের পরিকল্পনাটি মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামেও পরিচিত ছিল। বৃটিশ সরকার ৩জুন, ১৯৪৭ সালে ঘোষণা করা একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছিল, যার মধ্যে এই নীতিগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

৩ জুনের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা [২৪৪] :

১- বৃটিশ ভারতের দু'টি নতুন অধিরাজ্য ভারত এবং পাকিস্তানের বিভাগ ১৯৪৭ সালের ১৫আগস্ট থেকে কার্যকর হবে।

২- দু'টি নতুন দেশের মধ্যে বেঙ্গল এবং পাঞ্জাব প্রদেশ দু'টির বিভক্তকরণ হবে।

৩- দু'টি নতুন দেশের প্রত্যেকটিতে গভর্নর-জেনারেলের অফিস স্থাপন করা হবে রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে।

৪- নতুন দু'টি দেশের সম্পর্কিত সংবিধান সভার ওপর সম্পূর্ণ আইনসভার কর্তৃত্ব প্রদান।

---

২৪৪. Towards Indias Freedom And Partition / S R Mehrotra / P. 247

www.pathagar.com

৫- ১৯৪৭ সালের ১৫আগস্ট থেকে কার্যকরভাবে দেশীয় রাজ্য গুলোর ওপর থেকে বৃটিশ অধিরাজ্যের অবসান এবং স্বতন্ত্র থাকার বা উভয় অধিরাজ্যকে স্বীকার করা রাষ্ট্রের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান।

৬- দু'টি নতুন দেশের মধ্যে বিশেষত সশস্ত্র বাহিনীর বিভাজনসহ যৌথ সম্পত্তি ইত্যাদির বিভাজন হবে।

পাকিস্তানে যে অঞ্চলগুলো থাকবে :

পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং বালুচিস্তান প্রদেশ। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এখন পাখতুনখোয়া) এর ভাগ্য গণভোটের ফলাফল সাপেক্ষে।

বাংলা ও আসাম :

ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ এর অধীন গঠিত বাংলা প্রদেশটির অস্তিত্ব আর থাকবে না। এর পরিবর্তে দু'টি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে, যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ। আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে গণভোটে।

১৯৪৭ সালের বাংলা ভাগ

হিন্দুস্থানের মুসলিম ও মুশরিকদের সাথে প্রকাশ্য ও মারাত্মক দ্বন্দ্ব শুরু হয় ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ ইস্যুতে। ১৯০৫ সালে ইংরেজরা বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করে। ঐ সময় বাংলা সমৃদ্ধ ছিল এবং এখানে বার বার বিদ্রোহ হচ্ছিল। তাই বাংলাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা পূর্ববঙ্গকে আলাদা করে ঢাকাকে প্রাদেশিক রাজধানী করে। এতে বিদ্রোহী মুসলিমরা অসন্তুষ্ট হলেও রাজনীতিবিদ মুসলিমরা খুশি হয় কারণ তাতে পূর্ববঙ্গের উন্নতি হবে। ঢাকা তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। মুসলিমদের এই সন্তুষ্টিতে খুবই অসন্তুষ্ট হয় মুশরিক হিন্দুরা।

তারা শুরু করে দাঙ্গা হাঙ্গামা। ফলশ্রুতিতে মুসলিমরা কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আলাদা রাজনৈতিক দল মুসলিমলীগ গঠন করে। বাংলা নাকি হিন্দুদের মা'। এই মা'কে নাকি ভাগ করা যায় না। তাদের বাংলা মায়ের জন্য তাদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ১৯১১ সালে বাংলা আবার একত্র হয়ে যায়। ১৯৩৫ সালে প্রথম নির্বাচনে মুসলিমরা জয়ী হয় এবং প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। ১৯৪৬

www.pathagar.com

সালের নির্বাচনেও মুসলিমলীগ বাংলায় সরকার গঠন করে। যখন পাকিস্তান প্রস্তাবের ব্যাপারে ইংরেজ সরকার রাজি হয়ে যায় তখন থেকেই এদেশের রাজনৈতিক নেতারা বাংলার ভবিষ্যত নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

নিয়ম অনুযায়ী বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে। এবার দেখা গেলো উল্টো ঘটনা। এবার ১৯৪৭ সালে এসে কিন্তু আর হিন্দুরা বাংলা মা'কে এক রাখতে চায় না। তারা গোঁ ধরেছে তারা এবার বাংলা মা'কে কেটেই ফেলবে। ভাগ করে ফেলবে। কোনোভাবেই বাংলাকে এক থাকতে দিবে না। এখন তারা আর বাংলা মা বলতেই রাজি না। অবশেষে বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের মতবিরোধের ফলে বাংলার ভবিষ্যত নিয়ে তিনটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি তৈরি হয়।

১- বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে।

২- বাংলা আলাদা স্বাধীন রাজ্য বা দেশ হিসেবে থাকবে।

৩- বাংলা ভাগ হবে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সাথে এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হবে।

বাংলার প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিমলীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী একটি পরিকল্পনা পেশ করেন যে, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা ভারত কিংবা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে না যুক্ত হয়ে বরং একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। সোহরাওয়ার্দী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যদি বাংলা এভাবে বিভক্ত হয় তবে পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কেননা, সব কয়লা খনি কিংবা পাট কল পশ্চিম বাংলার অংশ হয়ে যাবে এবং একটি সিংহভাগ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা কী না শিল্পায়নের সাথে যুক্ত পশ্চিম বাংলায় অভিবাসন সম্পন্ন করবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'কোলকাতা' যা ভারতের অন্যতম প্রধান শহর এবং শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু তা পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সোহরাওয়ার্দী ২৪এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে দিল্লির একটি সংবাদ সম্মেলনে তার প্রস্তাব তুলে ধরেন। বাংলার সব মুসলিমলীগ নেতারা এর সাথে একমত ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু মুসলিমলীগ প্রধান জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন দিয়েছেন, তাতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মুসলিমলীগ আর তেমন ভূমিকা রাখেনি। অন্যদিকে এই প্রস্তাবের অন্যতম বিরোধী হলো বাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস।

www.pathagar.com

ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন নিজেও কিছুদিন ধরে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক ঐক্যবদ্ধ বাংলার কথা চিন্তা করেছিলেন। ২৬এপ্রিল সোহ্‌রাওয়ার্দী যখন মাউন্টব্যাটেনের কাছে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব করেন এবং বলেন যে "যথেষ্ট সময় পেলে তিনি বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করেন", তখন এই প্রস্তাবের পক্ষে মাউন্টব্যাটেনের সমর্থন ছিল। ঐ দিনেই মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে সোহ্‌রাওয়ার্দীর কথা জানান এবং জিন্নাহ তাতে সম্মতি দিয়েছিলেন। ২৮এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন বারোজকে জানালেন যে, তার এবং তার বৃটিশ সহকর্মীদের "পরিকল্পনা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে পৃথক অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। জিন্নাহ কোনো আপত্তি করবে না।[২৪৫]

পৃথক স্বাধীন দেশ হবার সম্ভাবনা যাতে তৈরি হয় সেজন্য ১মে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে, বাংলা থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্যরা প্রথমে ভোট দিয়ে ঠিক করবেন যে তারা স্বাধীন বাংলার পক্ষে, না হিন্দুস্থান বা পাকিস্তানে যোগদান করতে চান। পরে তারা বাংলা ভাগ হবে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। ২মে বারোজকে মাউন্টব্যাটেন জানালেন, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য আর একটা বিকল্প হিসেবে বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে সমস্ত ভোটদাতাদের মতামত গ্রহণ করার ওপর জোর দেওয়া যেতে পারে। ৩মে কিরণশঙ্কর রায় যখন মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন সংবিধান সভার সদস্যদের ভোটাভুটির মাধ্যমে অথবা গণভোটের মাধ্যমে বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকার অধিকার দেবার যে পরিকল্পনা মাউন্টব্যাটেন করেছিলেন তার কথা কিরণশঙ্করকে বললেন। মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে কিরণশঙ্কর যখন শুনলেন যে সোহ্‌রাওয়ার্দী যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী ও সংযুক্ত মন্ত্রিসভাতে সম্মত তখন তিনি উল্লসিত হলেন।

৪মে বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে চিঠির মাধ্যমে ও টেলিগ্রাম করে জানালেন যে, বাংলার জনগণের মতামত নেবার জন্য গণভোট হতে পারে, তার জন্য কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগবে। তখন স্থির ছিল যে বৃটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ১৯৪৮ এর জুনের মধ্যে। অতএব বাংলায় গণভোট সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল। বাংলা

২৪৫. কারা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করলো এবং কার স্বার্থে / সুনীতি কুমার ঘোষ / পৃ. ২৬৩-২৬৭

www.pathagar.com

ঐক্যবদ্ধ থাকবে, না বিভক্ত হবে- এই প্রশ্নটি শুধু সেদিনের ৬ কোটির কিছু বেশি বাঙালীর কাছে নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ৭মে তে মাউন্টব্যাটেন বলেছেন যে, সোহরাওয়ার্দী তাকে জানিয়েছেন যে জিন্নাহ স্বাধীন বাংলাতে রাজি আছেন। মাউন্টব্যাটেন তখন ঐ প্রশ্নে গণভোট বা সাধারণ নির্বাচনের কথা ভাবছিলেন। কিন্তু তার পরেই ভি পি মেনন ও নেহেরুর সাথে কথা বলে মাউন্টব্যাটেনের মত সম্পূর্ণ বদলে গেলো।

মাউন্টব্যাটেন এবার ঠিক করলেন যে, বাংলার জনমত জানার জন্য গণভোট বা সাধারণ নির্বাচন হবে না, এমনকি বাংলার আইনসভার সদস্যরা বাংলা অবিভক্ত পৃথক রাষ্ট্র থাকবে তার পক্ষে ভোট দেবার অধিকার পাবে না। বাংলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে সংবিধান সভা। যেখানে ছিল কংগ্রেসের প্রাধান্য। বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং পৃথক রাষ্ট্র হবে তাতে মুসলিমলীগ নেতাদের সম্মতি ছিল। ২৬এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাহকে সোহরওয়ার্দীর স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বাংলার প্রস্তাবের কথা বললেন তখন জিন্নাহ একটুও ইতস্তত না করে বলেছিলেন, "আমি আনন্দিত হবো... তারা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকুক সেটাই ভালো হবে"।[২৪৬]

অন্যদিকে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বরাবর বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। পাকিস্তান হোক আর না হোক, তবু বাংলাকে ভাগ করতে হবে- এই ছিল তাদের অন্যতম দাবী। তারা চেয়েছিলেন বাংলাকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে পঙ্গু করতে। বিড়লা প্রমুখ মাড়োয়ারী বড় মুৎসুদ্দিদের ঘাঁটি কোলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে তারা কখনো হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গুটিকয়েক নেতা সোহরাওয়ার্দীর পরিকল্পনার সাথে একমত ছিলেন। তাদের মাঝে ছিলেন বাংলা প্রদেশের প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা এবং নেতাজি সুভাস চন্দ্র বোসের বড় ভাই শরৎচন্দ্র বোস এবং কিরণ শঙ্কর রায়। তবে, জওহরলাল নেহেরু এবং ভাল্লাবভাই পাতিলসহ বেশিরভাগ কংগ্রেস নেতা এই পরিকল্পনা বাতিল করেন। এছাড়াও শ্যাম প্রসাদ মুখার্জীর নেতৃত্বাধীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল এর তীব্রভাবে বিরোধিতা শুরু করে। তাদের মতামত ছিল যে, এই পরিকল্পনা আসলে বিভক্তিকরণের বিপক্ষে সোহরাওয়ার্দীর

---

২৪৬. কারা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলো এবং কার স্বার্থে / সুনীতি কুমার ঘোষ / পৃ. ২৬৩-২৬৭

www.pathagar.com

দ্বারা একটি চাল মাত্র যাতে কোলকাতা শহরসহ শিল্পোন্নত পশ্চিম অংশের ওপর লীগ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। তারা আরো মতামত পোষণ করেছিলেন যে, যদিও পরিকল্পনায় একটি সার্বভৌম বাংলার কথা উল্লেখ করা আছে, এটা বাস্তবিক পক্ষে একটি ভার্চুয়াল পাকিস্তান ছাড়া কিছুই হবে না এবং হিন্দু সংখ্যালঘুদের চিরতরে মুসলিম সংখ্যাগুরুদের দয়ার ওপর চলতে হবে।

যদিও কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া প্রস্তাবটির আলোর মুখ দেখা সম্ভব ছিল না, শরৎচন্দ্র এবং সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র নিয়ে একটি মতৈক্যে পৌঁছুতে তাদের আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর মত শরৎচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন যে, বিভক্তিকরণের ফলে বাংলার অর্থনীতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অর্ধেকের মত হিন্দু জনগোষ্ঠী অসহায় অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে আটকা পরবে। চুক্তিটি ২৪মে, ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

৮জুন গান্ধী শরৎচন্দ্র বোসকে লিখেছিলেন, "নেহেরু ও প্যাটেল অবিভক্ত বাংলার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তাদের মতে তফশিলী নেতাদের হিন্দুদের থেকে পৃথক করার এটা একটা কৌশল। এটা তাদের সন্দেহ নয় দৃঢ় বিশ্বাস।... তারা আরও মনে করেন যে, তফশিলীদের ভোট কেনার জন্য জলের মত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। যে ব্যবস্থাই হোক তার জন্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আগে চুক্তি হতে হবে। আমি যা দেখছি সেটা তোমার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।" তিনি শরৎ বোসকে বাংলার ঐক্যের জন্য লড়াই বন্ধ করার ও বাংলা বিভাগের জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য উপদেশ দিলেন।

যেহেতু কংগ্রেস নানান ঘটনার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান মেনে নিয়েছে তাই ইংরেজরা মুসলিম অধ্যুষিত দুই প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ মেনে নিতে বাধ্য করে মুসলিমলীগকে। সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিল অন্তত কোলকাতা যাতে পাকিস্তানে থাকে। জিন্নাহও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের চাপে সেটা সম্ভব হয়নি। সিদ্ধান্ত হয় জেলা ভিত্তিক ভাগ হবে। হিন্দুপ্রধান জেলাগুলো ভারতে যোগ দিবে। মুসলিম প্রধানগুলো পাকিস্তানে থাকবে।

সে সময় বাংলা প্রদেশে জেলা ছিল ২৭টি। এর মধ্যে ১৫টি মুসলিম প্রধান জেলা হলো দিনাজপুর, রংপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, নাদিয়া, ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম।

www.pathagar.com

আর ১১টি ছিল হিন্দু প্রধান জেলা, কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, যশোর, খুলনা। আর একটি ছিল বৌদ্ধ প্রধান জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

হিন্দুদের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিচক্ষণ জিন্নাহ সুন্দরবন ও সমুদ্রকে বেশি পাবার জন্য খুলনা ও যশোর পাকিস্তানে রাখতে চেয়েছেন। বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ ও মালদা।

অবশেষে যেভাবে চূড়ান্ত ভাগে পাকিস্তানে যেসব জেলাগুলো থাকে সেগুলো হলো, পূর্ব দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, পূর্ব নাদিয়া, ঢাকা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম। অন্যদিকে বাংলার যে জেলাগুলো হিন্দুস্থানে যোগ দেয় সেগুলো হলো, কোলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম নাদিয়া, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি।

বাংলায় গণভোট হতে দেয়নি হিন্দুরা কারণ ভোট হলে বাংলার মানুষ দু'টি সিদ্ধান্তের একটি বেছে নিতো। এক পুরো বাংলা পাকিস্তানে যোগ দিতো নতুবা বাংলা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতো। সিলেটের ব্যাপারে হিন্দুদের ও কংগ্রেসের বাধা না থাকায় সেখানে স্বাভাবিকভাবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের মানুষ ভোট দিয়ে পাকিস্তানে যুক্ত থাকার ব্যাপারে রায় দেয়। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭জুলাই সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে মোট ভোটার ছিল ৫ লাখ ৪৬ হাজার ৮১৫ জন। ভোট দিয়েছিল ৭৭ শতাংশ মানুষ। ২৩৯টি ভোটকেন্দ্রে বড় কোনো ঝামেলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছিল বলেই জানা যায়।[২৪৭]

নির্বাচনে কংগ্রেসের মার্কা ছিল ঘর আর মুসলীমলীগের ছিল কুড়াল। হিন্দুদের মধ্যে শূদ্ররা ছিল মুসলীমলীগের পক্ষে। তারা নিয়মিতই হিন্দু প্রভাবশালীদের অত্যাচারের শিকার হতেন। আর সেই অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তারা ভারতের বদলে পাকিস্তানে থাকতে চেয়েছেন। তারা হিন্দুদের চাইতে মুসলিমদের কাছে

---

২৪৭. সিলেট গণভোট, ১৯৪৭ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/374yE57 / অ্যাকসেস ইন ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

নিজেদের নিরাপদ ভাবতেন। আলেমদের একদল ছিল কংগ্রেসি। এরা মূলত কওমী আলেম। তারা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে কংগ্রেসী হিন্দুদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন। হুসাইন আহমেদ মাদানী ছিলেন হিন্দুপন্থী আলেমদের নেতা।[২৪৮]

দেশভাগের ইতিহাসে সিলেটের গণভোট এক বিরল ঘটনা। এই ভোটে জয়ী হতে মুসলিমলীগ ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালায়। সিলেটের জনগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল মুসলিমলীগ। পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেওয়া ফরজ ঘোষণা করে ফতোয়াও জারি করা হয় মুসলিমলীগ পন্থী আলেমদের কাছ থেকে। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে উল্লেখ রয়েছে গণভোটের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পাঁচশো কর্মী নিয়ে কোলকাতা থেকে সিলেট এসেছিলেন প্রচারণা চালাতে। সিলেটে ৬০ শতাংশ মুসলিম। তারপরও ভোটে জেতার জন্য মুসলিমলীগকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল কারণ কওমী আলেমরা হিন্দুদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ায় অনেক মুসলিম বিভ্রান্ত হয়ে কংগ্রেসে ভোট দিতে চেয়েছিল।

অবশেষে মুসলিমলীগ জয়ী হলো। পাকিস্তানের পক্ষে পড়লো ২ লাখ ৩৯ হাজার ৬১৯ ভোট। আর ভারতে যোগদানের পক্ষে পড়লো ১ লাখ ৮৪ হাজার ৪১ ভোট। মুসলিমলীগ ৫৫ হাজার ৫শ ৭৮ ভোট বেশি পায়। ভোটে জিতার পরেও সিলেটের পাঁচটি মহকুমার একটি মহকুমা করিমগঞ্জ পাকিস্তানে যুক্ত হয়নি। বেআইনিভাবে র‍্যাডক্লিফ লাইন অনুসারে করিমগঞ্জকে ভারতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সিলেটের মুসলিমদের কাছে তাই র‍্যাডক্লিফ লাইন বরাবরই বিতর্কিত।

◆ ◆

২৪৮. সাতচল্লিশে সিলেট কীভাবে পাকিস্তানের অংশ হল? / আবুল কালাম আজাদ / বিবিসি বাংলা / ১৭ অগাস্ট ২০১৭

www.pathagar.com

••| চতুর্থ অধ্যায় |••

আধুনিক বাংলা

১৯৪৭ সালের ১৪আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। এর মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মুসলিমদের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের সাফল্য আসে। যদিও পাকিস্তান গঠিত হওয়ার আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে যায় পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হওয়ার মাধ্যমে। ভারতের হিন্দু প্রধান প্রদেশ একটিও ভাগ হয়নি অথচ মুসলিম প্রধান দুইটি প্রদেশ ভাগ করতে বাধ্য করে কংগ্রেস। বৃটিশ আইনজীবী র‍্যাডক্লিপকে মাউন্টব্যাটেন দায়িত্ব দেন সীমারেখা টেনে দেওয়ার জন্য। পাঞ্জাব ও বাংলায় সেই ভাগ করতে গিয়ে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। সেই সূত্রে সীমান্ত অঞ্চলে নতুন করে আবার দাঙ্গা শুরু হয়। ফলে মুসলিমরা স্বাভাবিকভাবেই মনঃক্ষুণ্ণ হয়। তারপরও প্রায় দুই'শ বছরের পরাধীনতার অবসান হওয়ায় মুসলিমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আধুনিক বাংলার সময়কাল ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও জামায়াত

পাকিস্তানেও তুর্কির মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। মোস্তফা কামাল পাশা বৃটিশদের থেকে তুর্কি জাতিকে উদ্ধার করে। স্বভাবতই মুসলিমরা ভেবেছিল তিনি আবার প্রচলিত খিলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু খিলাফতের কফিনে শেষ পেরেকটি মারেন তিনি। খেলাফত ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করে সেক্যুলার তুরস্ক গঠন করেন। একই ব্যাপার ঘটিয়েছেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পাকিস্তান

www.pathagar.com

আন্দোলনের সময় বৃটিশ আমলে জিন্নাহ যখন বিভিন্ন জনসভায় যেতেন। তখন তিনি বুক পকেটে থাকা ছোট্ট একটি কুরআনের কপি বের করে দেখিয়ে বলতেন, এটিই হবে পাকিস্তানের সংবিধান। কুরআনের ভিত্তিতেই চলবে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র।

যখন থেকে পাকিস্তান প্রস্তাব হয়েছে তখন থেকেই মুসলিমলীগের নেতারা বলতেন পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হবে। পাকিস্তানের পক্ষে থেকে মুসলিমলীগের এই দাবীকে সঠিক মনে করতেন না গত শতাব্দির পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি ১৯৪০ সালে এই বিষয়ে একটি লেকচার দেন যা পরে বই আকারে ছাপা হয়েছে। বইটির নাম ইসলামী হুকুমাত কিস্তারা কায়েম হতি হ্যায়।[২৪৯] সেখানে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। এর পরের বছর ১৯৪১ সালে তিনি প্রস্তাবিত পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি সংগঠন কায়েম করেন, যার নাম জামায়াতে ইসলামী।[২৫০]

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের সংবিধান একটি সেক্যুলার সংবিধান হবে বলে ধারণা দেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে তারা আলোচনা শুরু করেন পাকিস্তানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেম উপযোগী, না আমেরিকান প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম, তা নিয়ে। এতে ক্ষিপ্ত হয় ইসলামপন্থী মানুষরা।

১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে ১৯৪৮ সাল থেকে। আর সেটি ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী নিয়ে। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে করাচির জাহাংগীর পার্কে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম রাজনৈতিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের প্রতি চারটি দফার ভিত্তিতে 'আদর্শ প্রস্তাব' গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

---

২৪৯. ইসলামী বিপ্লবের পথ / সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী / অনুবাদকের ভূমিকা

২৫০. মাওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / পৃ. ১০১

www.pathagar.com

দফাগুলো হচ্ছে[২৫১]

১। সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র এক আল্লাহর। সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।

২। ইসলামী শরীয়াহ হবে দেশের মৌলিক আইন। (কুরআন ও সুন্নাহ)

৩। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল করা হবে।

৪। ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোনো অবস্থাতেই ইসলামী শরীয়াহর সীমা লংঘন করবে না।

এই দাবীগুলো নিয়েই জামায়াতে ইসলামী ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন শুরু করে।

১৯৪৮ সালের ১১সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন। গভর্ণর জেনারেল হন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন লিয়াকত আলী খান। এই সময় থেকে প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ শাসকের ভূমিকায় থাকেন। লিয়াকত আলী খান সরকার ১৯৪৮ সালের ৪অক্টোবর ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। প্রায় ২০ মাস জেলে রাখার পর ১৯৫০ সালের ২৮মে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে দেশের আলিম সমাজ যদি সর্বসম্মতভাবে কোনো ইসলামী শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করে, গণপরিষদ তা বিবেচনা করে দেখবে। প্রধানমন্ত্রী আস্থাশীল ছিলেন যে বহুধাবিভক্ত আলিম সমাজ এই জটিল বিষয়ে কখনো একমত হতে পারবে না এবং কোনো সর্বসম্মত প্রস্তাবও পেশ করতে পারবে না।

১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে করাচিতে সারা দেশের সকল মত ও পথের ৩১ জন শীর্ষ আলিম একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে একত্রিত হন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ সুলাইমান নদভী। সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি খসড়া পেশ করেন। আলাপ-

২৫১. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম নাজির আহমদ / পৃ. ১৩

www.pathagar.com

আলোচনার পর চূড়ান্ত হয় একটি মূল্যবান দলিল, "ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি।"[২৫২]

দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

২. দেশের আইন আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ ভিত্তিতে রচিত হবে।

৩. রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার ওপর সংস্থাপিত হবে।

৪. রাষ্ট্র মা'রুফ প্রতিষ্ঠা করবে এবং মুনকার উচ্ছেদ করবে।

৫. রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সম্পর্ক মজবুত করবে।

৬. রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দেবে।

৭. রাষ্ট্র শরীয়াহর নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করবে।

৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

৯. স্বীকৃত মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দীনি স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১০. অমুসলিম নাগরিকগণ আইনের আওতায় পার্সোনাল সংরক্ষণ ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

১১. রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত অমুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।

১২. রাষ্ট্র প্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।

১৩. রাষ্ট্র প্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।

১৪. রাষ্ট্র প্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মাজলিসে শূরা থাকবে।

১৫. রাষ্ট্র প্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেন্ড করতে পারবেন না।

১৬. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্র প্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।

১৭. রাষ্ট্র প্রধান তার কাজের জন্য মজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের ঊর্ধ্বে হবেন না।

১৮. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।

১৯. সরকারি ও বেসরকারি সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।

---

[২৫২] রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম নাজির আহমদ / পৃ. ১৩-১৫

www.pathagar.com

২০. ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।

২১. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।

২২. আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যে কোনো ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

এই নীতিমালা বিপুল সংখ্যায় লিফলেট আকারে ছাপিয়ে সারা দেশে ছড়ানো হয়। এর পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সারা দেশে বহুসংখ্যক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। আবার জামায়াতের দাবীর বিরুদ্ধেও কেউ কেউ অবস্থান নেন। মুসলিমলীগ নেতারা কৌশলী অবস্থান নেন। তারা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে দেখতে চান না। তবে তারা তা স্পষ্ট করেননি।

প্রকাশ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন বিভিন্ন আঞ্চলিক নেতারা। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মওলানা(!) আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন অন্যতম। তিনি তো পাকিস্তানকে সেক্যুলার হিসেবেও দেখতে চাইতেন না। তিনি মাওবাদী কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন হলে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা কঠিন হয়ে যাবে বলে তিনি মনে করতেন।

কাদিয়ানী সমস্যা

পাঞ্জাবের মুসলিমলীগ নেতা লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর ১৯৫১ সালে প্রধানমন্ত্রী হন বাঙালি খাজা নাজিম উদ্দিন। তিনি ১৯৫৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। সে সময় পাকিস্তানে আহমদিয়া বা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ব্যাপক বিস্তার হয় এবং একই সাথে তারা পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। পাকিস্তানের কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তা এই মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কাদিয়ানীদের বিভ্রান্ত মতবাদ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে প্রভাব রাখার আশংকা শুরু হয় মুসলিমদের মধ্যে। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মূল নেতা মওলানা মওদূদী বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে দেখেন। তিনি সংবিধান কমিটি থেকে চিহ্নিত কাদিয়ানীদের বাদ দেওয়া, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কাদিয়ানী ও অমুসলিমদের অংশগ্রহণ না করানোর দাবী তুলেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাইয়্যেদ মওদূদী বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনও চালিয়ে যান। তিনি 'কাদিয়ানী মাসয়ালা' নামে একটি বই লিখে কাদিয়ানী বা আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম প্রমাণ করেন এবং তাদের ভ্রান্ত আকিদার স্বরূপ উন্মোচন করেন। এই বইটি কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে গতি এনে দেয়। এই আন্দোলন বড় ধরনের নাড়া দেয় পাকিস্তানকে। অধিকাংশ মুসলিম এই আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। এ সময় অনেকগুলো সংগঠন একযোগে কাদিয়ানীদেরকে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষনার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। তারা সর্বদলীয় কনভেনশনে ১৯৫৩ সালের ২৭ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটি' গঠন করে। জামায়াত ইসলামী এই কমিটির বিরোধিতা করে অহিংস আন্দোলনের পক্ষে অবস্থান নেয়।[২৫৩][২৫৪]

এদিকে পাঞ্জাবে কাদিয়ানী সমস্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যকার দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ১৯৫৩ সালের আটাশে মার্চ মওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। এটা ছিল মূলত সামরিক কর্তৃপক্ষের ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতার নগ্ন বহি:প্রকাশ। তারা দাঙ্গা সৃষ্টির অভিযোগে গ্রেফতার করলেও মূলত মওলানা মওদূদী ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী মওলানাকে গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে "কাদিয়ানী মাসয়ালা" বইয়ের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এ অভিযোগেই ৮মে তারিখে সামরিক আদালত মওলানাকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করে।[২৫৫] অথচ মওলানা সামরিক মানুষ ছিলেন না। মূলত এটা ছিল একটা অজুহাত। মওলানা মওদূদীকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন থেকে দূরে রাখাই ছিল এর বেসিক উদ্দেশ্য। এর পেছনে মুসলিমলীগের ইন্ধন ছিল। মওলানার ফাঁসির ঘোষণার সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আরেক বাঙালি নেতা মোহাম্মদ আলী বগুড়া। বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর তীব্র বিরোধিতা ও ক্ষোভের মুখে মুসলিমলীগ ও সেনাবাহিনী তার মৃত্যু দণ্ডাদেশ মওকুফ করে তারা

---

২৫৩. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম নাজির আহমদ / পৃ. ১৫

২৫৪. মওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / পৃ. ১৩৬

২৫৫. মওলানা মওদূদী : একটি জীবন একটি ইতিহাস / আব্বাস আলী খান / পৃ. ১৩৭

www.pathagar.com

মওলানাকে যাবজ্জীবনের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করে। বিশ মাস কারাবাসের পর মওলানাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয় সরকার।[২৫৬]

অথচ সামরিক কর্তৃপক্ষ যে "কাদিয়ানী মাসয়ালা" পুস্তিকা প্রণয়নের অজুহাতে মওলানাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করে সে পুস্তিকাটির কিন্তু তারা বাজেয়াপ্ত করেননি। লাহোরের সামরিক আদালতে তার বিচার চলাকালেই লাহোর শহরেই বইটির বেস্ট সেল হয়েছিল। শুধু লাহোর নয় সারা পাকিস্তানেই বইটির বিক্রি চলছিল দেদারছে। মূলত বইটির কোথাও কোনো উস্কানিমূলক কথা ছিল না। বরং তাতে তিনি 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন কমিটি'র বিরোধিতা করেছেন। তাই সরকারও চেয়েছিল বইটি মানুষ পড়ুক।

কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয়, অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এ বইটিতে তা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কাদিয়ানীদেরকে আইনগতভাবে অমুসলিম ঘোষণা করাই ছিল মওলানা মওদূদীর দাবী। এ দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্য এ বইটিতে সরবরাহ করা হয়েছে। এ দাবী আদায়ের লক্ষ্যে মওলানা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলবার আহ্বান জানান। অবশেষে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়।[২৫৭] কাদিয়ানীরা যে অমুসলিম এ ব্যাপারে উম্মতের গোটা আলেম সমাজ একমত।

গণদাবীর মুখে গণপরিষদ ১৯৫৬ সালের ২৯ফেব্রুয়ারী একটি শাসনতন্ত্র পাস করে।[২৫৮] কিন্তু সেখানে ইসলামপন্থীদের বেশিরভাগ দাবীই উপেক্ষা করা হয়। এ সময় পাকিস্তানের ক্ষমতায় ছিল আওয়ামীলীগ। আর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বাঙালি নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। মুসলিমলীগ মনে করেছে এই দাবী দিয়ে মওদূদী ও জামায়াতকে বোকা বানিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে রাখবে।

মওলানা মওদূদী তাদের এই চালাকি বুঝতে পেরেও 'ইসলামিক রিপাবলিক

---

২৫৬. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম নাজির আহমদ / পৃ. ১৬

২৫৭. ভারতের কাদিয়ান থেকে যেভাবে পাকিস্তানকে আবাসভূমি করেছিল আহমদিয়া সম্প্রদায় / বিবিসি বাংলা / ১৭ আগাস্ট ২০১৭

২৫৮. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম নাজির আহমদ / পৃ. ১৭

www.pathagar.com

অব পাকিস্তান' এই ঘোষণাকে পজেটিভ হিসেবে গ্রহণ করে সংবিধানকে স্বাগত জানান এবং বাকী দাবীগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। মওলানার যুক্তি ছিল এর মাধ্যমে রাষ্ট্র তার পরিচয় পেয়েছে। ধীরে ধীরে সকল নিয়ম কানুন, আইন আদালত ইসলামী শরীয়াহর ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

মওলানার এই চিন্তার বাস্তবতা হচ্ছে, পাকিস্তানের ইসলামী রিপাবলিক পরিচয়ে একে একে সেখান থেকে সুদ, মদসহ অনেক অনৈসলামিক নিয়ম-কানুন ও আচার-আচারণ বন্ধ হয়েছে। কাদিয়ানীদেরও অমুসলিম ঘোষিত হয়ে একটি সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তবে শাসনতন্ত্র নিয়ে পাকিস্তানে ব্যাপক গোলযোগ তৈরি হয়। প্রথমত ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের মধ্যে ভাঙন তৈরি হয়। আগেই বলেছিলাম মওলানা(!) ভাসানী ইসলামী রিপাবলিকের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন।[২৫৯] এর পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দী সরকার আমেরিকা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে। এতে চীনপন্থী ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং কাগমারিতে সম্মেলন করেন। কাগমারিতে তিনি ইসলামী রিপাবলিক ও আমেরিকাপন্থী অবস্থান থেকে সরে না এলে সালামুন আলাইকুম জানাতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী ও আওয়ামীলীগের অন্যান্য নেতারা তার এই অবস্থানকে গুরুত্ব দেননি। কোণঠাসা হয়ে পড়েন ভাসানী। অবশেষে আওয়ামীলীগ থেকে পদত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে মাওবাদী দল গঠন করেন।[২৬০]

এদিকে নতুন সংবিধানে গভর্নর জেনারেল সিস্টেম বাদ পড়ে। গভর্নর জেনারেল ছিলেন ইংল্যান্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত। স্বাধীনতার সময় এই নিয়ম যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান নিজেদের জন্য শাসনতন্ত্র তৈরি না করবে ততদিন ইংল্যান্ডের রাজা/রাণী কতৃক গভর্নর জেনারেল থাকবেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নওয়াব পরিবারের সন্তান। তিনি ছিলেন মীর জাফরের বংশধর। আগে মূলত রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী দ্বারা পরিচালিত হতো। নতুন সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ইস্কান্দর মির্যার সাথে সোহরাওয়ার্দীর বিরোধ বাড়তে থাকে। এদিকে পূর্ব

---

২৫৯. উপমহাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত / সিরাজুল হোসেন খান / জ্ঞান বিতরণী / পৃ. ১১৯

২৬০. মওলানা ভাসানী ও কাগমারী সম্মেলন / এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া / দৈনিক ইনকিলাব / ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

www.pathagar.com

পাকিস্তানে সংসদ অধিবেশনে সংঘর্ষ চলাকালে স্পিকার শাহেদ আলী ইন্তেকাল করেন। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে অস্থিরতা শুরু হয়। ইস্কান্দর মির্যাকে চাপে ফেলতে ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন।

সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগে পুরো পাকিস্তানে গোলযোগ আরো বৃদ্ধি পায়। প্রদেশগুলোতেও নানান ইস্যুতে অস্থিরতা তৈরি হয়। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে অস্থিরতার মূল বিষয় ছিল আওয়ামীলীগ ও ন্যাপের মধ্যেকার বিরোধ। সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর গুজরাট থেকে আসা মুসলিমলীগ নেতা ইবরাহীম ইসমাইলকে প্রধানমন্ত্রী করে ইস্কান্দর মির্যা। আওয়ামীলীগ ও রিপাবলিকান পার্টির ভেটোতে মাত্র ৫৫ দিন পরই তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর ইস্কান্দর মির্যা নিজ দলের ফিরোজ খান নুনকে প্রধানমন্ত্রী করেন। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেকার সমস্যার সমাধান হয় না। সারাদেশেই গোলযোগ তৈরি হয়। বিভিন্নস্থানে বিশেষত লাহোরে ও পাঞ্জাবে সেনাবাহিনীকে মানুষ আহ্বান করতে থাকে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে ইস্কান্দর মির্যা সংবিধান স্থগিত করে সামরিক আইন জারি করেন। সেনাপ্রধান আইয়ুব খাঁনকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। সামরিক আইন জারির পর সারাদেশে সেনা মোতায়েন নিশ্চিত করা হয়।[২৬১] গোলযোগ ও হট্টগোল বন্ধ হয়। সামরিক আইন জারির বিশ দিন পর আইয়ুব খাঁন ইস্কান্দর মির্যাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করেন। ইস্কান্দার মির্জা লন্ডনে নির্বাসিত হন। পাকিস্তানে শুরু হয় সেনাশাসন আইয়ুব খাঁনের অধ্যায়। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল হয় আইয়ুব খাঁনকে স্বাগত জানিয়ে।

ভাষা আন্দোলন ও এর ঘটনা প্রবাহ

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ তখন একটি প্রদেশ হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা যে হিন্দি হবে, সে সিদ্ধান্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগেই ঘোষণা

---

২৬১. সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2MP2a8j / অ্যাকসেস ইন ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে আলোচনা চলাকালে এ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠন নিখিল ভারত মুসলিমলীগের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। তবে ১৯৩৭ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত 'উর্দু' পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে, এটা সহজেই অনুমিত ছিল। এর মধ্যেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে যায়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরুতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ এক বিবৃতিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। এর প্রতিবাদ করেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগই ছিল পূর্ববঙ্গের অধিবাসী এবং তাদের মাতৃভাষা বাংলা। এটাই ছিল ড. শহীদুল্লাহর একমাত্র যুক্তি।[২৬২]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত ছিল না কারণ বাংলা সবার জন্য বোধগম্য ছিল না। আবার শুধু পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলায় যদি প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বাংলা চালু করা হয়, তবে সেটাও রাষ্ট্রের ঐক্যের জন্য হুমকি। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলা' অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে চালু হলে এখানে পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের জন্য বোধগম্য হবে না। এখানে তারা ব্যবসা ও পড়ালেখা করার জন্য আসবে না। যেটা এই অঞ্চলের মানুষের জন্যই ক্ষতিকর হবে। ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের মাত্র বিশ বছরের মধ্যে ঢাকা কোলকাতা থেকেও সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। এই বাংলাদেশের সবগুলো সূচক এগিয়ে যায়। এর অন্যতম কারণ ছিল এখানে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান থেকে বহু মুহাজির ব্যবসায়ী এসেছেন। ব্যবসা করেছেন ও শিল্প গড়েছেন। এজন্য বাংলার রাজনীতিবিদেরা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না।

আবার পূর্ব পাকিস্তানে অফিসিয়াল ভাষা বাংলা হলে পাকিস্তানের অন্যান্য গোষ্ঠী পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পশতু, বেলুচরা তাদের নিজ নিজ প্রদেশে নিজ নিজ ভাষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে এক অঞ্চলের মানুষ আরেক অঞ্চলে অপাংক্তেয় হয়ে পড়বে। একই সাথে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট হবে। এজন্য

---

২৬২ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ওঠে '৪৭ সালেই / আসিফুর রহমান সাগর / দৈনিক ইত্তেফাক / ১ ফেব্রুয়ারী ২০২০

www.pathagar.com

লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা হিসেবে এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হিসেবে উর্দু ছিল পাকিস্তানের ভাষা হিসেবে সঠিক চয়েজ।

অন্যপক্ষে অবিভক্ত উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হিন্দুদের হিন্দি-প্রীতির বিপরীতে মুসলমানদের উর্দুর প্রতি একটা সহজাত দুর্বলতা ছিল। তা ছাড়া উপমহাদেশীয় মুসলমানদের প্রাচীনপন্থি ও আধুনিকপন্থি উভয় ধরনের শীর্ষ শিক্ষাকেন্দ্র যথাক্রমে দেওবন্দ ও আলীগড় উর্দু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় উর্দুর প্রতি প্রাচীন ও আধুনিক উভয়পন্থী উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে একটা সমীহ বোধ ছিল। উর্দু ছিল সকল মুসলিমের কাছে বোধগম্য একমাত্র ভাষা। যদিও পাকিস্তানে বাঙালি বেশি তবে বাঙালি ছাড়া আর কেউ বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত ছিল না। সুতরাং উর্দু রাষ্ট্রভাষা না হলে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী সমস্যায় পড়ে যাবে।

বাংলাদেশের বহু অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে উর্দুতে কথাবার্তা বলা একটা আভিজাত্যের পরিচায়ক বলে মনে করা হতো। অন্যদিকে ঢাকা মহানগরীর আদি অধিবাসীদের মধ্যে উর্দু-বাংলা মিশ্রিত এক ভাষা বহুল প্রচলিত থাকায় তারাও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে সুনজরে দেখেননি বরং মুশরিকদের ষড়যন্ত্র হিসেবেই গণ্য করেছে। এসব কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন মোটেই গণদাবী বা জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না। ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা পরে হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগ থেকেই এ নিয়ে আলোচনা, বাদ-প্রতিবাদ, লেখালেখি শুরু হয়। এসব বাদ-প্রতিবাদ ও লেখালেখিতে বাংলার পক্ষে অংশগ্রহণ করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাবন্ধিক আবদুল হক, কবি ফররুখ আহমদ প্রমুখ।[২৬৩]

অনেকে মনে করেন উর্দু পাকিস্তানীদের মাতৃভাষা ছিল। আসলে উর্দু তাদের মাতৃভাষা না। পাকিস্তানের পাঁচ জাতির পাঁচটি আলাদা ভাষা। উর্দু কারো মাতৃভাষা ছিল না। বর্তমানে পাকিস্তানের মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ উর্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। আর এরা হলো ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া জনগণ।[২৬৪]

আপনি জেনে অবাক হবেন পাকিস্তানের চাইতেও ভারতে উর্দুভাষী বেশি।

---

২৬৩. যেভাবে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় / মোহম্মদ আবদুল গফুর / দৈনিক ইনকিলাব / ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

২৬৪. The World Factbook / Central Intelligence Agency / P. 264

www.pathagar.com

ভারতের প্রায় সকল মুসলিম (বাঙালি ছাড়া) উর্দুকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। পাকিস্তানে দেড় কোটির মতো মানুষের মাতৃভাষা উর্দু, আর ভারতে ১৮ কোটি মানুষের মাতৃভাষা উর্দু। মোদ্দাকথা হলো পাকিস্তানিদের মাতৃভাষা উর্দু নয়। আমাদেরও উর্দু নয়। তবে উর্দু সকল মুসলিমেরই যোগাযোগের ভাষা ছিল। উর্দু ভারতের সব জাতি গোষ্ঠীর জন্যই কমন ও সবচেয়ে বোধগম্য ভাষা ছিল। যদিও সেটা কারো মাতৃভাষা ছিল না।

উর্দু একটি লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা। লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা মানে হল আন্তঃযোগাযোগীয় ভাষা। যেটি কয়েকটি ভাষার সমন্বয়ে গঠিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের (যেমন সিলেট, নোয়াখালী, বরিশাল, রংপুর ও চট্টগ্রাম) মানুষ যখন একটা অফিসে বাংলা একাডেমীর ঠিক করে দেওয়া কোলকাতার সাথে মিল রেখে তৈরি করা 'প্রমিত' বাংলায় কথা বলে, তখন কিন্তু সেখানে এক প্রকার লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কাই ব্যবহার করে। এখানেও মাতৃভাষার ওপরে একটা লিঙ্গুয়াফ্রাঙ্কা চাপানো হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য এটাই জরুরি ছিল। প্রমিত বাংলা ভাষা আমাদের কারো মাতৃভাষা নয়।

হিন্দি নামটি ফার্সি থেকে এসেছে। পারস্যের অধিবাসীরা ভারতীয় লোক ও তাদের ভাষাকে হিন্দি নামে ডাকতো। ইতিহাসবিদেরা তাই মনে করেন। ৮ম-১০ম শতকের দিকে ভারতে মুসলিম আক্রমণের সময় উত্তর ভারতের খাড়ি বোলি কথ্য ভাষা থেকে হিন্দির উৎপত্তি ঘটে। খাড়ি বোলি ছিল দিল্লি এলাকার ভাষা, এবং বহিরাগত মুসলিম শাসকেরা সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য এই ভাষাই ব্যবহার করতেন। এই খাড়ি বোলি ভাষার একটি রূপ ধীরে ধীরে ফার্সি ও আরবি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ ধার করলে উর্দু নামের এক সাহিত্যিক ভাষার উদ্ভব ঘটে।

উর্দু শব্দটি তুর্কি "ওর্দু" শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ "শিবির" বা "ক্যাম্প"। অন্যদিকে সাধারণ জনগণের মুখের ভাষায় আরবি-ফার্সির তেমন প্রভাব পড়েনি, বরং তারা সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ ও সাহিত্যিক রীতি ধার করতে শুরু করে এবং এভাবে হিন্দি ভাষার জন্ম হয়। সেই হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে উপমহাদেশের মুসলিমরা উর্দু আর অন্যরা হিন্দি ভাষায় কথা বলতো। পাকিস্তানের সে সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মাতৃভাষাগুলো ছিল বাংলা, পাঞ্জাবী, বেলুচ, সিন্ধি, পশতু ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এর মধ্যে উর্দুই ছিল বোধগম্যতার দিক দিয়ে কমন যা হিন্দীর অনুরূপ। তাই এই ভাষাই মুসলিমদের ভাষা হয়ে ওঠে।[২৬৫]

মুসলিমলীগের তথা পাকিস্তানের তৎকালীন নেতারা তাদের প্রদেশগুলোর মধ্যে কমন ভাষা চালু করার জন্যই উর্দুকে সিলেক্ট করেছে। আর এটা মুসলিম তাদের ইশতেহারে এনেছিল সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের আগে। হিন্দির বিপরীতে উর্দু তখন থেকেই রাজনৈতিক মর্যাদা পায়। আর বিষয়টা এমন ছিল না যে উর্দু অপ্রত্যাশিতভাবেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। প্রত্যেক জাতি তাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা থেকে বঞ্চিত করেছে সংহতি রক্ষার জন্য।

শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ভিন্ন দাবী করেছে আমাদের কিছু বাঙালি ছাত্র। বাংলার সব মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিল এটাও সঠিক নয়। ঢাকায় সে সময় প্রচুর ছাত্র উর্দুর পক্ষেও ভূমিকা রেখেছিল। বাংলার কোনো রাজনৈতিক নেতা বায়ান্নোর আগ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন না। ঢাকা ভার্সিটি ও জগন্নাথ কলেজের (তখন কলেজ ছিল) কিছু ছাত্র ছাড়া এই আন্দোলন অন্য কেউ করেনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সর্বপ্রথম অফিসিয়ালি উত্থাপন করেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তৎকালীন সকল বাঙালি সংসদ সদস্যরা ওনার বক্তব্যকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। অতএব এটা বাংলার গণমানুষের দাবী বলা অযৌক্তিক। [২৬৬]

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলার অযৌক্তিক ও পরিকল্পিত উদ্যোগ সর্বপ্রথম গ্রহণ করে তমুদ্দুনে মজলিশ ১৯৪৭ সালের ১সেপ্টেম্বরে। তমুদ্দুনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনের মেনিফেস্টোরূপী 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' নামের একটি ছোট বই। এই বইয়ে স্থান পায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবদুল মনসুর আহমদ এবং তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তরুণ লেকচারার আবুল কাসেমের তিনটি নিবন্ধ।

তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত ওই পুস্তিকার প্রথম নিবন্ধই ছিল

---

২৬৫. Urdu Literary Culture / Mehr Afshan Farooqi / P. 67

২৬৬. পাক-গণপরিষদে বাংলাকে পরিষদের ভাষা করার দাবী / দৈনিক ইত্তেফাক / ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবুল কাসেমের। তমুদ্দুনের পক্ষ থেকে তার লিখিত "আমাদের প্রস্তাব" শীর্ষক নিবন্ধে ভাষা আন্দোলনের মূল দাবী উত্থাপিত হয় দুইটি। [২৬৭]

১. বাংলা ভাষাই হবে –

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে আদালতের ভাষা

(গ) পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দু'টি :

উর্দু ও বাংলা।

সমগ্র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এই মূল দাবীতেই পরিচালিত হয়। অধ্যাপক আবুল কাসেম তার নিবন্ধে এক পর্যায়ে বলেন, "গণপরিষদের প্রত্যেক সদস্যের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে তারা যেন বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে মত দিয়ে বাঙালির আত্মহত্যার পথ সুগম না করেন, তা স্পষ্ট বুঝাতে হবে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সে সম্বন্ধে মুসলিমলীগ কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যায়। এ পরিস্থিতির সুযোগ নেন নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসনের উচ্চ স্তরের কর্মকর্তারা।"

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার নূরুল হক ভুইয়াকে আহ্বায়ক করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাবিবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, কবি জসীমউদ্দিন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ। ১৯৪৭ সালের ১৭নভেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে মওলানা আকরম খাঁ সহ কয়েকশ চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও ছাত্রনেতাদের স্বাক্ষরসহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

এর বিপরীতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধী আন্দোলনও তখন জমে

---

২৬৭. পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি / বদরুদ্দিন উমর / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ১৪

www.pathagar.com

ওঠে। এই প্রসঙ্গে আবুল কাসেম বলেন, "এদিকে উর্দু সমর্থক আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্বনামখ্যাত মওলানা দ্বীন মোহাম্মদ সাহেব প্রমুখকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল্লায় ও মফস্বলের বহুস্থানে উর্দুকে সমর্থন করে বহু সভা করা হয়। এরা কয়েক লাখ দস্তখত যোগাড় করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক মেমোরেণ্ডাম পেশ করেন। পথে-ঘাটে ইস্টিমারে এ স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজ চলে। স্বাক্ষর সংগ্রহের পর কয়েকজন নামকরা ব্যক্তি করাচীতে গিয়ে সরকারের কাছে পেশ করে আসেন।"[২৬৮]

যারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে ছিলেন তারা কেউ কিন্তু অবাঙালি ছিলেন না। তাদের যুক্তি হলো পূর্ব পাকিস্তানে যদি বাংলাকে অফিসিয়াল ভাষা করা হয় তবে অন্যান্য অঞ্চল যেমন পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচ, কাশ্মীরে তাদের নিজস্ব ভাষা চালু হবে। এক্ষেত্রে বাঙালিদের সেসব অঞ্চলে কাজ করা ও শিক্ষাগ্রহণ করা কঠিন হবে। অন্যদিকে বাংলায় অন্যান্য জাতি গোষ্ঠির পাকিস্তানিরা আসবে না। ফলে দীর্ঘদিনের ইংরেজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শোষণের ফলে পিছিয়ে থাকা বাংলা আরো পিছিয়ে যাবে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় সংহতি বিনষ্ট হবে।

১৯৪৭ সালের ২৭নভেম্বর করাচিতে একটি শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের সাধারণ ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর প্রতিবাদে ৬ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আবুল কাসেম। এ সময় পাকিস্তান সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক ১৫ডিসেম্বর এক সার্কুলারে বাংলাকে বাদ দিয়ে ইংরেজি ও উর্দুকে পরীক্ষার বিষয়ভুক্ত করায় তার বিরুদ্ধে অধ্যাপক আবুল কাসেম এক বিবৃতি দেন। আবুল কাসেম এমনভাবে বিবৃতি দেন যেন পাকিস্তানে বাঙালি বাদে আর কোনো জাতি গোষ্ঠী নেই। তার এই অনুচিত বিবৃতি ছাপেনি কোনো পত্রিকা।

আবুল কাসেম এই বিবৃতি ৩১ডিসেম্বর ভারতের কোলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদে ছাপার ব্যবস্থা করেন। কোলকাতার ঐ পত্রিকা এ বিষয়ে পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করে ও বাঙালি নির্যাতনের অভিযোগ এনে "অবিশ্বাস্য" শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। ওই পত্রিকার কপি ঢাকায়

---

২৬৮. ভাষা আন্দোলন - সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন / মোসতফা কামাল / বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. / পৃ. ৫৫

www.pathagar.com

নিয়ে এসে প্রচারণা চালায় তমুদ্দুনে মজলিসের কর্মীরা। এই ঘটনা ঢাকাবাসীর মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাদের আগের ধারণা সত্য হয়েছে বলে তারা মনে করেন। নতুন একটি ইসলামী ভাবধারার রাষ্ট্রে ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্যই মুশরিকরা কিছু ছাত্রদের লেলিয়ে দিয়েছে। এ রকমটাই ভাবতে থাকেন ঢাকাবাসী। তারা তমুদ্দুনের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেন।[২৬৯]

১৯৪৮ সালের ২৩ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। তারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। একমাত্র চারজন হিন্দু ছাড়া আর কেউ পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্য এই প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেননি। ফরিদপুরের নেতা তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে গণপরিষদের সকল বাঙালি নেতা একযোগে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ঢাকার নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, "পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক, আমরা সবাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংহতি চাই।" পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান এ প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। উর্দুকে লক্ষ কোটি মুসলমানের ভাষা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র উর্দুই হতে পারে"। গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথের সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে বাতিল হয়ে যায়।[২৭০]

গণপরিষদে বাংলার রাষ্ট্রভাষা প্রস্তাব বাতিল হওয়ার প্রতিবাদে ২৬ফেব্রুয়ারী অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৪জানুয়ারী সাবেক বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থক অংশ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ নামে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংগঠন ভাষা আন্দোলনের সমর্থক হওয়ায় পুনর্গঠিত সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর নির্বাচিত হন যুগপৎ মজলিস ও

২৬৯. ভাষা আন্দোলন ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র / ফিরোজ মাহবুব কামাল / ৪ জানুয়ারী ২০২১ / https://bit.ly/2OMzjSp

২৭০. ভাষা আন্দোলন ও ভারতীয় ষড়যন্ত্র / ফিরোজ মাহবুব কামাল / ৪ জানুয়ারী ২০২১ / https://bit.ly/2OMzjSp

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের সদস্য তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শামসুল আলম। তবে বাংলার একজন রাজনৈতিক নেতারও প্রত্যক্ষ সমর্থন না পাওয়ায় ভাষা আন্দোলন গণভিত্তি তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ও মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে ১১মার্চ প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১মার্চ ভাষা আন্দোলনকারীরা খুবই সহিংস হয়ে ওঠে। তারা সচিবালয়ে ঢুকে সরকারি কর্মকর্তাদের হেনস্তা করতে থাকে। এর প্রতিরোধে মুসলিমলীগের নেতা কর্মীরা রাস্তায় নামে। ফলে পালিয়ে যায় ভাষা আন্দোলনকারীরা। মুসলিমলীগের নেতা কর্মীরা ঢাকা মেডিকেল ও ঢাবির হলে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করে। পুলিশ দুই পক্ষের লোকদেরই ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।[২৭১]

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর আসন্ন ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে তৎকালীন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৫মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে ৮ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিগুলো ছিল-[২৭২]

১- ভাষার প্রশ্নে গ্রেফতার করা সবাইকে মুক্তি প্রদান করা হবে।

২- পুলিশি অত্যাচারের বিষয়ে তদন্ত করে একটি বিবৃতি প্রদান করা হবে।

৩- বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে।

৪- সংবাদপত্রের ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।

৫- আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না।

৬- ২৯ফেব্রুয়ারী হতে জারিকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হবে।

৭- পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি উঠে যাবার পর বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করা হবে।

---

২৭১. ভাষা আন্দোলন - সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন / মোসতফা কামাল / বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. / পৃ. ৫৬

২৭২. ভাষা আন্দোলন - সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন / মোসতফা কামাল / বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. / পৃ. ৫৮

www.pathagar.com

৮- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন " রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই" এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী ভুল স্বীকার করে বক্তব্য দিবেন।

পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের ১৯মার্চ ঢাকায় আসেন। ২১মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘোষণা দেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা"। এতে ভাষা আন্দোলনকারীরা ক্ষেপে যায় এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্যোগ নেয়। তমুদ্দুনের নেতৃত্বে কিছু ছাত্র জিন্নাহ্র সাথে দেখা করেন। জিন্নাহ্ তাদের বুঝান কেন একটি ভাষাই পাকিস্তানের সংহতির জন্য জরুরি। এরপর ২৪মার্চ জিন্নাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বক্তব্যে বলেন, "Let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead the people is really the enemy of the state. Without one state language no state can remain tied up solidly together and function."

Let me restate my views on the question of a state language for Pakistan. For official use in this province, the people of the province can choose any language they wish... There can, however, be one lingua franca, that is, the language for inter-communication between the various provinces of the state, and that language should be Urdu and cannot be any other...

The state language, therefore, must obviously be Urdu, a language that has been nurtured by a hundred million Muslims of this subcontinent, a language understood throughout the length and breadth of Pakistan and, above all, a language which, more than any other provincial language, embodies the best that is in Islamic culture and Muslim tradition and is nearest to the languages used in other Islamic countries. [২৭৩]

---

২৭৩. Bhasha Andolon (1947 - 1952) / http://www.londoni.co// https://bit.ly/2ZwM8m0 / অ্যাকসেস ইন ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

তখন তার এই বক্তব্য করতালি দিয়ে স্বাগত জানায় ছাত্ররা। প্রচলিত ইতিহাসে আমাদের জানানো হয়েছে ছাত্ররা 'নো নো' বলে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো সে 'নো নো' শব্দ শোনা যায়নি। হতে পারে তারা সত্যই বলেছেন। কিছু ছাত্র হয়তো 'নো' বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি ছাত্র করতালি দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন। এই ব্যাপারটা আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে অস্বীকার করা হয়েছে।[২৭৪]

উক্ত পরিস্থিতিতে জিন্নাহ ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলতে আগ্রহী হন। রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদল জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শামসুল হক, কামরুদ্দিন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, অলি আহাদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম এবং নজরুল ইসলাম। বৈঠকে জিন্নাহ একক রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন, পাকিস্তান নিয়ে তার চিন্তা ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

জিন্নাহ তাদের বুঝাতে সক্ষম হন কেন উর্দু জরুরি এবং এতেই কল্যাণ রয়েছে বাঙালিদের। প্রতিটা প্রদেশে আলাদা ভাষা থাকলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে বাঙ্গালিরাই। জিন্নাহ ছাত্রদের বুঝিয়ে ভাষা আন্দোলন থেকে সরে আসার অনুরোধ করেন। ভাষা আন্দোলনের নেতারা জিন্নাহর যুক্তির কাছে হার মানে এবং আন্দোলন থেকে সরে আসার মৌখিক স্বীকৃতি দেয়। অবশ্য জিন্নাহ তাদের কাছ থেকে লিখিত কোনো ডকুমেন্টস চাননি। তিনি আন্তরিকভাবে বুঝিয়ে ছাত্রদের ভুল আন্দোলন থেকে ফিরতে বলেছেন।

ঢাকা ত্যাগের সময় তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে করা চুক্তির আর প্রয়োজনীয়তা নেই বলে উল্লেখ করেন একই সাথে উর্দুর ব্যাপারে আবারো তার মতামত ব্যক্ত করেন। আন্দোলন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে তমুদ্দুন মজলিস। দ্বিধান্বিত নেতৃত্ব থেকে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্ব কেড়ে নেয় বামাদর্শের ছাত্রনেতা কমরেড তোয়াহা এবং এই আন্দোলনকে বামদের আন্দোলনে পরিণত করেন। নেতৃত্ব হারানোর পর পরবর্তীতে তমুদ্দন মজলিস আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করে একটি বিবৃতি প্রদান করে এবং পরে তারা

---

২৭৪. রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে জিন্নাহর বক্তব্য (১৯৪৮) / https://bit.ly/3u8bDIB

www.pathagar.com

আস্তে আস্তে আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসে। বলা চলে ১৯৫২ সালের আগ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলন বন্ধ থাকে।

১৯৪৮ সালের ১৮নভেম্বর পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ২৭নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই মিটিং এ ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে প্রশংসা করে মানপত্র পাঠ করা হয়। সেই মানপত্র পাঠ করেন ডাকসুর জিএস গোলাম আযম। মানপত্রে তিনি বাংলা ভাষার দাবী পুনরায় উত্থাপন করেন। তবে লিয়াকত আলী খান এই ব্যাপারে কোনোরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।[২৭৫] ১৭নভেম্বর আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র ভাষা কর্মপরিষদের সভায় একটি স্মারকলিপি প্রণয়ন করা হয় এবং সেটি ২৭নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী এক্ষেত্রেও কোনো সাড়া দেননি।

যদিও ভাষা আন্দোলন করেছে অল্প কিছু ছাত্র এবং এটি মোটেই গণভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়নি তথাপি পাঞ্জাবের নেতা লিয়াকত আলী খান এটিকে একেবারে উড়িয়ে দেননি। তিনি মনে করেছেন যেহেতু এই ভাষায়ই পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে এটা এক সময় বড় আকার ধারণ করতে পারে। তাই তিনি এর কিছুদিন পর, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে ভাষা সমস্যার ব্যাপারে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছেন। এই জন্য বাংলা সমর্থক মওলানা আকরম খাঁনের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি গঠন করেন লিয়াকত আলী খান। ভাষা কমিটিকেও এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলেন। ১৯৫০ সালের ৬ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কমিটি তাদের প্রতিবেদন তৈরি করে ও সমাধানে কিছু প্রস্তাবনা তৈরি করে। ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১৯৫২ সালে ঢাকার নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনি ২৭জানুয়ারী পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণে পাকিস্তানের মূল সমস্যা সংবিধান নিয়ে কথা বলেন। সেখানে পাকিস্তানের অফিসিয়াল ভাষা ইংরেজি পরিবর্তন করে উর্দু করার কথা

---

২৭৫. ভাষা আন্দোলন - সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন / মোসতফা কামাল / বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. / পৃ. ১৫০

www.pathagar.com

বলেন। তিনি আরো বলেন, 'কোনো জাতি দু'টি রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি। প্রদেশের সরকারি কাজ-কর্মে কোনো ভাষা ব্যবহৃত হবে তা প্রদেশের জনগণই ঠিক করবে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে কেবল উর্দু'। এতে আবারো বামপন্থী ছাত্ররা নতুন করে সংগঠিত হয়। নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার প্রতিবাদে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯জানুয়ারী প্রতিবাদ সভা এবং ৩০জানুয়ারী ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। পরদিন ১৯৫২ সালের ৩১জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মী পরিষদ গঠিত হয়। নতুন কর্মপরিষদ ৪ফেব্রুয়ারী ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সভা এবং ২১ফেব্রুয়ারী প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।[২৭৬]

এবার আন্দোলন চাঙ্গা হয় কারণ এবার মুসলিম ভেঙে গঠিত হওয়া আওয়ামীলীগের একাংশের সাপোর্ট পায় ভাষা আন্দোলন। ভাসানীর সাপোর্টের মূল কারণ হলো নাজিমুদ্দিনের বিরোধীতা। সে সময় মুসলিমলীগের বিরোধীতা করাই ছিল আওয়ামীলীগের অন্যতম কাজ। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ মিছিল করে ভাষা আন্দোলনকারীরা এবং প্রচুর ভায়োলেন্স করে। জ্বালাও পোড়াও শুরু করে। এর অন্যতম কারণ মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

৪ফেব্রুয়ারীর সহিংসতার জন্য ২০ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাকিস্তান সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ২১ফেব্রুয়ারী থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ২০ফেব্রুয়ারী রাতে আওয়ামী মুসলিমলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কর্মী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের কিছু সদস্য নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার পক্ষে থাকলেও, সবশেষে ১১-৩ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু বাম ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ব্যাপারে আলাদা সিদ্ধান্ত নেয় এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্তা পাঠিয়ে দেয়।

সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হয়। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সমাবেশ চালাতে থাকে। পুলিশ অস্ত্র হাতে সভাস্থলের চারদিক

---

২৭৬. ভাষা আন্দোলন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3bn79Fq / অ্যাকসেস ইন ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ঘিরে রাখে। পুলিশের নমনীয় অবস্থান দেখে ছাত্রলীগ তাদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সমাবেশে যোগ দেয়। বিভিন্ন অনুষদের ডীন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগ যোগ দিলে সমাবেশের আকার অনেক বড় হয়ে যায়। তাই এগারটার দিকে ছাত্ররা গেটে জড়ো হয়ে প্রশাসনের প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রাস্তায় নামার প্রস্তুতি নিলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে ছাত্রদের সতর্ক করে দেয়। অনেক ছাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেলেও বাকীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুলিশ দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পুলিশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। উপাচার্য তখন পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ বন্ধ করতে অনুরোধ জানান এবং ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগের নির্দেশ দেন। পুলিশ পিছিয়ে আসে।[২৭৭]

পুলিশ পিছিয়ে গেলে ছাত্ররা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। এ সময় কয়েকজনকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার শুরু করলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এবার পুলিশ অনেক ছাত্রকে গ্রেফতার করে এবং তেজগাঁও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। দুপুরের দিকে আইন পরিষদের সদস্যরা আইনসভায় যোগ দিতে এলে ভাষা আন্দোলনকারীরা তাদের বাধা দেয়। অনেককে হেনস্তা করে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[২৭৮] কিন্তু পরিস্থিতির ভয়ানক পরিবর্তন ঘটে যখন ছাত্ররা দলবল নিয়ে আইনসভার দখল নিতে যায়। আইনসভার ওপর তারা ক্ষ্যাপার কারণ আইনসভার সদস্যরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে পছন্দ করেনি। ছাত্রছাত্রীরা পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছোড়া শুরু করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। এ সময় ছাত্রছাত্রীদের আক্রমণে লুটিয়ে পড়ে সচিবালয়ের পিয়ন[২৭৯] আব্দুস সালাম।

যাকে এখন ভাষা শহীদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সামলাতে ব্যর্থ হয়ে আইনসভার সদস্য নিরাপত্তায় গণপরিষদ ভবনের দিকে অগ্রসররত মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। এতে অনেকে আহত হয় এবং প্রতিবাদকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়।

---

২৭৭. ১৪৪ ধারা ভঙ্গ / জাহীদ রেজা নূর / প্রথম আলো / ২ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

২৭৮. পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি / ৩য় খন্ড / বদরুদ্দীন উমর / সূবর্ণ প্রকাশন / পৃ. ২৩৩

২৭৯. ভাষা আন্দোলন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3bn79Fq / অ্যাকসেস ইন ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

প্রচলিত ইতিহাসে বলা হয় পুলিশের গুলিবর্ষণে রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার এবং আবুল বরকত গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এছাড়া অহিউল্লাহ নামেও একজন বালক পুলিশের গুলিতে নিহত হন।

বর্তমান জগন্নাথ হল ছিল ১৯৫২ সালের সেক্রেটারিয়েট ও আইনসভা [২৮০]। সেখানে হামলা চালিয়েছে ভাষা আন্দোলনকারীরা। সেক্রেটারিয়েটের পিয়ন আব্দুস সালাম নিহত হওয়ার পর পুলিশ নিরাপত্তা রক্ষার্থে কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালায়। যারা সে সময় প্রমিনেন্ট ভাষা আন্দোলনকারী ও সামনের সারিতে ছিল তারা কেউ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে প্রমাণ ইতিহাসে নেই। একাধিক ভাষা আন্দোলনকারীদের বয়ানে এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান শহীদ মিনার এলাকায় শুধুমাত্র সংঘর্ষ হয়।

তাহলে ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলে কেন কথিত ভাষা আন্দোলনকারীরা মৃত্যুবরণ করলো? কারা তাদের হত্যা করলো?

---

২৮০. The All-Pakistan Legal Decisions. 1949. p. 6.

www.pathagar.com

আমরা যদি সে সময় খুন হওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় নিতে চাই তাহলে আপনাদের কাছে আরো স্পষ্ট হবে যে একুশের ভিকটিমরা কেউ পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেনি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলে খুন হন রফিক উদ্দিন। হোস্টেলের ভেতর গিয়ে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এমন অভিযোগ কখনোই পাওয়া যায়নি। অভিযোগ ছিল পুলিশ মিছিলে গুলি চালিয়েছে। অথচ রাস্তায় মিছিলে থাকা কেউ গুলিবিদ্ধ হয়নি। রফিক ১৯৪৯ সালে বায়রা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাশ করেন। পরে স্থানীয় দেবেন্দ্র কলেজে ভর্তি হন কিন্তু পড়ালেখা শেষ করেননি।[২৮১]

ঢাকায় এসে বাবার সাথে প্রেসের ব্যবসায়ে যুক্ত হন। তিনি ছাত্র ছিলেন না। তার ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার রেকর্ডও ছিল না। যদিও নতুনভাবে এই আওয়ামী সরকার আসার পর রফিককে জগন্নাথ কলেজের হিসাব বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। অথচ তার উচ্চ মাধ্যমিক পাশের কোনো খবর নেই।

এরপর আব্দুল জব্বারের লাশের খবর পাওয়া যায়। তিনি ২১ফেব্রুয়ারীর আগের দিন তার ক্যান্সার আক্রান্ত শাশুড়িকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন চিকিৎসা করাতে। তিনি পাকিস্তান সরকারের আনসার বাহিনীতে চাকুরি করতেন। আনসার কমান্ডার আব্দুল জব্বার ঢাকা মেডিকেলে ছিলেন। তাকে সেখানেই কে বা কারা গুলি করে হত্যা করে। তার লাশ ঢাকা মেডিকেলের হোস্টেলে পড়েছিল। সেখান থেকে জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। [২৮২]

ময়মনসিংহ থেকে আসা সরকারি চাকুরে এই আব্দুল জব্বারের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাকেও খুন হতে হলো অজানা কারণে সংঘর্ষের স্থান থেকে দূরে।

আবুল বরকত ছিলেন ২১ফেব্রুয়ারী খুন হওয়া একমাত্র ছাত্র। যিনি ঢাবিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মাস্টার্সের ছাত্র ছিলেন। তিনি আমাদের দেশের মানুষ নন, মুহাজির ছিলেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান ভাগ হলে তার পরিবার ভারত

---

২৮১. আহমদ, রফিক উদ্দিন / বাংলাপিডিয়া

২৮২. জববার, আবদুল / বাংলাপিডিয়া

www.pathagar.com

থেকে ঢাকায় এসে বসবাস শুরু করেন। প্রচলিত ইতিহাস মতে তিনি ভাষা আন্দোলনকারী ছিলেন এবং পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু একাধিক ভাষা সৈনিকদের জবানীতে পাওয়া যায় তিনি ভাষা আন্দোলন বিরোধী ও পুলিশের ইনফর্মার ছিলেন।[২৮৩][২৮৪] এই দাবীর পক্ষে প্রমিনেন্ট মানুষ হলেন দুইজন, ভাষা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা (সভাপতি, কমিউনিস্ট পার্টি) এবং ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। এই আবুল বরকতও ঘটনাস্থলে নয় মেডিকেলের হোস্টেলে খুন হন।

সর্বশেষ ২১ফেব্রুয়ারীতে খুন হন অহিউল্লাহ নামের একজন শিশু। বয়স আট কি নয় বছর। তার বাবা হাবিবুর রহমান পেশায় ছিলেন রাজমিস্ত্রি। ঢাকার নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে গুলিবিদ্ধ হয় নিষ্পাপ এই শিশুটি। ঘাতকের গুলী লাগে অহিউল্লাহর মাথায়। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে অহিউল্লাহ। তার মৃত্যুর কারণও অজানা।

২১ফেব্রুয়ারীর খুনের মাধ্যমে শেষ হয়নি একুশের খুনীদের রক্তের লালসা। মিছিলে পুলিশের বাধার প্রতিবাদে পরেরদিন অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ২২ফেব্রুয়ারীও ভাষা আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। পুলিশ লাঠিচার্য করে সেই মিছিল ছত্রভঙ্গ করে। সেদিনও খুন হন একজন। তিনিও আবুল বরকতের মতো এদেশের মানুষ নন। তিনি দেশভাগের জন্য ভারত থেকে আসা মুহাজির। তার নাম শফিউর রহমান।

শফিউর রহমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কোলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্শিয়াল কলেজ থেকে আই.কম পাস করে তিনি চব্বিশ পরগনা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানি পদে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং ঢাকা হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখায় কেরানির চাকরিতে যোগ দেন।

১৯৫২ সালের ২২ফেব্রুয়ারী শফিউর রহমান তখন সাইকেল যোগে ঐ পথে অফিসে যাচ্ছিলেন। হরতালের মধ্যে অফিসে যাওয়ার অপরাধে তাকে পেছন থেকে গুলি করে। তিনি পিঠে গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাকে

[২৮৩]. ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন / মোস্তফা কামাল/ পৃ.-৮১

[২৮৪]. সাক্ষাৎকারে সরদার ফজলুল করিম/ https://arts.bdnews24.com/archives/2092

www.pathagar.com

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ঐদিন সন্ধ্যা ৭টায় তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮৫] তিনি কখনো ভাষা আন্দোলন করেননি ও আন্দোলনকারীদের সাথে যুক্তও ছিলেন না।

বর্তমান প্রচলিত ইতিহাসে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। অথচ ভাষা আন্দোলনের সময় নিহত হওয়া কেউই মিছিলে ছিল না। কেউই ভাষা আন্দোলন করেননি। আর যারা মিছিলে ছিল তারা কেউই নিহত হওয়া তো দূরের কথা, গুলিবিদ্ধও হননি। যারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের নেতৃত্ব দিয়েছেন, মিছিল করেছেন, মিছিলের সামনে থেকেছেন তারা গ্রেফতার ও লাঠিচার্জের শিকার হলেও গুলির শিকার হননি।

খুন হওয়া মানুষদের পরিচিতি, অবস্থান, খুন হওয়ার স্থান নির্দেশ করে এরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে খুন হয়নি। ঘোলাটে পরিস্থিতির সুযোগে কেউ তাদের খুন করেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ব্রাহ্মনবাড়িয়ার নুরুল আমিন একজন বাঙালি ছিলেন। বাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষ বশত তিনি খুনের নির্দেশ দিবেন এটা অমূলক ধারণা। ২১ফেব্রুয়ারীর মৃতরা কেউ পুলিশের গুলিতে খুন হননি। কমিউনিস্টরা পরিস্থিতি তাদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য কিছু নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে।

ঐ সময় গণপরিষদে অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। পুলিশের গুলির খবর জানতে পেরে আওয়ামীলীগের মওলানা তর্কবাগিশসহ বিরোধী দলীয় বেশ কয়েকজন অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন। যদিও মওলানা তর্কবাগিশ বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়ার বিপক্ষে ছিলেন তারপরও তিনি পুলিশের গুলির প্রতিবাদ করেন।[২৮৬] পরবর্তীতে মুসলিমলীগ সরকার আর ভাষা আন্দোলনকারীদের কোনো সভা সমাবেশ বা কোনো কার্যক্রমের সুযোগ দেয়নি।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে জানানো হয় পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার কারণে ১৯৫২ সালে বাঙালিরা প্রাণ দেয়। এটা সত্য নয় ১৯৫২ সালের ঘটনার সাথে কোনো অবাঙালি জড়িত নেই। যার উক্তি নিয়ে দাঙা-হাঙ্গামা হয় তিনি হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি ঢাকার নেতা, ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য। তারা অন্তত

---

২৮৫. রহমান, শফিউর / বাংলাপিডিয়া

২৮৬. ভাষা আন্দোলন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3bn79Fq / অ্যাকসেস ইন ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

চার পুরুষ ধরে ঢাকার স্থানীয়। একই সাথে তিনি পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সে সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন। তার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনিও বাঙালি। একই সাথে পুলিশ অফিসাররাও ছিলেন বাঙালি। এখানে কেউই অবাঙালি ছিলেন না।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পর মুসলিমলীগের বিরোধীরা বিশেষত আওয়ামী মুসলিমলীগ ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, ১৯৫২ সালের আগে কোনো বাঙালিদের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো নেতা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন না। ঘটনার কিছুদিন পর সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রচারপত্র বিতরণ করে ভাষা আন্দোলনকারীরা। এটা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন শেরে বাংলা। কারণ তিনি স্বাক্ষর দেননি। ভাষা আন্দোলনকারীরা স্বাক্ষর জালিয়াতি করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল।[২৮৭]

১৯৫৪ সালে মুসলিমলীগের বাঙালি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া এক সভায় সিদ্ধান্ত নেন বাংলা ভাষাকে উর্দু ভাষার সমমর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করা হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের ছয়টি ভাষাকে একই মর্যাদা দেওয়ার দাবী ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের আরেক মুসলিমলীগ নেতা আবদুল হক এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান এবং তার এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অনড় থাকেন। তার নেতৃত্বে ২২এপ্রিল করাচিতে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এভাবে সমাবেশ-পাল্টা সমাবেশ চলতে থাকে। সেখানে সহিংস ঘটনায় সিন্ধি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক আল ওয়াহিদ পত্রিকার অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ২৭এপ্রিল বাংলা ও অন্যান্য ভাষাকে সমমর্যাদা দেওয়ার দাবীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এমন জটিল ও সহিংস পরিস্থিতিতে মোহাম্মদ আলী বগুড়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ বন্ধ করেন। ১৯৫৪ সালে গণপরিষদ নির্বাচনে শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট অধিকাংশ আসনে জয়লাভ করে।

যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক ক্ষমতায় এসে বাংলা একাডেমি গঠন করে। এ প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, গবেষণা এবং মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে বলে গঠনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের

---

[২৮৭] আওয়ামীলীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৬১

www.pathagar.com

মধ্যেই পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মাহমুদ ১৯৫৪ সালের ৩০মে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৫৫ সালের ৬জুন তারিখে যুক্তফ্রন্ট পুণর্গঠন করা হয়; যদিও আওয়ামীলীগ সে মন্ত্রীপরিষদে যোগ দেয়নি।

১৯৫৬ সালে প্রথমবারের মতো ২১ফেব্রুয়ারী পালিত হয়। শহীদ মিনার নতুনভাবে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কথিত পুলিশের গুলিতে নিহত ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে পাকিস্তানের গণপরিষদে কার্যক্রম পাঁচ মিনিট বন্ধ রাখা হয়। সারাদেশব্যাপী পালিত হয় শহীদ দিবস এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান ছিল বন্ধ। আরমানীটোলায় এক বিশাল সমাবেশের নেতৃত্ব দেন মওলানা ভাসানী।

১৯৫৬ সালে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর পদত্যাগের পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। তার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখিত হয়।[২৮৮] পাস হওয়া শাসনতন্ত্র নানান ইস্যুতে বিতর্কের জন্ম দেয়। তার প্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগে ভাঙন সৃষ্টি হয়। সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন। তার বছরখানেক পর সেনাবাহিনী শাসন ক্ষমতা দখল করে। সেনাপ্রধান আইয়ুব খাঁন প্রেসিডেন্ট হন এবং সংবিধান স্থগিত করেন।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে বড় ঘটনা ঘটায় এই নিয়ে আর কেউ নতুন করে বিতর্ক করেনি। ১৯৫৯ সালের ৬জানুয়ারী আইয়ুব খাঁন এক সরকারি বিবৃতি জারি করেন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে উল্লেখিত দুই রাষ্ট্র ভাষার ওপর সরকারি অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন। এভাবেই বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থায়ী হয় ও ভাষা আন্দোলন সফল হয়। তবে ভাষা আন্দোলন নিয়ে পাকিস্তানের নেতারা যে আশংকা করেছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি হয় ও রাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হয়। মুসলিম ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদ তৈরি হয়।

---

২৮৮. PARLIAMENTARY HISTORY / National Assembly of Pakistan / https://bit.ly/37voPxh / অ্যাকসেস ইন ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

পুরো ঘটনার জন্য দায়ী কিছু অপরিণামদর্শি বাঙালি বুদ্ধিজীবী। তারা সোশ্যালিজমের প্রতি অনুরক্ত ছিল। ইসলামী সোশ্যালিজম ও ইসলামী কম্যুনিজমের মতো বিভ্রান্ত মতবাদের তারা ধারক ও বাহক ছিল। ইসলামের মধ্যে তারা সংস্কার করতে চেয়েছিল। এই বিভ্রান্ত মুসলিমরাই গঠন করেছিল তমুদ্দুনে মজলিশ।[২৮৯] তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী আদর্শাশ্রয়ী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দেশে ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা সমুন্নত করার প্রত্যয় নিয়ে ভারত বিভাগের অব্যবহিত পরেই ঢাকায় গড়ে ওঠে এই সংগঠনটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১সেপ্টেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নামকরণ হয় পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ। তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠায় অধ্যাপক আবুল কাশেমের অগ্রণী সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক এ.এস.এম নূরুল হক ভূঁইয়া, শাহেদ আলী, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, হাসান ইকবাল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সিনিয়র ছাত্র।

প্রফেসর আবুল কাশেম ছিলেন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৯৪৯ সালে মজলিশের সভাপতি নির্বাচিত হন।

তারা বিভাগপূর্ব বেঙ্গল মুসলিমলীগের বামপন্থী দর্শন বিশেষত আবুল হাশেমের বামপন্থী দর্শনে প্রভাবিত হন। তাদের মধ্যে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী সমাজতন্ত্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং আরও কতক ব্যাপারে তাদের প্রত্যয় ও অবস্থান ছিল গণমুখী। তমদ্দুন মজলিশের গঠনতন্ত্রে বিধৃত এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:[২৯০]

১. কুসংস্কার, গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে 'সুস্থ ও সুন্দর' তমদ্দুন গড়ে তোলা;

২. যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানবসমাজকে এগিয়ে নেওয়া;

---

২৮৯. তমুদ্দুন মজলিশ সম্পর্কে শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রহ. / https://bit.ly/37M4FQ3

২৯০. তমদ্দুনে মজলিশ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3uhjiUM / অ্যাকসেস ইন ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

৩. মানবীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা;

৪. নিখুঁত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা।

পরবর্তীতে আবুল হাশেম খেলাফতে রব্বানী গঠন করলে তমুদ্দুনে মজলিশ খেলাফতে রব্বানীর সাংস্কৃতিক সংগঠনে পরিণত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের নাটকীয়তা

১৯৫৪ সালের আগে আরো কিছু প্রাসঙ্গিক কথা বলা দরকার। তাহলে সে সময়ের পরিস্থিতি কিছুটা উপলব্ধি করা যাবে এবং যুক্তফ্রন্টের প্রেক্ষাপট বুঝা যাবে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার কালে মোটাদাগে বাংলায় রাজনৈতিক দল ছিল দুইটি। এক মুসলিমলীগ, দুই কৃষক প্রজাপার্টি। ১৯৪৫-৪৬ সালের পরিস্থিতিতে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক প্রজাপার্টি অস্তিত্ব হারিয়েছে হিন্দুদের সাথে মিলিত হওয়ার দায়ে। একই সাথে বাংলার মানুষের কাছে ফজলুল হক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর তিনি রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে আইন পেশায় সময় দিতে থাকেন।

এছাড়া জামায়াতে ইসলামী তখন একেবারে ক্ষুদ্র একটি দল। রাজনীতিতে যাদের প্রভাব নেই। এছাড়াও আরেকটি দলের অস্তিত্ব তখন ছিল তারা হলো জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। এটা হলো আলিয়া ও দেওবন্দি আলেমদের একটি বিচ্ছিন্ন দল যারা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ থেকে আলাদা হয়েছে। আলেমদের মধ্যে যারা মুসলিমলীগ ও পাকিস্তানকে সাপোর্ট করেছেন তারা হুসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে আলাদা দল গঠন করেন। এদের নেতা ছিলেন শাব্বির আহমদ উসমানী। এই দলের উৎপত্তিই হয়েছিল মুসলিমলীগকে সাপোর্ট করার জন্য।[২৯১]

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে নবগঠিত পাকিস্তানে মুসলিমলীগ ছাড়া আর কারো প্রভাব ধর্তব্যে ছিল না। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান হওয়ার পরে ঢাকায় মুসলিমলীগের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন মওলানা আকরম খাঁ এবং খাজা নাজিমুদ্দিন। তাদের

---

২৯১. ইতিহাসে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও মাছিহাতা সম্মেলন ১৯৫০ / সৈয়দ আহসান / দৈনিক ইনকিলাব / ১২ জানুয়ারী ২০১৮

www.pathagar.com

প্রভাবে দলের মধ্যে প্রায় কোণঠাসা ছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের অনুসারীরা। তারা মূলত ইসলামী চেতনা ধারণ করতেন না। তারা মুসলিম জাতীয়তাবাদটাকেই বেশি ধারণ করতেন। তারা মোঘলটুলিতে ১৫০ নম্বর বাড়িতে একটি অফিস করেছিলেন। সেখানে তারা একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার কথা চিন্তা করছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে তার অনুগত শেখ মুজিবুর রহমান কোলকাতা থেকে এসে তাদের সাথে যুক্ত হন।[২৯২]

এদিকে ভাসানী এবং তার অনুসারীরা মুসলিমলীগকে সমাজতান্ত্রিক বামধারায় রূপান্তর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইসলামী চেতনাধারীদের তোপের মুখে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না। ভাসানী টাঙ্গাইলের আরেক নেতা শামসুল হককে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বুঝান এবং তাকে সাথে রাখেন। ভাসানী আদর্শিক বিষয় গোপন রেখে বাঙালিদের নিয়ে আলাদা দল গঠনের উদ্যোগ নিতে থাকেন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর সাথে যোগাযোগ করেন। তারা একটি সভা ডাকেন। সেই সভা ডাকার প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ খান।[২৯৩]

১৯৪৯ সালের ২৩জুন ঢাকার টিকাটুলীর কেএম দাস লেন রোডের রোজ গার্ডেন প্যালেসে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিমলীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার সভাপতি ছিলেন টাঙ্গাইলের আবদুল হামিদ খান ভাসানী আর সেক্রেটারি শামসুল হক।[২৯৪] ঘটনাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু'জনেই টাঙ্গাইলের। সহ-সভাপতি হন আতাউর রহমান খান, শাখাওয়াত হোসেন ও আলী আহমদ। শেখ মুজিবুর রহমান, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও এ কে রফিকুল হোসেনকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোষাধ্যক্ষ হন ইয়ার মোহাম্মদ খান। এ সময় শেখ মুজিব কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। অন্যদিকে, পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে

২৯২. আওয়ামীলীগের ৭১ বছর: যেভাবে জন্ম হয়েছিল দলটির / সায়েদুল ইসলাম / বিবিসি বাংলা / ২৩ জুন ২০১৯

২৯৩. আওয়ামীলীগের ৭১ বছর: যেভাবে জন্ম হয়েছিল দলটির / সায়েদুল ইসলাম / বিবিসি বাংলা / ২৩ জুন ২০১৯

২৯৪. আওয়ামীলীগের ৭১ বছর: যেভাবে জন্ম হয়েছিল দলটির / সায়েদুল ইসলাম / বিবিসি বাংলা / ২৩ জুন ২০১৯

www.pathagar.com

সংগঠনটির নাম রাখা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগ। আর এর সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

পুরো পাকিস্তানে এই দলটি আসলে কার্যকর ছিল না। এটা মূলত বাঙালিদের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

ভাসানী এই দলটিকে মুসলিমলীগ বিরোধী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ঘটনা বাঙালিদের মধ্যে মুসলিমলীগ বিরোধী সেন্টিমেন্ট তৈরি করে। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আওয়ামী যুবলীগ সকল বিরোধীদলের ঐক্য গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুরুতেই 'গণতান্ত্রিক দল' ও 'আওয়ামীলীগ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দও মুসলিমলীগ বিরোধী জোটের জন্য কাজ করতে থাকে।

এর সূত্র ধরে ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিমলীগের কাউন্সিল অধিশেন মুসলিমলীগ বিরোধী জোট গঠনের উদ্দেশ্যে সমমনা দলসমূহ নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাসানী শেরে বাংলাকে আবারো রাজনীতিতে আসার জন্য অনুরোধ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারির সঙ্গে সঙ্গে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে তার দলের ভরাডুবি ঘটলে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন নূরুল আমিন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ফজলুল হককে পূর্ববাংলার এটর্নি জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তিনি পুনরায় রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সরকারি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তার ১৯৩০ এর দশকের নিজস্ব দল কৃষক প্রজাপার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। নাম পরিবর্তন করে এর নতুন নামকরণ করেন কৃষক শ্রমিকপার্টি (KSP)।[২৯৫] আওয়ামী মুসলিমলীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন।

---

২৯৫. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১২১

www.pathagar.com

যুক্তফ্রন্টের আরেকটি শরিকদল- নেজামে ইসলাম যাদের পূর্ব নাম 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর মুসলীমলীগ নেতৃবৃন্দের ওয়াদা ভঙ্গের ফলে নবগঠিত পাকিস্তানে 'নেজামে ইসলাম' তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুদূর পরাহত দেখে তারা নিরাশ হয়ে পড়েন। এক প্রকার প্রতারিত হয়েই ১৯৫২ সালে নিখিল ভারত জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের নেতৃবৃন্দ মুসলিমলীগের সঙ্গ ত্যাগ করে 'নেজামে ইসলাম পাটি' নামে পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ১৮, ১৯ ও ২০মার্চ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলায় দলটির কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনেই মওলানা আতহার আলীকে সভাপতি, মওলানা সৈয়দ মুসলেহ উদ্দিনকে সাধারণ সম্পাদক এবং মওলানা আশরাফ আলীকে সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত করে 'নেজামে ইসলাম পার্টি'র কার্যক্রম শুরু হয়।[২৯৬]

যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানে নেজামে ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে এই পার্টির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়। মুসলিমলীগের তুলনায় এই দলের নেতৃত্বে বড় বড় উলামা থাকায় অল্পদিনেই নেজামে ইসলাম পার্টি একটি শক্তিশালী বৃহৎ দলে পরিণত হয়।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বুঝতে পেরে নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিমলীগ, কৃষক-শ্রমিকপার্টি এবং নেজামে ইসলামীর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, গণতন্ত্রী দল ও যুবলীগ; কিন্তু শেরে বাংলা ও নেজামে ইসলামীর নেতৃবৃন্দের বিরোধীতায় এই দলগুলিকে ফ্রন্টভুক্ত করা হয়নি। তবে ভাসানীর চেষ্টায় গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামী মুসলিমলীগের নামে নমিনেশন লাভ করেন। ১৫ জন যুবলীগ সদস্য, ১০ জন গণতন্ত্রী দলের সদস্য এবং ১০ জন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য আওয়ামীলীগের পরিচয়ে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন লাভে সমর্থ হয়।

১৯৫২ সালের ২০ফেব্রুয়ারী মতান্তরে ২০এপ্রিল আবুল হাশিমের নেতৃত্বে

---

২৯৬. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ৯৩

www.pathagar.com

এই পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়।[২৯৭] নির্বাচনে যাওয়ার আগে আরো একটি দল যুক্তফ্রন্টে যোগ দিতে চেয়েছে। তারা হলো খেলাফতে রব্বানী পার্টি। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালের ১৬নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগে পার্টির সভাপতি জনাব আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তারা যুক্তফ্রন্টে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়।

খেলাফতে রব্বানী হলো তমুদ্দুন মজলিশের ফাদার অর্গানাইজেশন। যুক্তফ্রন্টে থাকলেও শেষ পর্যন্ত আসন ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা হয়। তাই তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়, তারা মাত্র ১০টি মুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং বাকি ২২৬টি আসনের জন্য রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের সমর্থন করবেন।

এদিকে বাংলায় মুসলিমলীগের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তার প্রধানমন্ত্রীত্ব চলাকালে ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও কাদিয়ানী দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মোহাম্মদ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার আমলে দারিদ্রের হার বাড়ে বিধায় পশ্চিম পাকিস্তানে সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়, এটিও তার পদচ্যুতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে পদচ্যুত হয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন এবং রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন বলে ঘোষণা দেন। এই কারণেই মূলত মুসলিমলীগ দূর্বল হয়ে পড়ে। ওনার পরে মোহাম্মদ আলী বগুড়া হাল ধরলেও তিনি নাজিমুদ্দিনের মতো প্রভাবশালী নেতা ছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের গ্রহণ যোগ্যতাও ভালো ছিল না। সর্বোপরি আলেমদের একটি বড় অংশ মুসলিমলীগকে ত্যাগ করলে মুসলিমলীগের অবস্থান নষ্ট হয়ে পড়ে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট তাদের নীতি ও ২১ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে।

নীতি : "কুরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ" এমন কোনো আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

---

[২৯৭] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ৯৩

www.pathagar.com

নির্বাচনী ওয়াদা :

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ, পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত উপকূলে কুটিরশিল্প ও বৃহৎশিল্পে লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিমলীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণ কেলেঙ্কারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মুহাজিরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকরী

www.pathagar.com

করিয়া বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয় সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া কম বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ, রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের হিসেব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালা-কানুন রদ ও রহিত করত বিনাবিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য-আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলাভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিমলীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

www.pathagar.com

১৮. ২১ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করত পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।[২৯৮]

১৯৫৪ সালে মার্চের ৮-১২ তারিখ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে একটি বড় অংশ মানুষ ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এর কারণ সম্ভবত মুসলিমলীগের নিষ্ক্রিয়তা।[২৯৯] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩৭% ভোট কাস্ট হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে মোট আসন ছিল ৩০৯ টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭ টি। এর মধ্যে মুসলিমলীগ মাত্র ৯টি আসন, যুক্তফ্রন্ট ২১৫টি আসন, খেলাফতে রব্বানী ১টি আসন ও বাকীগুলো স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জিতে নেয়। পরবর্তীতে স্বতন্ত্রদের একজন মুসলিমলীগে ও আটজন যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়। ফলে মুসলিমলীগের জয়ী আসন হয় ১০টি আর যুক্তফ্রন্টের জয়ী

---

২৯৮. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১২৮-১৩০

২৯৯. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৩২

www.pathagar.com

আসন হয় ২২৩টি।[৩০০]

কয়েক বছর আগেও বিপুল জনপ্রিয় মুসলিমলীগের এই পতনের কারণ যা পাওয়া যায় তা হলো,

১- দল ভেঙে যাওয়া ও বহু প্রভাবশালী নেতার আওয়ামী মুসলিমলীগে যোগদান

২- লবণ, কোরোসিন ও সরিষার তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া।

৩- দীর্ঘ ৭ বছরেও সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হওয়া।

৪- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নূরুল আমিন সরকারের দমন-নীতি।

৫- খাজা নাজিমুদ্দিনের রাজনীতি থেকে সরে যাওয়া ।

৬- লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া।

৭- পূর্ববাংলার জনগণের আর্থিক দুর্দশা।

৮- মুসলিমলীগের গণসংযোগের অভাব।

৯- দুর্নীতি দমনে সরকারি ব্যর্থতা

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জিতে যাওয়া মূলত মুসলিমলীগের অদক্ষতার কারণেই হয়েছে। এর বাইরে আরেকটি কারণ ছিল যুক্তফ্রন্ট নেতাদের প্রচারণা ছিল চোখে পড়ার মতো। সারাদেশে সাংগঠনিক মজবুতি ও নির্বাচন মনিটর করার জন্য ভাসানী কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। একই সাথে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখবেন বলে প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রার্থী হননি। সেই সুবাদে এই দুই নেতা সারা বাংলায় জনসমাবেশ করে বেড়িয়েছেন।

নির্বাচনে সরকারি দলের এমন শোচনীয় পরাজয় ছিল বিরল ঘটনা। পূর্ববাংলার তৎকালীন সরকার নির্বাচনে পরাজয়ের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দেন, কিন্তু নির্বাচনে কারচুপির প্রচেষ্টা করেননি। এই নির্বাচনে একটা বড় অংশ জনগণ ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকলেও বাকী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে

[৩০০] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৩৪

www.pathagar.com

ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছিল এবং তারা উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। এই নির্বাচনে মুসলিমলীগের পরাজয়ের ফলে পাকিস্তান গণপরিষদে তাদের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পায়। ফলে পাকিস্তানের কোয়ালিশন সরকার গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কেন্দ্রের সরকার যুক্তফ্রন্টের সাথে কোয়ালিশন করে। যুক্তফ্রন্ট থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন মুসলিমলীগের বাঙালি নেতা মোহাম্মদ আলী বগুড়া ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি বোর্ডের প্রধান নির্বাচিত হন শেরে বাংলা ফজলুল হক। কারণ সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। সেই জন্য শেরে বাংলা পূর্ববাংলায় সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান এবং তার নেতৃত্বে ৩এপ্রিল চার সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা ছিলেন কৃষক-শ্রমিকপার্টির সৈয়দ আজিজুল হক ও আবু হোসেন সরকার এবং নেজামে ইসলামীর মৌলভী আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন যথাক্রমে কৃষক শ্রমিকপার্টির আবদুল হাকিম এবং আওয়ামীলীগের শাহেদ আলী। ১৫মে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন ফজলুল হক। মন্ত্রী পরিষদ গঠন নিয়ে শেরে বাংলা ও আওয়ামীলীগের সাথে ব্যাপক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেরে বাংলা কিছু কিছু নেতা যেমন শেখ মুজিব, আতাউর রহমান খানকে কোনোভাবেই মন্ত্রীসভায় নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৩০১][৩০২]

অবশেষে শেরে বাংলা আওয়ামীলীগের চাপে মন্ত্রিসভা গঠন করেন নিজের অপছন্দের ব্যক্তিদেরকে নিয়ে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা হলেন, এ কে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন; আবু হোসেন সরকার, অর্থ; আতাউর রহমান খান বেসামরিক সরবরাহ; আবুল মনসুর আহমদ, জনস্বাস্থ্য; কফিল উদ্দিন চৌধুরী, বিচার ও আইন; সৈয়দ আজিজুল হক, শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন; আবদুস সালাম খান, শিল্প ও পূর্ত; শেখ মুজিবুর রহমান, কৃষি, ঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন; আবদুল লতিফ বিশ্বাস, রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার; আশরাফ আলী চৌধুরী, সড়ক ও

---

[৩০১] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৩৮

[৩০২] আওয়ামীলীগ উত্থানপর্ব ১৯৪৮-১৯৭০ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ.৬৭

www.pathagar.com

গৃহ নির্মাণ; হাশিম উদ্দিন আহমদ বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন; রাজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী, স্বাস্থ্য ও কারা; ইউসুফ আলী চৌধুরী, কৃষি, বন ও পাট এবং মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন জমিদারি অধিগ্রহণ।[৩০৩]

মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরুর আগে আদমজী জুট মিলে দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গায় ১ হাজার ৫০০ নিরপরাধ শ্রমিক নিহত হয়। শুরুতেই এমন একটি বিপর্যয় প্রাদেশিক সরকারকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। শপথ নেওয়ার পর শেরে বাংলা কোলকাতায় সফরে যান এবং সেখানে হিন্দু মহাসভার কয়েকটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সে সব বক্তব্যে তিনি হিন্দু মহাসভার পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে এক করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। এরপর ঢাকায় তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাৎকারে তিনি সাংবাদিক কালাহানকে বলেছেন, বাংলাকে স্বাধীন করা তার প্রথম কাজ।' কোলকাতার বক্তব্য ও সাক্ষাৎকারের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয় ঢাকায়। মাত্র কয়েকদিন আগে বিপুল ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান ফজলুল হকের বিরুদ্ধে সারা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ফজলুল হকের পদত্যাগের দাবী জোরালো হতে থাকে। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩১মে দেশদ্রোহের অভিযোগে এ কে ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন।[৩০৪]

শেরে বাংলা ফজলুল হককে গৃহবন্দী করা হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ করার অপরাধে শেখ মুজিব ও আওয়ামীলীগের বহু নেতাকর্মীকে আটক করা হয়। এদিকে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাকিস্তানে। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। আর ভাসানী ইউরোপ সফরে ব্যস্ত ছিলেন। সদ্য নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকার অল্পদিনের মধ্যেই লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্টের এই বেহাল দশা দেখে শেখ মুজিব আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'এই দিন থেকে বাঙালীদের দুঃখের দিন শুরু হলো। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সাথে কোনোদিন একসাথে হয়ে দেশের কাজ করতে নামতে নেই, তাতে দেশ সেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশ বেশি হয়।'

---

৩০৩. যুক্তফ্রন্টে বঙ্গবন্ধু / সিরাজ উদ্দীন আহমেদ / প্রথম আলো / ১৬ মার্চ ২০২০
৩০৪. যুক্তফ্রন্টে বঙ্গবন্ধু / সিরাজ উদ্দীন আহমেদ / প্রথম আলো / ১৬ মার্চ ২০২০

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের ১৮ডিসেম্বর মুক্তি লাভ করেন। প্রায় সাত মাস বন্দী জীবন যাপন করে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হন। এরপর দলের নির্দেশে শেখ মুজিবুর রহমান করাচি গমন করেন। সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

আমি তার (সোহরাওয়ার্দী) সঙ্গে বেয়াদবি করে বসতে পারি। পরের দিন সকাল নয়টায় আমি হোটেল মেট্রোপোলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।...তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না, বেলা তিনটায় এসো, অনেক কথা আছে।" আমি বেলা তিনটায় গিয়ে দেখি, তিনি একলা শুয়ে বিশ্রাম করছেন।...আমি তার কাছে বসলাম। তিনি আলাপ করতে আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ আলাপ করলেন, তার সারাংশ হলো গোলাম মোহাম্মদ জানিয়ে দিয়েছেন যে মন্ত্রিসভায় যোগ না দিলে তিনি মিলিটারিকে শাসনভার দিয়ে দেবেন। আমি বললাম, পূর্ব বাংলায় গিয়ে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রিত্ব দিতে পারতেন। আমার মনে হয়, আপনাকে ট্র্যাপ করেছে। ফল খুব ভালো হবে না, কিছুই করতে পারবেন না। যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন, তা শেষ করতে চলেছেন।[৩০৫]

মওলানা ভাসানী ইউরোপ থেকে ফিরে কোলকাতায় একটি হোটেলে অবস্থান করছিলেন। তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগ নেই। যুক্তফ্রন্ট নিষ্ক্রিয় প্রায়। এদিকে গোলাম মুহাম্মদ কেএসপি নেতা আবু হোসেন সরকারকে কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্যা মওলানা ভাসানীর দেশে ফিরে আসার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সোহরাওয়ার্দীর চেষ্টায় ভাসানী ১৯৫৫ সালের ২৬এপ্রিল কোলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন।'

এদিকে বগুড়ার মুসলিমলীগের মোহাম্মদ আলীর সাথে শেরে বাংলার সমঝোতা হয়ে যায়। বগুড়ার পরামর্শে ফজলুল হক আওয়ামীলীগকে ছাড়াই পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এটা সঠিক কাজ ছিল না, কারণ আওয়ামীলীগ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এতে ক্ষিপ্ত হয় সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানী। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না কারণ তারা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নন।

---

৩০৫. যুক্তফ্রন্টে বঙ্গবন্ধু / সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ / প্রথম আলো / ১৬ মার্চ ২০২০

www.pathagar.com

তাই তারা শেখ মুজিবকে দিয়ে শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তারা ভেবেছিল এতে শেরে বাংলা মূখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। ১৯৫৫ সালের ১৭ফেব্রুয়ারী পার্লামেন্টারি নেতা হিসেবে ফজলুল হকের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে শেখ মুজিব। কিন্তু এতে আওয়ামীলীগের জন্য হিতে বিপরীত হয়। ৩২ জন আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্য পার্টি পরিবর্তন করে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগদান করেন। এই ধারা অব্যাহত থাকে, ফলে ২এপ্রিল (১৯৫৫)এর মধ্যেই আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্য সংখ্যা ১৪০ থেকে ৯৮-এ নেমে আসে। তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩৪ থেকে বেড়ে ৬৯ হয় এবং নেজামে ইসলামীর সদস্য সংখ্যাও বেড়ে ১২ থেকে ১৯ হয়।[৩০৬]

তাছাড়া ১৯৫৫ সালের শুরুর দিকে আওয়ামী মুসলিমলীগ থেকে ভাসানী মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে দলের নাম শুধু আওয়ামীলীগ করে। এই 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেবার কারণে ২০ জন সদস্য আওয়ামীলীগ থেকে বের হয়ে আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিমলীগ নামে দলবদ্ধ হয় এবং তারা কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামীকে সরকার গঠনের ব্যাপারে সমর্থন দেয়। এইভাবে যুক্তফ্রন্ট বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে আওয়ামীলীগ এবং অন্যদিকে কৃষক শ্রমিকপার্টি, নেজামে ইসলামী এবং আওয়ামী মুসলিমলীগ। গণতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট দলের সদস্যবৃন্দ আওয়ামীলীগকে সমর্থন করে, অন্য দিকে খেলাফতে রব্বানী পার্টি ও কিছু হিন্দু-সদস্য ফজলুল হকের জোটকে সমর্থন দেন। এইভাবে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টভুক্ত মুসলমান সদস্যবৃন্দ দুই ধারায় বিভক্ত হয়। ১৯৫৫ সালের ৬জুন আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় গঠিত মন্ত্রিসভা 'যুক্তফ্রন্ট' নাম নিয়েই শপথ নিয়েছিল। অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারই ক্ষমতায় ফিরে এসেছিল, তবে এখানে আওয়ামীলীগের কেউ ছিল না।

আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন ধারাটি ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে গ্রহণ করে, অপরপক্ষে ফজলুল হকের জোট মুসলিম জাতীয়তাবাদের রাজনীতি গ্রহণ করে মুসলিমলীগের নিকট নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে। আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রক্ষার্থে ১৯৫৬ সালে ৫মার্চ ফজলুল হক পূর্ববাংলার গভর্নর পদ লাভে সক্ষম হন। গভর্নর পদে যোগদান করে ফজলুল

---

৩০৬. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৪০

www.pathagar.com

হক ১৯৫৬ সালের ২২মে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু বাজেট পাস করাতে ব্যর্থ হলে মন্ত্রিসভার পতন হবে এই আশঙ্কায় গভর্নর ২৪মে (১৯৫৬) আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা সংবিধান অনুসারে চালানো যাচ্ছে না এই কারণ দেখিয়ে জরুরি ক্ষমতা বলে এখানে কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয়। সাত দিন পর কেন্দ্রের শাসন প্রত্যাহার করে আবু হোসেন সরকারের পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভা পুনর্বহাল করা হয়।

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত খসড়া-সংবিধান সমর্থন করে আবু হোসেনের মন্ত্রীসভা। অপরদিকে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করাকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ দলীয়ভাবে বিরোধিতা করে ভাসানীর নির্দেশে। কিন্তু আওয়ামীলীগের মূল নেতা সোহরাওয়ার্দী ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করেন। আওয়ামীলীগ সংবিধানে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা ও পূর্ববাংলার জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবী করে। কিন্তু গণপরিষদে কৃষক শ্রমিকপার্টি মুসলিমলীগকে সমর্থন করায় কেন্দ্রীয় মুসলিমলীগ সরকার সংবিধান পাস করিয়ে নিতে সমর্থ হন। আওয়ামীলীগ গণপরিষদ থেকে ওয়াকআউট করে এবং সংবিধানে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে। তবে সোহরাওয়ার্দী ব্যক্তিগতভাবে সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।[৩০৭]

স্পিকার শাহেদ আলী হত্যা ও পাকিস্তানে গণতন্ত্রের কবর রচনা

১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে প্রাদেশিক আইনপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কিন্তু আইন পরিষদে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভা আস্থা ভোটের সম্মুখীন হলে সুনিশ্চিত পরাজিত হবে বুঝতে পেরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর শেরে বাংলা ফজলুল হক উক্ত পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এভাবে পুনরায় আবু হোসেন সরকার সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ফজলুল হকের নেতৃত্বে। কিন্তু ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারের পতন ঠেকাতে পারেনি।

---

৩০৭. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৪১-১৪২

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে পাকিস্তান কেন্দ্রে আওয়ামীলীগ সমর্থিত কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দর মির্যা ও আওয়ামীলীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের নেতৃত্বে চলে আসেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত বাংলায় ১৯৫৬ সালের ৩০আগস্ট শেরে বাংলার দল কৃষক শ্রমিকলীগের আবু হোসেন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কৃষক শ্রমিকপার্টির নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটার পর ৬সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়।

এই কোয়ালিশন সরকার গণতন্ত্রী দল, রফিক হোসাইন-এর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিমলীগ অংশ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০৯ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামীলীগ কোয়ালিশন সরকারের প্রতি ২০০ জন সদস্যের সমর্থন ছিল। এই ২০০ জনের মধ্যে আওয়ামীলীগের সদস্য সংখ্যা ছিল ৯৮ জন, গণতন্ত্রী দলের ১২ জন, সংখ্যালঘু ৭২ জন এবং ১৮ জন আওয়ামী মুসলিমলীগের।[৩০৮]

পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলায় আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ৫ দিন পর কেন্দ্রেও আওয়ামীলীগ ও রিপাবলিকান পার্টির (ইস্কান্দর মির্যা) কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন আওয়ামীলীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তখন পাকিস্তান গণপরিষদের ৮০ জন সদস্যের মধ্যে আওয়ামীলীগ সমর্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩ এবং রিপাবলিকান পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০ জন। তাছাড়া গণপরিষদের ১ জন গণতন্ত্রী দলীয় সদস্য ও ৭ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য আওয়ামীলীগ ও রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকারের প্রতি সমর্থন দেন। ফলে গণপরিষদে কোয়ালিশনের পক্ষে সদস্য সংখ্যা হয় ৫১ জন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো তিনি পাকিস্তানের সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

একই সঙ্গে কেন্দ্রে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসীন হওয়ায় আওয়ামীলীগ অল্প সময়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু আওয়ামীলীগের

---

৩০৮. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৪১-১৪২

www.pathagar.com

শাসনামল শান্তিপূর্ণ ছিলো না। কেন্দ্রে ও প্রদেশে আওয়ামীলীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সরকার গৃহীত বিভিন্ন নীতির প্রশ্নে পার্টির অভ্যন্তরে কোন্দল দেখা দেয়। আওয়ামীলীগ গঠিত হওয়ার সময় থেকেই অনেক বামপন্থী নেতা-কর্মী এই পার্টিতে ঢুকে পড়ে। পার্টির এই অংশ ভাসানীর নেতৃত্বে সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতি এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা শুরু করে। মওলানা ভাসানী প্রকাশ্যে সমালোচনা করে বলেন যে, "আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করেছে তা পার্টির মেনিফেস্টো বিরোধী। এভাবে আওয়ামীলীগের অভ্যন্তরে দু'টি ভিন্নমতালম্বী গ্রুপের সৃষ্টি হয়।

এই মতবিরোধ শক্তিশালী হয় ১৯৫৭ সালে আওয়ামীলীগের কাগমারী সম্মেলনে। কাগমারী সম্মেলন ১৯৫৭ সালের ৮ফেব্রুয়ারী থেকে ১০ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ৮ফেব্রুয়ারী ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ হয়। এই সভায় ভাসানী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি বলেন, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের দ্বারা শোষিত হতে থাকলে পূর্ববঙ্গবাসী তাদের সালামুন আলাইকুম জানাতে বাধ্য হবে।

এই কথাটি যখন তিনি বলেন তখন পাকিস্তান কেন্দ্রের সরকারে ছিল আওয়ামীলীগ। আওয়ামীলীগই পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন দল। ভাসানী ক্ষমতাসীন দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তান শোষিত হচ্ছে এটা হচ্ছে ভাসানীর রাজনৈতিক মিথ্যে কথা। সে এর মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি বিশেষত আওয়ামীলীগের লোকদেরকে সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিতে চেয়েছিল।

মূলত কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবী জানান। এই চুক্তিতে চীন নাখোশ হয়েছে। চীনের খুশি বা অখুশিই ভাসানীর খুশি বা অখুশি। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারেও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ভাসানীর মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রস্তাবিত পাকিস্তান সংবিধানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভাসানী তীব্র প্রতিবাদ করেন। সোহরাওয়ার্দী পৃথক নির্বাচনের পক্ষপাতি ছিলেন। ইসলামিক রিপাবলিকের ব্যাপারেও ভাসানীর আপত্তি ছিল। এতে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ হবে বলে তিনি মনে করতেন। ভাসানী তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘেঁষা বৈদেশিক নীতিরও

www.pathagar.com

বিরোধিতা করেন। তিনি চেয়েছিলেন চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে। ভাসানী কাগমারি সম্মেলন করেছে মূলত চীনের চাপে।[৩০৯]

কাগমারি সম্মেলনের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই কথা বলতে থাকেন দলের ডানপন্থী ও উদারপন্থীরা। অনেকটা কোণঠাসা ভাসানী মাসখানেক পরে ১৮মার্চ আওয়ামীলীগ থেকে পদত্যাগ করেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন সোহরাওয়ার্দীর চুক্তি বাতিলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। একই বছর ২৫জুলাই ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠিত হয়। ন্যাপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাসানী প্রকাশ্যে বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং এরপর থেকে সব সময় বাম ধারার রাজনীতির সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এজন্য তাকে তার বিরোধীরা উপহাস করে লাল মওলানা বলতো। ন্যাপ গঠনের পর প্রাদেশিক পরিষদের ২৮ জন সদস্য আওয়ামীলীগ থেকে সরে এসে ন্যাপে যোগ দেন।[৩১০][৩১১]

১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ১১ জন আওয়ামীলীগ দলীয় সদস্য এবং রসরাজ মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু সদস্যবৃন্দ আওয়ামীলীগ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। এমতাবস্থায় সরকার আসন্ন আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন ও তার দল কৃষক শ্রমিকপার্টির আবু হোসেন সরকারকে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ইতোমধ্যে কেন্দ্রে ইস্কান্দর মির্যার সাথে মতবিরোধের জেরে সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন।

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করলেও মন্ত্রীসভা ভাঙেনি। কেন্দ্রে ফিরোজ খান নূনের মন্ত্রিসভা আওয়ামীলীগের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় টিকেছিল। স্বভাবতই পূর্ববাংলায় আওয়ামীলীগ সরকারকে টিকিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রীয়

---

৩০৯. মওলানা ভাসানী ও কাগমারী সম্মেলন / এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া / দৈনিক ইনকিলাব / ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

৩১০. কাগমারীর অর্জন ও মওলানা ভাসানী / সোহরাব হাসান / প্রথম আলো / ২৯ নভেম্বর ২০১৭

৩১১. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৪৪

www.pathagar.com

সরকার পূর্ব বাংলার গভর্নর শেরে বাংলাকে বরখাস্ত করে। নতুন অস্থায়ী গভর্নর পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানের আওয়ামীলীগ সরকারকে পুনর্বহাল করেন। ১৯৫৮ সালের বাজেটের ব্যাপারে বাংলায় চারটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কিন্তু আগস্ট পর্যন্ত বাজেট পাস সম্ভব হয় না। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে আইনপরিষদে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয় এবং অক্টোবরে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইনপরিষদের অবসান ঘটে।

আইন পরিষদের স্পিকার জনাব আবদুল হাকিম ছিলেন কৃষক শ্রমিকপার্টির এবং ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী ছিলেন আওয়ামীলীগ দলীয়। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কখনো কৃষক শ্রমিকপার্টির সরকার আবার কখনো আওয়ামীলীগের সরকার দেশ পরিচালনা করে। ১৯৫৮ সালে আওয়ামীলীগ স্পষ্টত অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্পিকার আবদুল হাকিম নিরপেক্ষ নন। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৮ সালের ২০সেপ্টেম্বর আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্পিকার এক রুলিং দিয়ে তা বাতিল করেন। ফলে পরিষদ ভবনের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। স্পিকার পরিষদকক্ষ ত্যাগ করেন।

তখন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী স্পিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় দেওয়ান মাহবুব আলী স্পিকারের বিরুদ্ধে তার অনাস্থা প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলে ১৭০ জন সদস্য তা সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি ভোটে দিলে তা গৃহীত হয়। কিন্তু বিরোধী দলীয় কৃষক শ্রমিকপার্টির সদস্যবৃন্দ এই পরিবর্তন মানেনি। পরবর্তী ২ দিন চেয়ারম্যান প্যানেলের সদস্য সৈয়দ আজিজুল হকের সভাপতিত্বে স্বল্প সময়ের জন্য অধিবেশন চলে। কিন্তু তার পরদিন ২৩সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী স্পিকারের চেয়ারে বসামাত্র কৃষক শ্রমিকপার্টি ও তার সমর্থক দলের সদস্যবৃন্দ জনাব শাহেদ আলীকে উক্ত চেয়ারে আসন গ্রহণ না করার দাবী করে।[৩১২]

শাহেদ আলী আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে বিভিন্ন বস্তু নিক্ষেপ করতে থাকে। এ বিষয়ে 'আজাদ পত্রিকা রিপোর্ট করে, ঐ সময় একটি বস্তু ডেপুটি স্পিকারের উপর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি মুখে আঘাত পান এবং আহত স্থান হইতে

[৩১২] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৪৪

www.pathagar.com

রক্তপাত হইতে থাকে। নিক্ষিপ্ত বস্তুটি সম্ভবত সদস্যদের ডেস্কের সহিত সংযুক্ত কোনো কাঠের খণ্ড হতে পারে। আহত অবস্থায় শাহেদ আলীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি ২৫সেপ্টেম্বর বেলা ১:২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। এই ঘটনা পূর্ববাংলা জাতীয় পরিষদের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এরপর ৭অক্টোবর (১৯৫৮) পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করা হলে পূর্ববাংলা তথা পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির অবসান ঘটে।[৩১৩]

এই ঘটনা নিয়ে চট্টগ্রামের বাঁশখালীর নেতা ও ভাসানীর সমর্থক ন্যাপ নেতা অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ বলেন,

“২৩সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। এদেশের ইতিহাসের এক চরম কলঙ্কজনক দিন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত কিন্তু জনগণের স্বার্থ বিরোধী এই নেতারা সেদিন দেশের ইতিহাসকে কল্পনাতীতভাবে মসীলিপ্ত করে। বাইরের ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদদের কথা বাদ দিলাম। আমরা ৩০৯ জন পরিষদ সদস্য ছিলাম। তাদের মধ্যে কিছু কলমবাজ লোক তো ছিলেন। বামপন্থীদের মধ্যেও কেউ আজ পর্যন্ত এই দিনের ঘটনাবলীর একটি পূর্ণ বিবরণ লিখেননি। ঐদিনের কার্যবিবরণী, টেপ রেকর্ডার সব কিছু পরবর্তী সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তা কোথায় আছে জানি না। জানলেও তা পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

কাজেই অনেক ক্ষেত্রে আমাকে স্মৃতি নির্ভর হতে হচ্ছে। আর সেদিনকার সেই বিয়োগান্ত নাটকীয় ব্যাপারটির নাটকীয় বর্ণনা আমার অদক্ষ হাতে সম্ভব নয়। তবু চাই যে এর একটা রেকর্ড থাকুক। ভবিষ্যৎ বংশধররা উপলব্ধি করবে তাদের পিতৃপুরুষরা শ্রেণী চেতনার অভাবে কাদের নামে ‘জিন্দাবাদ’ দিয়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করত। আর শ্রেণীগত কারণে, শ্রেণীশোষণের স্বার্থে এই নেতারা কী নির্মম, নির্লজ্জ, পাশবিক বিশ্বাসঘাতকতা করত। জনতা কত মহান। আর এই ‘জননেতা’ নামধারীরা কত নিচ, কত হীন। জনতা কত নি:স্বার্থপর। আর এরা কত স্বার্থান্ধ, কত লোভাতুর, কত নির্লজ্জ।

২৩সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) সম্পূরক (Supplementary) বাজেট পেশের সাথে সাথে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেলো।

---

৩১৩. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৪৫

www.pathagar.com

মোহন মিয়া, নান্না মিয়া, নবী চৌধুরী প্রমুখ আবু হোসেন দলের (কৃষক শ্রমিক পার্টি) নেতারা মাইক স্ট্যান্ড, চেয়ারের হাতল ইত্যাদি যা পেলেন তা ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীর দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন। এ ব্যাপারে ফরিদপুরের মোহন মিয়া (ইউসুফ আলী চৌধুরী) ওস্তাদ ছিলেন। চরের জমি জবর দখলের সময় তিনি তার লাঠিয়াল বাহিনীর সাথে থাকতেন এবং নিজেই দাঙ্গা পরিচালনা করতেন। ওদিকে আওয়ামীলীগের যারা মাসলম্যান, মারামারিতে ওস্তাদ তারা মোহন মিয়াদের ওপর পাল্টা আক্রমণ করল। আই.জি. ইসমাইল সাহেব স্বয়ং পরিষদ কক্ষের ভেতরে। এসেম্বলী মার্শালরাও ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে (যা আশির কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে) তারা পরিস্থিতির মোকাবেলা করে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হন।

শেখ মুজিব আমার পাশে বসা ছিলেন। অপর পক্ষ স্পিকারের ওপর আক্রমণ করার সাথে সাথে সে তার ব্যাগ থেকে শঙ্কর মাছের হাত দেড়েকের একটা লেজ বের করে। শুনেছি শঙ্কর মাছের লেজের আঘাতে নাকি ঘা হয় এবং সে ঘা পঁচতে থাকে। স্পীকারের চারদিকে আবু হোসেনের দল হল্লা করছিল। সেদিকে লাফ দেবার আগে আমি শেখ মুজিবের হাত ধরে ফেললাম এবং বললাম – গভর্ণমেন্ট তোমাদের, এসেম্বলি মার্শালরা এমন কি পুলিশের আই.জি উপস্থিত আছেন। কিন্তু মুজিব ঝাড়া মেরে আমার হাত থেকে মুক্ত হয়ে গেল। মারামারি চলছে। সূর্য পূর্ব দিকে না উঠে পশ্চিম দিকে উঠতে পারে কিন্তু যখন মারামারি চলছে তখন শেখ মুজিব আতাউরের মত চুপচাপ বসে থাকবে তা তো হতে পারে না। তাহলে শেখ মুজিব আর শেখ মুজিব থাকে না।

মারামারি শুরু হলে মহিলা সদস্যরা বিকট কান্নার রোল তুললেন। তাদের পরিষদ কক্ষের পশ্চাদভাগে চলে যেতে বলা হয়। সেদিন প্রেস গ্যালারি খালি ছিল। সাংবাদিকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। আমরা ন্যাপ দলীয়রা দাঙ্গাতে জড়িত নয় একথার প্রমাণ রাখার জন্য পরিষদ কক্ষের পেছন ভাগে লাইন ধরে দাঁড়াই। দাঙ্গা হচ্ছিল সামনের দিকে, স্পীকারের চারদিকে। শান্তিবাহিনীর ভূমিকা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কার বাপের সাধ্য এমন পারস্পরিক বেপরোয়া হিংস্র আক্রমণকে প্রতিরোধ করে। আবু হোসেন দলের একজনের নিক্ষিপ্ত জিনিসের আঘাতে শাহেদ আলীর নাক দিয়ে দরদর রক্ত ঝরতে শুরু করল। ২৫সেপ্টেম্বর বেলা ১-২০মিনিটের সময় ঢাকা

www.pathagar.com

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। পরদিন গিলোটিন করে বাজেট পাশ করার পর অধিবেশন মূলতবী হয়।"[৩১৪]

স্পিকার শাহেদ আলী হত্যায় মুজিবের ভূমিকা আছে এবং শেখ মুজিবই হত্যা করেছে এমন একটি কথা সমাজে বেশ ভালোভাবেই প্রচলিত আছে। যদিও কথাটির সত্যতা কম। উপস্থিত বেশিরভাগ সাক্ষ্যই জানান দেয় কৃষক শ্রমিকপার্টি শাহেদ আলীর ওপর আক্রমণ করেছে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সদস্যরা তা ঠেকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার তখন থেকেই শুরু হয়। কৃষক শ্রমিক পার্টি এই অভিযোগ করে পত্রিকায় বিবৃতি দেয় এবং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যার কাছে আবু হোসেন নিচের টেলিগ্রামটি করে।

Mujibur Rahman and other leaders attacked Speaker with spears, rods and microphone stands stop imported armed goondas by Awami Leaguers rushed inside Assembly from outside attacked Speaker and opposition members encircling Speaker to save his life were molested and beaten stop despite frantic appeal police refused help stop some opposition members wrongfully confined in Awami Minister's house stop others threatened with attack anywhere any time stop. (Justice Asir Commission Report)

আবার শেরে বাংলা ফজলুল হকও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে টেলিগ্রাম করেন। তিনি বলেন,

Mujibur Rahman over Telephone several times threatened me with violence of the worst sort saying I will not be allowed to enter the Assembly. Will be bodily removed adding that no local police will be of help to me. Relation of mine was assaulted last evening. I seek your advice. (Justice Asir Commission Report. 9th April 1959)

১৯৫৪ সালে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালিদের জোট যুক্তফ্রন্ট বাংলার

---

৩১৪. অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ রচনাসমগ্র-১ / আনু মুহাম্মদ / মীরা প্রকাশন / পৃ. ২৫৩-২৫৫

www.pathagar.com

ক্ষমতায় আসে এবং এর ফলশ্রুতিতে কেন্দ্রেও যুক্তফ্রন্টের অবস্থান তৈরি হয়। ধারণা করা হয়েছিল এর মাধ্যমে পাকিস্তানে সুন্দর গণতন্ত্রের চর্চা হবে। কিন্তু শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানীর হটকারিতা, নির্লজ্জ লোভের ফল ভোগ করতে হয়েছে পুরো পাকিস্তানকে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতায় ও তাদের বিষাক্ত আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে পুরো পাকিস্তান। অবসান হয় গণতন্ত্রের। আসে আইয়ুব খাঁনের সেনা শাসন। শুরুতে মানুষ আইয়ুবকে স্বাগত জানালেও কিছুদিন পরেই আইয়ুব তার স্বৈরাচারের বিষদাঁত প্রদর্শন করে।

আইয়ুব খাঁন ও তার মৌলিক গণতন্ত্র

আইয়ুব খাঁনের জন্ম হয়েছিলো বৃটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবোটাবাদে। ১৯২৬ সালে তরুণ আইয়ুব বৃটিশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা গড়ার কারিগর 'রয়েল মিলিটারি কলেজ' এ অধ্যায়ন করার সুযোগ পেয়ে যান যেটি ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারের স্যান্ডহার্স্টে অবস্থিত ছিল। ১৯২৮ সালে বৃটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আইয়ুব দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আইয়ুব কর্নেল ছিলেন, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে আইয়ুব নবগঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে।[৩১৫]

স্বাধীন পাকিস্তানে আইয়ুব প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ পেয়েছিলেন ১৪তম পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক হিসেবে, এরপর খুব দ্রুত ওপরে ওঠেন তিনি; ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন আইয়ুব। ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; আইয়ুব এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইস্কান্দর মির্যার জারি করা সামরিক আইনের পক্ষে ছিলেন। ইস্কান্দর মির্যার মূলত আইয়ুব খানের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতিত্ব নিশ্চিত করেছিলেন।

আইয়ুব দেশের সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর সেনাবাহিনীর প্রধানের

---

৩১৫. ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3kjVQ4F / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

পদে জেনারেল মুহাম্মদ মুসা খানকে নিযুক্ত করেছিলেন। আইয়ুব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার করাসহ প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে মনোযোগ দিয়েছিলেন। আইয়ুব খাঁন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পেশোয়ারে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় একটি বিমান ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর বৈমানিকেরা বিমান চালাতো এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে তারা অনেক সাহায্য করেছিল। ভারতকে রুখতে গিয়ে চীনের সঙ্গেও আইয়ুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন, ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক চরম বৈরিতার দিকে যায় সে বছরে ভারত চীনের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৬৫ সালে আইয়ুব খাঁন সরকার ভারতের সঙ্গে একটি বড় ধরনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেছিল যেটি ঐতিহাসিকভাবে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ১৯৬৫ নামে পরিচিতি পেয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির একজন গোঁড়া সমর্থক আইয়ুব পাকিস্তানেও যুক্তরাষ্ট্রের মত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

আইয়ুব খাঁন জনগণের দাবীর মুখে ক্ষমতা দখল করেন। স্বভাবতই তার ওপর প্রত্যাশার চাপ ছিল। তিনি পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন রাজনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করেছেন। এই কাঠামো প্রস্তুতের মূল কারণ হলো পকিস্তানের রাজনীতিবিদেরা শাসনতন্ত্র তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি গণতন্ত্রের নতুন একটি সংস্করণ প্রস্তুত করালেন। এর নাম দিলেন বেসিক ডেমোক্রেসি বা মৌলিক গণতন্ত্র।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খাঁন একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ জারি করেন। মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল -

(১) ইউনিয়ন পরিষদ (পল্লী এলাকায়) এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি (পৌর এলাকায়),

www.pathagar.com

(২) থানা পরিষদ

(৩) জেলা পরিষদ

(৪) বিভাগীয় পরিষদ

(৫) প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ

একজন চেয়ারম্যান এবং ১৫ জন সদস্য নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। এতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকতেন। পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন মনোনীত সদস্য, যারা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। তবে ১৯৬২ সালের এক সংশোধনী দ্বারা মনোনয়ন প্রথা বিলোপ করা হয়। ফলে পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্ব স্ব ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে সদস্যদের দ্বারা তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতেন। এক দিক দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল পূর্বেকার ইউনিয়ন বোর্ডেরই অনুরূপ, তবে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হতো মৌলিক গণতন্ত্রী। সারা পাকিস্তানে সর্বমোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ছিল ৭, ৩০০।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের থানা পরিষদ গঠিত হতো। বেসরকারি প্রতিনিধি নিজেরা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটির চেয়ারম্যান। সরকারি সদস্যবৃন্দ দেশ গঠনমূলক কাজে থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সংখ্যা নির্ধারণ করতেন সংশ্লিষ্ট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। তবে সরকারি সদস্যদের সর্বমোট সংখ্যা কোনোক্রমেই বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারতো না। থানা পরিষদের প্রধান থাকতেন মহকুমা অফিসার (এসডিও), যিনি পদাধিকার বলে থানা পরিরষদের চেয়ারম্যান হতেন। মহকুমা অফিসারের অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকার বলে থানা পরিষদের সদস্য হিসেবে পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে থানাকে তহশিল বলে অভিহিত করা হতো এবং তহশিলের সভায় সভাপতিত্ব করতেন তহশিলদার। তখন পাকিস্তানে মোট ৬৫৫টি থানা ও তহশিল ছিল।[৩১৬]

---

৩১৬. মৌলিক গণতন্ত্র / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/37GJqip / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

তৃতীয় স্তরে ছিল জেলা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান এবং সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হতো। সদস্যদের সংখ্যা ৪০-এর বেশি হতো না। সকল থানা পরিষদের চেয়ারম্যানই সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য থাকতেন এবং উন্নয়ন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য সরকারি সদস্য মনোনীত হতেন এবং সমান সংখ্যক সদস্য মনোনীত হতেন বেসরকারি সদস্যদের মধ্য থেকে। মনোনীত সদস্যদের অন্তত অর্ধাংশ মনোনীত হতেন ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে এ পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন এবং পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক তার অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন ভাইস-চেয়ারম্যান। পাকিস্তানে ৭৪টি জেলা পরিষদ ছিল। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর ছিল জেলা পরিষদ। এটি ছিল ইংরেজ আমলের জেলা বোর্ডের উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান।

চতুর্থ ও শীর্ষ স্তর ছিল বিভাগীয় পরিষদ। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে এ পরিষদের চেয়ারম্যান থাকতেন। এতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের সদস্য ছিলেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য ছিলেন ৪৫ জন। সরকারি সদস্য ছিলেন বিভাগের অন্তর্গত সকল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সরকারি উন্নয়ন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ। সর্বমোট বিভাগীয় পরিষদের সংখ্যা ছিল ১৬।

মৌলিক গণতন্ত্রের আদেশ বলে যে পাঁচটি পরিষদ সৃষ্টি করা হয় তাদের মধ্যে শুধু দু'টি পরিষদ অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পরিষদ এবং থানা পরিষদ প্রধানত সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতো। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কার্যে নিয়োজিত থাকতো, যেমন ইউনিয়নের কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজ উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশবাহিনীর দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতো এবং সেখানকার সালিশি কোর্টের মাধ্যমে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করতো। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ, জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মান প্রভৃতি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বভারও ন্যস্ত ছিল ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদকে কর ধার্য ও আদায় এবং মূল্য, টোল ও ফি আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

থানা পরিষদ মূলত একটি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানমূলক সংগঠন। থানা পরিষদ তার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় বিধান করতো। থানা পরিষদই চলতি প্রকল্পসমূহ তত্ত্বসাধনসহ ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটির প্রণীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় বিধান করতো। থানা/তহশিল পরিষদ জেলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতো এবং ঐ পরিষদের নিকট দায়ী থাকতো। জেলা পরিষদ মূলত তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করতো : বাধ্যতামুলক দায়িত্ব, ঐচ্ছিক দায়িত্ব এবং সমন্বয়মূলক দায়িত্ব।

বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, সরকারি ফেরি নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। ঐচ্ছিক দায়িত্বগুলোর বিষয় ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক কল্যাণ এবং গণপূর্ত। এছাড়াও জেলা পরিষদের ওপর কৃষি, শিল্প, সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় পুনর্গঠনের প্রসার এবং সমবায় উন্নয়নের মত বিশাল কর্মকান্ডের দায়িত্বও অর্পিত হয়। জেলার মধ্যে স্থানীয় পরিষদসমূহের সকল কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনও ছিল জেলা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।[৩১৭]

১৯৬০ সালের হ্যাঁ/না ভোট

দুই বছর সামরিক শাসনের পর আইয়ুব খাঁন নিজের শাসন ব্যবস্থাকে মৌলিক গণতন্ত্রের আলোকে বেসামরিক শাসন বানিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি পুরো পাকিস্তান থেকে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী বা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নির্বাচন করেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। নিজের ওপর মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন আইয়ুব খাঁন। ১৯৬০ সালের ১৪ফেব্রুয়ারী তিনি হ্যাঁ/না ভোটের আয়োজন করেন। শতকরা ৯৫% মৌলিক গণতন্ত্রী হ্যাঁ ভোট দিয়েছে বলে জানা যায়। এভাবে আইয়ুব খাঁন পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য বেসামরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। যদিও অনেক রাজনীতিবিদ এই

---

৩১৭. মৌলিক গণতন্ত্র / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/37GJqip / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ও হ্যাঁ/না ভোটের বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন। সর্বপ্রথম আপত্তি তুলেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা মওদূদী।

নিজেকে বেসামরিক ও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে উপস্থাপন করে ১৯৬২ সালে আইয়ুব খাঁন নতুন সংবিধান তৈরি করেন। এতে সংসদীয় প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাই চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হয়। মওলানা মওদূদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ এর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। বাকীরা কেউ মৃদু প্রতিবাদ কেউ আইয়ুবকে সমর্থন দেন। মুসলিমলীগের একটি বড় অংশের নেতাদের নিয়ে আইয়ুব তার রাজনৈতিক দল ঘোষণা করেন কনভেনশন মুসলিমলীগ। আর অন্যদিকে বাকীরা নাম ধারণ করে কাউন্সিল মুসলিমলীগ। কাউন্সিল মুসলিমলীগ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৬২ সাল থেকে জামায়াত স্বৈরশাসনের বৈধতা দানকারী আইয়ুবের সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে এবং জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য আন্দোলন শুরু করে। প্রতিটি প্রদেশে মিছিল মিটিং ও সমাবেশ করতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় মামলা হামলা ও নির্যাতন চলতে থাকে সংগঠনটির বিরুদ্ধে। সবশেষ ১৯৬৪ সালে ৬জানুয়ারী আইয়ুব খাঁন জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেন। একইদিন মওলানা মওদূদীসহ শীর্ষ ৬০ জন জামায়াত নেতাকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে অনেক বাঙালি নেতাও ছিলেন, যেমন : অধ্যাপক গোলাম আযম, মাস্টার শফিকুল্লাহ, মাস্টার আব্দুল ওয়াহিদ, আব্দুর রহমান ফকির, শামসুল হক ইত্যাদি।[৩১৮]

এদিকে ১৯৬২ সালের ২৪জানুয়ারী তৎকালীন আওয়ামীলীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে তার রাজনৈতিক দলের কয়েকজন নেতা আতাউর রহমানের বাসভবনে আইয়ুব বিরোধী এক বৈঠকে মিলিত হন। ৩০জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দী করাচি গেলে তাকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকায় আওয়ামীলীগ প্রতিবাদ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা

---

৩১৮. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ১৮

www.pathagar.com

করে। পুলিশ বাস, থানা পুড়িয়ে দেয়। ৭-৯ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ঢাকায় ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন চলতে থাকে এবং এ সময়ের মধ্যে প্রায় ২২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ববাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। মার্চ মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খুললে আবার আন্দোলন শুরু হয়। ১৫মার্চ থেকে অব্যাহতভাবে ধর্মঘট চলতে থাকে। এ সময় ডাকসুর সহ-সভাপতি রফিকুল হক ও ছাত্র ইউনিয়ন নেতা হায়দার আকবর খান প্রমুখ নেতাসহ বহু ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।[৩১৯]

আইয়ুব খাঁন হলেন ১ম পাকিস্তানি নেতা যিনি ভারতকে রুখতে গিয়ে চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করেন। যার ধারাবাহিকতা আজো বিদ্যমান। সেজন্য মওলানা ভাসানী আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা থেকে বিরত থাকেন।

১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও ভাসানীর বিশ্বাসঘাতকতা

১৯৬৪ সাল। পাকিস্তানের ১ম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আইয়ুব খাঁনের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে সব রাজনৈতিক দল একাট্টা। রাজনীতি থেকে অভিমান করে বিদায় নেওয়া বাংলার অন্যতম প্রধান নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে হাজির হয়েছে সামসময়িক অনেক নেতা। এর মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামীলীগ সভাপতি আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ, সেক্রেটারি শেখ মুজিবসহ রয়েছেন অনেকে।[৩২০]

তাদের দাবী পাকিস্তানকে রক্ষায় নাজিমুদ্দিন যেন আবার রাজনীতিতে ফিরে আসেন। আইয়ুবের বিরুদ্ধে যেন প্রেসিডেন্ট ইলেকশন করেন। বৃদ্ধ নাজিমুদ্দিন রাজি হননি। তবে তিনি আইয়ুব বিরোধী জোট গঠনে মধ্যস্থতা করতে রাজি হন। তিনি তার বাসায় কাউন্সিল মুসলিমলীগ, আওয়ামীলীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এই দলগুলোর নেতাদের ডাকেন।

সব দল মিলে কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিজ নামে একটি জোট করেন।[৩২১] জোটের নেতা হিসেবে থাকেন নাজিমুদ্দিন। ন্যাপের ভাসানী ওপরে আইয়ুব বিরোধী

---

৩১৯. ইতিহাস ৩ (বাংলাদেশের অভ্যুদয়) / বিএ-বিএসএস প্রোগ্রাম / বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৩২০. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ১৯

৩২১. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১২৭

www.pathagar.com

হলেও তিনি আসলে আইয়ুবের সমর্থক। কারণ আইয়ুব চীনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করেছে যা আর কেউ করেনি। কম্বাইন্ড অপজিশনের সিদ্ধান্তগুলো আইয়ুবের কাছে মশিউর রহমান জাদু মিয়ার মাধ্যমে ফাঁস করে দেওয়া ছিল মওলানা ভাসানীর অন্যতম কাজ।[৩২২]

নাজিমুদ্দিন একটি গোপন পরিকল্পনা করেন। যেহেতু আইয়ুব সেনা অফিসার হিসেবে বেতন নেয় তাই প্রার্থীতা ঘোষণা করার পর তার প্রার্থীতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হবে। এতে তার প্রার্থীতা বাতিল হবে। এই তথ্য পৌঁছে যায় আইয়ুবের কাছে। ব্যস! আইয়ুব আগেই বেতন নেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং পেছনের তারিখ দিয়ে বেতন বন্ধের কার্যকারিতা অনুমোদন করে নিজেকে বাধামুক্ত করেন।[৩২৩]

এরপর আসলো বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের পালা। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন আজম খান। কিন্তু আইয়ুবের এজেন্সির পরামর্শক্রমে ভাসানী শর্ত দেন এমন ব্যক্তি আমাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাবে না, যে সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট। মওলানা ভাসানী এই শর্তে অটল থাকেন। পরে তিনি আইয়ুবের পরামর্শক্রমে নাম প্রস্তাব করলেন ফাতিমা জিন্নাহ। এর কারণ ছিল ফাতিমা জিন্নাহর নাম শুনলে কেউ প্রস্তাব ফেলতে পারবে না তার ব্যক্তিত্বের কারণে। তবে তিনি রাজনৈতিক নেতা নন। ক্যারিশমাটিক নেতাও নন। আবার সম্মানের কারণে তার প্রতি রাজি হলেও আদর্শিক কারণে জামায়াত ও নেজামে ইসলাম রাজি হতে চাইবে না।[৩২৪]

ভাসানীর প্রস্তাবে তার দল ন্যাপ, মুসলিমলীগ, আওয়ামীলীগ রাজি হলো। নেজামে ইসলামও এক পর্যায়ে রাজি হলো। জামায়াত রাজি হয়নি।[৩২৫] তারা আলোচনা মুলতবি রাখার জন্য অনুরোধ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সময় চেয়ে নেন। সে সময় মওলানা মওদূদী কারাগারে ছিলেন বলে তার মতামত নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন।

---

৩২২. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১২৮-১২৯

৩২৩. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১২৮-১২৯

৩২৪. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১২৮-১২৯

৩২৫. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১২৯

www.pathagar.com

জামায়াত নেতারা পাকিস্তানের তৎকালীন বিখ্যাত আলেম মাআরেফুল কুরআনের লেখক মুফতি শফির কাছে এই বিষয়ে জানতে চান। তিনি সংকটকালীন মুহূর্ত উত্তরণের জন্য কিছু সময় এই নেতৃত্ব মেনে নেওয়া জায়েজ বলে ফতোয়া দেন। উল্লেখ্য, ফাতিমা জিন্নাহ শর্তারোপ করেন, যদি তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তবে এক বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করবেন না। এক বছরের মধ্যেই সকলের ভোটাধিকার ফেরত এনে তিনি নতুন নির্বাচন দিবেন। তাই মুফতি শফি এই ফতোয়া দেন।

তারপর জামায়াত নেতারা যান জেলখানায় মওলানা মওদূদীর কাছে। মওলানা মওদূদী উত্তর দেন, জামায়াত ছাড়া যদি সবাই ঐক্যমত পোষণ করে তবে আমরাও ফাতিমা জিন্নাহর প্রতি সমর্থন দিতে পারি। কারণ, আইয়ুবের পুরুষ হওয়া ছাড়া কোনো গুণ নেই অন্যদিকে ফাতিমা জিন্নাহর মহিলা হওয়া ছাড়া কোনো দোষ নেই। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ফাতিমা জিন্নাহ ছাড়া আইয়ুবের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো অন্য কোনো সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিকল্প ইসলামপন্থীদের কাছে ছিল না।[৩২৬]

রাজনীতিবিদদের একটি সংকট তৈরি করেছে আইয়ুব ক্ষমতায় এসেই। ১৯৫৯ সালের ৭আগস্ট প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দু'টি অধ্যাদেশ জারি করেন। একটি হলো PODO, অন্যটি EBDO. পোডো মানে হলো পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার। আর এবডো মানে হলো ইলেক্টিব বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার। পোডো আইন প্রয়োগ করে অনেক রাজনীতিবিদের প্রতি অভিযোগ আনে আইয়ুব। সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি করা হয় রাজনীতিবিদদের।

বিগত আমলে ঘটে যাওয়া কিছু দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে ফেলা আগে ক্ষমতায় থাকা অনেক রাজনীতিবিদদেরকে। একতরফা সামরিক বিচারে হেনস্তা করা হয়। যারা পোডো আইনে অভিযুক্ত হবে তারা এবডো আইনে ১৯৬৬ সালে ৩১ডিসেম্বর পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে ও সরকারি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এভাবে পুর্ব পাকিস্তানের ৪২ জন বাঙালি নেতা রাজনীতিতে অযোগ্য হয়ে পড়েন।[৩২৭]

---

৩২৬. জীবনে যা দেখলাম (৩য় খণ্ড) / অধ্যাপক গোলাম আযম / কামিয়াব প্রকাশন / পৃ. ৪০-৪২

৩২৭. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১০২

www.pathagar.com

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য পোডো এবং এবডোর মুখোমুখি হতে চাননি ক্ষমতার শীর্ষে থাকা তিন বাঙ্গালি নেতা। তারা হলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ফরিদপুরের মুসলিমলীগ নেতা মৌলভি তমিজুদ্দিন। মৌলভি তমিজুদ্দিন দীর্ঘদিন পাকিস্তান গণপরিষদের স্পিকার ছিলেন। তারা আত্মসমর্পন করে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক আর রাজনীতিতে ফিরতে পারেননি। সোহরাওয়ার্দী রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরও আইয়ুব বিরোধী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

এই অপরাধে তার বিরুদ্ধে পোডো প্রয়োগ হয়। সরকার দুর্নীতি প্রমাণ করে এবং এরপর এবডো প্রয়োগ হয়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ম্যাসিভ দুর্নীতি প্রমাণ হয় এবং দুর্নীতির কারণে তিনি গ্রেফতার হন। এভাবে আইয়ুব সারা পাকিস্তান রাজনীতি শূন্য করে ফেলেন। এক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা থাকে না। তবে পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা অন্যান্য প্রদেশের চাইতে অধিক ক্ষমতায় ছিলেন বলে তারাই বেশি আক্রান্ত হয়েছেন।

আইয়ুব কোনোভাবেই জামায়াতকে আটকাতে পারেনি। রাজনীতি শূন্য অবস্থায় যখন মুসলিমলীগ, কৃষক শ্রমিকপার্টি ও আওয়ামীলীগ চুপসে গেছে। তখন আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে কণ্ঠ উচ্চকিত রেখেছেন মওলানা মওদূদী। তাকে কোনো আইনের মাধ্যমে ধরতে না পেরে জামায়াতের বিরুদ্ধে আইয়ুব রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনে। তার দাবী জামায়াত পাকিস্তানে বিশ্বাসী না। তাই জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে।

উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে বাকী থাকে ভাসানী ও খাজা নাজিমুদ্দিন। খাজা নাজিমুদ্দিন অনেক আগেই রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন বলে আইয়ুবের আক্রমণের শিকার হননি। আর তাছাড়া তিনি বৃদ্ধও হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে ভাসানী আর আইয়ুবের সম্পর্ক তো ছিল অন্যমাত্রায়। সেখানে ভাসানী তার আক্রমণের শিকার হওয়ার কথা না। ১৯৬৩ সালে তারা নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নেন।[৩২৮]

তাই অন্য কোনো ভালো বিকল্প না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে ফাতিমা জিন্নাহ কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিজের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। আইয়ুবের

---

৩২৮. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১১৯

www.pathagar.com

চিন্তা তাকে ভালো ফল এনে দিলো। আইয়ুব তার পক্ষের আলেমদের দিয়ে প্রচার করতে লাগলেন ইসলামী দলগুলো ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছে। তারা নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে।[৩২৯] পাকিস্তানের ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীই কেবল ভোটার। তাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়েছিল।

১৯৬৫ সালের ২জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব নির্বাচনে জিতে যান। অবশ্য নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে এমন অভিযোগ করতে পারেনি বিরোধী দলগুলো। ইত্তেফাক পত্রিকা রিপোর্ট করেছিল দশ কোটি মানুষের পরাজয়।

আইয়ুব খাঁন পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩.১২ শতাংশ ভোট পেয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৭৩.৫৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অর্থাৎ বাঙালি সব দলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিও বাঙালি মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। ফাতিমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ৪৬.৬০ শতাংশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬.০৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তিনটি বিভাগে ফাতিমা আইয়ুবের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন। সেগুলো হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং করাচি।[৩৩০]

ফাতিমা হেরে যাওয়ার কারণ দু'টি। এক. ইসলামপন্থীরা ফাতিমা জিন্নাহর প্রতি একমত হতে পারেনি। দুই. ন্যাপের মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ইসলামপন্থীরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রের শুরুতে জামায়াতের নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সময় ২২ দফা মূলনীতি তৈরি করেছিল। সেখানে নারী নেতৃত্ব নিষিদ্ধ করার কথা বলেছিল। সেই জামায়াত ও নেজামে ইসলাম যখন ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে সমর্থন দেয় তখন মৌলিক গণতন্ত্রীদের কাছে ইসলামপন্থীদের উদ্দেশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়। আর ন্যাপ ও আওয়ামীলীগের চীনপন্থীরা তাদের মূল নেতা মাও সে তুং এবং এ দেশীয় নেতা ভাসানীর ইশারায় আইয়ুবকেই ভোট দিয়েছে। কম্বাইন্ড অপজিশনে একটি শক্তিশালী দল ছিল ন্যাপ। আর তারাই ছিল বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায়। ভাসানীর সহায়তায় ও ইসলামপন্থীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে পাকিস্তানে আরো বেশি জেঁকে বসেছে স্বৈরাচারী সেনা শাসন।

---

৩২৯. কুদরতুল্লাহ শেহাবের ডায়েরি / মোস্তফা দৌলত / সৌখিন প্রকাশনী / পৃ.৩১-৩২

৩৩০. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৩০

www.pathagar.com

যেমন ছিল ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পাক-ভারত যুদ্ধ ছিল দু'টি দেশের মধ্যে এক বছরে সংঘটিত তিনটি বিবাদমান ঘটনার ধারাবাহিক পরিণতি। এগুলো হলো: এপ্রিল মাসে কুচের রান অঞ্চলে সীমিত আকারের পরীক্ষামূলক যুদ্ধ, আগস্ট মাসে ছদ্মবেশে পাকিস্তানিদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ এবং পরিশেষে সেপ্টেম্বর মাসে পরস্পরের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমণ। তাছাড়া ১৯৪৮ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ, পরবর্তীকালে কাশ্মীরের একাংশে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতে অন্তর্ভুক্তি, জাতিসংঘের ভেতরে ও বাইরে প্রতিপক্ষের কূটনৈতিক আলোচনা ইত্যাদি ঘটনাবলি পাকিস্তানকে তার পছন্দ অনুযায়ী কাশ্মীর সমস্যার একটি সমাধান অর্থাৎ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা ব্যাহত হয়।

কুচের রান অঞ্চলের ঘটনা

কুচের রান অঞ্চল হচ্ছে ভারতের গুজরাট রাজ্য এবং পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ৩২০ মাইল দীর্ঘ এবং ৫০ মাইল প্রশস্ত এক মরুময় অঞ্চল এবং জলাভূমি। দেশ বিভাগের সময় এবং রান অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে বাউন্ডারি কমিশনের ব্যর্থতার কারণে প্রায় ৩৫০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে দু'টি নতুন দেশের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৬৫ সালের ৯এপ্রিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই এলাকায় প্রবেশ করে এবং দাবী করে যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাঞ্জার কোটের নিকট একটি পাকিস্তানি চৌকিতে আক্রমণ করেছে। এই যুদ্ধ অতি দ্রুত তীব্রতর হয় এবং পাকিস্তান আমেরিকা থেকে সংগৃহীত নতুন প্যাটন ট্যাংক এই যুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করে। পরিশেষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের মধ্যস্থতায় ১৯৬৫ সালের ১জুলাই থেকে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়।

কাশ্মীরে জিব্রাল্টার অভিযান

আইয়ুব খাঁন তার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক গণঅসন্তোষকে ধীরে ধীরে এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন যে, 'বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম ও ঐক্য সৃষ্টি করে'। আইয়ুব খাঁনের উপদেষ্টামন্ডলি তাকে ঘিরে একটি ছোট বলয় গড়ে তোলে। এই গোষ্ঠী আজাদ কাশ্মীর গেরিলা

www.pathagar.com

দ্বারা গুপ্তভাবে এবং নিয়মিত সৈন্য দ্বারা প্রকাশ্যে কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা করে। 'জিব্রাল্টার অভিযান' নামে খ্যাত এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র কাশ্মীর অঞ্চলে ভারতের সঙ্গে স্থানীয় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। কিন্তু পরবর্তীকালে তা ভিন্ন রূপ নেয় এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে একটি বড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে পাকিস্তান ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এক গোপন অভিযান শুরু করে। এর সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন জিব্রাল্টার'। এর লক্ষ্য ছিল ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বাড়ানো। পাকিস্তান এজন্য 'সাদা-ই-কাশ্মীর' নামে একটি রেডিও স্টেশনও চালু করে। পাকিস্তানের নেতৃত্ব প্রত্যাশা করেছিল এর মাধ্যমে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠবে; কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের কিছুই ঘটেনি। বরং অনুপ্রবেশকারীদের অধিকাংশই আটক হয়েছিল বা ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিল। আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ 'অপারেশন জিব্রাল্টার' ফিকে হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিল। আর তথাকথিত মুজাহিদদের সামান্য যে কয়জন টিকেছিল, তারা জীবন বাঁচাতে পাকিস্তানে ফিরে গিয়েছিল।[৩৩১]

অপারেশন জিব্রাল্টার ব্যর্থ হলেও আইয়ুব খাঁন তার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি। ওই পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় সেপ্টেম্বরের প্রথম দিন ১৯৬৫ সাল পাকিস্তান শুরু করে 'অপারেশন গ্র্যান্ড স্লাম'। এর আওতায় পাকিস্তানি নিয়মিত সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি রেখা বা সিএফএল (সিজফায়ার লাইন) অতিক্রম করে এবং জম্মুর দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তী কয়েক দিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুব দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে এবং জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলার হুমকি তৈরি করে। ওই দিন থেকেই যুদ্ধে যোগ দেয় দুই দেশের বিমানবাহিনীও। প্রথম মুখোমুখি হওয়ার সময়ই পাকিস্তান এয়ারফোর্সের (পিএএফ) ফাইটারগুলো ভারতীয় বিমানবাহিনীর (আইএএফ) দু'টি ভ্যাম্পেয়ার ফাইটারকে ভূপাতিত করে ফেলে।

---

৩৩১. পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3khNY3P / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর যুদ্ধ

১৯৬৫ সালের ১সেপ্টেম্বর রাতে সমগ্র চম্ব অঞ্চলের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ব্যাপকহারে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। পাকিস্তান পরিচালিত এই অভিযানে ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ হতভম্ব হয়ে পড়ে। প্রচুর সৈন্য ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত ট্যাঙ্কবহর ব্যবহার করে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হয় এবং হতচকিত ও অপ্রস্তুত ভারতীয় সৈন্যরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ভারতীয় সরকার ভারতীয় বিমানবাহিনীকে নিযুক্ত করে। পরবর্তী দিন থেকে পাকিস্তান বিমানবাহিনী কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে ভারতীয় বিমানঘাঁটিগুলোর ওপর আক্রমণ চালায়।

নাজেহাল ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করতে আন্তর্জাতিক সীমানা রেখা অতিক্রম করে দু'টি আক্রমণ পরিচালনা করে। প্রথমটি ছিল ৬সেপ্টেম্বর লাহোর অভিমুখে। অন্যটি ছিল পরদিন শিয়ালকোট শহর অভিমুখে। পাকিস্তান এই শিয়ালকোট শহরকেই কাশ্মীরের চাম্ব সেক্টরে সেনাবাহিনী পাঠানোর জন্য ব্যবহার করে আসছিল। ভারতীয় বাহিনী লাহোর আক্রমণে কিছু প্রাথমিক সাফল্য লাভ করে। তারা একেবারে লাহোর বিমান বন্দরের সন্নিকটে পৌঁছে যায়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লাহোরের আশে পাশে খালের ওপর নির্মিত প্রায় ৭০টি সেতু বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়ে সেখানে পরিখার সৃষ্টি করে ভারতীয় বাহিনীকে আটকে ফেলে।[৩৩২]

এদিকে পাঞ্জাব অঞ্চলে পাকিস্তান ভারত অধিকৃত খেমখারান নামক একটি শহরে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। খেমখারান পাকিস্তানের দখলে চলে আসে। অন্যদিকে শিয়ালকোট রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের ৪০০ থেকে ৬০০টি ট্যাংক বহর নিয়ে সর্ববৃহৎ ট্যাংক যুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে পাকিস্তান সাফল্যলাভ করে। ভারতীয় সেনাবাহিনী শিয়ালকোট অভিমুখে অভিযান বন্ধ করে পিছু হাটতে থাকে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের (ইবিআর) প্রথম ব্যাটালিয়নকে মোতায়েন করা হয় লাহোর শহর ও বামবাওয়ালি-রাভি-বেদাইন

---

৩৩২. পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫ / বাংলাপিডিয়া/ https://bit.ly/3khNY3P / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

ক্যানেল (বিআরবি ক্যানেল) প্রতিরক্ষার জন্য। ভারতীয় বাহিনীর দফায় দফায় হামলা সত্ত্বেও এই রেজিমেন্ট তাদের প্রতিরক্ষা দেয়াল টিকিয়ে রেখেছিল। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তারা কেবল সুরক্ষাই দেয়নি, পাল্টা জবাব দিয়ে হামলাকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতেও সক্ষম হয়েছিল। এই রেজিমেন্টের ধ্বংস করা একটি ভারতীয় ট্যাঙ্ক এখনও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে প্রদর্শনীর জন্য রয়েছে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে আকাশ পথের লড়াইয়ে পাকিস্তান এয়ারফোর্স (পিএএফ) পাইলট ও বিমানের গুণগত মানের দিক থেকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর (আইএএফ) তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল। যদিও ভারতের বিমানবাহিনী সংখ্যাগত দিক থেকে বৃহত্তর ছিল, শেষ পর্যন্ত গুণগতভাবে এগিয়ে থাকার সুবিধা পেয়েছিল পাকিস্তান। ওই সময় ভারত পূর্ব পাকিস্তানে কোনো স্থল হামলা চালায়নি। তবে ৬সেপ্টেম্বর ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড কুর্মিটোলা ও লালমনিরহাটের অব্যবহৃত বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রামের বেসামরিক বিমানবন্দরে দফায় দফায় হামলা চালায়। তেজগাঁওয়ের সামরিক বিমান ঘাঁটিটি যদিও হামলার বাইরেই রয়ে যায়। এ ধরনের নিষ্ফল হামলা ছিল ভারতীয় বিমানবাহিনীর গোয়েন্দা ও সামরিক অপারেশনের গুরুতর ব্যর্থতা।

এর পাল্টা জবাব হিসেবে তেজগাঁও ঘাটি থেকে পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনীর কালাইকুন্ডা ঘাঁটিতে হামলা চালায় এবং সেখানে মজুদ থাকা বেশ কিছু ক্যানবেরা বোমারু বিমান ধ্বংস করে। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বাঙালি পাইলটরা এ সময় ব্যতিক্রমী পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও অসম সাহস দেখাতে সক্ষম হয়। মেজর জিয়াউর রহমান পাকিস্তানের ২য় সর্বোচ্চ খেতাব হিলাল-ই-জুরাত লাভ করেন, উইং কমান্ডার তোয়াব, স্কোয়াড্রন লিডার আলাউদ্দিন (মরণোত্তর), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সাইফুল আজম ও ফ্লাইং অফিসার হাসান সিরাত-ই-জুরাত খেতাব লাভ করেন।

লিডিং এয়ারক্রাফটসম্যান আনোয়ার হোসাইন পান তমঘা-ই-জুরাত (মরণোত্তর)। স্কোয়াড্রন লিডার এম কে বাশার, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় সেক্টর কমান্ডার হয়েছিলেন এবং পরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন, তিনি লাভ করেন 'তমঘা-ই-বাসালাত'। এই উচ্চ সামরিক খেতাব তাকে ভারতের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংখ্যক বোমারু বিমান পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব রেজিমেন্টের মধ্যে

www.pathagar.com

সাহসিকতার জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খেতাব ও পদক পেয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তারা ভারতীয় বাহিনী থেকে লাহোরকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। এই রেজিমেন্ট পেয়েছিল তিনটি 'সিতারা-ই-জুরাত (বাংলাদেশের বীরবিক্রম সমতুল্য), আটটি 'তমঘা-ই-জুরাত' (বাংলাদেশের বীরপ্রতীক সমতুল্য) এবং আরও বেশ কিছু পদক ও প্রশংসাপত্র। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আবির্ভূত হয়েছিল লাহোর শহরের রক্ষাকর্তা হিসেবে।

যুদ্ধে ১০সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারত এগিয়ে থাকলেও এরপর তারা আক্রান্ত হতে থাকে। ওদের সর্বোচ্চ সাফল্যের বিষয় ছিল লাহোর আক্রমণ। কিন্তু লাহোরে বিশাল ভারতীয় বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে। এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করে ভারত। অন্যদিকে পাকিস্তানও সুবিধে করতে পারছিল না। কারণ আইয়ুব খাঁন চেয়েছিল যুদ্ধ শুধু কাশ্মীর ফ্রন্টে রাখতে। কিন্তু যুদ্ধ কাশ্মীর, শিয়ালকোট, পাঞ্জাব ও লাহোর ইত্যাদি নানা ফ্রন্টে চালু হওয়ায় বিপাকে পড়ে পাকিস্তান। আর্থিক ক্ষতি ও রশদে সমস্যায় পড়ে পাকিস্তান। এছাড়াও আরো দু'টি বড় সমস্যা ছিল পাকিস্তানের। এক. যুদ্ধে পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের বন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের দিকে অবস্থান নেয়। দুই. ভারত যুদ্ধক্ষেত্র কাশ্মীর থেকে সরিয়ে এনে পাকিস্তানের ভূখণ্ডে প্রতিস্থাপন করে। তাই পাকিস্তানের সম্পদ পাকিস্তানের হাতেই নষ্ট হয়।

শুধু যুদ্ধে সৈনিকদের পারদর্শিতা ছাড়া আর কোনো লজিস্টিক সুবিধা পাকিস্তানের ছিল না। অন্যদিকে সকল সুবিধা থাকলেও ভারত যুদ্ধে পারদর্শিতা না দেখানোর ফলে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের মহাসচিব ২০সেপ্টেম্বর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় যুদ্ধবিরতির জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করলে পাকিস্তান প্রথমে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ভারত ২১সেপ্টেম্বর যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করলে পরের দিন ২২সেপ্টেম্বর পাকিস্তান তা গ্রহণ করে।

যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে পাকিস্তানেরই বেশি হয়েছে। পাকিস্তানের ৩৮০০ সৈন্য নিহত হয় অন্যদিকে ভারতের ৩০০০ সৈন্য নিহত হয়। পাকিস্তানের ২৫০ ট্যাংক নষ্ট হয় অন্যদিকে ভারতের ২০০ ট্যাংক নষ্ট হয়। ভারতের ৭৫ টি জঙ্গী বিমান ধ্বংস হয় অন্যদিকে পাকিস্তানের ২০ টি বিমান ধ্বংস হয়। ভারত ভূমি হারায় ৫৪০ বর্গ কি.মি. এলাকা আর অন্যদিকে পাকিস্তান হারায় ১৭৩৫ বর্গ কি.মি. এলাকা। এই ডাটাগুলো পরে বিভিন্ন নিরপেক্ষ পরিসংখ্যানে উঠে

www.pathagar.com

এসেছে। কিন্তু যুদ্ধকালীন আইয়ুব খাঁন দেশে পাকিস্তানের বিরাট বিজয় হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকে। এতে তার প্রতি মানুষের ভক্তি বাড়ে।

আরেকটি বিষয় সে যেটি চেয়েছিল তা হলো সমগ্র বিরোধী দলকে তার মুখী করে ফেলা। অর্থাৎ সবাই যাতে তার নেতৃত্ব মেনে নেয়। তার এই প্রচেষ্টাও সাময়িক সফল হয়। যুদ্ধবিরতি থেকে যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে। তাসখন্দ চুক্তি হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল আইয়ুব খাঁনের। পাকিস্তানে আইয়ুব খাঁনের সবচেয়ে সক্রিয় ও কার্যকর বিরোধী ছিলেন জামায়াতের আমীর মওলানা মওদূদী। সেই মওদূদীকেই কাজে লাগান আইয়ুব খাঁন।

১৯৬৫ সালে ৬সেপ্টেম্বর ভারত যখন লাহোর ও শিয়ালকোট আক্রমণ করে তখন আবুল আ'লা মওদূদী ছিলেন রাওয়ালপিন্ডিতে। তিনি সেখান থেকে লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি সরকারি সাহায্য পাবার জন্য বসে থাকেননি। এর আগেই তিনি জাতিকে নিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য লাহোরের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে সেনাবাহিনী আইয়ুব খাঁন আপনার সাথে দেখা করতে চান বলে আইয়ুব খাঁনের কাছে যেতে অনুরোধ করেন। মওলানা মওদূদী আইয়ুবের ডাকে সাড়া দেন।

আইয়ুব খাঁন এই সংকট মুহূর্তে মওলানা মওদূদীর সাহায্য চান। মওলানাকে তিনি অনুরোধ করেন, রেডিওতে ভাষণ দিয়ে বলতে যাতে জাতি ঐক্যবদ্ধ থাকে ও সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে। মওলানা রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সে সময় মওলানার ওপর ইসলামপন্থীদের ব্যাপক সমর্থন ছিল কারণ মওলানা ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন করেছিলেন।

এছাড়াও ১৪, ১৬ ও ১৮সেপ্টেম্বর যুদ্ধকালীন আহত, মুহাজিরদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান ও জামায়াত কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। পাকিস্তান রেডিও তার এই বক্তব্য ও কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে প্রচার করে।[৩৩৩]

---

৩৩৩. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ২১

www.pathagar.com

তাসখন্দ চুক্তি ও পাকিস্তানের পরাজয়

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তিনটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ বাঁধে। এর ১৭ দিন পরে যুদ্ধ বিরতি কার্যকরী হয়। জাতিসংঘ দুই দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে ১৯৬৫ সালের ৫আগস্টের অবস্থানে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। যুদ্ধবিরতির পরেও সৈন্য অপসারণসহ বেশ কিছু প্রশ্নে দুই পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। এই বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খাঁন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এর প্রধানমন্ত্রী নিকলাই কোসিগিনের উদ্যোগে তাসখন্দ শহরে মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা তাসখন্দ চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী ছিল ভারতের বন্ধু রাশিয়া। ১৯৬৬ সালের ৯ ও ১০জানুয়ারী তাসখন্দে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের অবসান হয়।[৩৩৪]

দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি তাসখন্দ চুক্তির মূলকথা ছিল। যে বিষয় নিয়ে বিরোধ সেই কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছে ও তাদের সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দুই পক্ষ নিজেদের বিরোধ মীমাংসার জন্য পরস্পরের মধ্যে শক্তি প্রয়োগ না করে জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করবেন বলে একমত হন। পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, কোনো বিরুদ্ধ প্ররোচনায় উৎসাহ না দেওয়া এবং ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার ব্যাপারে দুই পক্ষ একমত হন। কাশ্মীরকে ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইতোপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিগুলো কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে বিবেচনা করবেন বলেও একমত হন তারা। যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় এই চুক্তিতে। যুদ্ধের সময় এক দেশ অন্য দেশের যে সম্পদ দখল করেছে তা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারেও সম্মত হন দুই পক্ষ।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তানে আইয়ুব খাঁনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়।

---

৩৩৪. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ২২

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে বেশ জোরেশোরে প্রচার করতে শুরু করে পাকিস্তান যুদ্ধে জিতেছে। ভারতকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে ইত্যাদি। আইয়ুব খাঁন যুদ্ধে যারা ভালো পারদর্শিতা দেখিয়েছে এমন সৈন্যদের রাষ্ট্রীয় পদক দিতে থাকেন। চারদিকে একেবারে জয় জয়কার। এর মধ্যে পাকিস্তানি জনগণ ভুলে যায় তাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়েছে। এখনো কাশ্মীরের দখল ভারতীয়দের কাছে। কাশ্মীরের মুসলিমরা মুশরিকদের কাছে জিম্মী হয়ে আছে। আইয়ুব খাঁনের প্রোপাগান্ডার ফলে পাকিস্তানি জনগণ ভেবেছে পাকিস্তান যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। কাশ্মীর পাকিস্তানের অধিকারে চলে আসবে।

কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো তাসখন্দ চুক্তির ঘোষণাগুলো যখন প্রকাশ হলো তখন জনগণের মোহভঙ্গ হয়ে পড়ে। তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারণ যে ইস্যুতে এত রক্তক্ষয় সেই কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের সামান্যতম অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উল্টো কাশ্মীর ইস্যুকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সারা পাকিস্তানের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। জনগণ তাসখন্দ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। আইয়ুবের মূল শত্রু জামায়াতে ইসলামী সবার আগে বিবৃতি দিয়ে তাসখন্দ চুক্তি ও ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর ১৬জানুয়ারী আইয়ুব বিরোধী দলগুলো মিলিত হয় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। সেখান থেকে তারা যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তাসখন্দ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। তারা এই ব্যাপারে আইয়ুবের মিথ্যা প্রচারণা ও কূটনৈতিক ব্যর্থতাকে দায়ী করে। কাশ্মীরের মুসলিমদের ভাগ্য নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা থেকে বিরত থাকার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান।

তাসখন্দ চুক্তির ঘোষণায় যা ছিল[৩৩৫]

১) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, উভয় পক্ষই জাতিসংঘের সনদ মেনে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। চার্টারের অধীনে তারা বল প্রয়োগের পন্থা অবলম্বন না করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করার চুক্তি পুনঃর্নিশ্চিত করে। তারা বিবেচনা করে যে দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনার ধারাবাহিকতার কারণে তাদের অঞ্চলে এবং বিশেষত ভারত-

---

[৩৩৫] Tashkent Declaration / United natons Peacemaker / https://bit.ly/3qObAiU

www.pathagar.com

পাকিস্তান উপমহাদেশের শান্তির স্বার্থ এবং প্রকৃতপক্ষে, ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থ বাস্তবায়িত হয়নি। এটা সেই পটভূমির বিরোধী যেখানে জম্মু ও কাশ্মীর আলোচনা হয়েছিল এবং প্রত্যেক পক্ষই নিজ নিজ অবস্থান নির্ধারণ করেছিল।

২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, ১৯ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ এর মধ্যে উভয় দেশের সকল সশস্ত্র সদস্যকে তাদের ৫আগস্ট, ১৯৬৫ এ পূর্বের অবস্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং উভয় পক্ষই যুদ্ধবিরতি সীমায় যুদ্ধবিরতি শর্তাবলী পালন করবে।

৩) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক হবে একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির ভিত্তিতে।

৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, উভয় পক্ষই অপর দেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোনো প্রচারণাকে নিরুৎসাহিত করবে এবং এমন প্রচারণাকে উৎসাহিত করবে যা দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৫) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, পাকিস্তানে ভারতের হাই কমিশনার এবং ভারতে পাকিস্তানের হাই কমিশনার তাদের পদে ফিরে আসবেন এবং উভয় দেশের কূটনৈতিক মিশনের স্বাভাবিক কার্যক্রম পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। উভয় সরকারই কূটনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের 'ভিয়েনা সমঝোতা চুক্তি' পালন করবে।

৬) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান চুক্তিগুলি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

৭) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, তারা যুদ্ধ বন্দীদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিবেন।

৮) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, উভয়পক্ষ শরণার্থীদের সমস্যা এবং উচ্ছেদ/অবৈধ অভিবাসন সম্পর্কিত

www.pathagar.com

সমস্যাগুলির আলোচনা চালিয়ে যাবে। তারা আরোও একমত হয়েছেন যে, উভয় পক্ষই এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে যা জনসাধারণের সীমান্ত অতিক্রম রোধ করবে। সংঘর্ষের জেরে উভয় পক্ষের দখলে নেওয়া সম্পত্তি ও সম্পদের ফেরত নিয়ে আলোচনা করতেও তারা রাজি হয়েছেন।

৯) ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি একমত হয়েছেন যে, উভয় দেশের প্রত্যক্ষ উদ্বেগের বিষয়ে উভয় পক্ষই সর্বোচ্চ ও অন্যান্য পর্যায়ে বৈঠক চালিয়ে যাবে। উভয় পক্ষই ভারত-পাকিস্তান যৌথ সংস্থাগুলি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে, যা সরকারের আরোও কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এর সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে সরকারগুলিকে অবগত করবে।[৩৩৬]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি পারস্পরিক সন্তোষজনক ফলাফল আনয়নকারী উক্ত বৈঠক সংঘটিত করতে গঠনমূলক, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মহৎ অংশ গ্রহনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, সোভিয়েত সরকার এবং ইউএসএসআর মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে ব্যক্তিগতভাবে গভীর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। তারা উজবেকিস্তানের সরকার ও বন্ধুপ্রতিম জনগণের প্রতি তাদের বিমুগ্ধকারী সংবর্ধনা ও সহৃদয় আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে।

তাসখন্দ চুক্তি ঘোষিত হলে ক্ষেপে উঠে রাজনীতিবিদরা ও পাকিস্তানি জেনারেলরা। আইয়ুবের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো জোট গঠনের চেষ্টা করে। এতে নেতৃত্ব দেয় মুসলিমলীগ। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী লাহোরে আইয়ুব বিরোধী দলগুলোর একটি মিটিং আহ্বান করা হয় কাউন্সিল মুসলিমলীগের উদ্যোগে। মিটিং-এর উদ্দেশ্য ছিল তাসখন্দ চুক্তি পর্যালোচনা ও কাশ্মীরের মুসলিমদের জন্য কোনো প্রস্তাবনা দেওয়া। এই আলোচনায় মুসলিমলীগের সাথে ছিল আওয়ামীলীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি।[৩৩৭] এই আলোচনায় আইয়ুবের গোয়েন্দা হিসেবে থাকা ভাসানী ও তার দলকে বাদ দেওয়া হয়।

নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে জয়েন করার জন্য বলেন। কিন্তু

---

৩৩৬. Tashkent Declaration / United natons Peacemaker / https://bit.ly/3qObAiU

৩৩৭. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৩২

www.pathagar.com

মুজিব আগ্রহ দেখায়নি। কাশ্মীর বিষয়ে সে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের পরামর্শক্রমে শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের দলকে প্রস্তুত করেন লাহোরে পাঠানোর জন্য। কিন্তু হঠাৎ করেই বাঙালি সিএসপি কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস মুজিবের বাসায় এলেন। তিনি মুজিবকে কিছু একটা বুঝিয়েছেন। ব্যস্ অমনি মুজিব নিজেই লাহোরে বিরোধী দলগুলোর কাশ্মীর বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দিতে প্রস্তুত হন। ৪ফেব্রুয়ারী তাজ উদ্দিনসহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে লাহোর রওনা হন।

৫ফেব্রুয়ারী চৌধুরি মুহাম্মদ আলীর বাসায় মুসলিমলীগের সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ আফজালের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। সেই মিটিং এ শেখ মুজিব হঠাৎ করে ৬ দফা ঘোষণা করার আবদার করেন। তিনি সম্মেলনের এজেন্ডায় তার ৬ দফাকে এজেন্ডাভুক্ত করার দাবী জানান। কিন্তু অন্যান্য বিরোধী দল তা মেনে নেননি। তারা বলেন, আমরা আজ একত্রিত হয়েছি কাশ্মীর, তাসখন্দ ও আইয়ুব খাঁনকে নিয়ে। ফলে সম্মেলনের এজেন্ডা থেকে ৬ দফা বাদ পড়ে। মুজিব কিছুক্ষণ হট্টগোল করে সভাস্থল ত্যাগ করে। নিখিল পাকিস্তানের আওয়ামীলীগ প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এতে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। শুধু তাই নয় আওয়ামীলীগের অন্যান্য নেতা যারা মুজিবের সফরসঙ্গী হয়েছিলেন তারাও আগে থেকে কিছুই জানতেন না ৬ দফার ব্যাপারে।

মুজিব সম্মেলনস্থল ত্যাগ করে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি ঘটা করে ৬ দফা উপস্থাপন করেন। আইয়ুবপন্থী সংবাদ মিডিয়া ৬ দফা ঘোষণাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে। একই সাথে তারা সারাদেশে প্রচার করতে থাকে দেশ ভাঙার এজেন্ডা নিয়েছে বিরোধীদল। তাদের প্রচারণায় অনেকটা চাপা পড়ে যায় কাশ্মীর ইস্যুতে করা সম্মেলনের খবর। কাশ্মীর ইস্যু তখনো যে সমাধান হয়নি আজো তা আলোর মুখ দেখেনি।

আইয়ুবের ছয় দফা ও বিস্ময়কর রাজনৈতিক দুর্নীতি

দুঃখজনক ও বিস্ময়কর হলেও সত্য মূলত এই ৬ দফার কারিগর ছিলেন আইয়ুব খাঁন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন সেনা অফিসার ও রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি তাসখন্দ

www.pathagar.com

থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দিতে এবং ৬ দফার বিরোধী হয়ে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ প্রভাব বজায় রাখতে সবাই যেন তার হাতকেই শক্তিশালী করে। পরিশেষে কিন্তু তাই হয়েছিল। আইয়ুব খাঁন ৬ দফাকে হাতিয়ার করে বাঁচতে চেয়েছিলেন। আইয়ুব খাঁনের তথ্য সচিব আলতাফ গওহরকে দিয়ে ৬ দফা প্রণয়ন করেন। আলতাফ সাহেব কর্মসূচীটি রুহুল কুদ্দুসকে দেন। রুহুল কুদ্দুস ছিলেন মুজিবের ইনার সার্কেল। তিনি সেটা কৃষি ব্যাংকের এম ডি খায়রুল বাশারকে দিয়ে টাইপ করিয়ে বিমানে ওঠার আগ মুহূর্তে মুজিবের হাতে গুঁজে দেন।

বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই কারণে যে, আলতাফ গওহর পাকিস্তানের সমস্ত পত্র-পত্রিকাকে নির্দেশ দেন এই মর্মে, যেন তারা ৬ দফার বহুল প্রচার করে। এভাবেই ছয় দফা আলোচিত হয়। নতুবা বিরোধীদের মিটিং এ যেই ছয় দফা নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি সেই ৬ দফা নিয়ে মাতামাতি করার কোনো কারণ নেই। লাহোরে ৫ তারিখ ৬ দফা উত্থাপন না করতে পেরে মুজিব ১০ফেব্রুয়ারী সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে পত্রিকাগুলো আরো রসদ পায়। মানুষ ভুলে যায় তাসখন্দ কিংবা কাশ্মীর সমস্যা। রাজনীতিবিদ ও সামরিক অফিসারদের মাথা ব্যথার কারণ হয় ৬ দফা। একবার আইয়ুব ভারত বিরোধীতাকে পুঁজি করে যুদ্ধ লাগিয়ে সবার সমর্থন নিজের দিকে নিতে চেয়েছিলেন। কূটনীতিক ব্যর্থতায় সবার সমর্থন হারিয়ে এবার ৬ দফাকে পুঁজি করে আবার পরিস্থিতি তার দিকে নিতে চেয়েছিলেন।[৩৩৮]

এদিকে মুজিবের অবস্থাও ভালো নয়। আওয়ামীলীগের অধিকাংশই ৬ দফা মানেনি। দফা গুলোর সাথে তাদের বিরোধ না হলেও তাদের মূল বিরোধ মুজিবকে নিয়ে। মুজিবের কারো সাথে পরামর্শ না করে এ রকম স্বৈরাচারী টাইপের ঘোষণা কেউ মেনে নিতে পারেনি। ১৯৬৬ সালের ১৮-১৯মার্চ ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয়। এতে অন্যান্য মেম্বারসহ লীগ সভাপতি আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের প্রবল আপত্তির মুখে মুজিব ৬ দফা পাশ করাতে ব্যর্থ হয়। এর মাধ্যমে ৬ দফার সাথে আওয়ামীলীগের আর কোনো সম্পর্ক থাকে না। হতাশ মুজিব তার শেষ অস্ত্র ছাত্রলীগকে ব্যবহার করেন।

এই প্রসঙ্গে সাবেক মন্ত্রী ও তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন।

---

৩৩৮. প্রামাণ্যচিত্র / বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ / https://youtu.be/aXQpjbJjlvY

www.pathagar.com

দুঃখভরা মন নিয়ে শেখ মুজিব আমাদের(ছাত্রলীগ) ডাকলেন। বললেন, আমি তো বিপদে পড়ে গেছি। আমারে তোরা কি সাহায্য করবি না? ৬ দফা বলার পর থেকেই বিভিন্ন দিক থেকে আমার ওপর এটাক আসছে। আমার তো এখন ঘরে বাইরে শত্রু। আমরা তখন বললাম নিশ্চয়ই আপনার পাশে থাকবো।[৩৩৯] ঐ সময়েই ফ্যাসিবাদী মুজিব ছাত্রলীগের গুন্ডাদের সহযোগিতায় সভাপতি তর্কবাগীশকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। এ সময় ছাত্রলীগ ও নিউক্লিয়াসের সন্ত্রাসীরা চেলাকাঠ হাতে নিয়ে সশস্ত্র পাহারায় ছিলেন।[৩৪০]

এরপর মুজিব নিজের পক্ষের লোকদের নিয়ে কাউন্সিল করেন। এবারের কাউন্সিল সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি করা হয় শেখ মুজিবকে। এরপর শেখ মুজিব ৬ দফার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান। অন্যদিকে আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের আরেকটি ধারা চালু থাকে। তবে যেহেতু সেই আওয়ামীলীগের আলাদা কোনো কর্মসূচী ছিল না, তাই তারা তৃণমূলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

এভাবেই আইয়ুব-মুজিব ষড়যন্ত্রে নষ্ট হয়ে যায় কাশ্মীরের মুসলমানদের ভাগ্য। হয়তো তখন পাকিস্তানি জেনারেলরা তাসখন্দ চুক্তিকে বাতিল করে ভারতকে চাপ দিয়ে কাশ্মীর নিয়ে আরেকটি সমাধানে পৌঁছাতে পারতো। কিন্তু ৬ দফাকে সরকার গুরুত্বপূর্ণ করে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখাকে জোর দেয়। পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে ইচ্ছেকৃত সমস্যা তৈরি করে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য বিনষ্ট করার মাধ্যমে নিজের হাতকেই শক্তিশালী করে আইয়ুব খাঁন। অন্যদিকে চোখের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায় কাশ্মীর ইস্যু।

আওয়ামীলীগ নেতা ও শেখ মুজিবের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা আতাউর রহমান খান (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) ৬ দফা নিয়ে সবচেয়ে বিস্তারিত বলেন। তার ভাষ্যমতে,

(তাসখন্দে) কয়দিন আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী একটি যুক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, শান্তিপূর্ণভাবে উভয় পক্ষ নিজেদের ছোট বড় সমস্যার সমাধান করবে। আশ্চর্যের কথা, যা নিয়ে যুদ্ধ, অর্থাৎ কাশ্মীর, তার নামগন্ধও এই ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রইলো না। এত কান্ড

৩৩৯. প্রামাণ্যচিত্র / বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ / https://youtu.be/aXQpjbJjlvY

৩৪০. জাসদের উথান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬

www.pathagar.com

করে, এত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে, সারা পাকিস্তানকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি ঠেলে দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত হলো, ওম্ শান্তি!

পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অসংখ্য শহর বাজার গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেরা সৈনিক নিহত হয়েছেন। পৃথিবীর কোনো যুদ্ধে নাকি এত অল্প সময়ে এত অফিসার নিহত হয় নাই। তাদের স্থান পূরণ সম্ভব হবে না। তাই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিরুপ ছিল। এত ক্ষয়ক্ষতির পর আইয়ুব খাঁন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে অপমান-জনক একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন। দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এই চুক্তি অপরাধ স্বীকৃতির শামিল বলে তারা মনে করে।

যে সব সৈনিক কর্মচারী শহীদ হয়েছেন তাদের বিধবা স্ত্রী ও পরিবারবর্গ এক মিছিল বার করলো লাহোর শহরে। ধ্বনি তুললো, আমাদের স্বামী পুত্র ফেরত দিন। তারা শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নাই। অনর্থক আপনি তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন। অকারণে তাদের অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। যদি দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য হতো, তা হলে আপনি এমন চুক্তি কেন স্বাক্ষর করলেন? ইত্যাদি –

পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের ৫-৬ তারিখে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় কনফারেন্স আহ্বান করলেন। এই উপলক্ষে চৌধুরী মহম্মদ আলি ও নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খাঁ ঢাকা এসে সব দলের সাথে আলাপ আলোচনা করে কনফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করলেন। বললেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক এই মূহূর্তে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত।

জামায়াত, নিজামে ইসলামীও কাউন্সিল লীগে যোগদানে সম্মতি দিলো। আওয়ামীলীগেরও দোমনাভাব। শেখ মুজিবের মতামতই দলের মত। প্রতিষ্ঠানের ভিন্ন অভিমত নাই। শেখ মুজিব কনফারেন্সে যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এন-ডি-এফ সভা করে মত প্রকাশ করলো যে, কনফারেন্সের পক্ষে আমাদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে, তবে বর্তমান অবস্থায় কোনো সদস্য এতে যোগদান করতে পারছে না। শেখ মুজিব আমাকে টেলিফোনে বললেন, আপনারা ঠিকই করেছেন। আমরাও যাবো না।

www.pathagar.com

পরদিন সংবাদপত্রে দেখি, শেখ মুজিব সদলবলে লাহোর যাচ্ছেন। প্রায় চৌদ্দ পনেরো জন এক দলে। ব্যাপার কি? হঠাৎ মত পরিবর্তন। মতলবটা কি?

লাহোর কনফারেন্স শুরু হলো গভীর উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে।

অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ একটি বোমা নিক্ষেপ করলেন – 'ছয় দফা'। প্রস্তাব বা দাবীর আকারে একটা রচনা নকল করে সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হলো। কোনো বক্তৃতা বা প্রস্তাব নাই, কোনো উপলক্ষ্য নাই, শুধু কাগজ বিতরণ। পড়ে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। জাতীয় কনফারেন্সে এই দাবী নিক্ষেপ করার কি অর্থ হতে পারে? কনফারেন্স ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সম্মিলিত হয়েছে। এই দাবী যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, এই সম্মেলন ও এই সময় তা উপযোগী নয় – সম্পূর্ণ অবান্তর।

তারপর দলবলসহ শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে এসে মহাসমারোহে 'ছয় দফা' প্রচার করলেন সংবাদপত্রে। শেখ মুজিবের দাবী ও নিজস্ব প্রণীত বলে ৬ দফার অভিযান শুরু হয়ে গেলো।

ছয় দফার জন্মবৃত্তান্ত নিম্নরূপ

কিছু সংখ্যক চিন্তাশীল লোক দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দূরাবস্থার কথা আলাপ আলোচনা করেন। আমাদের ইঙ্গিত ও ইশারা পেয়ে তারা একটা খসড়া দাবী প্রস্তুত করলেন। তারা রাজনীতিক নয় এবং কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টও নয়। তারা 'সাতদফার' একটা খসড়া আমাদেরকে দিলেন। উদ্দেশ্য, এটা স্মারকলিপি হিসেবে আইয়ুব খাঁনের হাতে দেওয়া, কিংবা জাতীয় পরিষদে প্রস্তাবাকারে পেশ করার ব্যবস্থা করা।

এই খসড়ার নকল বিরোধীদলীয় প্রত্যেক নেতাকেই দেওয়া হয়। শেখ মুজিবকেও দেওয়া হয়। খসড়া রচনার শেষ বা সপ্তম দফা আমরাও সমর্থন করি নাই। শেখ মুজিব সেই দফা কেটে দিয়ে ৬ দফা তারই প্রণীত বলে চালিয়ে দিলো। তারপর বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ৬ দফার দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক মর্ম ও তাৎপর্য লেখায়ে প্রকাশ করা হয়। ইংরেজী ও বাংলায় মুদ্রিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয় সারা দেশব্যাপী।

লাহোর কনফারেন্স বানচাল হয়ে গেলো। নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবকেই এর জন্য

www.pathagar.com

বিশেষভাবে দায়ী করেন। তারা অভিযোগ করেন, শেখ মুজিব সরকার পক্ষ থেকে প্ররোচিত হয়ে এই কর্ম করেছেন। লাহোরে পৌঁছার সাথে সাথে আইয়ুব খাঁর একান্ত বশংবদ এক কর্মচারী শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে কি মন্ত্র তার কানে ঢেলে দেয়, যার ফলেই শেখ মুজিব সব উলটপালট করে দেয়। তারা এও বলে যে আওয়ামীলীগের বিরাট বাহিনীর লাহোর যাতায়াতের ব্যয় সরকারের নির্দেশে কোনো একটি সংশ্লিষ্ট সংস্থা বহন করে। আল্লাহ্ আলীমুল গায়েব।[৩৪১]

ছয় দফায় করা দাবীসমূহ নিম্নরূপ :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দু'টি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দু'টি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দু'টি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থা সম্বলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

৪. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসেব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে;

৫. দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে।

---

৩৪১. স্বৈরাচারের দশ বছর / আতাউর রহমান খান / নওরোজ কিতাবিস্তান / পৃ. ৩৫৪-৩৫৭

www.pathagar.com

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীরসদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।[৩৪২]

১৯৬৬ সালের ২০মার্চ ঢাকায় আইয়ুব খাঁন ৬ দফাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, দেশের অখণ্ডতাবিরোধী কোনো কিছু সহ্য করা হবে না।[৩৪৩] প্রয়োজনে অস্ত্রের মুখে তার জবাব দেওয়া হবে। এর মধ্যে আইয়ুব কয়েকবার শেখ মুজিবকে এরেস্ট করেন এবং ছেড়ে দেন। আইয়ুব ও শেখ মুজিবের মধ্যে পারস্পরিক হুমকি ও উত্তপ্ত কথাবার্তা ৬ দফাকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলে। এদিকে তর্কবাগীশের নেতৃত্বে থাকা আওয়ামীলীগ দিন দিন জনপ্রিয়তা হারায়। অন্যান্য বিরোধীদলগুলোও কোনো ভালো কর্মসূচি দিতে পারেনি।

এদিকে মুজিবের ৬ দফাকে কেন্দ্র করে নতুন করে স্বপ্ন দেখে আওয়ামীলীগের মধ্যে থাকা গোপন সংগঠন নিউক্লিয়াস ও বামপন্থী দলগুলো। ছয় দফাকে কেন্দ্র করে যতগুলো কর্মসূচি (হরতাল, বিক্ষোভ, জ্বালাও-পোড়াও, ও অবরোধ) হয়েছে তাতে নিউক্লিয়াস সদস্য ও কম্যুনিস্টদের খুবই একটিভ দেখা গিয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে আলাদা করে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম কায়েম করা। এক্ষেত্রে তারা মুজিবের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও ৬ দফাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। এভাবে আইয়ুব-মুজিব ষড়যন্ত্রে রাজনৈতিক দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে জন্ম নেওয়া ৬ দফার পক্ষে জনমত তৈরি হয়েছিল।

বাংলার ইলুমিনাতি 'নিউক্লিয়াস'সম্পর্কে কিছু কথা

আপনারা তো ফ্রি-মেসন, ইলুমিনাতি ইত্যাদি গুপ্ত সংগঠনের সাথে পরিচিত। পৃথিবীর সকল ষড়যন্ত্র নাকি তাদের দ্বারাই হয়। আমরা আজকে জানবো বাংলার ইলুমিনাতি নিয়ে। বাংলার এই গোপন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলম খান। নোয়াখালীর সন্তান এই সিরাজুল আলম খান পড়েছেন ঢাকা ভার্সিটিতে গণিত বিভাগে। গণিতে পড়লেও গণিতবিদ না হয়ে হয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক।

---

৩৪২. ছয়দফা কর্মসূচি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/2ZKqw5N / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

৩৪৩. স্বাধীনতার ৫০ বছর: ছয় দফা ঘোষণা করে যেভাবে নেতা হয়ে ওঠেন শেখ মুজিব / মিজানুর রহমান খান / বিবিসি বাংলা / ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

কম্যুনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজের মতো করে রাষ্ট্র কল্পনা করেছেন। তাই তিনি সিপিবি বা ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেননি। যোগ দিয়েছেন ছাত্রলীগে।

এর বেসিক কারণ ছাত্রলীগ জনপ্রিয় ছাত্রসংগঠন। এর মধ্যে থেকেই তার নিজস্ব কর্মী রিক্রুটমেন্ট করতে সুবিধে হবে। ১৯৬১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৪৪] যেহেতু পাকিস্তান ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্র। এখানে নিজেদের মতো করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হবে, তাই তিনি প্রাথমিক লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন পূর্ব পাকিস্তানকে পকিস্তান থেকে আলাদা করা। পাকিস্তান থেকে বাংলাকে আলাদা করতে পারলেই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

আজকে যদি একটি রাষ্ট্রের কথা বলতে বলি, যে রাষ্ট্রের মানুষ শরিয়াহ আইন চায় তাহলে সবার আগে যে নামটি আসবে সেটি হলো আফগানিস্তান। তবে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো, আমরা যেই সময়ের কথা আলোচনা করছি সেই সময়ে আফগানিস্তানের অধিকাংশ ছাত্র-যুবকরাই কম্যুনিস্ট হয়ে পড়েছে। সত্তরের দশকে তো সেখানে কম্যুনিস্টরা বিপ্লবই করে ফেলেছে। এই উপমহাদেশে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে ছিল হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের সব রাজনৈতিক গোষ্ঠী। তবে কেউই আদর্শিক ও কার্যকরভাবে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেনি। তাদের দর্শনের তাত্ত্বিক মোকাবেলা করেছেন মওলানা মওদূদী। তার লেখা ও বক্তব্য মুসলিম সমাজে বেশ ভালো প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

আফগানিস্তানে তার শিষ্য তৈরি হয়েছে কাবুল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বুরহান উদ্দিন রব্বানী। সেখানকার মুসলিম যুবকদের বিপথ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন তিনি। বাংলায় তার শিষ্য তৈরি হয়েছে মওলানা আব্দুর রহীম, প্রফেসর গোলাম আযম, একেএম ইউসুফ, আব্বাস আলী খাঁন প্রমুখ। আর পাকিস্তানে তো মওলানা মওদূদী নিজেই ছিলেন। সাথে ছিল নঈম সিদ্দিকী, মিয়া তুফায়েল মোহাম্মদ, খুররম জাহ মুরাদ প্রমূখ। পাকিস্তান ও বাংলায় তাই কম্যুনিস্টরা সেভাবে বিপ্লব করতে পারেনি। আফগানিস্তানে বিপ্লব করলেও বুরহান উদ্দিন রব্বানী, আহমদ শাহ মাসউদ, গুলুবুদ্দিন হেকমতিয়ারের চেষ্টায় আবারো আফগানিস্তানের ছাত্র-যুবকরা ইসলামের পথে ফিরে এসেছে, রুশ

---

৩৪৪. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ১১

www.pathagar.com

কম্যুনিস্টদের সাথে যুদ্ধ করেছে, জীবন দিয়েছে এবং ১৯৯২ সালে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।[৩৪৫]

আমরা আবার আমাদের মূল আলোচনায় ফিরি। সিরাজুল আলম খান প্রকাশ্যে ছাত্রলীগ হলেও গোপনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ লালন করতেন।[৩৪৬] কিন্তু বাংলায় অনেকে কম্যুনিজম আদর্শ লালন করলেও ধর্ম থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়নি। তাই সিরাজুল আলম ছাত্রলীগ ও শেখ মুজিবের ওপর ভর করেই কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক করার লক্ষ্যে তিনি দেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার বিষয়টা তার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন। ১৯৬১ সালে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি হওয়ার পর তিনি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ শুরু করে দেন। তার প্রাথমিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি অনেকের সাথে আলাপ করেন। এর মধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথেও তার যোগাযোগ হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে তার সাথে যুক্ত হয়েছে চিত্তরঞ্জন সুতার এবং কালিদাস বৈদ্য। তারা তাকে ভারতের পক্ষ হয়ে পরামর্শ ও তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করার অঙ্গীকার করেন।

যদিও ভারতের মূল লক্ষ্য ও সিরাজের মূল লক্ষ্য এক নয়। ভারত কোনোভাবেই বাম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে চায় না। তবে ভারত ও সিরাজের প্রাথমিক লক্ষ্য মিলে যাওয়ায় তারা একে অপরের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার করে। সিরাজ ছাত্রলীগের সেক্রেটারি হয়ে সারাদেশ সফর করেন এবং নিজের মতে যাদের আনা যাবে এমন লোক বাছাই করতে থাকেন। ১৯৬১ সালে সিরাজ পরীক্ষামূলকভাবে ইস্ট পাকিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট গঠন করেন। কয়েকজন সহযোগী নিয়ে এই সংস্থার নামে লিফলেট বিতরণ করেন।[৩৪৭] তার এই উদ্যোগ ছাত্রসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি এখান থেকে সরে আসেন। ছাত্রলীগের বহু নেতা তাকে পাতি বিপ্লবী কিংবা রোমান্টিক বিপ্লবী বলে অভিহিত করেছিল।

---

৩৪৫. Burhanuddin Rabbani / The Guardian / https://bit.ly/3bCwVW9 / Access in 25 Feb 2021

৩৪৬. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ১২

৩৪৭. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৪২-৪৩

www.pathagar.com

এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে সিরাজুল আলম খান প্রকাশ্যে আর স্বাধীনতা বা দেশ ভাগ নিয়ে কাজ করেননি। ১৯৬২ সালে তিনি তৈরি করেছেন ইলুমিতানিদের মতো অথবা হাল আমলের জঙ্গী গোষ্ঠীগুলোর মতো একটি গুপ্ত সংগঠন। যার নাম নিউক্লিয়াস। পুরো নাম স্বাধীন বাংলা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের একেবারে শুরুর নেতা হলেন চারজন। সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ ও আবুল কালাম আযাদ। এই সংগঠনের মিটিং সাধারণত হতো কাজী আরেফের বাসায়।[৩৪৮] নিউক্লিয়াস প্রথমে ধীরে ধীরে ছাত্রলীগ দখল করলো। সিরাজ ছাত্রলীগ কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। সবার কাছে স্পষ্টত যেটা মনে হতো ছাত্রলীগে দুইটি উপদল। একটি সিরাজের প্রভাবাধীন। আরেকটি অংশের নেতা শেখ ফজলুল হক মনি।

সিরাজরা চেষ্টা করতো ছাত্রলীগের শাখা পর্যায়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা নিক্লিয়াসের মধ্যে থেকে যেন আসে। সেই চেষ্টা করতো। এদিকে সিরাজের বাইরের অংশ শুধু কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিয়ে চিন্তা করতো। ফলে দেখা গিয়েছে কয়েকবছরের মধ্যে নিউক্লিয়াস যেভাবে যাকে চায় সেই ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসীন হয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল মুজাহিদী। তিনি সিরাজের বলয়ের বাইরে থেকে উঠে আসা নেতা ছিলেন। আর আওয়ামীলীগের মূল দলে সিরাজের লোক ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তিনিও কম্যুনিস্ট ছিলেন। আদর্শ গোপন করে তিনি শেখ মুজিবের একেবারে কাছের লোকে পরিণত হন। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনের সময় থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামীলীগের একক নেতায় পরিণত হন।

সিরাজুল আলম খান স্বাধীনতা নিয়ে বড় নেতাদের মধ্যে শুধু মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করেন। মওলানা ভাসানী চীনপন্থী বাম ছিলেন। সে সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে চীনের সম্পর্ক ভালো ছিল। সেই সুবাদে ভাসানী পাকিস্তানের বিপক্ষে কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার অনুমতি চীন থেকে পাননি। কারণ পাকিস্তান ভাগ ভারতের পক্ষে যাবে যা চীনের জন্য ক্ষতিকর। চীন পাকিস্তানের পক্ষে থাকায় ভাসানী সিরাজের সাথে কাজ করতে পারেননি।[৩৪৯]

---

৩৪৮. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৪২-৪৩
৩৪৯. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৮০-৮১

www.pathagar.com

এরপর সিরাজুল আলম আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খানের সাথে যোগাযোগ করেন তার নেতৃত্বে কাজ করার জন্য। আতাউর রহমান খান সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কিন্তু তার সাথে কথা বলে সিরাজ নিশ্চিত হয়েছে তিনি পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের কট্টর সমর্থক, একই সাথে কম্যুনিজমের বিরোধী। এই প্রসঙ্গে সিরাজ বলেন আতাউর রহমানের পেছনে তার বহু সময় অপচয় হয়েছে। তাই সিরাজ বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবের পক্ষেই থাকেন। তাকে মূল নেতা বানানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তবে সিরাজের ভাষ্যমতে তিনি মুজিবের কাছে তার মূল পরিকল্পনা কখনোই পরিষ্কার করেননি।[৩৫০]

৬ দফাকে কেন্দ্র করে আওয়ামীলীগে যখন ভাঙ্গন দেখা দেয়, তখন শেখ মুজিবকে একনিষ্ঠ সাপোর্ট দিয়েছেন নিউক্লিয়াস। শেখ মুজিবকে আওয়ামীলীগের একক নেতায় পরিণত করে নিউক্লিয়াস। শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসলে নিউক্লিয়াস সদস্যরা তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মূল নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করতেন। সিরাজের নির্দেশ হলেই কেবল তা বাস্তবায়ন হতো। কারণ ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ তখন ছিল সিরাজের কাছে। এদিকে মুজিবও ছিল অসহায়। ৬ দফাকে জনপ্রিয় করতে গিয়ে মুজিব সিরাজের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ১৯৬৬ সাল থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত সকল ঘটনা ও দুর্ঘটনার সাথে জড়িত থাকে নিউক্লিয়াস। তারা বাংলায় একটি শক্তিশালী সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়। তাদের স্বার্থে আঘাত এলে বাইরের মানুষকে নির্বিঘ্নে খুন তো করতোই। সময়ে সময়ে নিজেদের লোককে খুন করতে দ্বিধা করতো না।[৩৫১]

৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র, মামলা প্রত্যাহার আন্দোলন, ১১ দফা আন্দোলন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করে এই 'নিউক্লিয়াস'। আন্দোলনের এক পর্যায়ে গড়ে তোলা হয় 'নিউক্লিয়াসে'র রাজনৈতিক উইং বি.এল.এফ এবং সামরিক ইউনিট 'জয় বাংলা বাহিনী'।[৩৫২] এর সম্পর্কে একেবারে জানতেন না মুজিব, বিষয়টা এমন ছিল না। মুজিব মনে করতো সে নিউক্লিয়াসকে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে সিরাজ ভাবতো তারা মুজিবকে ব্যবহার করছে। অবশ্য মুজিবকে দিয়ে আগরতলায় ভারতের সাথে ষড়যন্ত্র করা প্রমাণ করে মুজিব

৩৫০. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৮০-৮১
৩৫১. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৬১-৭৮
৩৫২. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৪৯

www.pathagar.com

নিউক্লিয়াস দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন। তবে স্বাধীনতার পর মুজিবকে দিশেহারা করে ফেলে নিউক্লিয়াস। মুজিবও তাদের প্রচুর সদস্যকে খুন করেছে। নিউক্লিয়াসকে পুরো কন্ট্রোলে নিয়ে আসেন জিয়াউর রহমান।

পাকিস্তানি প্রশাসন প্রায়ই নিউক্লিয়াস সদস্যকে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করাকালে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে, চোরাচালানে ও অস্ত্রসহ গ্রেফতার করতো। তবে এর দায় বেশিরভাগ বহন করতে হতো ছাত্রলীগকে। কারণ প্রতিটি নিউক্লিয়াস সদস্য ছাত্রলীগ নেতা বা কর্মী। আরেকটি বিষয় নিউক্লিয়াসকে রক্ষা করেছে সেটা হলো তাদের স্লিপার সেল সিস্টেম। একজন সদস্য শুধুমাত্র তার উর্ধ্বতন ও তার অধস্থনকে চিনতো। এর বাইরে ওপরে শুধু সিরাজ, রাজ্জাক ও কাজী আরেফকে চিনতো। কোনো টিম ওয়ার্কের প্রয়োজন হলে ঐ কাজ পর্যন্তই তাদের যোগাযোগ ছিল। এর বাইরে কেউ কাউকে চিনতো না। তাই পাকিস্তানি প্রশাসন তাদের নেটওয়ার্ক ভাঙতে পারেনি।

মুসলিম উম্মাহ চেতনার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে 'জয় বাংলা' সহ সকল স্লোগান নির্ধারণ এবং বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণে "...এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বাক্যসমূহের সংযোজনের কৃতিত্ব 'নিউক্লিয়াসে'র। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিরাজুল আলম খানের ভুমিকাই ছিল মুখ্য। ১৯৬৯-'৭০ সালে গণ-আন্দোলনের চাপে ভেঙে পড়া পাকিস্তানি শাসনের সমান্তরালে 'নিউক্লিয়াস'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠন করা হয় ছাত্র-ব্রিগেড, যুব-ব্রিগেড, শ্রমিক-ব্রিগেড, নারী-ব্রিগেড, কৃষক-ব্রিগেড, সার্জেন্ট জহুর বাহিনী। এদের সদস্যরা ভেঙে পড়া পাকিস্তানি শাসনের পরিবর্তে যানবাহন চলাচল, ট্রেন-স্টীমার চালু রাখা, শিল্প-কারখানা উৎপাদন অব্যাহত রাখা এবং থানা পর্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করে। নিউক্লিয়াসের সদস্যদের দ্বারা এইসব দুরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য কৌশল ও পরিকল্পনাও 'নিউক্লিয়াস' এর।[৩৫৩]

১৯৬৯ সাল নাগাদ নিউক্লিয়াসেরএর সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ হাজারে।[৩৫৪] উনসত্তরের পর তারা আর সদস্য সংখ্যা বাড়ায়নি। শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বহু মানুষকে কাজে লাগিয়েছে। ১৯৭০ এর নির্বাচনে

---

৩৫৩. ৭ মার্চের ভাষণ এবং সিরাজুল আলম খান / জাফরুল্লাহ চৌধুরী / দৈনিক নয়াদিগন্ত / ৯ এপ্রিল ২০১৮

৩৫৪. আমি সিরাজুল আলম খান / শামসুদ্দিন পেয়ারা / মাওলা ব্রাদার্স / পৃ. ৪৯

www.pathagar.com

শেখ মুজিবকে জয়ী করতে হেন কাজ বাকী ছিল না যা তারা করেনি। পাকিস্তানের বিগত নির্বাচনগুলোতে কেন্দ্র দখলের মতো ঘটনা ঘটেনি। ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রথম সিরাজের পরিকল্পনায় নিউক্লিয়াস সদস্যরা কেন্দ্র দখল করে প্রচুর জাল ভোট দেয়। ফলে ন্যাপ, নেজামে ইসলামী ও মুসলিমলীগের বহু জনপ্রিয় নেতা হেরে যায়। নিউক্লিয়াসের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। গুপ্ত সংগঠন নিউক্লিয়াসের দেখানো কেন্দ্র দখলের প্রসেস থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন আর কখনো বের হতে পারেনি।

১৯৭১ সালে পহেলা মার্চ থেকে সারা বাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে নিউক্লিয়াস। সাত মার্চের আগে তারা বহু অবাঙালিকে হত্যা করে। অবাঙালি শিল্পপতিদের সম্পদ লুটপাট করে। তাদের এসব কাজের বড় উদ্দেশ্য ছিল যাতে রাজনৈতিক সমঝোতা না হয়। রাজনৈতিক সমঝোতা না হলেই তাদের দেশভাগ করা সহজ হবে। আর এজন্যই তারা ঝামেলা তৈরি করে। সারা দেশে সেনাবাহিনীর ওপর বিনা কারণে হামলা করে। ২৫মার্চের আগে যখন ইয়াহিয়া খাঁন, শেখ মুজিব ও ভুট্টো ঢাকায় ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনারত তখন নিউক্লিয়াস বিহারীদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। তারা চেয়েছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীও যাতে পাল্টা একশনে যায়। যাতে গণহত্যার অভিযোগ এনে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠাতে পারে।

নিউক্লিয়াস সদস্যের প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতীয় সেনবাহিনীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে উন্নত সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় এবং 'মুজিব বাহিনী' নামে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীনস্ত ১১টি সেক্টরের পাশাপাশি ৪টি সেক্টরে বিভক্ত করে বি.এল.এফ নামে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা ও কৌশল ছিল কেবল ভিন্ন ধরনের নয়, অনেক উন্নতমানের এবং বিজ্ঞানসম্মত। বিএলএফ এর চার প্রধান ছিলেন সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ।[৩৫৫] তবে তারা সর্বাত্মক যুদ্ধে নামার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। নিউক্লিয়াস আরেকটি কাজ করেছে তা হলো ১৪ডিসেম্বর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে। এসব বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগ ছিল মাওবাদী অর্থাৎ চীনের পক্ষে। আর চীনের পক্ষে মানেই তারা ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে।

---

৩৫৫. মুজিব বাহিনী / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3pTByAn / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ১মার্চ ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত পাকিস্তান জাতীয় উদ্বোধনী সভা স্থগিত ঘোষণার পরপরই ২মার্চ বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণসহ ৩মার্চ 'স্বাধীন বাংলার ইশতেহার' ঘোষণার পরিকল্পনাও 'নিউক্লিয়াস'এর। বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এই দু'টি কাজ ছিল প্রথম দিক নির্দেশনা। আর এই দুই গুরুদায়িত্ব পালন করেন নিউক্লিয়াসের আ.স.ম আবদুর রব এবং শাজাহান সিরাজ। নতুন দেশের নাম 'বাংলাদেশ'হবে এ সিদ্ধান্তও সিরাজুল আলম খানের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। নিউক্লিয়াসের শীর্ষ নেতারা এটি অনুমোদন করেছেন।[৩৫৬]

ভুট্টো, পিডিএম এবং আইয়ুব খাঁনের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন

১৯৬৬ সালে আইয়ুব বিরোধী জোটের আন্দোলন নষ্ট করে দেয় আইয়ুব খাঁন শেখ মুজিবের মাধ্যমে। এরপর বিরোধী দলগুলো আবারো আইয়ুবের বিরুদ্ধে জোট গঠন করে। এবারের উদ্যোক্তা আতাউর রহমান খান। আতাউর রহমান খান ছিলেন আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি। তিনি কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। যেসব সিনিয়র নেতাকে শেখ মুজিবুর রহমান নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেন তাদের মধ্যে একজন আতাউর রহমান খান।

১৯৬৭ সালের ৩০এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসায় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের নুরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরী, কাউন্সিল মুসলিমলীগের মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা, তোফাজ্জল আলী ও খাজা খায়ের উদ্দীন, জামায়াতে ইসলামীর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, মওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম, নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগের নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, এডভোকেট আবদুস সালাম খান ও গোলাম মুহাম্মদ খান লুখোর, নেজামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, মৌলবী ফরিদ আহমদ ও এম.আর. খান এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন এবং পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট'(P.D.M.)নামে একটি রাজনৈতিক জোট

---

৩৫৬. সিরাজুল আলম খান রহস্য, একটি রাজনৈতিক বিতর্ক / সাইফুল ইসলাম / পরিবর্তন ডট কম/ https://bit.ly/3kreJmC / অ্যাকসেস ইন ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২১

www.pathagar.com

গঠনের ঘোষণা দেন।[৩৫৭] এইভাবে নতুন করে শুরু হয় গণতন্ত্র তথা জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন।

বিরোধী দলের জোট থেকে বাদ পড়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ ও ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর শরীক দল ছিল পাঁচটি। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, কাউন্সিল মুসলিমলীগ, আওয়ামীলীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী।[৩৫৮] উল্লেখ্য, ছয় দফা আন্দোলন নিয়ে আওয়ামীলীগে ভাঙন ধরে। সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান পরিচালিত অংশটি পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে' যোগ দেয়। সেক্রেটারি থেকে নিজেকে সভাপতি ঘোষণা করা শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাজশাহীর কামারুজ্জামান পরিচালিত অংশটি "ছয় দফা" ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন আওয়ামীলীগের এডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং সেক্রেটারি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম।

'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর ৮ দফা দাবী

১. শাসনতন্ত্রে নিম্ন বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকবে

ক. পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার;

খ. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য;

গ. পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার;

ঘ. সংবাদপত্রের অবাধ আজাদি;

ঙ. বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা

২. ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন

ক. প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স);

---

৩৫৭. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ২২

৩৫৮. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ২৩

www.pathagar.com

খ. বৈদেশিক বিষয়;

গ. মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা;

ঘ. আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়

৩. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কায়েম করা হবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত আঞ্চলিক সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকবে

৪. উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ১০ বছরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।

৫.ক. মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং

খ. আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য

গ. আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচিত করবেন

৬. সুপ্রিমকোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে যাতে ১০ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হতে পারে

৭. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকর সামরিকশক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে

৮. এই ঘোষণায় শাসনতন্ত্র শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়, যা অবিলম্বে জারি করা হবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করবার ৬ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৩৫৯]

---

৩৫৯. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ২৩-২৫

www.pathagar.com

পিডিএমের নেতৃত্বে নতুন করে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। সারা পাকিস্তানে সাড়া পড়ে যায়। যদিও পিডিএমের উদ্যোক্তাসহ বড় নেতারা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের, কিন্তু পিডিএমের আন্দোলন জমে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন চাঙ্গা ছিল শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন ছয় দফা আন্দোলন। নিউক্লিয়াস ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জ্বালাও পোড়াও শুরু হয়েছে। আর পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন জমে উঠেছে পাঞ্জাবে। বিশেষ করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আইয়ুবের স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদে ও মৌলিক গণতন্ত্র বাদ দিয়ে সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই আন্দোলনে জ্বালানী হিসেবে কাজ করেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি ছিলেন আইয়ুব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আইয়ুব খাঁন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তির ব্যর্থতা তার ওপর চাপিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছেন। তিনি তাকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বরখাস্ত করেন।[৩৬০] জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৬৭ সালের শুরুতে পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নতুন দল করে আইয়ুব বিরোধী জ্বালাময়ী বক্তব্য ও মন্ত্রী থাকাকালীন কিছু ঘটনা বর্ণনা করে ভুট্টো রাতারাতি জনপ্রিয় দলে পরিণত হতে থাকে।[৩৬১]

পাকিস্তান পিপলস পার্টি ছিল একটি প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল, যা সামাজিক উদারনীতি ও গণতান্ত্রিক নীতির সমর্থক। তার দলটি এমন ছিল এতে জাতীয়তাবাদী, ডানপন্থী, বামপন্থী ও সাধারণ মানুষ একত্রিত হতে পারে। তিনি জনগণের ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হন। হত্যার চেষ্টা, মিথ্যা পুলিশি মামলা, কারাবাস এবং তার বন্ধুদের এবং পরিবারের নির্যাতন সত্ত্বেও ভুট্টোকে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ থেকে কেউ সরাতে পারেনি।

পিডিএমের নেতৃত্বে আইয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের

---

৩৬০. Tashkent 1966 and its ramifications / Syed Badrul Ahsan / The daily star / January 16, 2013

৩৬১. History / Pakistan Peoples Party (PPP)/ https://www.ppp.org.pk/history/ Access in 7 Mar 2021

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে, অর্থনীতি অল্পকিছু মানুষের কাছে কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বেশিরভাগ নাগরিকরা প্রতিবাদ শুরু করে। এতে বেশি ভূমিকা রাখে পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের মানুষেরা। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধীতা এবং প্রতিরোধের কাজটা শুরু হয় বেকার যুবক এবং শিক্ষার্থীদের দিয়ে। ছাত্ররা আইয়ুব খাঁনের অর্থনৈতিক নীতির প্রতিবাদে তাদের ডিগ্রি সার্টিফিকেট পুড়িয়েছে।[৩৬২]

১৯৬৮ সালে যখন আইয়ুব খাঁন "উন্নয়নের দশক" উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন এটিকে নিন্দা করে এবং তারা "পরিবর্তনের দশক" নাম দিয়ে আন্দোলন শুরু করে। সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনের জন্য ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের নেতৃত্বে পাকিস্তানে বিভিন্ন শহরে যেমন করাচি, রাওয়ালপিন্ডি এবং পেশোয়ারে বিক্ষোভ শুরু হয়।[৩৬৩]

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে, সামরিক স্বৈরশাসক উন্নয়নের দশক উদযাপন করতে লাহোরের দুর্গ স্টেডিয়ামটি নির্বাচন করেছিল। সরকার সেখানে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের থাকতে বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সবাই সেখানে জড়ো হয়। স্টেডিয়াম একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় ছাত্রদের দ্বারা। অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্কালে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশনের নেতৃত্বে হঠাৎ একটি গান গাওয়া হয় যার শিরোনাম ছিল বিষাদের দশক। পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে সব ছাত্র কোরাস করতে লাগলো। ছাত্রদের এই বিষয়টা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। আগত অন্যান্যরাসহ সরকার পুরোপুরি শক্‌ড হলো। ছাত্রদের এমন পরিকল্পনা সরকারের অজানা। অল্প সময়ের মধ্যেই সেনাবাহিনী ও পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ শুরু হলো। শুরু হলো ছাত্রবিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ আগের মতো নির্বাচনসহ কিছু দাবী নিয়ে নয়, এখন একটাই দাবী, আইয়ুবের পতন।[৩৬৪]

৭নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে সরকার বিরোধী ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশ গুলি

---

৩৬২. "Crises in Political Development" and the Collapse of the Ayub Regime in Pakistan (Vol. 5, No. 2 (Jan., 1971)) / Maniruzzaman Talukder / P. 221-238

৩৬৩. Pakistani students, workers, and peasants bring down a dictator, 1968-1969 / global nonviolent action Database / https://bit.ly/3boSxXf / Access in 7 Mar 2021

৩৬৪. Exit stage left: the movement against Ayub Khan /Sunday Magazine / Dawn / August 31, 2014

www.pathagar.com

করে তিনজন ছাত্রকে হত্যা করে। এই হত্যা ছাত্রদের সাথে সকল মানুষকে আন্দোলনে নামিয়ে দেয়। সবাই মিলে সরকারকে অসহযোগিতা করতে থাকে। তারা রেল ও বাসের ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দেয়। প্রত্যেক নাগরিক আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এর পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে ভূট্টোর জ্বালাময়ী ভাষণগুলো।

রাওয়ালপিন্ডি হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ছাত্ররা স্টুডেন্ট একশন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে। এটি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে আরো বড় ভূমিকা রাখে। এই কমিটির প্রধান আহ্বায়ক ছাত্রনেতা শেখ আব্দুল রশিদ। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। এটি সরকারের জন্য হিতে বিপরীত হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে ছাত্ররা মারাত্মক সহিংস হয়ে ওঠে। তারা রাওয়ালপিন্ডিকে পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করে ফেলে। তারা 'হুইল জ্যাম' (চাকা বন্ধ) নামে ধর্মঘট করে।

ঠিক একই সময়ে নভেম্বরের মাঝামাঝিতে ভুট্টো সরকারের এই নাজুক অবস্থার সুবিধা নেয়। সে পাকিস্তানের কৃষক ও শ্রমিকদের মাঠে নামিয়ে দেয়। শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে এবং সকল কারখানা ও উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। বিদ্রোহ ক্রমেই শহর থেকে গ্রামে প্রসারিত হতে থাকে। কৃষকেরা স্বৈরাচারি আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। এই ঘটনাগুলো দ্রুত হিংস্র হয়ে ওঠে। কৃষকরা তাদের দমনকারীদের ওপর হামলা করে, জমির মালিকদের এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করে।[৩৬৫]

বহু স্থানে ছাত্ররা কৃষকদের সহযোগিতায় নায়েব, তহশিলদার, পুলিশ, দারোগা, সার্কেল অফিসারদের বিচার করে গলায় জুতার মালা পরিয়ে ঘুরিয়েছে। ঘুষ হিসেব করে ফেরত নিয়েছে, জরিমানা করেছে, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের পদত্যাগ করিয়েছে, বেশ্যাবাড়ি তুলে দিয়েছে, মদ গাঁজার দোকান ভেঙ্গে দিয়েছে, চোর-ডাকাতদের শায়েস্তা করেছে। এ ছাড়া শহরাঞ্চলে ক্ষমতা অপব্যবহারকারী সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রকাশ শারীরিক আক্রমণ বা নথিপত্রাদি তছনছ এবং অফিসে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ঘটেছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের পেশাজীবীরা তাদের দীর্ঘদিনের অপূর্ণ দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেছেন এবং রাজপথে নেমে মিছিলে উচ্চকিত হয়েছেন, হাজার হাজার শ্রমিক তাদের

৩৬৫. Exit stage left: the movement against Ayub Khan /Sunday Magazine / Dawn / August 31, 2014

www.pathagar.com

ন্যূনতম অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে ঘেরাও আন্দোলনকে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।[৩৬৬]

ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকদের বিদ্রোহের সাথে সাথে আইয়ুব খাঁন ডিসেম্বরে নতুন করে বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের বিদ্রোহের মুখোমুখি হয়। পিডিএমের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শুরু হলেও বিক্ষোভকারীরা (ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী) তখনো এক প্লাটফর্মে ছিল না। তারা প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে ভুট্টো তার যোগ্য নেতৃত্ব দেখাতে সক্ষম হন। তিনি জাতির স্বার্থে সবার হয়ে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কারণে যতদিন যেতে থাকলো ততই ভুট্টো বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসতে লাগলেন। ভূট্টো শুধু জনগণের মধ্যে নয়, সেনাবাহিনী ও আমলাদের মধ্যেও আস্থা অর্জন করতে থাকে।

এদিকে যখন পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলন চলছে তখন শেখ মুজিবুর রহমান, নিউক্লিয়াসের কয়েকজন সদস্য এবং ভারতীয় গোয়েন্দারা একত্র হয়েছেন। এই লক্ষ্যে ভারতের আগরতলায় একটি মিটিংও হয়। তাদের উদ্দেশ্য তারা পাকিস্তানকে ভাগ করে ফেলবেন। এখানে তিন গ্রুপের তিন উদ্দেশ্য থাকলেও তিন গ্রুপের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল একই। আর সেটা হলো পাকিস্তানের ভাগ। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য বাংলার সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। নিউক্লিয়াসের উদ্দেশ্য কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা। ভারতের উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের একটি বড় অংশ যেখানে পাকিস্তানের প্রায় ৫৮% জনসংখ্যার বসবাস, সেই অংশকে আলাদাভাবে নিজেদের অংশ করে নিবে অথবা করদ রাজ্য বানাবে। তবে আগরতলায় মুশরিক ও মুসলিম গাদ্দারদের এই মিটিং সফল হয়নি, তারা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনি। উপরন্তু আগরতলায় এই রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রের খবর সরকারি গোয়েন্দাদের কাছে ফাঁস হয়ে যায়।

মুশরিকদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করে সরকার। শেখ মুজিব এই অভিযোগ অস্বীকার করে। জনগণ অবশ্য সরকারের কথা বিশ্বাস করেনি। কারণ স্বৈরাচারকে অবিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। পরে ঐ মামলার আসামীদের থেকে জানা

---

৩৬৬. Pakistani students, workers, and peasants bring down a dictator, 1968-1969 / global nonviolent action Database / https://bit.ly/3boSxXf / Access in 7 Mar 2021

www.pathagar.com

গেলো শেখ মুজিবুর রহমান মিথ্যা কথা বলেছেন। আগরতলায় মুশরিকদের সাথে করা দেশভাগের ষড়যন্ত্রের ঘটনা সঠিক।

আগরতলায় মুশরিকদের সাথে শেখ মুজিবের ষড়যন্ত্র

আগরতলা হলো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী। এখানে নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থতায় ১৯৬৩ সাল থেকে এক মুসলিমবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কিছুসংখ্যক বাঙালি অফিসার ও সিপাহি অতি গোপনে সংগঠিত হতে থাকেন। এর নেপথ্যে কাজ করে নিউক্লিয়াস। তারা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ লক্ষ্যে অতি গোপনে কাজ করে যেতে থাকেন। তাদের এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল ভারতীয় মুশরিকদের সহায়তা। চিত্তরঞ্জন সুতার ও কালিদাস বৈদ্যের মধ্যস্থতায় নিউক্লিয়াস বাঙালি অফিসারদের সাথে ভারতীয় অফিসারদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়।

ভারতীয় অফিসাররা এই নিউক্লিয়াস ও কয়েকজন সেনা অফিসারদের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি। তাই তারা নিউক্লিয়াসকে শর্ত দেয় জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা ছাড়া নিউক্লিয়াসকে সহায়তা করা যাবে না। আর গণভিত্তি না থাকলে ভারতের পক্ষে সহায়তা করা উচিত হবে না এবং এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। শেখ মুজিবকে বুঝিয়ে রাজী করান সিরাজুল আলম খান। শেখ মুজিব ভারতীয় হাইকমিশনে যোগাযোগ করে নিউক্লিয়াসের কথার সত্যতা যাচাই করেন।

এছাড়াও শেখ মুজিবের নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল দেশভাগ নিয়ে। এই ব্যাপারে তিনি ১৯৬৩ সালে ভারতের আগরতলায় গিয়েছেন বেনামে ও অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। তার আগরতলা ভ্রমণ ও সেখানে ১৫ দিন থাকা নিয়ে আলোচনা আসলেও তিনি কী প্রসঙ্গে ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দাদের সাথে আলোচনা করেছেন সে ব্যাপারে এখনো সবাই অন্ধকারে আছে। তবে তিনি তৎকালীন মুশরিকদের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে কিছু আবদার নিয়ে চিঠি দিয়েছেন। বিনিময়ে ভারত কী সুবিধা পাবে তাও উল্লেখ করেছেন। এই ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন মহিউদ্দিন আহমেদ তার "আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০)" বইতে।[৩৬৭]

---

৩৬৭. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১১১-১১৭

www.pathagar.com

এই ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালে। শেখ মুজিব তখন জেলে ছিলেন। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকা নিউক্লিয়াস সদস্যরা এই ষড়যন্ত্র এগিয়ে নিয়ে যায়। আগরতলা গিয়ে নিউক্লিয়াস সদস্যরা লে. কর্নেল মিশ্র ও মেজর মেননের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেন।[৩৬৮]

অত্যন্ত গোপনে এই মিটিং করার চেষ্টা করলেও পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতার কারণে এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। যারা মুশরিকদের এই মিটিং-এর কারিগর তারা প্রত্যেকে আলাদাভাবে ভারত গিয়েছে ও ভারত থেকে এসেছে। পাকিস্তানি গোয়েন্দারা কাউকে এরেস্ট না করে নজরদারীতে রেখেছিল। কারণ তখন একজনকে এরেস্ট করলে বাকীরা সতর্ক হয়ে যাবে, হয়তো ভারত থেকে তারা আর ফিরবে না। তাই পাকিস্তানি গোয়েন্দারা গাদ্দারদের ধরার জন্য অপেক্ষা করলো। যখন সবাই ভারত থেকে ফিরে এসে কাজে যোগ দিলো তখন একযোগে সবাইকে গ্রেফতার করলো।

গোয়েন্দাবাহিনী সারা পাকিস্তানে প্রায় দেড় হাজার আওয়ামী কর্মীকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে কালিদাস বৈদ্যও ছিল। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর ১৯৬৮ সালের ৬জানুয়ারী এক প্রেসনোটে ঘোষণা করে যে, সরকার ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এক চক্রান্ত উদঘাটন করেছে। এ ঘোষণায় ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ৮ জনের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ পায়। এতে অভিযোগ করা হয় যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ভারতীয় সহায়তায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিল। স্বরাষ্ট্র দফতর ১৯৬৮ সালের ১৮জানুয়ারী অপর এক ঘোষণায় শেখ মুজিবুর রহমানকেও এ ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করে।[৩৬৯]

সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা ঘোষণা দেয়। এই মামলায় আসামি করা হয়েছিল তাদের নাম[৩৭০]

১। শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)

২। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)

---

৩৬৮. স্বাধীনতা সংগামে আওয়ামীলীগের ভূমিকা / মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি / পানগুছি / পৃ. ১২০

৩৬৯. আওয়ামী লীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬৬

৩৭০. স্বাধীনতা সংগামে আওয়ামীলীগের ভূমিকা / মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি / পানগুছি / পৃ. ১২১

www.pathagar.com

৩। স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান (মাদারীপুর)
৪। প্রাক্তন লিডিং সি ম্যান সুলতান উদ্দিন (নোয়াখালী)
৫। প্রাক্তন এবল সি ম্যান নুর মোহাম্মদ (ঢাকা)
৬। আহমদ ফজলুর রহমান সিএসপি (ঢাকা)
৭। ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ (নোয়াখালী)
৮। প্রাক্তন কর্পোরেল এবি সামাদ (বরিশাল)
৯। দলিল উদ্দিন (বরিশাল)
১০। রুহুল কুদুস সিএসপি (খুলনা)
১১। ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক (বরিশাল)
১২। ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (চট্টগ্রাম)
১৩। বিধানকৃষ্ণ সেন (চট্টগ্রাম)
১৪। সুবেদার আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৫। ইপিআর টিএস ক্লার্ক মুজিবর রহমান (কুমিল্লা)
১৬। সাবেক ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক (কুমিল্লা)
১৭। সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)।
১৮। মোহাম্মদ খুরশিদ (ফরিদপুর)
১৯। খান মোহাম্মদ শামছুর রহমান সিএসপি (ঢাকা)।
২০। রিসালদার শামসুল হক (ঢাকা)
২১। হাবিলদার আজিজুল হক (বরিশাল)
২২। এসএসি মাহফজুল বারি (নোয়াখালী)
২৩। মেজর শামসুল আলম (ঢাকা)
২৪। সার্জেন্ট শামসুল হক (নোয়াখালী)
২৫। ক্যাপ্টেন মোতালিব (ময়মনসিংহ)
২৬। ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর)
২৭। ক্যাপ্টেন খোন্দকার নাজমুল হুদা (বরিশাল)
২৮। ক্যাপ্টেন নুরুজ্জামান (ঢাকা)
২৯। সার্জেন্ট আবদুল জলিল (ঢাকা)
৩০। মাহবুবুদ্দিন চৌধুরী (সিলেট)
৩১। লে. এস এম রহমান (যশোর)
৩২। সাবেক সুবেদার তাজুল ইসলাম (বরিশাল)

www.pathagar.com

৩৩। মোহাম্মদ আলী রেজা (কুষ্টিয়া)

৩৪। ক্যাপ্টেন খুরশিদ (ময়মনসিংহ)

৩৫। লে. আবদুর রউফ (ময়মনসিংহ)

আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলায় ৩৫ জনের মধ্যে মাত্র একজন রাজনীতিবিদ। বাকীরা সবাই সরকারের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা। নিউক্লিয়াস সদস্যদের মধ্যে এগারো জন রাজস্বাক্ষী হয়। ফলে শেখ মুজিব ও আওয়ামী কতিপয় নেতার ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। সাক্ষ্যদের সাক্ষ্যে ও বাকীদের রিমান্ড থেকে পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে প্রতিদিনই পত্রিকায় তাদের কুকীর্তি ফলাও করে প্রকাশ করছে সরকার। যতই কুকীর্তি প্রকাশ করছে জনতা ততই উত্তপ্ত হচ্ছিল মুজিবের বিরুদ্ধে। অবস্থা বেগতিক দেখে আওয়ামী নেতারা ও শেখ মুজিব পুরো ঘটনা অস্বীকার করে। একে আইয়ুবের ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করতে থাকে। বাঙালিরা অবশ্য স্বৈরাচারী আইয়ুবকে নয় ষড়যন্ত্রকারী শেখ মুজিবের ওপর আস্থা রেখেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই মামলাকে বানোয়াট মামলা হিসেবে সাব্যস্ত করেছিল। এই মামলাকে তাই বলা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মিথ্যা মামলা।

যে এগারো জন নিউক্লিয়াস কর্মী রাজসাক্ষী হলেন, তারা হলো, [৩৭১]

১। লে. মোয়াজ্জেম হোসেন (ময়মনসিংহ)

২। প্রাক্তন কর্পোরেল আমির হোসেন মিয়া (মাদারীপুর)

৩। সার্জেন্ট শামসুদ্দিন আহমদ (ময়মনসিংহ)

৪। ডা. সৈয়দুর রহমান (চট্টগ্রাম)

৫। মির্জা রমিজ (চট্টগ্রাম)

৬। ক্যাপ্টেন আবদুল জলিল ভূঁইয়া (কুমিল্লা)

৭। কর্পোরেল জামালউদ্দিন (পাবনা)

৮। কর্পোরেল সিরাজুল ইসলাম (কুমিল্লা)

৯। মোহাম্মদ গোলাম আহমদ (মাদারীপুর)

১০। মোহাম্মদ ইউসুফ (বরিশাল)

১১। সার্জেন্ট আবদুল হালিম (কুমিল্লা)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন

৩৭১. স্বাধীনতা সংগামে আওয়ামীলীগের ভূমিকা / মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি / পানগুছি / পৃ. ১২১

www.pathagar.com

বৃটিশ আইনজীবী ও পার্লামেন্ট সদস্য টমাস উইলিয়াম। তাকে সহায়তা করেন এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ।[৩৭২] এ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খান ও আতাউর রহমান খান উভয়েই ছয় দফা ইস্যুতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। শেখ মুজিব তাদের আওয়ামীলীগ থেকে বের করে দিয়েছে। কিন্তু এই দুই নেতা যখন দেখলেন মুজিব যেভাবে ফেঁসে গিয়েছে নিশ্চয়ই তার ফাঁসি হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। তাই তারা মুজিবকে রক্ষায় আইনী সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এলেন। অন্যদিকে মুজিব যাদের পরামর্শে এই গাদ্দারির সাথে যুক্ত হলেন তারা সটকে পড়েছিল। এই ঐতিহাসিক মামলায় মুজিব আত্মপক্ষ সমর্থনে যে জবানবন্দী দেন তার রাজনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

শেখ মুজিবুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন,

"*স্বাধীনতাপূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিমলীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিমলীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ গঠন করি। আওয়ামীলীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান। ১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিত্ব লাভ করি। অধিকন্তু আমি গণচীনে প্রেরিত বিধান পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেই। জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যে কয়েক বৎসর কারা-নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।*

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার ওপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল

---

৩৭২ স্বাধীনতা সংগামে আওয়ামীলীগের ভূমিকা / মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি / পানগুছি / পৃ. ১২১

www.pathagar.com

বিনা বিচারে আটকে রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯ এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০ এর জানুয়ারীতে আমার উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি লাভের পর আমার ওপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়, যেমন : ঢাকা ত্যাগ করলে আমাকে গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরেও একইভাবে সে বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মতো আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সবলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামীলীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গদল হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেন্ট পদে জনাব আইয়ুব খাঁনের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মুহ্‌তারেমা ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারি কর্তৃপক্ষও পুনরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া আমাকে বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমার দল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করে। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি

www.pathagar.com

আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণকালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশসহ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান। আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত। ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ৬-দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ৬-দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় অংশের জন্যেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে। অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ ৬-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্যে ৬-দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারি নেতৃবৃন্দ ও সরকারি প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' 'গৃহযুদ্ধ' ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম, তখন তাহারা যশোরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে এইবারের মতো প্রথম গ্রেফতার করে। আমাকে যশোরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমাকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন, কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেইদিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা ৭টায় নিজগৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যা ৮টায়, পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার

www.pathagar.com

ওপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়।

পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করেন। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন প্রদান করেন, কিন্তু মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে আমাকে কারা দরজায়ই গ্রেফতার করে। এবারের গ্রেফতারী পরোয়ানা মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীন মোমেনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একইভাবে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেফতারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত ৮মে, আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত ১টার সময় পুলিশ 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুল' এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ শহীদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়।

অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, ইত্তেফাক মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার্স অব কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামীলীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধিবলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

www.pathagar.com

আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ১১ জন নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ জনকে গ্রেফতার করে এবং অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম্ খান প্রায়শই তাহার লোকজন এবং সরকারি কর্মচারীদের সমুক্ষে উন্মুক্তভাবে বলিয়া থাকেন যে, যতদিন তিনি গদিতে আসীন থাকিবেন, ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটকাবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

প্রায় ২১ মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখে রাত ১টার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। আমাকে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয় এবং কাহারো সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না, বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগবিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক-মানসিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রচার করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হওয়ার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮জুন, আমি প্রথম এ্যাডভোকেট জনাব আবদুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাহাকে আমার অন্যতম কৌশলী নিয়োগ করি। কেবলমাত্র আমার ওপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা এবং নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লে. কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, লে. মোজাম্মেল হোসেন, এক্স-কর্পোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতান উদ্দিন আহম্মদ, কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ্ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের কখনো দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান এই তিনজন সিএসপি অফিসারকে আমি জানি। আমি মন্ত্রী হিসেবে সরকারি কার্য সম্পাদনকালে তাহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোনো ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনোদিন লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসগৃহে অথবা করাচীতে জনাব কামাল উদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমার অথবা লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম হোসেনের অথবা করাচীতে জনাব কামাল উদ্দিনের বাসগৃহে কোনো সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই কিংবা তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজউদ্দিনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই।

ঐ সকল ব্যক্তি কোনোদিন আমার গৃহে গমন করে নাই এবং আমিও এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনো ডা. সাঈদুর রহমান কিংবা মানিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাহারা চট্টগ্রামে আমার প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শত শত সাধারণ কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানে তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন মন্ত্রী, এম.এন.এ ও এম.পি.এ.। বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০ জন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ; প্রাক্তন এম.এন.এ., এম.পি.এ. ও অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারো নিকট কোনো প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে, আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মানিক চৌধুরী ও একজন সাধারণ এল.এম.এফ. ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোনো সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করিতে পারি।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্যে ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে আওয়ামীলীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডা. সাঈদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই। আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্যে ন্যায় বিচার চাহিয়াছিলাম। ৬-দফা কর্মসূচীতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্যে আমি যাহাই করিয়াছি, ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডির ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্তে আমাকে সর্বদাই শাসকগোষ্ঠী এবং স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ২৮ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে, তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্রই বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে।

একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে এ কথা জানাইতে চাই যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারি কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে দলিলপত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোনো বিভাগ হইতে কোনো প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক। বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্র জাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার

www.pathagar.com

করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনো পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যে কোনো কিছু করি নাই কিংবা কোনোদিনও এই উদ্দেশ্যে কোনো স্থল, নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো কর্মচারীর সংস্পর্শে কোনো ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।

আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"[৩৭৩]

আগরতলা ষড়যন্ত্র বিষয়ে শেখ মুজিবের এই জবানবন্দী মিথ্যা তা পরবর্তীতে অনেকের কথায় প্রমাণিত হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন, এই মামলার ২৬ নং আসামী ক্যাপ্টেন শওকত আলীর কথায়। তিনি "সত্য মামলা আগরতলা" নামে একটি বই লিখে মুশরিকদের সাথে করা পুরো ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত তুলে ধরেন। বইটির ভূমিকায় তিনি বলেন, "*জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যারা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলাম, "ষড়যন্ত্র" শব্দটি তাদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ আমরা ষড়যন্ত্রকারী ছিলাম না। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব ক'টি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নেবো, তাদের বন্দী করবো এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবো।*"[৩৭৪]

এছাড়া ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখ জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পিকার কর্নেল শওকত আলী বলেন, "*আগরতলা মামলা ষড়যন্ত্র ছিল না, এটা ছিল সত্য। মামলাটি ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য। এই অন্যান্যদের মধ্যে আমরা ৩৪ জন ছিলাম। ১৯৬৮ সালের ১৯জুন আমাদের ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করা হয়। সে সময় পাকিস্তানের ওই বিশেষ আদালতে আমাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগে বলা হয়, আপনারা পাকিস্তানের*

---

৩৭৩. আগরতলা মামলার অপ্রকাশিত জবানবন্দী / মুহাম্মদ শামসুল হক / পৃ. ২৩০-২৩৫

৩৭৪. সত্য মামলা আগরতলা / কর্নেল শওকত আলী / প্রথমা প্রকাশন / ভূমিকা

www.pathagar.com

পূর্বভাগ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথক করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই অভিযোগটি সত্য ছিল।"[৩৭৫]

কর্নেল শওকতের এই কথায় প্রমাণ হয় সে সময় মিথ্যে কথা বলে শেখ মুজিব ও তৎকালীন আওয়ামী নেতারা এদেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ অভিযোগ এনেছিল। তারা সে সময় জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য ও সম্ভাব্য শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য জনগণ ও আদালতকে মিথ্যা বলেছে। ১৯৬৯ সালে এদেশে মুজিব বাঁচানোর জন্য আন্দোলন হয়, সেই আন্দোলনে প্রাণ দেয় আসাদসহ অনেকে। আন্দোলনকারী ও জনগণকে মিথ্যে বলে মুজিব দেশে ফাসাদ লাগিয়ে দেয়।

মুশরিকদের সাথে করা আগরতলা ষড়যন্ত্র যেভাবে ফাঁস হয়

আগরতলা ষড়যন্ত্র কোনোভাবেই একদিনের ঘটনা নয়। এটি ছিল একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা ১৯৬২ সালে নিউক্লিয়াসের সিরাজুল আলম খান শুরু করেছিল। সেনাবাহিনীতে নিউক্লিয়াসের প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন বরিশালের লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়ার মাধ্যমে পুরো নিউক্লিয়াস টিম ধরা পড়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিউক্লিয়াসের সবাই সবাইকে চিনতো না। ফলে বেঁচে গিয়েছে সিরাজসহ নিউক্লিয়াসের মূল কর্তারা।

নিউক্লিয়াস লে. ক. মোয়াজ্জেমকে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনমেন্ট দখলের এসাইমেন্ট দেয়। মোয়াজ্জেম এই এসাইনমেন্ট বাস্তবায়নে যাদের যুক্ত করা দরকার শুধুমাত্র তারাই বিচ্ছিন্নভাবে নানান কমিটিতে যুক্ত ছিল। মূলত নিউক্লিয়াসের একজন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এতগুলো মানুষের নাম পাকিস্তানি গোয়েন্দারা জেনে যায়। নিউক্লিয়াসের ঐ সদস্য শুধুমাত্র যাদের চিনতো কেবল তারাই আটক হয়েছে। মোয়াজ্জেমকে দিয়ে নতুন কোনো তথ্য আদায় করতে পারেনি বলে সেনাবাহিনীতে থাকা নিউক্লিয়াসের সব সদস্যের নাম জানতে পারেনি সরকার।

সিরাজুল আলম খানের নির্দেশনায় সশস্ত্র বাহিনীর ছোট একটি গ্রুপ বাঙালি সেনা

---

৩৭৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগ সত্য : ডেপুটি স্পিকার / বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম / অ্যাকসেস ইন ৭ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

ও অফিসারদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে গোপনে একটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলে। করাচির মনরো দ্বীপে ১৯৬২ সালে এক কর্মকর্তার বাসায় প্রথম আনুষ্ঠানিক গোপন সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। লে. ক. মোয়াজ্জেম, স্টুয়ার্ড মুজিব, সিম্যান নুর মোহাম্মদ ও লিডিং সি-ম্যান সুলতান উদ্দিন এ সভায় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে যাদের বিশ্বাস করা যায়, তাদেরই তারা এ সংগঠনের সদস্য করে নেন। সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেন, সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে।

এ আন্দোলনের একজন উচ্চপদস্থ নেতার প্রয়োজন মনে করা হলে কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ওসমানী নৈতিক সমর্থন জানিয়ে ওই মুহূর্তে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন। তার বক্তব্য ছিল, সশস্ত্র বিদ্রোহ করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা বাঙালি রেজিমেন্টের এখনো হয়নি। আরও ১০টি বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা দরকার। নিউক্লিয়াস সদস্যরা অতটা সময় অপেক্ষা করতে রাজি ছিলেন না।

তারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও মওলানা ভাসানীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হলো। শেখ মুজিবের সঙ্গে বিদ্রোহী দলের প্রথম যোগাযোগ হয় ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে করাচিতে। মোয়াজ্জেম নিজে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয় এবং মোয়াজ্জেম তার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। শেখ মুজিব তখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহর প্রচার নিয়ে ব্যস্ত। তিনি মোয়াজ্জেমকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে ফাতেমা জিন্নাহ নির্বাচনে জিতলে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আর প্রয়োজন হবে না।[৩৭৬][৩৭৭]

১৯৬৬ সালের জুন মাসে মোয়াজ্জেম চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির বাসায় একটি জরুরি সভা ডাকেন। এ সভায় তিনি প্রস্তাবিত নতুন রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ, জাতীয় পতাকার ডিজাইন ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো সদস্যদের সামনে তুলে ধরেন। নীতিগুলো ছিল :

---

৩৭৬. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬৮

৩৭৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র / সাহিদা বেগম / বাংলা একাডেমি / পৃ. ৩৪-৩৫

www.pathagar.com

১) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা;

২) যে কাজ করবে না, সে খাবে না—এ নীতি বলবৎ করা;

৩) সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সরকারের মালিকানাধীন করা;

৪) কলকারখানা জাতীয়করণ করা;

৫) প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করা।[৩৭৮]

এগুলো মূলত নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রীয় কমান্ডের তৈরি করা। মোয়াজ্জেম শুধু তার বাহিনীর কাছে উপস্থাপন করেছে।

অস্ত্রশস্ত্র পাওয়ার উদ্দেশ্যে মোয়াজ্জেম ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি পি এন ওঝাকে মানিক চৌধুরীর মাধ্যমে অস্ত্রের একটি তালিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ওঝা ও মানিক চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের ভার দেওয়া হয় সাবেক করপোরাল আবদুস সামাদকে। এ যোগাযোগ নিরাপদ ও সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য স্থান হিসেবে আহমদ ফজলুর রহমানের স্ত্রী হাসিনা রহমানের ঢাকাস্থ গ্রীন ভিউ পেট্রোল পাম্প নির্ধারণ করা হয়। আবদুস সামাদকে পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজারের চাকরি দেওয়া হয়। চট্টগ্রামের নিউক্লিয়াস সদস্য ডা. সাঈদুর রহমানের মাধ্যমে মোয়াজ্জেম ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ওঝার সঙ্গে পাঁচবার দেখা করেন।[৩৭৯][৩৮০]

এর আগে ১৯৬৭ সালের ২০ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকারি কর্মসূচি ছিল। একই সময় চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করা হচ্ছিল। পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তার চট্টগ্রামে আসার কথা ছিল। গুপ্ত সন্ত্রাসী সংগঠন নিউক্লিয়াস এ সুযোগে সেনাপ্রধানসহ সব কর্মকর্তাকে হত্যা এবং অন্যান্য সেনানিবাসে যুগপৎ আক্রমণ করে দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু মাদারিপুরের করপোরাল আমির হোসেনের একটি ভুলে এ পরিকল্পনার তথ্য সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে চলে যায়। ফলে চট্টগ্রামের অনুষ্ঠান বাতিল

---

৩৭৮. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬৯

৩৭৯. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬৯

৩৮০. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র / সাহিদা বেগম / বাংলা একাডেমি / পৃ. ১৮-২১

www.pathagar.com

করা হয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সরকার সন্দেহভাজন কিছু কিছু গ্রেফতার করার কাজ শুরু করে। কিন্তু এতে নিউক্লিয়াসের কেউ গ্রেফতার হয়নি। ফলে নিউক্লিয়াস থাকে নিরাপদে।

নিউক্লিয়াসের কেউ এরেস্ট না হলেও নিউক্লিয়াসের একটি বড় পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয় লে. ক. মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমির হোসেনের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন। এভাবে নিউক্লিয়াস তাদের বহু সদস্যকে খুন করে। আমীর হোসেনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আশরাফ আলীকে। আশরাফ আমির হোসেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি আমির হোসেনকে সতর্ক করে দেন। সেই থেকে আমির পলাতক হয়ে যান। বহুদিন পলাতক জীবনে থেকে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আমির হোসেন নিউক্লিয়াসের চোখ এড়িয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে চলে আসে।[৩৮১]

নিউক্লিয়াসের সাথে পঞ্চম বৈঠকে ওঝা জানান, ভারত সরকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের আগে বিপ্লবী দলের সঙ্গে ভারত সরকারের কর্মকর্তাদের আলোচনা হওয়া দরকার বলে মনে করে। ওঝা আগরতলায় দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠকের প্রস্তাব করেন। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে এক জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত হয়, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান ও আলী রেজা প্রতিনিধি হিসেবে আগরতলায় যান। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই নিম্নপদের অফিসারদের সাথে আলোচনা করতে রাজি হয় না। এই আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালের শেষদিকে শেখ মুজিব, মোয়াজ্জেমসহ কিছু পদস্থ নেতা ও মূল পরিকল্পনাকারীরা ভারতে আগরতলায় যান।[৩৮২]

এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা অফিসে আমির হোসেন নিজেই হাজির হয়ে যা যা জানেন তার সবকিছু ফাঁস করে দেন। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গোয়েন্দাদের এক চৌকস দল পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তারা অভিযুক্তদের ওপর নজরদারি করেন। নিউক্লিয়াস সদস্যরা ধারণাই করতে পারেনি আমির হোসেন এমন কিছু করবে। তাই তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে

---

৩৮১. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৭০
৩৮২. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬৯

www.pathagar.com

যাচ্ছিল। পাকিস্তানি গোয়েন্দারা তদন্ত করতে গিয়ে আগরতলায় ভারতীয় মুশরিক গোয়েন্দাদের সাথে মিটিং-এর বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পান। এরপর গণগ্রেফতার শুরু হয়। গ্রেফতার পর্ব প্রায় শেষ হয়ে গেলে ১৯৬৮ সালের ৬জানুয়ারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি প্রেসনোট দিয়ে ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে। এর ১২ দিন পর ১৯৬৮ সালের ১৮জানুয়ারী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আরেকটি ঘোষণায় শেখ মুজিবুর রহমান ও শামসুর রহমান খান সিএসপিকে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার অভিযোগে আটক করা হয়।[৩৮৩]

এই ষড়যন্ত্র ফাঁসে সরকারকে সহায়তা করে নিউক্লিয়াসের আমির হোসেনসহ ১১ জন সদস্য। ফলে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য জানা যায়। যদিও মুজিব করাচিতে মোয়াজ্জেমের বাসায় যাওয়া নিয়ে মিথ্যাচার করেছিল। তবে এই প্রসঙ্গে মোয়াজ্জেমের স্ত্রী বলেন, "*এটি ১৯৬৪ সালের কথা। আমার বয়স কম। ক্লাস টেনে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যায়। অনেক কিছুই বুঝতাম না। করাচিতে ড্রিগ রোডে মোহাম্মদ আলী কলোনির বাসায় তার কাছে অনেকেই আসতেন। কথা বলতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো মাঝরাতে এসে আমাকে বললেন, এতজনকে খাওয়াতে হবে। বলতাম, ঘরে তো তেমন কিছু নেই, কী খাওয়াবো? উনি বলতেন, আলু ভর্তা ডিম, যা কিছু হোক, কেউ না খেয়ে যাবে না। মাঝে মাঝে বিরক্ত হতাম।*

মামলা চলার সময় আমাদের বাসায় আসা এদের অনেককে দেখে আমি চিনতে পেরেছি। একদিন সন্ধ্যায় বাসায় এসে বললেন, ভালো কিছু আয়োজন করো, একজন বিশেষ অতিথি আসবেন। আমি কয়েক পদ রান্না করলাম। তারপর কে বা কারা এলো, দেখিনি। সকালে উনি বললেন, জানো কে এসেছিল? শেখ মুজিব! বললাম, আমাকে একটু ডাকলেই পারতে, ওনাকে দেখতাম। শেখ মুজিব দু'বার আমাদের বাসায় এসেছিলেন। শুনেছিলাম, রুহুল কুদ্দুস সাহেব আর আহমদ ফজলুর রহমান সাহেব শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন।

উনি (মোয়াজ্জেম) প্রায়ই উইকএন্ডে করাচি থেকে ঢাকায় যেতেন। শনিবার গিয়ে সোমবারে চলে আসতেন। বলতেন, অফিসের কাজ থাকে। তারপর উনি বদলি হলেন। তখন আমরা বরিশালে। উনি ডেপুটেশনে বিআইডব্লিউটিতে।

---

৩৮৩. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৭০

www.pathagar.com

তিনি বললেন, বরিশালে থাকলে সুবিধা, প্রতি সপ্তাহে ঢাকা যাওয়া যায়। আবার একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ভাত আর রুটি এক থালায় রাখা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানিদের উনি একদম দেখতে পারতেন না। এটি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি হবে হয়তো। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলো। দেখলাম, উনি বসে দু'আ করছেন। বললাম, এত রাতে? নিজের মনেই বললেন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওরা বিলোনিয়া সীমানা ক্রস করেছে।"[৩৮৪]

মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়ার শুরুটা ছিল আওয়ামীলীগের জন্য হতাশাব্যঞ্জক। আইনজীবীদের অন্যতম ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের লেখা থেকে জানা যায়, কে জেড আলম, সাখাওয়াত হোসেন, আবুল খায়ের খান ও মওদুদ এই চারজন তরুণ ব্যারিস্টার শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা কেউ আওয়ামীলীগের সদস্য ছিলেন না। আওয়ামীলীগের নেতারা কেউ জেলে, বেশিরভাগ পলাতক। বাইরে যারা ছিলেন, তারা প্রায় সবাই নিশ্চুপ। মুজিবের সকল মিটিং ও ষড়যন্ত্র ফাঁস হওয়ায় তারা বেশ বিব্রত।

তখন এই চারজন আইনজীবী বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে তার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় যান। বেগম মুজিব প্রথমে তাদের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেছিলেন, আমার বাড়ির ওপর দিয়ে এখন কাক পর্যন্ত ওড়ে না। আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবেরা এই রাস্তা দিয়ে আর যায় না, আমাদের বাড়ি এড়াবার জন্য অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে যায়। বন্ধুবান্ধবেরা যারা তার (মুজিবের) কাছ থেকে উপকার পেয়েছে তারাও আর আসে না, আপনাদের তো আমি চিনি না। এরপর তারা চারজন মানিক মিয়ার সঙ্গে আলাপ করে তাকে নিয়ে বেগম মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং মানিক মিয়ার বাসায় কয়েকটি বৈঠক করেন। বেগম মুজিব তাদের বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। এর প্রায় এক মাস পর তিনি তার এক আত্মীয়কে নিয়ে মওদুদের কায়েতটুলীর বাসায় মাঝরাতে এসে শেখ মুজিবের সই করা একটি ওকালতনামা দিয়ে তাদের উদ্যোগ নিতে বলেন।[৩৮৫]

সিনিয়র আইনজীবীরা কেউ ওকালতনামায় সই দেননি। মওদুদ তখন তরুণ। তিনি লন্ডনে তার বন্ধুদের শরণাপন্ন হন। জাকারিয়া খানের নেতৃত্বে লন্ডনের

---

[৩৮৪] আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৭২-১৭৩
[৩৮৫] চলমান ইতিহাস : জীবনের কিছু সময় কিছু কথা / মওদুদ আহমদ / ইউপিএল / পৃ. ৫৬-৫৮

www.pathagar.com

বাঙালিরা স্যার টমাস উইলিয়ামের সঙ্গে আলোচনা করে তাকে নিয়োগ করে। টমাস উইলিয়াম আসছে জেনে ঢাকায় অনেক আইনজীবী উৎসাহ দেখান। শেষ পর্যন্ত আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে আইনজীবীদের একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব হয়।[৩৮৬] এই মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ও রাষ্ট্রের পক্ষে যে আইনজীবী লড়েন তিনি হলেন টিএইচ খান। তোফাজ্জল হোসেন খান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭৯ সালে তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৫নভেম্বর ১৯৮১ সালে আইন ও বিচার, তথ্য ও বেতার, শিক্ষা, ভূমি, প্রশাসন, ধর্ম, যুব ও ক্রীড়া এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২৪মার্চ ১৯৮২ সালে এরশাদের সামরিক আইন জারি হলে আবারও আইন পেশায় ফিরে যান তিনি। এরশাদের বিরোধিতা করায় ১৯৮৬ সালে গ্রেফতার হন তিনি। ১৯৯২ সালে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।[৩৮৭]

মামলা চলাকালে ২৯আগস্ট আকস্মিকভাবে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বিচারকক্ষে হাজির হন। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনজীবীদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে বসেন। কাঠগড়ায় শেখ মুজিবকে দেখে তিনি দ্রুত তার কাছে যান এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। গুঞ্জন শোনা যায়, ভুট্টো শেখ মুজিবের পক্ষে আইনি লড়াইয়ে নামবেন। ভুট্টো তখন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

একপর্যায়ে ভুট্টো কাঠগড়ার পাশে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে ১০ মিনিট কথা বলেন। তারা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে কথা বলছিলেন। এরপর ভুট্টো বিচারকক্ষ ছেড়ে চলে যান। তিনি শেখ মুজিব বা অন্য কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ওকালতনামায় সই করেননি। ধারণা করা হয় তিনি শেখ মুজিবের লোকদের আন্দোলনে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে চলা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানেও যদি আন্দোলন শুরু হয়

৩৮৬. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৭৪-১৭৫

৩৮৭. বিচারপতি টি এইচ খানের শততম জন্মদিন / বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম / অ্যাকসেস ইন ৭ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

তবে বেকায়দায় পড়বে আইয়ুব খাঁন। ভুট্টো মুজিবের পক্ষে বিদেশেও ক্যাম্পেইন করেন। মুজিবের পক্ষ নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের পক্ষে আন্দোলনে সক্ষম হয়নি আওয়ামীলীগ।[৩৮৮]

১৯৬৮ সালের প্রায় পুরো সময় আওয়ামীলীগ দিশেহারা ছিল। অসহায় হয়ে শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। মামলার কার্যবিবরণী সংগ্রহের জন্য অনেক সাংবাদিক ট্রাইব্যুনাল কক্ষে উপস্থিত থাকতেন। তাদের মাধ্যমে মুজিব ভাসানীকে বারংবার আন্দোলন শুরু করার অনুরোধ জানান। কারণ মুজিব বুঝেছিলেন আইনী প্রক্রিয়ায় এই মামলা থেকে বাঁচার উপায় নাই। রাজনৈতিক চাপে ফেলেই এই মামলা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ভাসানী রাজনীতিতে ভিন্নমত পোষণ করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন আইয়ুব খাঁনের সমর্থক। আইয়ুবের পুরো শাসনামলে তিনি আইয়ুবকে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন। আর এখন আইয়ুব খাঁনের খারাপ সময়ে তার বিরোধীতা করার যৌক্তিকতা ছিল না।

ঊনসত্তরের গণভ্যুত্থান ও আইয়ুবের পতন

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। ক্রমেই সেই আন্দোলন জোরালো হতে থাকে। ১৯৬৮ সালে আন্দোলনের মূল ফোকাস তৈরি করে আইয়ুবের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (NSF)। ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন মাওবাদী কম্যুনিজম ও পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ লালনকারী ছাত্রদের সংগঠন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ঘটনা উপঘটনার মধ্য দিয়ে আন্দোলন ক্রমেই বড় হতে থাকে।

এদিকে বাংলায় ১৯৬৭ সালে পিডিএমের অনেক জনসভা হলেও আন্দোলন সেভাবে জমে ওঠেনি। কারণ আন্দোলনের মূল উৎস ছাত্ররা বেশিরভাগ শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ১৯৬৭ এর শেষে ও ১৯৬৮ সালের শুরুতে আগরতলা মামলায় বহু আওয়ামী ও ছাত্রলীগ নেতা এরেস্ট

---

৩৮৮. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৭৬

www.pathagar.com

হয়েছে। আর যারা এরেস্ট হন নাই যেমন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা শেখ মুজিবের আগরতলা ষড়যন্ত্র নিয়ে বেশ বিব্রত ছিলেন। তাই ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলায় আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন জমে ওঠেনি।

ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফোরাম ঢাবি অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন গভর্ণর মোনায়েম খান (কিশোরগঞ্জ)। ১৯৬৮ সালে ছাত্রলীগ আগরতলা ষড়যন্ত্র ইস্যুতে ব্যাকফুটে গেলে মোনায়েম তার সমর্থকদের দিয়ে NSF কে চাঙ্গা করেন। বলাবাহুল্য ঢাবির এই NSF আর পাঞ্জাবের NSF এক ছিল না। ঢাবির NSF সরকারের গুন্ডাবাহিনী হিসেবেই তৈরি হয়েছে। তারা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তো করেইনি। উল্টো আইয়ুব বিরোধীদের শায়েস্তা করতো। ক্যাম্পাসে শক্তি প্রদর্শন, আইয়ুব বিরোধী শিক্ষকদের হেনস্তা করা ইত্যাদি তাদের নিয়মিত কাজ ছিল। ১৯৬৮ সালে আন্দোলন জমাতে না পারার কারণ হিসেবে নিউক্লিয়াস NSF কে দায়ী করে।

বাংলার রাজনীতিতে অনেক খারাপ ট্রেডিশন শুরু করে নিউক্লিয়াস। এর মধ্যে একটি ছিল ঢাবি ক্যাম্পাসে ছাত্রহত্যা। NSF এর যে ক'জন প্রভাবশালী ছাত্রনেতা ছিল তাদের মধ্যে সাইদুর রহমান, জমির আলী ও মাহবুবুর রহমান খোকা ছিল অন্যতম। এর মধ্যে সাইদুর রহমানের আরেক ব্যঙ্গ নাম ছিল পাচপাত্তু। যতদূর জানা যায় সে পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সে বার বার ফেল করায় প্রমোশন পায়নি। অন্যদিকে তার ক্লাসমেটরা এমএসসি পার্ট টু এর ছাত্র। সে নাকি নিজেকে এমএসসি পার্ট টু এর ছাত্র দাবী করতো, অথচ তার পাস কোর্স শেষ হয়নি। অবশেষে তাকে আড়ালে ব্যঙ্গ করে ডাকা হতো সাইদুর রহমান পাস পার্ট টু। পাস পার্ট টু ধীরে ধীরে পাচপাত্তুতে পরিণত হয়। ১৯৬৮ সালের অক্টোবরে ছাত্রলীগ (নিউক্লিয়াস) NSF কে ভয় দেখিয়ে ক্যাম্পাস ছাড়া করার উদ্যোগ নেয়। এজন্য তারা তিন নেতা পাচপাত্তু, জমির ও খোকাকে হত্যার ঘোষণা দেয়। এর কিছুদিন পর অক্টোবর মাসে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে নিউক্লিয়াস পাচপাত্তুকে ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে খুন করে।[৩৮৯] জমির ও খোকা পালিয়ে যায়। শুরুতে ছাত্রলীগ আনন্দ মিছিল করলো। খুনের আসামী ধরতে প্রশাসন তৎপরতা চালালে ছাত্রলীগও ক্যাম্পাস ছাড়া হয়।

---

৩৮৯. ডন অব ঢাকা / সংগ্রামের নোটবুক / https://bit.ly/3v0WQQa / অ্যাকসেস ইন ৭ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন আইয়ুবের ভিত নড়ে উঠেছে। আইয়ুবের পতন এখন পিডিএম, NSF এবং ভুট্টোর একক দাবীতে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় আইয়ুব মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বন্ধু ভাসানীর দারস্থ হয়েছেন। সে চেয়েছিল ভাসানীর মাধ্যমে ছয় দফার পক্ষে, আগরতলার দেশবিরোধী আসামীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন করিয়ে নিতে। কারণ পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাচ্ছে বা ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখলে নিচ্ছে এমন ভয় দেখিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলন কন্ট্রোল করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বাইরে কোনো হরতাল, অবরোধ, জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন সফল করতে দিচ্ছেন না চৌকস মোনায়েন খান। তিনি শক্ত হাতে ঢাকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিলেন। পুলিশকে দিয়ে গুলি না করিয়ে তিনি আন্দোলন তৈরি করতে পারে এমন নেতাদের চাপে রেখেছিলেন। ফলে ঢাকা ছিল নিরুত্তাপ। তিনি পাচপাত্তু খুনের ঘটনায়ও মাথা গরম করেননি।

আইয়ুবের ইশারায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের মুক্তির দাবীতে ১৯৬৮-১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আইয়ুবের পরিকল্পনা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন হলে দেশ ভেঙে যাচ্ছে জুজু দেখিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পিডিএম ও ভূট্টোর নেতৃত্বে চলা আন্দোলনকে প্রশমিত করবেন।

১৯৬৮ সালের ২৮নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের এক যৌথসভায় ৬ডিসেম্বরকে জুলুম প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ৬ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় মওলানা ভাসানী বলেন "পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী মানিয়া না লইলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পূর্ব বাংলা গঠন করিবে"। পল্টনের ওই জনসভার পরদিন ৭ডিসেম্বর ঢাকায় হরতাল আহ্বান করা হয়। ওই দিনে পুলিশ মিছিলে গুলি চালিয়ে তিন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। ব্যস্! আন্দোলন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। দিনে দিনে তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে শহর-বন্দরগঞ্জে। চারদিকে নিউক্লিয়াস সক্রিয় হয়ে ওঠে। মোনায়েম খান ভাসানীকে এরেস্ট করেননি। ১৯৬৯ সালের ৮জানুয়ারী পর্যন্ত ভাসানী একাই আন্দোলনে গতি এনে দেন। পুলিশ নিষ্ক্রিয় প্রায়।[৩৯০]

৩৯০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব / মাযহারুল ইসলাম / আগামী প্রকাশন / পৃ. ৩৫৪

www.pathagar.com

ভাসানী তার সভা সমাবেশে আইয়ুব বিরোধী কথা না বলে একের পর স্বাধীনতার প্রস্তাব ও শেখ মুজিবের মুক্তির কথা বলে যাচ্ছেন। এর মধ্যে নিউক্লিয়াস দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। তারা কি ভাসানীকে সামনে রেখে বিপ্লব করে ফেলবে! নাকি আওয়ামীলীগ অথবা শেখ মুজিবের জন্য অপেক্ষা করবে! তবে তারা ভাসানীর দিকেই ঝুঁকেছে বেশি। অন্যদিকে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে আওয়ামীলীগ পরিচালনা করছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। যতদূর জানা যায় তিনি নিউক্লিয়াসের ব্যাপারে অবগত ছিলেন না। তাই নিউক্লিয়াসের প্রভাবও তার ওপর বিদ্যমান ছিল না। তাই তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণভিত্তি তৈরির বাইরে যে কোনো কর্মসূচীকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অবস্থাদৃষ্টে যা মনে হলো মায়ের চাইতে মাসির দরদ বেশি। আওয়ামীলীগের চাইতে ন্যাপ বেশি ভূমিকা রাখছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উইথড্রো করতে, শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

১৯৬৯ সালের ৪জানুয়ারী ডাকসু, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ, মাওবাদী) ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ, মার্ক্সবাদী) এর নেতৃবৃন্দ 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে এবং তাদের ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১১ দফার মধ্যে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত ৬ দফার সাথে ছাত্র সমস্যাকেন্দ্রিক দাবী দাওয়ার পাশাপাশি কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত দাবীসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১১ দফা কর্মসূচি আন্দোলনে ব্যাপক গতি এনে দেয়।

১১ দফা নিম্নরূপ~

১. হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত আইন বাতিল করা এবং ছাত্রদের সকল মাসিক ফি কমিয়ে আনা।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দেওয়া এবং দৈনিক ইত্তেফাকের প্রকাশনার নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া।

৩. ছয় দফা দাবীর শর্তানুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশগুলোকে (অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ,

www.pathagar.com

বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু) স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন করা।

৫. ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ।

৬. কৃষকদের ওপর থেকে কর ও খাজনা হ্রাস এবং পাটের সর্বনিম্নমূল্য ৪০ টাকা ধার্য করা।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক আন্দোলনে অধিকার দান।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৯.জরুরি আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার।

১০. সিয়াটো (SEATO), সেন্ট্রো (CENTRO) সহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ।

১১. আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ও অন্যান্যদের ওপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহার করে নেওয়া।[৩৯১]

ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি :

৮জানুয়ারীতে পূর্ব পাকিস্তানে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে ডাক (DAC) গঠনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির (ডাক) শরীকদল ছিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগ (মুজিব), পাকিস্তান আওয়ামীলীগ (তর্কবাগীশ), জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (তোয়াহা, মার্ক্সবাদী), পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিমলীগ, পাকিস্তান জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, নেজামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী। ভাসানীর সাথে আইয়ুবের যোগাযোগ ও ভাসানীর প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি সবার জানা। তাই কোনো বিরোধী দল ভাসানীর সাথে যুগপৎ আন্দোলনে রাজি

---

৩৯১. এগারো দফা / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/৩৮fak০U / অ্যাকসেস ইন ৭ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

হয়নি। তাই ভাসানী আন্দোলন শুরু করলেও কেউ তার সাথে যুক্ত হয়নি। [৩৯২]

ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির আট দফা দাবী ঃ-

১- ফেডারেল পার্লামেন্ট সরকার প্রবর্তন

২- প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন

৩- অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার

৪- নাগরিক অধিকার বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল

৫- শেখ মুজিবুর রহমান, খান আব্দুল ওয়ালী, জুলফিকার আলী ভুট্টোর মুক্তিদান

৬- ১৪৪ ধারার আওতায় সকল প্রকার আদেশ প্রত্যাহার

৭- শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহালকরণ

৮- সংবাদ পত্রের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহালকরণ[৩৯৩]

ডাক ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ যুগপৎ আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে ও সরকারি নিপীড়নের প্রতিবাদে ২০জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসভা ও প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচি হাতে নেয় তারা। এ মিছিলে পুলিশের গুলিতে মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়নের অন্যতম নেতা আসাদউজ্জামান নিহত হলে গণজাগরণ রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানের। এরপর ২৪জানুয়ারী গুলিতে নবম শ্রেণির ছাত্র মতিউর এবং ছুরিকাঘাতে রুস্তম নিহত হলে ঢাকার পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। শহরের নিয়ন্ত্রণভার সেনাবাহিনীর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়। পরদিন সেনাবাহিনী ও ই.পি.আর এর বেপরোয়া গুলিতে ঢাকার নাখালপাড়ায় গৃহবধূ আনোয়ারা বেগম গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলে তার প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র।

এদিকে বাইরের পরিস্থিতি অনেক উত্তপ্ত দেখে ক্যান্টনমেন্টে আটকে থাকা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফজলুল হক বিদ্রোহ

---

৩৯২. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৮১

৩৯৩. রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী / এ. কে. এম. নাজির আহমদ / দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম / পৃ. ২৬

www.pathagar.com

করে বসে। তারা ওয়াশরুমে যাওয়ার কথা বলে বের হয়ে এক সৈনিকের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে জিম্মি করে। তাদের প্রচেষ্টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। জহুরুল হক ও ফজলুল হক দু'জনই গুলিবিদ্ধ হন। তাদের সিএমএইচ-এ চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু সংবাদে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে যায়। আন্দোলন আরো ভয়ানক হয়ে ওঠে। এমন উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠে যে, ঐদিন বিকেলে মওলানা ভাসানী তার জনসভায় দু'মাসের মধ্যে ১১ দফার বাস্তবায়ন এবং সকল রাজবন্দির মুক্তি দেওয়া না হলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেলখানা ভেঙ্গে শেখ মুজিবকে ছিনিয়ে আনা হবে। সভা শেষে ছাত্রলীগ (নিউক্লিয়াস) মন্ত্রী ও বিচারকদের ঘরে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট শুরু করে।[৩৯৪]

এভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে চলা যুগপৎ আন্দোলনে ও গণঅভ্যুত্থানের প্রবল চাপে আইয়ুব পিছু হটেন। তিনি শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতা করে ফেলেন। ১৯৬৯ সালের ২১ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খাঁন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বিরোধী দলগুলোর সাথে আলোচনা করার জন্য তিনি ২৬ফেব্রুয়ারী গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। তিনি চেয়েছেন যেন আন্দোলনকারী সব দল তার সাথে আলোচনায় বসে।

২২ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে আইয়ুব খাঁন। শেখ মুজিবসহ ৩৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩ তারিখ গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় শেখ মুজিবকে। সেখানে তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। সারা ঢাকা শহরে আনন্দ মিছিল করে ছাত্রলীগ। রণক্ষেত্র ঢাকা থেকে উৎসবের ঢাকায় পরিণত হয়। মুজিব তার জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে যান। বক্তৃতায় শেখ মুজিব সব বিরোধী দলকে শান্ত থাকার জন্য আহ্বান করেন এবং প্রেসিডেন্টের সাথে গোল টেবিল আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আইয়ুবের প্রতি আস্থা রাখার জন্য আওয়ামীলীগসহ সব বিরোধী দলকে আহ্বান জানান।[৩৯৫]

মুজিবের মুক্তির পর রাওয়ালপিন্ডি থেকে উড়ে আসেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

---

৩৯৪. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ/ প্রথমা প্রকাশন পৃ. ১৮৫-১৮৬

৩৯৫. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৯০-১৯২

www.pathagar.com

তিনি ভাসানী ও মুজিবের সাথে বৈঠক করেন। ধারণা করা হয় তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। মুজিবের মুক্তির পর থেকে ঢাকায় আন্দোলন সংগ্রাম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শেখ মুজিবের অনুরোধে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি আইয়ুবের সাথে আলোচনায় যোগ দিতে রাজি হয়। অবশেষে ২৬ তারিখ গোলটেবিল মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। নানান বিষয়ে ও দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর ঈদুল আযহা উপলক্ষে বিরতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আবারো ১৯৬৯ সালের ১০মার্চ থেকে গোলটেবিল আলোচনা শুরু হয়। গোলটেবিল আলোচনায় ভাসানী ও ভুট্টো অংশগ্রহণ করেনি।

গোল টেবিল বৈঠকের আগে ২৩ ও ২৪ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খাঁনের সাথে শেখ মুজিবের আন্তরিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মুজিব আইয়ুবকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আগামী নির্বাচনে প্রার্থী না হওয়া আপনার ভুল। আইয়ুব তার ডায়েরিতে লিখেন, আমাদের কথাবার্তা ছিল খোলামেলা। মুজিবকে একটু আপোসমূলক মনে হলো। তার ওপর তার দলের চরমপন্থীদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল এবং ছাত্ররা তার নিয়ন্ত্রণের পুরোপুরি বাইরে ছিল।[৩৯৬]

এদিকে ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানের NSF আন্দোলন থেকে এক চুলও সরে আসেনি। বরং আরো বেশি জ্বালাও, পোড়াও, অবরোধ শুরু করে দিয়েছে। তাদের একটাই দাবী, আইয়ুবের পতন হতে হবে। ১৩মার্চ গোলটেবিল আলোচনার সমাপ্তি হয়। ১৪মার্চ ঢাকায় ফিরে মুজিব ভাসানীর সমালোচনা করেন এবং রাজনীতি থেকে অবসরে যাওয়ার পরামর্শ দেন।[৩৯৭]

গোলটেবিল সমাপ্তিকালে আইয়ুব খাঁন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এবং ফেডারেল পার্লামেন্টারি প্রবর্তনের দাবী মেনে নিয়েছেন বলে ঘোষণা দেন। তার এই ঘোষণা ভুট্টোকে থামাতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র আন্দোলন চলতে থাকে। এমতাবস্থায় আইয়ুব খাঁনের ওপর সেনাবাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে ২৫মার্চ আইয়ুব খাঁন সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন।

আমাদের অনেক ভুল ইতিহাস শেখানো হয় তার মধ্যে একটি হলো, ভাসানীর

৩৯৬. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৯৫

৩৯৭. আওয়ামীলীগ : উত্থানপর্ব (১৯৪৮-১৯৭০) / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৯৮

www.pathagar.com

নেতৃত্বে ঢাকায় সৃষ্টি হওয়া গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খাঁনের পতন হয়। মূলত আইয়ুবের বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (PDM) এর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ সালে। তারই ধারাবাহিকতায় পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও NSF এর আন্দোলন শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবকে মুক্ত করার আন্দোলন শুরু হয় ৮ডিসেম্বর এবং এই আন্দোলনের শেষ হয় ২২ফেব্রুয়ারী। PDM ও DAC এক পর্যায়ে আইয়ুব খাঁনকে রেখেই শান্তিপূর্ণ সমাধানে রাজি হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো ও NSF আন্দোলন চালিয়ে গেলে আইয়ুব খাঁনের পতন হয় ২৫মার্চ।

পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান

আমাদের প্রচলিত ইতিহাসে পাকিস্তান আমল সম্পর্কে আমাদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন পাকিস্তানিরা বৃটিশদের মতো আমাদের ওপর চেপে বসেছে অথবা আমাদের দেশ দখল করে তারা আমাদের শাসন করেছে। বস্তুত এটা মোটেও সত্য নয়। বরং পাকিস্তান তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে পাকিস্তানের ২৪ বছর আমলে বাঙালিরা শাসকগোষ্ঠীর সাথে ছিলেন। পাকিস্তান আমলকে মোটাদাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক গণতান্ত্রিক পাকিস্তান ও দুই সেনা শাসনের পাকিস্তান। গণতান্ত্রিক পাকিস্তানের সময় ছিল সাড়ে এগারো বছরের মতো। এই সময়ে ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, মোহাম্মদ আলী বগুড়া, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো বাঙালি নেতারা।

সে সময় পাকিস্তানের বড় জাতিগোষ্ঠী ছিল বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচ, পশতুন ও কাশ্মীরি। গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে ৭ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৩ জন প্রধানমন্ত্রী ছিল বাঙালি, ৩ জন ছিলেন পাঞ্জাবি, বাকী একজন হলেন গুজরাটের (ভারত হতে আগত)। তাছাড়া ৭ জনের প্রতিটি মন্ত্রীসভায় বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল বেশ ভালো। তাই পাকিস্তানে বাঙালিদের শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে রাখা হয়েছে এমন ধারণা অমূলক।

পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের মধ্যে সাড়ে ১২ বছর ছিল সেনা শাসন। এর মধ্যে আইয়ুব খাঁন সাড়ে ১০ বছর আর ইয়াহিয়া খান ২ বছর। আইয়ুব খাঁন শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সমস্যা ছিলেন না বরং সমগ্র পাকিস্তানের জন্যই সমস্যা ছিলেন। বেশি সমস্যা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। আর এজন্য

www.pathagar.com

তারা আইয়ুবের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন করে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েছে। অন্যদিকে আইয়ুব বাঙালিদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছে এবং ঢাকাকে সেকেন্ড ক্যাপিটাল হিসেবে গড়ে তুলেছে। তাই আইয়ুবের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন করেনি বাঙালিরা। বরং ভাসানীর মতো জনপ্রিয় নেতা আইয়ুবের হয়ে কাজ করেছেন। সময়ে সময়ে শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগও আইয়ুবের সাথে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছে। আইয়ুবের মন্ত্রীসভায়ও বাঙালিদের আধিক্য ছিল।

বস্তুত ১৯৪৭ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর আমল থেকেই এ অঞ্চলের উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জিন্নাহ বিমান বা স্থল বাহিনীর পাশাপাশি নৌ-বাহিনীকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য নৌ-পথই একমাত্র উপায় বলে সম্ভবত নৌ-বাহিনীকে শক্তিশালী করার আগ্রহ তার বেশি ছিল। রিয়ার এডমিরাল জে. ডব্লিউ জেফোর্ড হাজার মাইল দূরে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো নেভাল বেস না থাকায় ক্রুসহ একটি গোটা বেতার ষ্টেশন চট্টগ্রামে আকাশ পথে নিয়ে এসে বসালেন।

দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য আমাদেরকে যেমন চীন-কোরিয়ানদেরকে Foreign Direct Investment করার জন্য আহ্বান জানাতে হচ্ছে, তাদেরকে বিভিন্ন tax rebate দিতে হচ্ছে। পাকিস্তান হবার পর ইস্পাহানী, আদমজী, বাওয়ানীসহ বড় বড় শিল্পোদ্যক্তাদেরকে দেশের এ অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তারা প্রতিষ্ঠিত করেন আদমজী, ইস্পাহানী ও বাওয়ানী জুট মিল এবং এদের পথ অনুসরণ করে বাংলাভাষী মুসলমানরা ১৯৭১ সালের মধ্যে পাটকল গড়ে তুলে ৭৬টি, বস্ত্রকল ৫৯টি ও চিনি কল পূর্বের ৪টিসহ ১৫টি। [৩৯৮]

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই অঞ্চলে রেলপথের প্রসার, টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। তবে বাংলার উন্নয়নের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন তাল মেলাতে পারেনি। কারণ ১৯৪৭ সালে বৃটিশদের শোষণের ফলে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক বেশি। ইংরেজ আমলে সবচেয়ে বেশি শোষণের শিকার হয়েছে পূর্ব বাংলা। এখানে শিল্প কারখানা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে চলেছে

---

৩৯৮. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৩৬

www.pathagar.com

১০০ বছর। এই ১০০ বছর কোম্পানী শাসনে চলেছিল। পরবর্তী ৮০-৯০ পশ্চিম পাকিস্তান পুরোপুরি বৃটিশদের কবলে আসে। কিন্তু ততক্ষণে বৃটিশরা তাদের বর্বরতা থেকে অনেকটাই সরে এসেছিল। এরপরও পূর্ব বাংলায় উন্নয়ন হয়নি হিন্দুদের কঠোর বিরোধীতায়। তাই ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার অবস্থা ছিল পুরো ভারতের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা।

সেখান থেকে পূর্ব বাংলাকে কামব্যাক করার সুযোগ দিয়েছেন পাকিস্তান আমলের শাসকেরা। ২৪ বছরে উন্নয়নের হার পাকিস্তানের অন্য অঞ্চলগুলোর চাইতে অবিশ্বাস্য রকম বেশি ছিল। এই ২৪ বছরে তাই আপনি একটি আন্দোলনও দেখাতে পারবেন না যেখানে বৈষম্যের জন্য আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলন যা হয়েছে সব ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। জাতিগত আন্দোলন হয়েছে শুধু একটা আর সেটা হলো ভাষা আন্দোলন। কিন্তু পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ জনগণ ভাষা আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন।

পাকিস্তান আমলের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো[৩৯৯]

০১. বাংলাদেশ সচিবালয় (১৯৭১ সনের পর এ সচিবালয়ের পুরাতন ৬ নং ভবনটি ভেঙে ২০ তলা ভবন তৈরি করা হয়)

০২. পাকিস্তানের Second capital হিসেবে শেরেবাংলা নগরকে পরিকল্পিতভাবে তৈরি (যার সুবিধা আমরা এখন নিচ্ছি)

০৩. সংসদ ভবন (পাকিস্তানের গণপরিষদের জন্য তৈরি বিশাল কমপ্লেক্স)

০৪. বায়তুল মোকাররম মসজিদ (পাকিস্তানের জন্য আইকনিক ও সবচেয়ে বড় মসজিদ)

০৫. বাংলা একাডেমি (বাংলা ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য)

০৬. ইসলামিক একাডেমি (বর্তমান ইসলামী ফাউন্ডেশন)

০৭. পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা)

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসকরা চলে যাবার সময় ঢাকায় কোনো বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ছিল না। অথচ ভারতের প্রায় সব শহরেই তখন কেন্দ্রীয়ভাবে বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। ঢাকার নবাব পরিবারের জন্য তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দু'টি

---

৩৯৯. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৩৭-৩৮

www.pathagar.com

জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৪৮ সালে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিস্থিতির পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অধিদপ্তর তৈরি করা হয়।

১৯৫৯ সালে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ওয়াপদা) তৈরি করা হয়। ১৯৬০ সালে উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করা হয় সিদ্ধিরগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনায় (সর্বোচ্চ উচ্চক্ষমতার কেন্দ্রের আকার ছিল সিদ্ধিরগঞ্জে ১০ মেগাওয়াটের স্টিম টারবাইন)। তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা গিয়ে দাঁড়ায় ০ মেগাওয়াট থেকে ৪৭৫ মেগাওয়াট। যার অধিকাংশই উৎপাদিত হতো প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল চালিত জেনারেটর দ্বারা, স্টিম টারবাইন জেনারেটর দ্বারা এবং জল বিদ্যুৎ থেকে।

০৮. কমলাপুর রেল ষ্টেশন (পূর্বতন রেল ষ্টেশনটি ছিল গুলিস্তান-ফুলবাড়িয়ায়)

০৯. মিরপুর চিড়িয়াখানা (পূর্বতন চিড়িয়াখানায় বর্তমানে জাতীয় ঈদগাহ, সুপ্রীম কোর্টের প্রবেশদ্বারসহ প্রাঙ্গণ, বার কাউন্সিল, সড়ক ভবন নির্মিত হয়েছে)

১০. কুর্মিটোলা বিমানবন্দর (ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর)

১১. যমুনা সেতু (১৯৬৬ সনে একনেকে অনুমোদিত)

১২. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৬১ সনে এটির পরিকল্পনা গ্রহণ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়, যারা বর্তমানে ইরান-ইরাকে কর্মরত। ১৯৭২ সালে প্রকল্পটি শেখ মুজিব বন্ধ করে দেয়)

১৩. জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়

১৪. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

১৫. শেরে বাংলা কৃষি কলেজ (এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)

১৬. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৭. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. ইস্ট পাকিস্তান হেলিকপ্টার সার্ভিস[৪০০] (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, চাঁদপুর, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, ফরিদপুর এই

---

৪০০. History of PIA / https://bit.ly/38iUOBf / Access in 7 Mar 2021

www.pathagar.com

স্থানগুলোর সাথে ঢাকার যোগাযোগ দ্রুত করতেই এই সার্ভিসের আয়োজন করে পাকিস্তান। এই সার্ভিস সরকারি ভর্তুকি দিয়ে পরিচালনা করা হতো। অথচ এ রকম সার্ভিস পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না)

১৯. শাহজীবাজার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

২০. আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

২১. কর্ণফুলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

২২. হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল

২৩. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প

২৪. রামপুরা টেলিভিশন ভবন (পাকিস্তানের টেলিভিশন সেন্টার লাহোরে ও ঢাকায় একই সাথে স্থাপন করা হয়। লাহোরে সম্প্রচার শুরু হওয়ার একমাস পরে ঢাকায় সম্প্রচার শুরু হয়)

২৫. ঢাকা স্টেডিয়াম (বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম)

২৬. জাতীয় যাদুঘর (পূর্বতন যাদুঘরটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে)

২৭. WAPDA এবং এর অধীন শতশত বাঁধ ও সেচ প্রকল্প

২৮. ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (যা বর্তমানে রাজউক নামে পরিচিত। ঢাকাকে আধুনিক ও পরিকল্পিত নগর করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, গুলশান, বনানী প্রভৃতি পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গঠন ও নগরায়ন। ঢাকা রক্ষা বাঁধসহ বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া ও বাস্তবায়ন করা হয়)

২৯. শত শত পাট ও কাপড়ের কল যা বাংলাদেশ হওয়ার পর জাতীয়করণের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়

৩০. শিল্পায়নের জন্যে গড়ে তোলা হয় East Pakistan Industrial Development Corporation (EPIDC)

৩১. গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা (Ordinance Factory)

৩২. গাজীপুর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি

www.pathagar.com

৩৩.The Mercantile Marine Academy পরবর্তীতে নাম Bangladesh Marine Academy

৩৪. Institute of Postgraduate Medicine and Research (পিজি হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়)

৩৫. মংলা সামুদ্রিক বন্দর

৩৬. ঢাকার নিউ মার্কেটসহ বিভাগীয় শহরে এক একটি নিউমার্কেট তৈরি।

৩৭. রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, সিলেট বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

৩৮. পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পারাপারের জন্য এটি তৈরি করা হয়, বর্তমান নাম বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ। অব্যাহত দুর্নীতির ফলে স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান লাভের মুখ দেখেনি। অথচ পাকিস্তান আমলে তা লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল)

তারপরও মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে এ অঞ্চলের মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ অঞ্চলের মানুষকে কেবল শাসন-শোষন করেছে, উন্নয়নমূলক কোনো কাজ করেনি। এছাড়া সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করা হয়। তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের জন্য ১৯৭১ সালের পরে যে তত্ত্বকথা ও যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছিল, তা ছিল দু'অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দৃশ্যমান বৈষম্য ও বিভিন্নতা। পূর্ব পাকিস্তানকে দেখানো হয় পশ্চিম পাকিস্তানি জনগোষ্ঠীর শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে।

আমরা যে পরিসংখ্যানগুলো জানি, তা মূলত ষাট-এর দশকের শেষ দিকে প্রাপ্ত কিছু সংখ্যা ও সংখ্যাতত্ত্ব। এর মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের তথা কেন্দ্রীয় সুপিরিয়ার সার্ভিস (সিএসএস) ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম থাকা। উপস্থাপিত পরিসংখ্যানে এটাও দেখানো হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কম অর্থ বরাদ্দ করা। যদিও উপস্থাপিত ঐ পরিসংখ্যান অসত্য ছিল না; কিন্তু জনগণের সামনে যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রচারণা সেই পরিসংখ্যান নিয়ে চালানো হয়েছে, তা মোটেও সত্যি ও বাস্তব নির্ভর ছিল না। ঐসব পরিসংখ্যানকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রচারণা সর্বোতভাবে

www.pathagar.com

সত্যি ছিল না; হয়তো কিয়দাংশ ছিল ব্যতিক্রম এবং তাও ছিল অর্ধসত্য।

পুরো পরিসংখ্যান সহজ হয়ে যাবে যদি আপনি কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করেন। তখন আপনার দিব্যচোখে যে বৈষম্য দেখছেন তা বৈষম্য থাকবে না। অনেকক্ষেত্রে উদারতা মনে হবে।

প্রথমত : তৎকালীন পাকিস্তানে প্রদেশ ছিল পাঁচটি। বরাদ্দ হয়েছে প্রদেশভিত্তিক। প্রদেশভিত্তিক উন্নয়ন বরাদ্দ যদি আপনি ধরেন তাহলে আপনি মোট বরাদ্দকৃত অর্থকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করুন। তাহলে দেখা যাবে বেশি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের জন্য।

বছর	পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্কালিন ব্যয় (রুপি কোটিতে)	পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্কালিন ব্যয় (রুপি কোটিতে)	সমান ভাগ হলে বাংলাদেশ পাবার কথা
১৯৫০-৫৫	১১২৯	৫২৪	৩৩০
১৯৫৫-৬০	১৬৫৫	৫২৪	৪৩৫
১৯৬০-৬৫	৩৩৫৫	১৪০৪	৯৫১
১৯৬৫-৭০	৫১৯৫	২১৪১	১৪৬৭
মোট	১১৩৩৪	৪৫৯৩	৩১৮৫

টেবিলঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে অর্থনৈতিক সমীক্ষা[৪০১]

এখানে আমি বলতে চাই না বাংলাদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। সাধারণত বরাদ্দ দেওয়া হয় প্রয়োজন অনুসারে। পাকিস্তানের এই অংশ আকারে ছোট হলেও এখানে মানুষ ছিল বেশি। পাকিস্তানের একটি প্রদেশ বাংলাদেশে ছিল অধিকাংশ মানুষ। সেই হিসেবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এখানে বরাদ্দ কিছুটা বেশি বরাদ্দের প্রয়েজন ছিল, এটিই স্বাভাবিক।

বরাদ্দের ক্ষেত্রে সমান হতে হবে এই ধারণা অবান্তর। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় কি সমান বরাদ্দ হয়? বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে কি সমান বরাদ্দ

---

৪০১. পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ মেয়াদী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য উপদেষ্টা প্যানেলের রিপোর্ট।

www.pathagar.com

হয়? আবার কিছু কিছু বরাদ্দ আছে দূর্যোগকালীন। দূর্যোগ হলে বরাদ্দ হয়, খরচ হয়। আবার দূর্যোগ না হলে খরচ হয় না। এভাবেই চলে। এই নিয়ে প্রতিবেদন দাঁড় করানো অন্যায়, অযৌক্তিক।

দ্বীতিয়ত : যে কোনো দেশের উন্নয়ন হয় রাজধানী কেন্দ্রীক। একটা পরিসংখ্যান দাঁড় করানো হয় পাট, পাটজাতীয় দ্রব্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বেশি উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে। কিন্তু উন্নয়ন বেশি হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। মূল কথা হলো সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে উন্নয়ন বেশি হয়নি। উন্নয়ন হয়েছে রাজধানী কেন্দ্রীক। এটা খুবই স্বাভাবিক। এটাকে আপনি যদি বৈষম্য বলেন, তাহলে বলতে হয় বর্তমান বাংলাদেশে এর চাইতেও বেশি বৈষম্য হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় যে কোনো উৎপাদনের দিক দিয়ে (কাঁচামাল ও শিল্পজাত) সবচেয়ে পেছনে থাকার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের সব উন্নয়ন হয়েছে ঢাকা কেন্দ্রীক।

কেউ যদি বলে আমাদের প্রধান ফসল ধান সবচেয়ে বেশি উৎপাদন হয় দিনাজপুরে। তাই ঢাকার মত সকল উন্নয়ন দিনাজপুরেও করতে হবে। বড় বড় হোটেল করতে হবে। পিকনিক স্পট করতে হবে। ফ্লাইওভার করতে হবে। ঢাকার মত সমান করে উন্নয়ন বরাদ্দ দিতে হবে, তাহলে এটাকে আপনি পাগলের প্রলাপ বলবেন নিশ্চয়ই। এটাকে যদি পাগলের প্রলাপ বলেন তবে কেন আপনি চান পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানে সমান বরাদ্দ দিতে হবে?

বাংলাদেশে সবচেয়ে সফল শিল্প 'তৈরি পোশাক শিল্প'। এতে মানুষের কর্মসংস্থানও হয় অনেক বেশি। ২০১২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গার্মেন্টস কারখানা ঢাকা বিভাগে যখন ছিল ১৫ হাজারের বেশি, তখন চট্টগ্রাম বিভাগে মাত্র এক হাজার আর রংপুর বিভাগে মাত্র তিনটি।[৪০২] এখন এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী কেউ যদি বলে ঢাকা বিভাগ অন্যান্য বিভাগের সাথে বৈষম্য করেছে তা রীতিমত হাস্যকর। কারণ বাংলাদেশের যেখানে এই শিল্প কারখানা স্থাপন করা লাভজনক সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে নগরায়ন অনেক কম হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায়। ব্যবসা বাণিজ্যসহ সবদিক দিয়ে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে ঢাকা থেকে শুরু করে চট্টগ্রামে। এর নানান কারণ রয়েছে। শিক্ষিতের হার, নদী বন্দর,

---

[৪০২] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো / জেলাভিত্তিক প্রকাশনা ২০১২

www.pathagar.com

সমুদ্র বন্দর, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আগে থেকেই বিখ্যাত, যোগাযোগের সুবিধা, জলবায়ু ইত্যাদি অনেক কিছুই অবদান রেখেছে। এই ব্যাপারটিকে সামনে এনে কেউ যদি বলে উত্তরবঙ্গের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, তবে তা ভুল হবে।

তৃতীয়ত : অনেকে বলে থাকেন এদেশে বেশি মানুষের বাস ছিল। এদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতেও বেশি বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল। এটা নিরঙ্কুশ নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন প্রয়োজন হতে পারে। তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বরাদ্দ আসলে জনসংখ্যার ওপরে নির্ভর করে না। বরাদ্দ নির্ভর করে প্রয়োজনের উপরে। ধরুন ঢাকা- চট্টগ্রামের রাস্তা সংস্কার করতে হবে। সেক্ষেত্রে খরচ নির্ভর করবে না এ পথ দিয়ে কত মানুষ যাতায়াত করবে বরং নির্ভর করবে এর দূরত্ব কত? পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সাতগুণ বড়। সেক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেখানে খরচ বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। এভাবে শুধু যোগাযোগ নয় অবকাঠামোসহ প্রায় সকল উন্নয়ন বরাদ্দের জন্য জনসংখ্যা মূল ফ্যাক্টর নয়।

চতুর্থত : আরেক সমস্যা হলো আমরা ধরেই নিয়েছি পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনযাত্রা অবকাঠামো সমান ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হবার সময় পূর্ব পাকিস্তান যা বৃটিশ আমলে পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল এবং যা তদানীন্তন ভারতের যে কোনো অঞ্চলের চাইতে ছিল পশ্চাদপদ। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন রাজধানী ঢাকার সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী, লাহোর ও অন্যান্য শহরের একটি তুলনা করতে গিয়ে এক সময়ের পূর্ব বাংলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সাংবাদিক লেখক এইচ.এম আব্বাসী লিখেন: 'ঢাকা যখন রাজধানীতে পরিণত হয়, তখন সেখানে মুসলমান কিংবা হিন্দু মালিকানায় একটি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতো না। মাত্র ৫ ওয়াটের একটি রেডিও ষ্টেশন ছিল এবং বেশ কয়েক বছর সময় লাগে সেখান থেকে বাংলা দৈনিক আজাদ ও ইংরেজী দৈনিক মর্নিং নিউজ প্রকাশনা শুরু হতে। আমার একটা বড় দায়িত্ব ছিল পত্রিকার ছবি ব্লক করে করাচী থেকে বিমান যোগে তা ঢাকায় প্রেরণ করা যা নতুন ইংরেজী দৈনিক অবজারভার এ প্রকাশিত হতো অর্থাৎ ঢাকায় ব্লক বানানোর কোনো মেশিনও ছিল না।[৪০৩]

---

৪০৩. ওভার এ কাপ অব টি / এইচ, এম, আব্বাসী / মাশহুর অফসেট প্রেস / পৃ. ৪৬২

www.pathagar.com

তারপরেও পূর্ব পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগেনি, এটা অবিশ্বাস্যকর। এটার একটা বড় কারণ হতে পারে পাকিস্তান শাসকরা এই প্রদেশটিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত উন্নয়নের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান তার জীবন শুরু করে বলা যায় সম্পূর্ণ শূন্য থেকে, অর্থনৈতিক ও শিল্পক্ষেত্রে প্রদেশটির কোনোই অবকাঠামো ছিল না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান ছিল মোটামোটি শিল্পসমৃদ্ধ এবং ছিল সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক অবকাঠামো। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সর্ব বিবেচনায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অনেক অগ্রসর।'

১৯৪৭ সালের বাস্তব চিত্র হলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণই ছিল গরীব। বৃটিশ যুগের পূর্ব বাংলায় বসতি স্থাপনকারীদের জীবনের মান ছিল অতি নিম্নমানেরী। এর সুস্পষ্ট কারণ ছিল পূর্ব বাংলা বৃটিশদের কলোনী হিসেবে শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে ১৯০ বছর তথা ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে বৃটিশদের কলোনী ও শোষণের সময়কাল ছিল ৯০ বছর। প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৮৫৮ সালে বৃটিশ রাণী ভিক্টোরিয়া পুরো ভারতের কর্তৃত্ব গ্রহণের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এটা মোটেই অবিশ্বাস্য নয় যে, বৃটিশদের শাসনামলে পূর্ব বাংলা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক বেশি শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছিল। বিদেশী শাসন-শোষণ ছাড়াও পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের স্বদেশীদের দ্বারাও বৃটিশ শোষণ থেকে কম নির্যাতিত ও শোষিত হয়নি। জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভূমির প্রায় নিরঙ্কুশ মালিকানা ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের। ১৯৪৭ সাল নাগাদ তারা ৮০ শতাংশ ভূমির মালিক ছিল।[৪০৪]

পঞ্চমত : কথিত বৈষম্যের প্রমাণ হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের কম প্রতিনিধিত্বের অভিযোগ একটি জনপ্রিয় শ্লোগান। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৩ লক্ষ সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। অথচ সংখ্যায় বাঙালি ছিল বেশি। এই সংখ্যা দেশের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য চিত্রিত করে। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবানুগভাবে বিষয়টির মূল্যায়ন করতে হলে যে কেহই ১৯৪৭ সালে সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষী

[৪০৪] ওভার এ কাপ অব টি / এইচ, এম, আব্বাসী / মাশহুর অফসেট প্রেস / পৃ. ৪৬১

www.pathagar.com

মুসলমান সৈনিকদের সংখ্যা কত ছিল এই হিসেবের দিকে অবশ্যই দৃষ্টিপাত করবে। পাকিস্তানের শুরুতে ফেডারেল সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষী মুসলমান সৈনিকের সংখ্যা ছিল শ'কয়েক বা কোনো অবস্থাতেই এক হাজারের বেশি নয়।

সেনাবাহিনীতে বাংলাভাষীদের সংখ্যা অতি নগণ্য হওয়ার ঐতিহাসিক কার্যকরণ রয়েছে। বৃটিশ আমলে বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে সেনাবাহিনীতে নেওয়া হতো না। আবার বাঙালি মুসলমানরাও বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে খুব একটা যেতো না। মূল কারণ হলো প্রাকৃতিক কারণে নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের মানুষগণ যোদ্ধা হয় না। সাধারণত যোদ্ধা হয় রুক্ষ অঞ্চলের মানুষগণ। সেই হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের বেশিরভাগ অঞ্চলের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে যোদ্ধা জাতি। আগে থেকেই সেনাবাহিনীতে তাদের উপস্থিতি ছিল বেশি।

সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের এমন দূরাবস্থার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাঙালি তথা বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানিদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করে সেনা সার্ভিসে তাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য অনুরোধ জানান। পাকিস্তানের ২৩ বছরে এক হাজার বাঙালি থেকে সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাজার-এ, যার বৃদ্ধি সূচক হচ্ছে চার হাজার শতাংশ। এই তুলনায় সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির হার ছিল অনেক কম। ঐ সময়ে ৫০ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১ সালে দাঁড়ায় ২, ৬০, ০০০, যার বৃদ্ধিসূচক হচ্ছে ১২০০ শতাংশ। অর্থাৎ তুলনামূলক বিবেচনায় সেনাবাহিনীতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২৮০০ শতাংশ বেশি।

১৯৪৮ সালের হিসেব মতে সেনাবাহিনীতে চাকরীর জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানি প্রার্থী ছিল ২, ৭০৮ জন; আর পূর্ব পাকিস্তানের আবেদনকারী প্রার্থী ছিল মাত্র ৮৭ জন; অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানি প্রার্থী ছিল ৩০০ ভাগ বেশি। ১৯৫১ সালে সেনাবাহিনীতে চাকুরী প্রার্থী পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ১৩৪ আর পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ১, ০০৮ জন। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৫ জনে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল ২০০ গুণ বেশি অর্থাৎ ৩, ২০৪ জন। আবেদনপত্র

www.pathagar.com

দাখিল কিংবা সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য কিংবা ডিসক্রিমিনেশান থাকার গালগল্প হয়তো কেউ দাঁড় করাবেন, যা কিছুতেই প্রমাণযোগ্য নয়।[৪০৫]

এটা অবশ্যই সবার জানার কথা যে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে দরকার কঠোর ও অব্যাহত প্রশিক্ষণ যা দিন কয়েক এবং মাস কয়েকের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর কোনো দেশের পক্ষেই জেনারেল এর চাইতে অনেক নিচের একজন সেনা অফিসারকেও ২৫ বছরের কমে তৈরি করা সম্ভব নয়। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের দুইজন অফিসারের নাম উল্লেখ করার মত হয়ে ওঠে এর একজন ছিলেন কর্ণেল ওসমানী এবং আর একজন ছিলেন মেজর গণি। অথচ ঐ সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব ও পাঠানদের মধ্য থেকে বহু সৈনিক জেনারেল পদে পর্যন্ত উন্নীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি পদে কর্মরত থাকাকালে আইয়ুব খাঁন ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনেচ্ছু ছাত্রদের এক সমাবেশে তাদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হবার আহ্বান জানান। কিন্তু তাদের নিকট থেকে তেমন উৎসাহব্যাঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়নি। এর পরের দুই বছরের পরিসংখ্যানে তা স্পষ্ট। ১৯৫৬ সালে সেনাবাহিনীর অফিসার পদে আবেদনকৃতদের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিল মাত্র ২২ জন; অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিল ১১০ জন। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আবেদন করার সংখ্যা ৮০ শতাংশ উন্নীত হয়ে দাঁড়ায় ৩৯ জনে, অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আবেদনকারীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১০ থেকে ২৯৪-তে।[৪০৬]

ষষ্ঠত : সরকারি চাকুরি তথা কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের সম্মিলিত প্রতিনিধিত্বের চাইতে অনেক কম। এর পাশাপাশি আর একটি বাস্তবতা ছিল পাঞ্জাবী নয়, পশ্চিম পাকিস্তানিদের এমন প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এটা ঐতিহাসিক বাস্তবতা তথা বাঙালি, সিন্ধী, পাঠান ও বেলুচীদের ঐতিহাসিক অনগ্রসরতারই ফল। পাঞ্জাবে বসতি গড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম মুহাজিররা ছিল পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচীস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগোষ্ঠীর চাইতে পড়ালেখায় অনেক অগ্রসর। শিক্ষা-দীক্ষায়

৪০৫. অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস / এম টি হোসেন / পৃ. ১১

৪০৬. মিলিটারী এন্ড পলিটিক্স ইন পাকিস্তান / এইচ, এ, রিজভী / পৃ. ১৮১-১৮২

www.pathagar.com

শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক অনগ্রসতার কারণ ছিল অর্থনৈতিক এবং কিছুটা সামাজিক। বস্তুতঃ পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচীস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানরা উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। কিন্তু পাঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলের জনগণ আধুনিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বলা যায় পর পরই।

অর্থাৎ তারা পাকিস্তানের অপরাপর অঞ্চলের মুসলমানদের চাইতে শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল ৭০ থেকে ৮০ বছরের অগ্রে। এর প্রধান কারণ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ৭০ এর দশকে স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে আলীগড়ে প্রতিষ্ঠিত এঙ্গলো মোহামেডান কলেজ ভারতের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের মুসলমানদেরকে উচ্চ শিক্ষায় আকৃষ্ট করে তোলে। পাশাপাশি লাহোর সরকারি কলেজ এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহু আগে। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলোতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনুল্লেখ্য; এমনকি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানত মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্যে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও মুসলিম ছাত্র ও শিক্ষকের সংখ্যা ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষকরা ছিল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কেবল ১৯৪৭ সালের পর, যখন পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষকতার ফুরসত পায়। সত্যিকার অর্থে শিক্ষা-দীক্ষায় বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণেই বৃটিশ যুগের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস তথা আইসিএস-এ কোনো বাঙালি মুসলমানের ঢোকার যোগ্যতা ছিল না; যদিও উক্ত সার্ভিস ১৮৫৩ সালের অধ্যাদেশ বলে ১৮৫৪ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল।[৪০৭] ফলে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের প্রশাসন পায় মাত্র ১০০ জন প্রাক্তন আইসিএস অফিসার আর ভারত পায় ৫০০ জন। প্রাপ্ত ১০০ জনের মধ্যে একজনও বাঙালি কিংবা পাকিস্তানের অন্যান্য অনগ্রসর এলাকার ছিল না।

ঐ ১০০ জনের মধ্যে কেউ কেউ ছিল বৃটিশ বংশোদ্ভূত মুসলমান, কেউ ছিল শিক্ষায় অগ্রসর ভারতের অপরাপর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীভুক্ত। সঙ্গত কারণেই তারা ছিল পাঞ্জাব বা ইউপি'র মুসলমান। পাঞ্জাব ও ইউপি'র মুসলমানদের অগ্রসরতা আর পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অনগ্রসরতার

---

৪০৭. রোল অব হায়ার সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান / আলী আহমেদ / পৃ. ৩৫

www.pathagar.com

আরো প্রমাণ আছে। ১৮৮৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় আইসিএস অফিসারদের মধ্যে পাঞ্জাবের ছিল তিনজন মুসলমান, শিখ ছিল দুইজন এবং হিন্দু ছিল না একজনও; এমনকি মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ এলাকা অযোধ্যার পাঁচজন মুসলমান ছিল আইসিএস আর তার বিপরীতে ছিল ছয়জন হিন্দু। অথচ বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও মাত্র দুইজন মুসলমান ছিল আইসিএস, আর নয়জন ছিল হিন্দু।[৪০৮]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক সময় আইসিএস সার্ভিসে শুধু মনোনীত একজন বাঙালি মুসলমান জনাব নুরুন্নবী চৌধুরীকে পাওয়া যায়। ফলে পাক প্রশাসনে উদ্ভূত বিশাল শুন্যতা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের অফিসারদেরকে দিয়ে পুরণ করতে হয়েছে। তবে প্রতিযোগিতা নয় ১৯৪৯-৫০ সালে প্রবর্তিত ৪০ শতাংশ কোটার ভিত্তিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানিদের স্থান লাভ শুরু হয়।[৪০৯] সেনাবাহিনীতেও একইভাবে পাকিস্তানের অপরাপর অঞ্চলের চাইতে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সার্ভিসে নিয়োগ দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাউকে পাওয়া যায়নি; অথচ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আটজনকে পাওয়া যায়।

১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাওয়া যায় দুইজনকে, একজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাওয়া যায় ১৬ জনকে (যার মধ্যে ৭ জন ছিল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং ১০ জন ছিল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৬ বছরের ব্যবধানে ১৯৬৪ সালে সিএসএস এ পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ জন (১৫ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) আর পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ জন (১৩ জন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের)। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের তুলনায় ১০ গুণ।[৪১০]

---

৪০৮. রোল অব হায়ার সিভিল সার্ভিস ইন পাকিস্তান / আলী আহমেদ / পৃ. ৪৫

৪০৯. দি বৃটিশ এন্ড দেয়ার সাকসেসারস ফেবার এন্ড ফেবার / আর, সায়মন্ডস / পৃ. ৮৮-৯০

৪১০. দি ব্যুরোক্রেসি অব পাকিস্তান / রাল্ফ ব্রেনবান্তি / এশিয়ান ব্যুরোক্রেটিক সিষ্টেম ইমার্জেন্ট ফ্রম বৃটিশ কলোনিয়াল ট্রাডিশান, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় কমনওয়েলথ ষ্টাডি সেন্টার, ইউএসএ, ১৯৬৬ পৃ. ২৬৬-৬৭ এবং ২৭০-৭১

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা বৃদ্ধি এত দ্রুত হারে ঘটেছিল যে তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে যায়। যার দরুণ ১৯৭০-৭১ সালে বহু বাঙালি অফিসারই পাকিস্তান প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী ছিল সিএসএস ক্যাডারের একজন বাঙালি। যে হারে পাকিস্তান প্রশাসনে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আরো ১০ বা ২০ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যা অনুপাতে যথাযথ পর্যায়ে উপনীত হতো।

সপ্তমত : ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক স্কুল ছিল ২৮, ৩০০ আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩৯, ৪১৮।[৪১১] বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে রাখার জন্যই এই বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তানে মানুষ বেশি, স্কুলও থাকার কথা বেশি। এখানে প্রচারণা এমনভাবে চালানো হয় যাতে পূর্ব পাকিস্তানের চাইতে সাতগুন বৃহৎ পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তবতা অসচেতন পাঠকের নিকট চাপা থাকে। মূলত শিশুদের জন্য প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা বিস্তারের শুরু থেকেই প্রতিটি মহল্লায় গড়ে ওঠে এবং তা প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রতিটি শিশুর পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে পারে এমন দূরত্বে। ফলে প্রতি ৪/৫ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে সন্নিহিত এলাকায় জনবসতি গড়ে ওঠার পর পরই। শিক্ষাবীদদের সংজ্ঞায় যাকে বলা হয় স্কুল ম্যাপিং; এই বাস্তবতায় সাতগুণ বড় পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেশি হবারই কথা। সেই হিসেবে বলা যায় পশ্চিম পাকিস্তানে আরো বেশি স্কুল হওয়া উচিত ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পার্থক্য খুব একটা বেশি ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে ৪, ৪৭২ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৩, ৯৬৪।

অষ্টমত : সবচেয়ে বড় কথা হলো, পাকিস্তান যদি জাতিগতভাবে বাঙালি দের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখাতে অথবা শোষন করার চিন্তা করতো। তবে তারা জনসংখ্যার অনুপাতে সংসদীয় আসন বিন্যাস করতো না। পাকিস্তানের মোট তিনশত আসনের মধ্যে ১৬২ আসন পূর্ব পাকিস্তানে দেওয়া হতো না। যার কারণে শুধু একটি প্রদেশের ভোট দিয়েই টোটাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

---

৪১১. বাংলাদেশ কেন? / মাহিনবারি / যুদ্ধদলিল / https://bit.ly/3kZoAAb / অ্যাকসেসইন২৭মার্চ২০১৭

www.pathagar.com

হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। স্বৈরাচারী স্বৈরাচারীই। স্বৈরাচারী আইয়ুব খাঁন শুধু পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর ছিলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যও তিনি স্বৈরাচার ছিলেন। এদেশের মানুষ যেমন তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও তেমনি তার বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছে। স্বৈরাচারী আইয়ুবের শাসনকে দিয়ে টোটাল পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কথা বলার যৌক্তিকতা অন্তত এদেশের মানুষের কম। কারণ গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে শাসন বেশি করেছে বাঙালিরাই। এমনকি ভাষা আন্দোলনের সময়ও পাকিস্তানের শাসক ছিল বাঙালিরাই।

নবমত : বৈষম্যতত্ত্বের উদ্ভব ঘটানো হয়, পাকিস্তানে অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের প্রকৃত যে পরিসংখ্যান (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারণামূলক বলে প্রমাণিত হয়) তাতে উন্নয়নের যে গতি ছিল তা অব্যাহত থাকলে বৈষম্য সত্ত্বর বিদূরিত হয়ে দুই অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা সমান রূপই পরিগ্রহ করতো। সে হিসেবে পাকিস্তান অবিচ্ছিন্ন থাকলে এত দিনে শুধু যে পুরো মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বেই দেশটি অভিষিক্ত হতো তাই নয়; বিশ্বের অন্যতম বৃহৎশক্তি হিসেবেও পাকিস্তান আবির্ভূত হতো। পাকিস্তানের তেমন সম্ভাবনাই ছিল ভারত ও ইহুদী চক্রের (যারা পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে সর্বমূখী মদদ যুগিয়েছিল) চক্ষুশূল। তারা দ্রুত গড়ে ওঠা মুসলিম শক্তি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য সকল ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়।

পাকিস্তানের ১ম সাধারণ নির্বাচন

আমাদের দেশে প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী আইয়ুব খাঁনকে যতটা ভিলেন হিসেবে দেখানো হয় তার চাইতে বেশি ভিলেন দেখানো হয় ইয়াহিয়া খানকে। কিন্তু এই ইয়াহিয়া খানই বাঙালিদেরকে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক অধিকার দেন। পাকিস্তানের সকল জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেন। স্বৈরাচারমুক্ত পাকিস্তান গঠনে আমার দৃষ্টিতে তার আন্তরিকতা ছিল অসাধারণ। তার হাত ধরে পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের জন্য নেতা নির্বাচনের সুযোগ পায়।

১৯৬৯ সালের ২৫মার্চ আইয়ুব খাঁনের কাছে থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে

www.pathagar.com

ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেওয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছে, তার একটা সমাধান বের করা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করেন।

আইয়ুব খাঁনের মৌলিক গণতন্ত্র বাদ দিয়ে ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার ব্যবস্থা চালু করেন। প্রাপ্তবয়স্ক সকল পাকিস্তানি নাগরিকের ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র রক্ষকের ভূমিকা দেওয়া। যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুন্ন রাখার জন্য একটি ইসলামী ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শাসনতন্ত্রের মূলনীতি[৪১২]

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার

২. প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন

৩. আইন আদালতের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার রক্ষা

৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

৫. ইসলামী আদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র

১৯৬৯ সালের ২৮নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। তিনি ১৯৭০ সালের ২৮মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে উক্ত নির্বাচনের Legal frame work order এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশে নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ গঠন ও এর কার্যাবলি কেমন হবে তা ঘোষণা করেন

[৪১২] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৮৮

www.pathagar.com

১. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

২. মহিলারা সাধারণ আসনে নির্বাচনের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।

৩. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। জাতীয় পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৪. ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানি নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। (তবে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা আদালত কর্তৃক দুই বছরের বেশি সময়ের সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, কিংবা ১৯৬৯ সালের ১আগস্টের পর কোনো- না-কোনো সময় মন্ত্রী ছিলেন অথচ মন্ত্রিত্বের অবসানের পর দুই বছর অথবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ২ বছরের কম কোনো নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে এমন ব্যক্তি, কিংবা সরকারি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি, কিংবা সরকারি চাকুরি থেকে বহিস্কৃত কোনো ব্যক্তি যদি বহিষ্কারের পর অন্তত পাঁচ বছর কিংবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ৫ বছরের কম কোনো নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে, কিংবা পাকিস্তানের কোনো সরকারি চাকুরের স্বামী বা স্ত্রী হন, কিংবা তিনি আগে দেউলিয়া হন এবং আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর ১০ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে, ইত্যাদি এমন সকল প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।)

৫. কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬. যে কেউ একই সঙ্গে কোনো পরিষদের একাধিক নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী হতে পারবেন তবে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে তাকে নির্বাচনের সরকারি ফলাফল ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যে একটি আসন রেখে বাকিগুলো ছেড়ে

www.pathagar.com

দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি তা করতে ব্যর্থ হলে তার নির্বাচিত সবগুলি আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

৭. কোনো সংসদ সদস্য স্পিকার বরাবর স্বহস্তে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন। কোনো সদস্য স্পিকারের নিকট থেকে ছুটি না নিয়ে একাদিক্রমে পনেরোটি কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হয়ে যাবে। কোনো সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের সাত দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ শূন্য বলে গণ্য হবে। তবে স্পিকার নির্বাচনে বিলম্ব ঘটলে উপরিউক্ত সময়কাল বাড়ানো যাবে।

৮. জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তার পছন্দমতো দিন, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারবেন। জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করবেন।

৯. স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার পদ শূন্য হলে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ অন্য আরেকজন সদস্যকে স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। স্পিকারের পদ শূন্য হলে ডেপুটি স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হলে উক্ত পদ পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত কমিশনার স্পিকার/ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন।

১০. জাতীয় পরিষদের কোনো অধিবেশনে ১০০ জনের কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলে অধিবেশনের কাজ চালানো যাবে না, অধিবেশন চলতে চলতে সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের কম হয়েছে বলে কোনো সদস্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কোরাম পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখবেন কিংবা মুলতবি করে দিবেন। সদস্যরা পরিষদে বাংলা, উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিবেন। পরিষদের কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজিতে রক্ষিত হবে।

১১. ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বিন্যাস করা হবে। (এর ফলে বাঙালিরা লাভবান হয়, তবে এর মাধ্যমে

www.pathagar.com

ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। শুধু মাত্র বাংলার আসন দিয়েই পুরো পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়। ৩০০ আসনের মধ্যে বাংলা পায় ১৬২ টি আসন)[৪১৩]

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত সিদ্ধান্তগুলো সকল বিরোধী দল সাদরে গ্রহণ করে। ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ভাসানী মাওবাদী ছিলেন। গণতন্ত্র বাদে সশস্ত্র বিপ্লবে তিনি বিশ্বাস করতেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো তিনি এবং তার দল সব সময় একটি অশান্ত পরিবেশ চাইতেন যাতে করে সেই পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা যায়। একই উদ্দেশ্য নিউক্লিয়াসেরও ছিল। তারা ভেবেছিল যদি ইলেকশন হয় ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনা করে। তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা কঠিন হবে। তাই ভাসানী নির্বাচনের বিরোধীতা করে আন্দোলন শুরু করে। এই সময় তিনি তার বিখ্যাত উক্তি করেন "ভোটের বাক্সে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো"। তবে জনগণ তার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেনি। এমনকি তার দলের মধ্যেও এই নিয়ে ভাঙন তৈরি হয়। ভাসানীর এই দূরাবস্থা দেখে নিউক্লিয়াসও দমে যায়। তাছাড়া ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ক্ষতও তাদের দূর্বল করে রাখে।

১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে ১ম সাধারণ নির্বাচন। বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় সব দল নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। ভাসানীর দল বাদে পাকিস্তানের প্রায় এগারোটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে প্রায় সকল প্রধান দলসমূহ, যেগুলি সে সময় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হতো- সেগুলো মূলত ছিল আঞ্চলিক। যেমন, আওয়ামীলীগের জনপ্রিয়তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর কোনো সমর্থন ছিল না। তদনুরূপ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির জনসমর্থন ছিল সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়ে, অন্যত্র তার সমর্থন ছিল না। ওয়ালী ন্যাপের সমর্থন বেশি ছিল বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। অপরদিকে সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক যে-দলগুলি তখন ছিল সেগুলি কেবল নামেই ছিল সর্বপাকিস্তানি, বাস্তবে কোনো প্রদেশেই এগুলির ব্যাপক জনসমর্থন ছিল না।[৪১৪]

---

৪১৩. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৮৯-১৯২

৪১৪. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৩

www.pathagar.com

নির্বাচনে যাতে সকল রাজনৈতিক দল ভালোভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য ১৯৭০ সালের ১জানুয়ারী সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়। আওয়ামীলীগ নির্বাচনে সকল মতের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়। ফলে তারা নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ৬ দফার কথা উল্লেখ করলেও বক্তব্য বিবৃতিতে তা উহ্য রাখে। বরং শেখ মুজিব ইসলামী কানুন প্রতিষ্ঠার কথা বলে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করা শুরু করে।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ভেঙে ন্যাপ গঠিত হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ৬০ দশকে সারা পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়। পাকিস্তানেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। ১৯৬৭ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে মস্কোপন্থী নেতারা বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা চালায়। তাই মশিউর রহমান যাদু মিয়ার পরামর্শে রংপুরে কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ১৯৬৭ সালের ৩০নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনের পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্নে ন্যাপ চীনপন্থী ও মস্কোপন্থী এ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চীনপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন মওলানা ভাসানী এবং মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন সীমান্ত প্রদেশের আবদুল ওয়ালী খান। পূর্ব পাকিস্তান ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। এ অংশ বাংলায় মোজাফফর ন্যাপ নামেও পরিচিত হয়।

মোজাফফর ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতার বন্টন প্রশ্নে আওয়ামীলীগের ৬ দফা থেকে তাদের দাবী অনেক নমনীয় ছিল। ন্যাপ (ওয়ালী) কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা রেখে বাকী বিষয়গুলি প্রদেশের হাতে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এই যে, এই দলটি বাঙালি বুর্জোয়াদের দল এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানি বুর্জোয়া গোষ্ঠীর একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার অংশীদারিত্ব চায়। ন্যাপ (ওয়ালী) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তবে তা অর্জনের লক্ষ্যে তারা একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল : বাংলার কৃষক-শ্রমিক জাগো'।[৪১৫]

---

৪১৫. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৫

www.pathagar.com

মওলানা ভাসানী নির্বাচনের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করতে থাকেন। তিনি একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, আবার ভোটের আগে ভাত চাই' শ্লোগানও উত্থাপন করেন। তিনি নির্বাচনে তার দলের অংশগ্রহণের ব্যাপারে দুই পূর্বশর্ত আরোপ করেন : এক, জাতীয় সংসদে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করতে হবে; দুই. নির্বাচনের পূর্বেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। এর মধ্যে নির্বাচনের আগে নানান দাবী দাওয়া নিয়ে উদ্ভট আন্দোলন শুরু করেন। এর মধ্যে চোর খেদাও অন্যতম। উনি হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন গ্রাম-বাংলার চোর ডাকাত সমস্যা বড় সমস্যা। ভোটের আগে এই সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই বলে তার কর্মীদের দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চোর নির্মুল কমিটি গঠন করলেন ও মব জাস্টিস সৃষ্টি করে কিছু খুন করলেন। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ, মুদ্রা, প্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং যোগাযোগ বিষয়ক ক্ষমতা অর্পণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। পার্টি মেনিফেস্টোতে দাবী করা হয় যে, দুই প্রদেশের মধ্যে সকল ধরনের বৈষম্য যেন দশ বছরে দুর করা যায় সে লক্ষ্যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সংবিধানে উল্লেখ করা উচিত। এই দল বিশ্বাস করতো যে, কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্য অটুট রাখা সম্ভব। পিডিপি নেতা নূরুল আমিন আওয়ামীলীগের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামীলীগের ৬ দফা দাবীকে নির্বাচনী রেফারেন্ডাম হিসেবে গণ্য করায় আওয়ামীলীগ যদি পূর্ব পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য অটুট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

জামায়াতে ইসলামী এই দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা অপরাপর ইসলামী দল এবং মুসলিমলীগের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ঐ সকল দল ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। জামায়াতে ইসলামীর মতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত ভুল নীতির কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে। জামায়াত ১৯৫৬

www.pathagar.com

সালের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করে উক্ত সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রশ্নে জামায়াতের অভিমত ছিল যে বিভিন্ন প্রদেশকে এতটুকু স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা উচিত যা দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবে না।[৪১৬]

জামায়াতে ইসলামী আওয়ামীলীগের ৬ দফার সমালোচনা করে বলে যে, ৬ দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করবে। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামীলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামীলীগের ৬ দফা কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি হুমকি স্বরূপ। জামায়াত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচির দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই পারে পাকিস্তানের সকল সমস্যার সমাধান করতে।[৪১৭]

কাউন্সিল মুসলিমলীগ প্রধান পাঞ্জাবের মিঞা মমতাজ দৌলতানা পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তিনি আওয়ামীলীগের ৬ দফার কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ৬ দফার বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল, ক্ষমতাহীন ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। এই দল যে-কোনো ধরনের সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। দলের নেতৃবৃন্দ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কঠোর সমালোচনা করে।[৪১৮]

কনভেনশন মুসলিমলীগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। অন্য দুই মুসলিমলীগের ন্যায় এই দলও ভারত-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এই দলের নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪১৯]

---

[৪১৬] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৬

[৪১৭] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৬

[৪১৮] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৬

[৪১৯] স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৬

www.pathagar.com

কাইয়ুম মুসলিমলীগ এই দলও ভারত-বিরোধী ছিল। দলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানকে খণ্ডিত করতে চান। এই দল শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতী ছিল। দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাই দলের লক্ষ্য বলে প্রচার করা হয়। উপরে উল্লেখিত দলসমূহের কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী দল, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দল ও ডানপন্থী দলসমূহ যারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইসলামী ভাবধারার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল।[৪২০]

১৯৭০ এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সাধারণ ১৬২ এবং মহিলা ৭টি।

১৯৭০ সালের ৫অক্টোবর জাতীয় পরিষদের এবং ২২অক্টোবর প্রাদেশিক নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও বন্যার কারণে ডিসেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ১৯৭১ এর জানুয়ারী পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। ৩০০ টি আসনে মোট ১, ৯৫৭ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেয়। এর পর কিছু প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেয়। মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে ১, ৫৭৯ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। আওয়ামীলীগ ১৭০ আসনে প্রার্থী দেয়। এর মধ্যে ১৬২টি আসন পূর্ব পাকিস্তানে এবং অবশিষ্ট ৮ জন প্রার্থী দেয় পশ্চিম পাকিস্তানে। জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রার্থী দেয়। তাদের প্রার্থী সংখ্যা ১৫১। পাকিস্তান পিপলস পার্টি মাত্র ১২০ আসনে প্রার্থী দেয়। তার মধ্যে ১০৩ টি ছিল পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে। পূর্ব পাকিস্তানে তারা কোনো প্রার্থী দেয়নি। পিএমএল (কনভেনশন) ১২৪ আসনে, পিএমএল (কাউন্সিল) ১১৯ আসনে এবং পাকিস্তান মুসলিমলীগ (কাইয়ুম) ১৩৩ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে।

নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং প্রায় ৬৫% ভোট পড়েছে বলে সরকার দাবী করে। সর্বমোট ৫৬, ৯৪১, ৫০০ রেজিস্টার্ড ভোটারের মধ্যে

---

৪২০. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৬

www.pathagar.com

৩১, ২১১, ২২০ জন পূর্ব পাকিস্তানের এবং ২৩, ৭৩০, ২৮০ জন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটার।

জাতীয় পরিষদে আওয়ামীলীগ ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সাধারণ নির্বাচনের একই সাথে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও আওয়ামীলীগ পূর্ব পাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে জয়লাভ করে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৩৮টি আসনের ৮১টিতে জয়লাভ করে।[৪২১]

আওয়ামীলীগ ৩৮.৩% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ১৬০টি

পাকিস্তান পিপলস পার্টি ১৯.৫% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৮১টি

পিএমএল (কাইয়ুম) ৪.৫% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৯টি

পিএমএল (কনভেনশন) ৩.৩% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৭টি

জমিয়ত উলেমা -ই- ইসলাম ৪.০% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৭টি

মারকাজি জমিয়তন-উলেমা-পাকিস্তান ৪.০% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৭টি

ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি (ওয়ালি) ২.৩% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৬টি

জামায়াত-ই-ইসলামী ৬.০% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ৪টি

পিএমএল (কাউন্সিল) ৬.০% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ২টি

পিডিপি ২.৯% ভোট পেয়েছে এবং আসন পেয়েছে ১টি

প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

পাঁচটি প্রদেশের মধ্যে ভুট্টোর পিপলস পার্টি দুইটি প্রদেশে, খান ওয়ালির ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি দুইটি প্রদেশে ও শেখ মুজিবের আওয়ামীলীগ একটি প্রদেশে ভালো করেছে।

---

৪২১. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস / মুনতাসীর মামুন, মো. মাহবুবর রহমান / সুবর্ণ প্রকাশনী / পৃ. ১৯৯

www.pathagar.com

পাঞ্জাবের মোট ১৮০টি আসনের মধ্যে পিপলস পার্টি পেয়েছে ১১৩টি। সিন্ধু প্রদেশের মোট ৬০টি আসনের মধ্যে ২৮টি পেয়েছে পিপলস পার্টি। বেলুচিস্তানের ২০টি আসনের মধ্যে ন্যাপ (ওয়ালি) পেয়েছে ৮টি আসন। সীমান্ত প্রদেশের ৪০টি আসনের মধ্যে ন্যাপ (ওয়ালি) পেয়েছে ১৩টি আসন। পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়েছে আওয়ামীলীগ।

এই নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে কারচুপি হয়েছে এমন অভিযোগ আনেনি কোনো রাজনৈতিক দল অথবা পাকিস্তানি সেনাশাসকরা নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে বিজয়ী করেছেন এমন অভিযোগও পাওয়া যায়নি। তবে সরকারের প্রতি যে অভিযোগ এসেছে তা হলো পূর্ব পাকিস্তানে প্রচুর কেন্দ্র দখলের নজিরবিহীন ঘটনা ঘটিয়েছে আওয়ামীলীগ, ইয়াহিয়া খান তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন।

আমার পর্যবেক্ষণে এটা সঠিক নয় যে, ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের প্রতি প্রীতি দেখিয়ে তাকে দুর্নীতি করার সুযোগ দিয়েছেন। বরং বলা যায় ইয়াহিয়া খান কেন্দ্র দখলের মতো পরিস্থিতি হবে এমন ধারণা করতে পারেননি বলে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এর কারণ এটি একটি নতুন সংস্কৃতি যা আওয়ামীলীগের হয়ে নিউক্লিয়াস চালু করেছিল এবং তা থেকে আজও মুক্ত হতে পারেনি বাংলাদেশ।

শেখ মুজিব কেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারলেন না?

এদেশে প্রচলিত আছে ইয়াহিয়া খান সরকার শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি বা করতে চায়নি। যা সর্বৈব মিথ্যে কথা। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো দুজনকেই অভিনন্দন জানিয়ে ইয়াহিয়া বার্তা পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনের আগের মাসগুলোতে সামরিক আদালতে যারা বিভিন্ন অভিযোগে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাদের অনেককেই সাধারণ ক্ষমার আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়।[৪২২]

ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে খুবই উদগ্রীব ছিলেন। এ জন্য তিনি তার মন্ত্রিসভার সদস্য মাহমুদ হারুনকে ঢাকায় পাঠান। মাহমুদ হারুন হলেন ইউসুফ হারুনের ভাই এবং শেখ মুজিবের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি।

৪২২ আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৪

www.pathagar.com

শেখ মুজিবকে ইসলামাবাদে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রেসিডেন্ট তাকে রাজধানীতে স্বাগত জানাতে চেয়েছিলেন। মুজিব সবাইকে অবাক করে দিয়ে রাজধানী বা ইসলামাবাদে যেতে অপারগতা জানান।[৪২৩]

এদিকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখলের অভিযোগ এনে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে এদেশীয় মুসলিমলীগের তিন পক্ষ, পিডিপি ও নেজামে ইসলামের নেতারা। তারা আগে থেকে নির্বাচিত হওয়া জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। কিন্তু অভিনব কেন্দ্র দখলের বিরুদ্ধে তাদের প্রস্তুতি ছিল না। কেন্দ্র দখল ও জাল ভোট নিয়ে ঢাকাই চলচ্চিত্রের নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।[৪২৪] ভুট্টো প্রথমে এদের অভিযোগকে আমলে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচন পুনরায় দাবী করেন। ইয়াহিয়া খান এসব অভিযোগে কান দেননি। কিন্তু যখন মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে অস্বীকার করলো তখন 'এদিক আমার ওদিক তোমার' বলে দেশকে বিচ্ছিন্ন করার ইঙ্গিত দিলেন, তখন ভুট্টো পুর্ব পাকিস্তানের পুনরায় ভোট গ্রহণের দাবী থেকে সরে এসে মুজিবকে স্বাগত জানালো।

অনেকেই বলে থাকেন মুজিব ঢাকাকে পাকিস্তানের কেন্দ্র বা রাজধানী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি ইসলামাবাদ যাননি। এই দাবীটিও মিথ্যে। কারণ মুজিব নির্বাচনের পর বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কখনো সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতেও বলেননি তিনি ঢাকাকে পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে দেখতে চান। অতএব পাকিস্তানে না যাওয়াটা ছিল তার ষড়যন্ত্রের ফল অথবা তার রাজনৈতিক দুর্বলতা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার জন্য প্রথমে শেখ মুজিব নিজেই দায়ী। হয় তিনি ভারতীয় ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত অথবা তিনি পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেননি।

নির্বাচনে আওয়ামীলীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো মনে করতেন, তার সঙ্গে সমঝোতা না করে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করতে পারবে না। ২০ডিসেম্বর লাহোরে পাঞ্জাব অ্যাসেম্বলি চেম্বারসের সামনে পিপিপির এক সমাবেশে তিনি

---

৪২৩. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৪

৪২৪. ৭০ এর নির্বাচনে ভোট চুরির ইতিহাস / https://bit.ly/30lmh12 / অ্যাকসেস ইন ৭ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

বলেন, তার দলের সহযোগিতা ছাড়া সংবিধান ও কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা যাবে না। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের আসনে বসার জন্য পিপিপি প্রস্তুত নয়। তিনি আরও বলেন, পিপিপির পক্ষে আরও পাঁচ বছর (পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত) অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'[৪২৫]

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মানুষ জীবন বাজি রেখে আইয়ুব খাঁনকে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছে শেখ মুজিবকে নেতা হিসেবে পাওয়ার জন্য নয়। তাই শুরু থেকেই পিপলস পার্টি মুজিবের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করা ছাড়া সংসদে যোগ না দেওয়ার ঘোষণা স্পষ্ট করে। পরদিন ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, আওয়ামীলীগ জনগণের রায় পেয়েছে এবং আওয়ামীলীগ একাই সংবিধান তৈরি ও কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষমতা রাখে।[৪২৬] পাকিস্তানে বিজয় লাভ করার পরও প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার ২য় কারণ ভুট্টো ও পিপলস পার্টি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রায় ১২ জন জেনারেল শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী ছিলেন বলে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তথ্য দিয়েছেন। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আকবর খান শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বিরোধী ছিলেন। তাদের কাছে ১৯৬৭ সালে ক্যু এর পূর্ণাঙ্গ তথ্য ছিল। যার মাধ্যমে লে. ক. মোয়াজ্জেম ভারতের কাছে পুর্ব পাকিস্তানের ক্যান্টনম্যান্ট হস্তান্তরের ষড়যন্ত্র করেছিল।

সেনাবাহিনীর শীর্ষ জেনারেলদের কাছে মুজিবের ভারত কানেকশনের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। তারা তাই ইয়াহিয়া খানকে শেখ মুজিবের কাছে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছাড়তে বারণ করেছিল। তারা নিশ্চিত ছিল ক্ষমতা পেলে মুজিব ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে, এমনও হতে পারে পাকিস্তান ভারতের অধিনস্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মনে করতেন ভারতের সাথে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী আওয়ামীলীগের কিছু চরমপন্থী সদস্য। তিনি মনে করতেন

[৪২৫]. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬
[৪২৬]. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৬

www.pathagar.com

মুজিব চাইলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই তিনি বিভিন্ন আলাপচারিতায় মুজিবকে চরমপন্থী ও ভারতপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত না হতে অনুরোধ করেছেন। পাকিস্তানে বিজয় লাভ করার পরও প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার ৩য় কারণ সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য।

নির্বাচনের পরে ১৯৭১ সালের ৩জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত এক জনসভায় আওয়ামীলীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে দলীয় শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শেখ মুজিব। নৌকা আকৃতির একটি বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সবাই মঞ্চে ছিলেন। শপথনামায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন সংবলিত সংবিধান তৈরি করতে অঙ্গীকার করেন। শপথ নেওয়া শেষ হলে শেখ মুজিব উপস্থিত জনতাকে আহ্বান করে বলেন, কেউ যদি বাংলার মানুষের সঙ্গে বেইমানি করে তবে তোমরা তাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।' শেখ মুজিব জয় বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান' বলে ভাষণ শেষ করেছিলেন।

শপথ অনুষ্ঠানে বিদেশি কূটনীতিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মঞ্চের সামনে সাংবাদিকদের জন্য নির্ধারিত স্থানের পাশে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জাপান, ভারত ও ইরান দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। চীন ও রাশিয়ার দূতাবাস প্রতিনিধির অনুপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

৪ জানুয়ারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রমনার বটমূলে ছাত্রলীগের বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ও ড. কামাল হোসেন। অনুষ্ঠানে সদ্যনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ উপস্থিত হতে পারেননি। তার বদলে ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক আ ফ ম মাহবুবুল হক সভা পরিচালনা করেন। সভা শুরু হওয়ার আগে ২০-২৫ জনের একটি দল শ্লোগান দিতে দিতে সভা প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। তাদের শ্লোগানগুলো ছিল :

www.pathagar.com

বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো,

মুক্তিফৌজ গঠন করো—বাংলাদেশ স্বাধীন করো,

লাল সূর্য উঠেছে—বীর জনতা জেগেছে,

মুক্তির একই পথ—সশস্ত্র বিপ্লব,

স্বাধীন করো স্বাধীন করো-বাংলাদেশ স্বাধীন করো,

শেখ মুজিবের মন্ত্র-সমাজতন্ত্র।[৪২৭]

খেয়াল করে দেখুন, তারিখটা ৪জানুয়ারী। তখনো নির্বাচন পুরোপুরি শেষ হয়নি। অনেক দুর্গত অঞ্চলে ডিসেম্বরে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। তখনো আরো নয়টি আসনে নির্বাচন বাকী। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি করবে না এমন আশংকা তখনো দেখা দেয়নি, এমন সময় ছাত্রলীগের একদল সদস্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সামনে রেখে দেশ বিরোধী জঙ্গী শ্লোগান দিয়ে দেশকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। এরাই নিউক্লিয়াস।

নিউক্লিয়াস চেয়েছিল মুজিব যাতে প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা পায়। তাই তারা প্রচুর ভোট ডাকাতি করেছিল। কিন্তু ডাকাতির ফল হিসেবে মুজিব পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ম্যান্ডেট পেয়ে যায়। তারা যখন দেখলো শেখ মুজিব টোটাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছে তখন তারা তা ঠেকাতে চেয়েছিল। কারণ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলে বাংলাকে আলাদা করে তাদের সমাজতন্ত্র কায়েমের খায়েস ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তারা কোনো প্রয়োজন ছাড়াই দেশবিরোধী জঙ্গী কার্যক্রম শুরু করে। পাকিস্তানে বিজয় লাভ করার পরও প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার ৪র্থ কারণ সমাজতন্ত্রী নিউক্লিয়াস।

নিউক্লিয়াসের এই শ্লোগানের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতাদের শুধু একজন নেতা কথা বলেছিলেন। তিনি হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। তিনি ছেলেদের দেশবিরোধী কথা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন ও ধমক দিয়েছেন।[৪২৮] নিউক্লিয়াসের ছেলেদের সমর্থন দিয়েছেন তাজউদ্দিন আহমদ। শেখ মুজিব পুরো বিষয়কে ইচ্ছেকৃতভাবে এড়িয়ে গেছেন। আমার ধারণা তিনি তখনো

৪২৭. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৭

৪২৮. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৮

www.pathagar.com

ঠিক করতে পারেননি নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে প্রধানমন্ত্রী হবেন নাকি দেশ ভাগ করে ফেলবেন!

৯জানুয়ারী মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইলের সন্তোষে একটি জাতীয় সম্মেলন ডাকেন। সম্মেলনে তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবী করেন। উল্লেখ্য, নির্বাচনের আগে নভেম্বরে পল্টনের এক জনসভায়ও তিনি এ দাবী উচ্চারণ করেছিলেন। তবে তার এসব কথাবার্তাকে আর গুরুত্ব দেওয়ার কিছু ছিল না। তিনি ইতোমধ্যে তার আজব কর্মকাণ্ড ও প্রতারণার কারণে জনগণের রোষানলে পড়েছিলেন। ভোটের বাক্সে লাথি মারার ঘোষণা দিয়ে তিনি রাজনীতি থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

নির্বাচনের সব কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার পরপরই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিজয়ী প্রধান দু'টি দলের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সিদ্ধান্ত নেন। যেহেতু মুজিব রাজধানী যেতে চায়নি তাই প্রেসিডেন্ট নিজেই ঢাকায় এসেছেন ১১জানুয়ারী। এতে তার ক্ষমতা হস্তান্তরের সদিচ্ছার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন সেনাসদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জেনারেল সৈয়দ গোলাম মোহাম্মদ মহিউদ্দিন পীরজাদা, ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার উল করিম ও লে. কর্নেল মাহমুদ। করিম ও মাহমুদ দুজনই ছিলেন বাঙালি। করিম প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে বসতেন এবং মাহমুদ ছিলেন পীরজাদার স্টাফ অফিসার। করিমকে পীরজাদার ডান হাত মনে করা হতো।

ইয়াহিয়া খান রওনা হওয়ার আগে করাচি বিমানবন্দরে এবং ঢাকায় পৌছে সাংবাদিকদের সঙ্গে বেশ খোলামেলাভাবেই বলেন, তিনি ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এবং তার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। ঢাকায় পৌঁছে ইয়াহিয়া তার সাহায্যকারী দলের সঙ্গে প্রস্তুতিমূলক সভা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন লে. জেনারেল পীরজাদা, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও ব্রিগেডিয়ার ইস্কান্দার করিম।

শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলেন কামাল হোসেন, তাজউদ্দীন আহমদ ও খন্দকার মোশতাক আহমদ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। প্রেস ফটোগ্রাফারদের ফটোসেশন চললো অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করলেন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর মানসিকতা,

www.pathagar.com

ইসলামাবাদসহ পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামীলীগের অবস্থান ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার আলোকে সমাধানের তিনটি বিকল্প প্রস্তাব রাখেন। প্রথমত সেনাবাহিনীর সহায়তায় শেখ মুজিব পাকিস্তান পরিচালনা করবে। দ্বিতীয়ত ভুট্টোর সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে সরকার গঠন। তৃতীয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টোর দল ছাড়া অন্য দলগুলোর সাথে জোট করে ক্ষমতা শেয়ার করা।[৪২৯]

যেহেতু মুজিবের পশ্চিমের অর্থাৎ মূল ভুখণ্ডে কোনো অবস্থান নেই তাই তিনি ভালো করেই জানতেন এই বিকল্প প্রস্তাবের বাইরে একা পাকিস্তান শাসন করা তার জন্য সম্ভব না। তাই তিনি শুরুতেই ১ম প্রস্তাবে রাজি হলেন। এই প্রস্তাবের আওতায় ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট ও মুজিব প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। প্রেসিডেন্টের কাছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, বিচারবিভাগ ও অর্থের দায়িত্ব রাখতে চেয়েছে ইয়াহিয়া ও সেনাবাহিনী। এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর যে উদ্বেগ রয়েছে মুজিবের প্রতি তা দূর হবে।

শেখ মুজিব তার দলের অন্যান্য নেতাদের সাথে প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করলেন। এরপর পুনরায় ১৪জানুয়ারী আবার দেখা করতে চেয়েছেন প্রেসিডেন্টের সাথে। সে মিটিং-এ মুজিব স্পষ্ট করেন তার ও তার দলের পক্ষে ইয়াহিয়া খানকে নামে মাত্র প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে মুজিব ভারতের প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর আর আলোচনা আগায়নি। ইয়াহিয়া খান ২য় প্রস্তাবের দিকে অগ্রসর হন। ১৫জানুয়ারী তিনি ফিরে যান পশ্চিমে। সেখানে করাচি বিমানবন্দরে তিনি মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেন।[৪৩০]

এরপর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিজয়ী প্রার্থী ভুট্টোকে প্রেসিডেন্ট ভবনে ডাকেন ও মুজিবের সাথে সমঝোতায় রাজি হতে অনুরোধ করেন। আলোচনা আরো চলতে থাকে ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে। লারকানায় ভুট্টোর পৈত্রিক বাড়িতে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে মুজিবের সাথে আলোচনা করে ক্ষমতা ভাগাভগি করার ব্যাপারে রাজি করান। ২৭জানুয়ারী ভুট্টো ঢাকায় এসে মুজিবের সাথে আলোচনা শুরু করেন।

---

৪২৯. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ১৯-২১

৪৩০. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ২৪

www.pathagar.com

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করার মতো। যেহেতু মুজিব নির্বাচনে জিতেছেন, তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে শেখ মুজিবের ভূমিকা থাকা উচিত ছিল একটিভ এবং তার পরিকল্পনা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা মোটেও দেখা যায়নি। তার ভূমিকা ছিল প্যাসিভ। সে ঢাকায় বসে আছে। কারো সাথেই আলোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে না। এই সমস্যাকেই ১ম সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছি।

ভুট্টো-মুজিব আলোচনা এগোয়নি। আসলে মুজিব কী চাচ্ছিলেন, তা তিনি নিজেও জানতেন না। তিনি ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন করতে রাজি হয়েছেন অথচ ভুট্টোকে কোনো ক্ষমতার অংশীদার করতে চাননি। এই সমস্যা কী মুজিবের একার ছিল? আমরা যদি একটু পেছনের দিকে যাই দেখতে পাবো ১৯৩৭ সাল থেকে এই বাংলায় নির্বাচনে যারাই জিতেছে কেউ তাদের অংশীদারদের ছাড় দিতে পারেনি বলে স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারেনি। ইংরেজ আমলে শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দী প্রায়ই মন্ত্রীসভা গড়তেন আর ভাঙতেন। পাকিস্তান আমলে ৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে জেতার পর শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খানের তিন বছরে পাঁচের বেশি মন্ত্রীসভা তৈরি করতে হয়েছে। অবশেষে স্পিকারকে খুন করে গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে।

ভুট্টো মুজিবের কাছে প্রথমে উপপ্রধানমন্ত্রী পদ চেয়েছেন। মুজিব রাজি না হওয়ায় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ চেয়েছেন। মুজিব তাতেও রাজি ছিলেন না। ভুট্টোকে ব্যবহার করে মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন বিনিময়ে শুধু একটি মন্ত্রনালয় (কৃষিমন্ত্রী) দিতে চেয়েছেন। ভুট্টো শুধু একটি মন্ত্রীতে রাজি হয়েছেন যদি পররাষ্ট্র হয়। আর তা না হলে মন্ত্রীসভায় আওয়ামীলীগ ও পিপলস পার্টির সমান সংখ্যক মন্ত্রী চেয়েছেন। মুজিব কৃষি ছাড়া আর কোনো মন্ত্রনালয় দিতে রাজি হননি। ভুট্টো ফিরে যান।

ইয়াহিয়া খান দুই দলকেই দ্রুত সমঝোতায় আসতে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতের সাথে একটি বিমান ছিনতাই নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় এবং বিমান চলাচল কিছুদিন বন্ধ থাকে। তাই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া কিছুদিন বন্ধ থাকে।

ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে সমস্যা নিরসনে মুজিব একটিভ ভূমিকা নিতে চান। তিনি মার্কিন দূতের কাছে যান আলোচনা করতে। তাকে সমঝোতার মধ্যস্থতাকারী

www.pathagar.com

মানতে চান। মুজিব ভুট্টোর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখেছেন। ভুট্টো পশ্চিমে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে ফেলেছে আন্দোলন করে। ইয়াহিয়া খানের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করছে। চাপের মুখে ইয়াহিয়া খান তার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন। এর মাধ্যমে ইয়াহিয়া ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত করেন। রাজনীতিবিদেরা যদি সমঝোতা করতে না পারে আবারো সেনা শাসন আসার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হলো। মুজিবও দেখতে পারলেন ভুট্টোর অব্যাহত আন্দোলনে তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান হারাম হয়ে যাচ্ছে। এদিকে মার্কিন দূত আর্চার ব্লাডের কাছে যাওয়ায় নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষেপে গিয়েছে।

অবশেষে ১মার্চ বেলা একটায় রেডিওতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। রেকর্ডকৃত ঘোষণাটি প্রেসিডেন্টের নামে পাঠ করা হলেও প্রেসিডেন্ট এতে কণ্ঠ দেননি। বেতার ঘোষণার অংশবিশেষ ছিল এ রকম:

"*বিগত কয়েক সপ্তাহে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ঐকমত্যে পৌঁছানোর পরিবর্তে আমাদের কোনো কোনো নেতা অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছেন। এটি দুর্ভাগ্যজনক। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক মোকাবিলা একটি দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।*

...সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া ভারত কর্তৃক সৃষ্ট সাধারণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সার্বিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অতএব, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান পরবর্তী কোনো তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি বারবার উল্লেখ করেছি যে শাসনতন্ত্র কোনো সাধারণ আইন নয়, বরং এটি হচ্ছে একত্রে বসবাস করার একটি চুক্তিবিশেষ। অতএব, একটি সুষ্ঠু ও কার্যকর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়ের পর্যাপ্ত অংশীদারি থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

...শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে যুক্তিসংগত সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত। এ সময় দেওয়ার পর আমি একান্তভাবে আশাকরি যে তারা একে কাজে লাগাবেন এবং সমস্যার একটি সমাধান বের করবেন। আমি পাকিস্তানি জনগণকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিস্থিতি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি, অনতিবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে কোনোরূপ ইতস্তত করবো না।"[৪৩১]

৩মার্চের সংসদ অধিবেশন স্থগিত হলে পূর্ব পাকিস্তানে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শেখ মুজিব হরতাল ঘোষণা করেন। সারা বাংলাকে নরকে পরিণত করে নিউক্লিয়াসের পরিকল্পনায় আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় ভারতের বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা মুহাজিরদের ওপর চলে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও গণহত্যা।

এতো এতো খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও হাল ছাড়েননি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। তিনি ১৫মার্চ ঢাকায় উড়ে এলেন। ১৬মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া একান্ত বৈঠক হলো এক ঘণ্টা। ১৭, ১৯ ও ২০মার্চও দু'জনের মধ্যে কথা হয়। তাদের দু'জনের সঙ্গেই ছিল নিজ নিজ পরামর্শক টিম। তারা জানলো, কয়েকটি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট একটা ফরমান জারি করবেন। ২১মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন। এবার ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। বৈঠকে ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে সমঝোতা করে দিতে চান ইয়াহিয়া। আলোচনা অনেক এগিয়েছে। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন।

এরপর কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটলো। "*শেখ মুজিবের স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা যুবনেতা আবদুর রাজ্জাককে (নিউক্লিয়াস প্রতিষ্ঠাতাদের একজন) ডেকে বললেন, 'তোমরা এখনো বসে আছো? তোমাদের নেতা কিন্তু আপোস করে ফেলেছে।' এতে নিউক্লিয়াসের মধ্যে তৎপরতা শুরু হলো। ২২মার্চ রাতে তারা ধরনা দিলেন শেখ মুজিবের কাছে। শেখ মুজিবের সঙ্গে তাদের আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজের বয়ানে:*

---

৪৩১. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৩৮

www.pathagar.com

২২মার্চ রাতে আমরা ৩২ নম্বরে গেলাম। রাত তখন ১০টা হবে। বঙ্গবন্ধু স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে খাটে শুয়ে আছেন। আমরা মেঝের ওপর বসলাম। তিনি এক হাতের ওপর মাথা ভর দিয়ে কাত হয়ে আধশোয়া অবস্থায় কথা বলতে লাগলেন। আমি বললাম, 'স্বাধীনতা ঘোষণা করে দ্যান।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'অনেক ভেবেছি, কোথাও সাপোর্ট নাই। ইন্ডিয়া সাপোর্ট দিতে পারে, নাও পারে। রাশিয়া দিবে কি না জানি না। আমেরিকা সাপোর্ট দিবে না। চায়না-হুজুরকে (মওলানা ভাসানী) বলছি, নেগেটিভ।' ঠিক এই সময় সিরাজ ভাই (সিরাজুল আলম খান) উঠে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন ৪০-৪৫ মিনিট পর। বললেন, 'কনফেডারেশনের প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? এতে পাকিস্তান থাকবে, কিন্তু ইয়াহিয়া এটা মানবে না। সুতরাং, আমাদের কাজটা হয়ে যাবে।' বঙ্গবন্ধু মুচকি হেসে সিরাজ ভাইকে বললেন, 'অ, তুই বুঝি মোস্তাকের (খন্দকার মোশতাক আহমদ) কাছে গেছিলি?'"[৪৩২]

একটা চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের একটি অংশের চাপ ছিল। ছাত্রদের দাবী ছিল, গণ-আন্দোলন নিয়ে কোনো আপোস চলবে না। শেখ মুজিব কেন্দ্রের ক্ষমতা নেওয়া অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঘোর বিরোধী ছিল নিউক্লিয়াস। প্রধানমন্ত্রী হওয়াটাকেই তারা আপোস হিসেবে দেখেছে।

চরম সিদ্ধান্ত নেয় নিউক্লিয়াস। তারা মুজিবের ওপর ভরসা রাখে না। কারণ মুজিব ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন করে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। ২৩তারিখ ভারত, রাশিয়া ও আমেরিকার মিডিয়ায় একটি খবর লিড নিউজ করে ছাপা হয়। বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান। প্রমাণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র হাতে প্যারেডরত ছাত্র-ছাত্রীদের একটি ছবি প্রকাশিত হয়। এই নিয়ে শুধু পাকিস্তান নয় সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তৈরি হয়। ভুট্টোর কথা সত্য প্রমাণিত হয়। ভুট্টো এতো দিন বলে আসছিল আওয়ামীলীগ গোঁয়ার্তুমি ও আলোচনা নামে সময় ক্ষেপন করছে। তারা পাকিস্তান ভেঙে দিতে চায়। তারা মুশরিকদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে চায়।

ইয়াহিয়া খাঁন হতাশ হয়ে পড়লেন। ২২তারিখের ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল প্রক্রিয়া ২৪তারিখে বন্ধ হয়ে গেলো। ভুট্টো মুজিবের সাথে আর কোনো

---

৪৩২ মার্চের উত্তাল দিন / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথম আলো / https://bit.ly/30knHIX / ২৬ মার্চ ২০১৫

www.pathagar.com

আলোচনা করতে রাজি না, ফলে তিনি পশ্চিমে চলে যান। ২৪মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় আওয়ামীলীগের আলোচক দল ইয়াহিয়ার পরামর্শক দলের সঙ্গে আবার বৈঠক করে। ওই বৈঠকে দেশের নাম 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান' হতে হবে বলে আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে একটি সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই মিটিং-এ শেখ মুজিব ছিল না। ইয়াহিয়া খান ধৈর্য ধরে ঢাবির ঘটনা জানতে চান। তারা এটাকে কিছু উগ্রবাদীদের কাজ বলে উল্লেখ করেন।

মুজিব পড়ে যায় বিপদে। নিউক্লিয়াস বিদেশি মিডিয়ার কাছে ছবি পাঠিয়ে মুজিবের সমস্ত রাজনৈতিক কাজের ইতি ঘটিয়ে দিলো। মুজিব পালিয়ে না গিয়ে গ্রেফতার হওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। ইয়াহিয়া খান সকল আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান। আর সেনাবাহিনী দেশদ্রোহীদের খোঁজার জন্য অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে। মুজিব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য যে চারটি সমস্যা ছিল। এর মধ্যে ইয়াহিয়া খান তার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে ১ম তিনটি সমস্যা দূর করে ফেলেছেন। কিন্তু ৪র্থ বাধা নিউক্লিয়াসের কাছে হেরে যান মুজিব ও ইয়াহিয়া খান। তারা মুজিবকে দেশদ্রোহী হিসেবে প্রমাণ করেছে। একজন দেশদ্রোহী তো আর দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না!

অপারেশন সার্চলাইট এবং এর প্রেক্ষাপট

১৯৭১ সালের ২৫মার্চ রাতে ঢাকায় দেশের সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করে। এই নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ বলতে চায়, এখানে গণহত্যা চালানো হয়েছে, নিরস্ত্র ঘুমন্ত মানুষের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে সেনাবাহিনী। যদিও এই দাবী সত্য নয়, তবে এটাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মূলত সেনাবাহিনী সেদিন তিনটি স্থানে অভিযান চালিয়েছে মুশরিকদের গুপ্তচর ও দেশদ্রোহীদের চিহ্নিত করার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স ও শাঁখারিবাজার।

পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টির অব্যাহত আন্দোলন চলছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তান প্রায় অচল করে দিয়েছে। তাদের দাবী তাদের ছাড়া পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হলে তা তারা মেনে নিবে না। মুজিব চেয়েছিল একাই পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করবে। এছাড়া ভুট্টো বিরোধী দলীয় আসনে বসতে রাজি ছিল না। তার দাবী সে যেহেতু পশ্চিমে শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ,

www.pathagar.com

তাই তার সাথে সমঝোতা করেই সরকার গঠন করতে হবে। পশ্চিমে তার সাহায্য ছাড়া কেউ পাকিস্তান যাতে চালাতে না পারে সেই ব্যবস্থা ভুট্টো করেছে।

ভুট্টোর চাপে ইয়াহিয়া খান তার মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে বাধ্য হন। ইয়াহিয়া খান ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে সমঝোতা করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু মুজিবের বিভ্রান্তিকর অবস্থানের কারণে সমঝোতা ব্যর্থ হয়। মুজিব ভুট্টোকে ছাড় দিতে রাজি হয় না। এদিকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল ৩মার্চ। ভুট্টো কোনো সমঝোতা ছাড়া অধিবেশন শুরু করতে নিষেধ করে যাচ্ছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

ভুট্টোর চাপে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব-পাকিস্তানের সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেন ১মার্চ। ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ৫০, ০০০ থেকে ৬০, ০০০ হাজার লোক বাঁশের লাঠি, লোহার রড নিয়ে হোটেল পূর্বাণীর সামনের সকল পথ রোধ করে ভিড় জমায়। সেখানে তারা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। পাকিস্তানের পতাকা পোড়ায় এবং জিন্নাহর ছবি ভাংচুর করে। একই সাথে রাষ্ট্রবিরোধী ও কম্যুনিজমের পক্ষে শ্লোগান দিতে থাকে। সে সময় হোটেল পূর্বাণীতে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু নির্বাচিত সদস্য ছিলেন যারা ৩ তারিখের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য এসেছিলেন ঢাকায়। তবে তারা কেউ ভুট্টোর দলের ছিলেন না। তারা বেশিরভাগ ছেলে ন্যাপ (ওয়ালি) দলের সদস্য।

শেখ মুজিব তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং হরতালের ঘোষণা দেন ও ৭মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান। সাংবাদিক মাসকারেনহাস ১মার্চের ঘটনার বর্ণনা লিখেছেন এভাবে, ..বিক্ষুব্ধ জনতার দীর্ঘ সারি ছুটে চলছিল পল্টন ময়দানের পথে যেখানে তারা ঐতিহ্যগতভাবে সব সময় তাদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরতো। উত্তেজিত চেহারায় হাতে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, হকিষ্টিক নিয়ে তারা যেন প্রতিশোধের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল পল্টনে। বিকাল সাড়ে চারটার মধ্যেই আনুমানিক ৫০, ০০০ হাজার লোক জমায়েত হয়ে গেলো। [৪৩৩]

---

৪৩৩. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩০

www.pathagar.com

চিৎকার, হৈচৈ আর উত্তেজনার পর সহসাই বেশ কিছু লোক ভীড়ের মধ্য থেকে বের হয়ে আসলো ও জিন্নাহ এভিনিউ (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এভিনিউ) এর সামনের দোকানপাট, জানালার কাঁচ, দরজা ভাংচুর আর অগ্নিসংযোগের পর লুটপাট শুরু করে দিলো। ওই সব দোকানের মালিকদের সকলেই ছিলেন ভারত থেকে আসা মুহাজির বা অবাঙালি। এর মধ্য দিয়ে চারদিকে গোলযোগ বিস্তৃত হতে শুরু করলো। ইতোমধ্যে হোটেল পূর্বাণী থেকে এনে একটি পাকিস্তানি পতাকা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, সামনের পিআইএ অফিসের কাচের জানালাগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হলো। কিছু যুবক চেষ্টা চালালো হোটেল পূর্বাণীতে পশ্চিম পাকিস্তানি মালিকানায় থাকা কয়েকটি দোকান লুটের'।

ম্যাসকারেনহাস- এর মতে, শেখ মুজিবের বক্তৃতা জনতার আবেগের পরিপূরক ছিল না। তিনি জনগণকে ভৎসনা করে লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দিতে বলেন। কিন্তু উত্তেজিত জনগণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এক অরাজক পরিস্থিতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল। ওই রাতে ঢাকা শহরের সর্বত্র দাঙ্গাকারী ও পুলিশের মাঝে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে, বেশ কয়েকটি হামলার ঘটনা ঘটে অবাঙালি ও তাদের সম্পত্তির ওপর। এ পরিস্থিতিতে আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবকরা হস্তক্ষেপ করলে তাৎক্ষণিক উগ্রজনতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।...আর এভাবেই এদিন সূচনা হয় দীর্ঘ ২৫ দিনের গণজোয়ারের...। এদিকে রাস্তায় উগ্রজনতার মারমুখী মনোভাব যেন এক নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে পরিণত হয়।

একদিকে মনে হচ্ছিল শেখ মুজিব উগ্রজনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন, অপরদিকে তার মৌখিক নির্দেশই ছিল আইন ও তার কথাবার্তা উৎসাহিত করছিল উগ্রবাদী আচরণকে। অনেক বাঙালির স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় ধৈর্যধারণ করার জন্য মুজিবের বাগাড়ম্বরপূর্ণ আহ্বান সত্ত্বেও বাঙালিদের বিদ্রোহ ছিল একদম খোলাখুলি, গর্বিত ও সশস্ত্র ধাঁচের। ৭মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মুজিবের ভাষণ শুনতে জনতার ঢল নামে, ..." আর এ জনতার হাতে ছিল বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র, বাঁশের লাঠি, লোহার রড, তরবারি, হাতে তৈরি ছোরা, শর্টগান। ওই সময়ের একটা বিশেষ শ্লোগান ছিল 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'।[৪৩৪]

---

৪৩৪. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩১

www.pathagar.com

সেই সময়ের ঘটনাবলী স্মরণ করে অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, সশস্ত্র অবস্থায় রাজনৈতিক মিছিলে যোগ দেওয়াটা যেন পরিণত হয়েছিল জনতার একটা স্বাভাবিক রীতিতে। বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মার্কিন কনসাল জেনারেল লিখেছেন, বাঙালি বিদ্রোহীদের বিদ্রোহের কুৎসিত দিকটা খুব শীঘ্রই প্রকাশ্যে বের হয়ে এলো। পশ্চিম পাকিস্তানি ও বিদেশীদের সম্পত্তিতে লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ঢাকার ফার্মগেটের আবাসিক এলাকায় সকল অবাঙালির দোকানপাটে ও তাদের বাড়ি ঘরেও আক্রমণ করলো বাঙালিরা। ঢাকা ভ্রমণকালে বিদেশীদের পছন্দের তালিকায় তাদের আবাসস্থল ছিল হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (শেরাটন)। একদল ছাত্র পিস্তল দিয়ে গুলিবর্ষণ করলো হোটেল ইন্টারকন্টিনন্টালের ওপর। রাস্তায় নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর প্রতিনিধি ও তার স্ত্রী উঠতি বয়েসি ছেলেদের দ্বারা হলো আক্রান্ত, কিন্তু আওয়ামীলীগের একটি প্রহরী দল তাদের শেষমেশ রক্ষা করে। ছাত্রদের একটি দল যারা সম্ভবত বামপন্থী ছিল তারা বৃটিশ কাউন্সিলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালিয়েছিল। এ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমকে জানায় যে, মার্চের প্রথম সপ্তাহেই গোলযোগে ১৭২ জন মারা গেছে ও আহত হয়েছে ৩৫৮ জন। এরা প্রায় সবাই ছিলেন ভারতের বিহার থেকে আসা বিহারী। ২৪মার্চের দিকে মার্কিন কনসুলেটের উপরও বোমাবাজি ও গুলিবর্ষণ করা হয়।[৪৩৫]

রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

১মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে শেখ মুজিব সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ আরো চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছায় এবং ঠিক ওই সময় থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে হারিয়ে ফেলে। শেখ মুজিব হাঁটছিলেন প্যারাডক্সের পথে, একদিকে তিনি উত্তেজনাকর বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছিলেন আর অপরদিকে তিনি জনগণকে হিন্দু, খ্রিস্টান ও অবাঙালিদের ভ্রাতৃতুল্য বিবেচনা করে যাতে তাদের

৪৩৫. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩১

www.pathagar.com

জানমালের কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সে কথা বলছিলেন। তার দলের উগ্রপন্থী কর্মীরা জনসম্মুখে হাজির হচ্ছিল রাইফেল ও শর্টগানের মতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাতেও তারা মানুষ আসছিল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। মুজিব একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেও শাসক গোষ্ঠীর সামনে বিরাট এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

কোনো বিকল্প সরকার গঠন না করে ও নিয়মতান্ত্রিক দায়দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা ছাড়াই তার কর্মী সমর্থকরা পূর্ব পাকিস্তানে তার নির্দেশনা আনুগত্যের সাথে মেনে চলছিল। এর মাধ্যমে একটি ত্রাসের রাজত্ব বা মগের মুল্লুক সৃষ্টি হয়েছিল। এর কারণ সব নির্দেশ শেখ মুজিবের নামে আসলেও সব সন্ত্রাসী নির্দেশ শেখ মুজিব দিতেন না। অরাজকতা সৃষ্টির যে নির্দেশনা তার বড় অংশ আসতো নিউক্লিয়াসের পক্ষ থেকে। তারা তাদের বিপ্লব সংঘটনের জন্য এরকম একটি অরাজক পরিস্থিতির চেষ্টা করে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও চাকমা প্রধান রাজা ত্রিদিব রায় সপরিবারে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ট্রেন আর সরকারের প্রদত্ত সময়সূচি অনুযায়ী চলছে না বরং মুজিবের নামে ইচ্ছে মতো চলছে। তার মতে মুজিবের ঘোষণা দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ও একজন অবিসংবাদিত নেতার নির্দেশ হিসেবেই যে সবকিছু এভাবে চলছিল তা নয় বরং এর পিছনে ছিল সহিংসতা ও তার দলীয় ক্যাডারদের সংহিসতার হুমকির ভয়।[৪৩৬]

বিহারীদের ওপর নৃশংস গণহত্যা

১মার্চ থেকে যে কার্যক্রম সবচেয়ে হৃদয়বিদারক আকারে দেখা দিয়েছে তা হলো বিহারীদের ওপর চালানো নিউক্লিয়াস ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের গণহত্যা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ভাগের সময় ভারতের মুশরিকদের নির্যাতনের শিকার এদেশে আসেন বহু সম্বল হারানো মুসলিম। তারা ঢাকায় এসে বাঙালি মুসলিম ভাইদের থেকে যেভাবে সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল সেভাবে পায়নি। বরং নিগ্রহের শিকার হয়েছে। তার ওপর ১৯৭১ সালে আওয়ামীলীগ তাদের হীন স্বার্থ বাস্তবায়ন

---

৪৩৬. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৬-৩৭

www.pathagar.com

করতে গিয়ে তাদের ওপর গণহত্যা চালায়। একটা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে ভারতের মুশরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করবে এবং পাকিস্তানকে ভাগ করে ফেলবে।

শর্মিলা বসু তার বই ডেড রেকনিং-এ বলেছেন, ইতোমধ্যে নির্বিচারে অবাঙালি বিশেষ করে বিহারীদের হত্যাকাণ্ডের মতো ভয়াবহ ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশকে মনে হয়েছিল এক রকম নিষ্ক্রিয় এবং সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল সেনা ছাউনির ভিতরে। মুজিব তার পিচ্ছিল পথেই হাঁটছিলেন ও সেই ব্যাপক প্রত্যাশিত ৭মার্চের জনসমুদ্রে উদ্গীরণ করলেন বিদ্যুৎ চমকানোর মতো বক্তৃতা যাতে স্বাধীনতার ঘোষণা করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন।

এ সময় ঢাকায় বিদেশীদের মাঝেও আতঙ্ক বৃদ্ধি পায়। ১২মার্চ মার্কিন কনসুলেটে দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হয় ও কেউ একজন কনসুলেট লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলি ছোড়ে। ১৫মার্চ কনসুলেট লক্ষ্য করে আরো গুলি ছোড়া হয়। ১৯মার্চ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও মার্কিন কনসুলেট ভবনে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। ঢাকা ক্লাব, বৃটিশ কাউন্সিল, আলিকো এবং আমেরিকান দূতাবাসে নিক্ষেপ করা হয় বোমা। ।[৪৩৭]

প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও চলতে থাকে অবাঙালিদের ওপর গণহত্যা, তাদের বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ। ঢাকার বাইরে যে ত্রাস ও অরাজকতা তৈরি হয়েছিল, তার তুলনায় ঢাকায় বিক্ষিপ্ত ও আতঙ্ক সৃষ্টির ঘটনা বলা চলে অনেক কমই ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো খুলনা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ৪মার্চ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল, ৫মার্চ খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুরে ছোরা ও দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ৫৭ জন অবাঙালিকে। চট্টগ্রামে ৩-৪মার্চ ওয়্যারলেস কলোনী ও ফিরোজশাহ কলোনীতে কয়েকশ' অবাঙালি নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যা করা হয় এবং তাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এভিয়েশনে কর্মরত ক্যাপ্টেন ইকরাম সেহগাল (পরে মেজর) জানান, তিনি ওয়্যারলেস কলোনী ও ফিরোজশাহ কলোনীর

---

৪৩৭. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৬-৩৭

www.pathagar.com

ওপর দিয়ে ৪মার্চ উড়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান ওই এলাকার সবকিছু পুড়ে কালো ছাই হয়ে গেছে।[৪৩৮]

এমনকি সামরিক সরকারের কঠোর সমালোচক সাংবাদিক ম্যাসকারেনাসও পূর্ব পাকিস্তানের অবাঙালি বাসিন্দাদের আতংকের বিষয়টিকে ন্যায্য বলে স্বীকার করেছেন। অবাঙালিদের রক্ষা করার জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও খুলনা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও দেশের ছোট ছোট শহরে হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজের মতো ঘটনা ঘটে চলছিল। প্রথম দিকে সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং তাতে উভয়পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু বাইরে থেকে তাদের সেনা নিবাস ফেরত আসার নির্দেশ দেয়া হয় ও তারপর থেকে তারা ভিতরেই ছিলেন। এরপর শহরের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় এবং এপ্রিলে সেনাবাহিনীর দ্বারা পুনরায় শহরের নিয়ন্ত্রণ না নেয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। ২মার্চ সান্ধ্য আইন জারী করা হয় ও কয়েকজন সান্ধ্য আইন অমান্যকারীকে গুলি করা হয়েছিল।[৪৩৯]

কিন্তু ৩মার্চ সেনাবাহিনীকে আবার ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সরকারের ওই সিদ্ধান্ত মারাত্মক ভুল ছিল। এর ফলে হাজার হাজার বিহারী মুসলিম শেখ মুজিবের সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে খুন হন। তখন সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কোনো দ্বন্দ্বে জড়ানো যাবে না, এমনকি সান্ধ্য আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো সেনা সদস্য শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়। ইয়াহিয়া খান ভেবেছিল সেনাবাহিনী নৈরাজ্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতি আরো বেগতিক হয়ে পড়বে। তাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাবে। তিনি মুজিবের সাথে আলোচনা করে সমঝোতা করতে চেয়েছেন। পরিস্থিতি যদি শুধু মুজিবের নিয়ন্ত্রণে থাকতো তাহলে হয়তো এতোটা খারাপ অবস্থা তৈরি হতো না। কিন্তু অরাজক পরিস্থিতির একটি বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে ভারতের মদদপুষ্ট নিউক্লিয়াস। এটাই ছিল বড় সমস্যা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণস্থানে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর প্রতি সংযত থাকার এই নির্দেশের সংবাদটি শেখ মুজিব ও নিউক্লিয়াসকে জানিয়ে দেন। ফলে

---

৪৩৮. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৬-৩৭

৪৩৯. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৬-৩৭

www.pathagar.com

পরিস্থিতি হয়েছে আরো ভয়াবহ। এতে কোনো প্রকার শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই বাঙালি দাঙ্গাকারীরা সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করা শুরু করে। জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁন ৬মার্চ কড়া ভাষায় বক্তৃতা দেন ও বালুচ আন্দোলন শক্ত হাতে দমনকারী জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হিসেবে ঢাকায় পাঠান। পূর্ব পাকিস্তানে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় পরিচালিত অঘোষিত সমান্তরাল সরকারি প্রশাসন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে বাঙালি প্রধান বিচারপতি জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতেও অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন।[৪৪০]

শফিউদ্দিন তালুকদার তার বইতে বলেছেন, সিরাজগঞ্জ সদরের রেলওয়ে কলোনীর বিহারী পট্টির হত্যাকান্ডটি ইতিহাসের একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। যে ঘটনাটি অনাকাঙ্খিত অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। অত্যন্ত রোমহর্ষক ও বেদনাদায়ক। উনিশ'শ একাত্তরের ৭মার্চ ঢাকার রেসকোর্স মাঠে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তেজদ্বীপ্ত ও ঐতিহাসিক ভাষণের পর ২৬মার্চের কয়েক দিন আগে সিরাজগঞ্জের সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষ এই নৃশংস ঘটনাটি ঘটায়।[৪৪১]

সিরাজগঞ্জের আওয়ামীলীগের এমন ধারণার উদ্রেক হয়েছিল যে, রেলওয়ে কলোনিতে বসবাসরত বিহারীরা বাংলাদেশের শত্রু, তারা বাংলাদেশকে সমর্থন করতে পারে না, তারা পাকিস্তানকেই সমর্থন করবে আর যেহেতু তারা অধিকাংশই উর্দু ভাষাভাষি, সেহেতু পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে বসবাসরত পশ্চিম পাকিস্তানিরাও তাদের শত্রু - এসব ধারণার বশবর্তী হয়ে জনগণ স্বত:স্ফূর্তভাবে সিরাজগঞ্জের রেলওয়ে কলোনির বিহারী পট্টিতে হামলা চালায় এবং তিনশ থেকে চারশ লোককে বিনা দোষে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

২৩মার্চ থেকেই শুরু হয় পাবনায় বাঙ্গালীর হত্যাযজ্ঞ। বাঙ্গালীরা ২৫০ জন পুরুষ, নারী ও শিশুকে একটা দালানে ঢুকিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। কলোনীর ভেতরে যারা ছিল তাদের সকলকেই এভাবে ফাঁদে ফেলে হত্যা করা হয়।"[৪৪২]

পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির নেতা রইসউদ্দিন আরিফ তার বইতে বলেন ...

---

৪৪০. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৮

৪৪১. একাত্তরের গণহত্যা : যমুনার পূর্ব-পশ্চিম / শফিউদ্দিন তালুকদার / কথাপ্রকাশ / পৃ. ৭৪-৭৬

৪৪২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র / বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর / আগামী প্রকাশনী / পৃ. ১৪৭

www.pathagar.com

রানু (প্রয়াত কমরেড রাশিদা) গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল শহরে পাঞ্জাবী সেনাদের আগমনের আগেই। ২৫মার্চের পর পাঞ্জাবী সেনাদের হাতে জান খোয়ানোর চেয়েও বেশি, ইজ্জত খোয়ানোর ভয়ে শহর থেকে সব মহিলারা দলে দলে গ্রামে পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রানুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্নতর। আসলে রানু নিজের আজন্মলালিত শহরটিকে ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিল আর দশজন মহিলার মতো যতটা না পাঞ্জাবীদের ভয়ে, . তার চেয়েও বেশি অন্য এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঐ বিশেষ ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর এ শহরের বাতাস যেনো পাথর হয়ে চেপে বসেছিল ওর বুকে।

'ক্রাকডাউনের' পর ঢাকা থেকে পাঞ্জাবী সেনাদের আগমনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের এ মফস্বল শহরটি ছিল পুরোপুরি মুক্ত এলাকা। বিশেষ করে ২৭-২৮ মার্চে শহরতলী এলাকায় অবস্থিত ইপিআর ক্যাম্পের সব অবাঙালি অফিসার-জওয়ান বউ-বাচ্চা সহকারে খতম হওয়ার পর গোটা শহর তখন পুরোপুরি শত্রুমুক্ত। এক অভাবিত মুক্তির স্বাদে কয়টা দিন শহরের অলিতে গলিতে আর ঘরে ঘরে আপাতমুক্তির আনন্দ-উল্লাসের কী যে জোয়ার বয়েছিল, তা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যায় না। রানুর মনেও আনন্দ-উল্লাসের হয়তো কমতি ছিল না।

কিন্তু এরই মাঝে হঠাৎ এক সকালে 'স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান চেতনা' হুমড়ি খেয়ে পড়লো শহরের বিহারী কলোনীগুলোর ওপর। হৈ হৈ রৈ রৈ করে রীতিমতো কুরুক্ষেত্র আর লংকাকান্ড চললো পুরো তিন দিন। বিহারী ছেলে, বুড়ো ও নারী-পুরুষের রক্তের স্রোত বয়ে গেলো কলোনীগুলোর ওপর। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, নিষ্ক্রিয়, অসহায় নারী-পুরুষ-শিশুর ওপর একতরফা হত্যাযজ্ঞ চললো পুরো তিনটে দিন।

রানু এই চরম লোমহর্ষক বর্বর মুহূর্তেও কাউকে না জানিয়ে একাকী কলোনীতে দৌড়ে গিয়েছিল। তাহমিনাদের ঘরের আঙীনায় পৌঁছে ওর বাবা-মা'র লাশ দেখে আঁৎকে উঠলেও সে পিছ-পা হয়নি। প্রিয়তমা বান্ধবীকে উদ্ধারের আশায় অতি দুঃসাহসে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে তাহমিনাদের ঘরে ঢুকে পড়েছিল এবং ঢুকেই আর্তচিৎকারে কলোনীর আকাশ প্রকম্পিত করে দিয়েছিল। রানুর চোখের সামনে এক বীভৎস দৃশ্যের নিস্তব্ধতা। মেঝেতে তাহমিনার লাশ পড়ে আছে চিৎ হয়ে, পরনে ওর একটি সুতোও নেই। রক্তে সারা ঘর ভাসছে।

www.pathagar.com

তার পরদিনই রানু শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। 'মুক্তিযুদ্ধের' পুরো ৯টি মাস রানুকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ হই। ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় ৭১-এ এই দেশের মাটিতে অসহায় মানুষকে নির্বিচারে হত্যা, অবলা নারীর ওপর বলাৎকার, ইত্যকার পাশবিক কার্যকলাপ প্রথম নাকি শুরু করে একশ্রেণীর বাঙালিরাই। রানুকে যদি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দেওয়া যেতো, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিশ্চয়ই শুরু হতো এই কলংকময় অধ্যায় দিয়ে।[৪৪৩]

যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনায় ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন সেখানে বাঙ্গালীরা প্রায় দুইশত বিহারীকে হত্যা করে। ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বিদ্রোহীরা সমগ্র বিহারী জনগণকে সাধারণভাবে হত্যা করে। মেয়ে ও শিশুদের টেনেহিঁচড়ে নড়াইলের দিকে নিয়ে যায়। ৪০০ থেকে ৫০০'র মতো মেয়েকে অপহরণ করে নদীপথে হিন্দুস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষের কংকাল ও দেহের অন্যান্য অংশ সমস্ত এলাকায় ছড়ানো রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। রামনগর কলোনীতে ঝুমঝুমপুর কলোনীর লোকেরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এই কলোনীতেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ১৫০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়। দুস্থ শিবিরে আশ্রয় নেয় ৪৪৮ জন।[৪৪৪]

তারাগঞ্জ কলোনীতে আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবকরা ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বিদ্রোহীরা সমগ্র কলোনীতে বেপরোয়া হত্যাকান্ড চালিয়ে যায়। খুব কম লোকই বেঁচেছিল। সমস্ত বাড়িঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৫শ'র মতো লোক নিহত হয়। নিখোঁজ লোকের সংখ্যা ৪শ'। হামিদপুর, আমবাগান, বাকাচর এবং যশোর শহরের পুরাতন কসবা। এই এলাকার অধিকাংশ জনগণকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। ঘরবাড়ি প্রথমে লুটপাট এবং পরে তা আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হয়। প্রায় ১ হাজার লোক নিহত ও নিখোঁজ হয়। ১৭৫ জন হাসপাতালে যায় এবং ১৭২ জন দুস্থ শিবিরে আশ্রয় নেয়।[৪৪৫]

---

৪৪৩. আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন সমগ্র / রইসউদ্দিন আরিফ / পাঠক সমাবেশ / পৃ. ১২০-১২৫

৪৪৪. বৃহত্তর যশোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস / ড. মো. আনোয়ার হোসেন / গতিধারা / পৃ. ১৮০-১৮১

৪৪৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র / বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর / আগামী প্রকাশনী / পৃ. ১৪২-১৪৪

www.pathagar.com

জাফর ইকবাল বলেন, ময়মনসিংহ শহরে বসবাসরত অবাঙালীরা এবং স্বাধীনতাবিরোধী কতিপয় রাজনৈতিক দলের সদস্যরা ময়মনসিংহ পতনের চেষ্টা চালায়। জনগণ এটাকে সুস্থভাবে গ্রহণ করেনি বলেই তাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলে নেয়। এতে কয়েকশ' লোক নিহত হয়। এ সময় শহরে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা। শামসুজ্জামান খান বলেন, ময়মনসিংহের ছত্রপুর এলাকার রেল কলোনীতে অনেক বিহারী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় সে কলোনীতে আগুন দেওয়া হয়। আগুনে পুড়ে মরে শিশু, নারী ও পুরুষ। আগুন-নেভার পর কোনো কোনো ঘরে পুড়ে যাওয়া আদম সন্তানের বিকৃত ও বীভৎস চেহারা দেখে চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল এক মানুষ অন্য মানুষকে কি করে এত নিষ্ঠুরভাবে মারে![৪৪৬]

বদরুদ্দিন ওমর তার স্মৃতিচারণ গ্রন্থে বলেন, ... আমরা কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেলো আড়িয়াল খাঁ অনেক চওড়া হয়েছে। এক সময় মাঝি বললো সামনে একটা বাজার আছে। আমরা রান্নার জিনিসপত্র কিনতে চাইলে সে নৌকো ভিড়াবে। আমাদের কথায় সে নদীর ডানদিকে এক জায়গায় নিয়ে আমাদের নামালো। সেটা কোনো ঘাট নয়। তবে নৌকো থেকে নেমে ডাঙ্গায় যাওয়া সহজ। মাঝি বললো বাজারের জন্য একটু ভিতরে যেতে হবে। তার কথামত এগিয়ে গিয়ে আমরা বাজার পেলাম। এক দোকানে চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, আলু কিনে আমরা নৌকোয় ফিরলাম।

কাঠের ব্যবস্থা নৌকোতেই ছিল। মাঝ নদীতে গিয়ে ভালো করে হাঁড়ি ধুয়ে খিচুড়ি চড়িয়ে দেওয়া হলো। কাঠের চুলোয় নৌকার ওপর রান্নার অসুবিধে হলো না। দু'টো মাটির শানকি ছিল। সেগুলো ভালোভাবে ধুঁয়ে আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। এমন সময় নদীর বাঁ দিকে দেখলাম, পাড় থেকে নেমে কয়েকটা লোক কি যেন টানাটানি করছে। একটু লক্ষ্য করতেই বোঝা গেলো সেটা একটি মেয়ের লাশ। লোকদের কাজকর্ম দেখে মনে হলো, লাশ থেকে তারা কিছু নেওয়ার চেষ্টা করছে। মাঝি বললো, তারা লাশটির শরীর থেকে গয়নাগাটি খুলে নিচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখার সময় হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়ায় দেখা গেলো এক ভয়াবহ দৃশ্য। একসাথে অনেকগুলো মেয়ের লাশ নদীর ওপর ভাসছে। সকলের পরনে

৪৪৬. ময়মনসিংহে মুক্তিযুদ্ধ / জাফর ইকবাল / ভোরের কাগজ / ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২

www.pathagar.com

শালোয়ার কামিজ। বোঝার অসুবিধা নেই, সেগুলো অবাঙালি মেয়েদের লাশ। সেই মেয়েদের লাশের সাথে বাচ্চাদের লাশও দেখা গেলো। নৌকো লাশগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেও লাশ কাতারবন্দী হয়ে আরও দেখা গেলো। বোঝা গেলো, সামনে বড় আকারে কোথাও অবাঙালী নিধন হয়েছে। আমরা খেতে বসার সময় এভাবে ভাসমান লাশগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার প্রবৃত্তি আর থাকলো না। আমরা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সেই লাশের মিছিল শেষ হলো। আমরা খেতে বসলাম। খেতে তো হবেই। কোনো রকমে খেলাম, মাঝিও আমাদের সঙ্গে খেলো, মনে হয় সোজা হাঁড়ি থেকেই।

লাশগুলো আসছিল টেকেরহাটের দিক থেকে। পরে আমরা শুনেছিলাম যে, ঐ এলাকার কাছাকাছি এক জায়গায় দু'টি লঞ্চ দাঁড় করিয়ে তার যাত্রী বিহারী মেয়ে ও তাদের বাচ্চাদের বাঙালীরা খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। ঐ মেয়েরা আসছিল যশোরের নড়াইল শহর থেকে। তখন সেখানে এসডিও ছিল কামাল সিদ্দিকী। চারিদিকে বাঙালীরা খুন খারাবী করতে থাকার সময় প্রথম চোটে পুরুষদের মেরে ফেলেছিল। মেয়েদেরকে আটক করে পরে খুন করার ব্যবস্থা করেছিল। সে সময় কামাল সিদ্দিকী, যে আমার পরিচিত ও ছাত্র, সে স্থানীয় ছিল, তাড়াতাড়ি দু'টি লঞ্চ ভাড়া করে মেয়েদেরকে বরিশালের দিকে পাঠিয়ে সেখান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার, হতে পারে ভারতের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করছিল। পথে বাঙালীরা লঞ্চ দু'টি আটক করে সেই নৃশংস হত্যাকান্ড করে। সেই নৃশংসতার বিবরণ টেকেরহাটেই শুনেছিলাম। কামাল সিদ্দিকী এরপর কোলকাতায় চলে গিয়েছিল। ১৯৭১ সালের পর আমার সাথে ঢাকায় দেখা হয়েছিল।

আমরা টেকেরহাট পৌঁছালাম। তখন বিকেল চারটের মত হবে। দেখলাম ঘাটে কতকগুলো লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম একটা লঞ্চ বড়দিয়া যাবে। বড়দিয়া খুলনা যশোরের বর্ডারের কাছে মধুমতী নদীর ওপর। সেটা একটা বড় মোকাম এবং নদী বন্দরও বটে। আমরা লঞ্চটিতে উঠে বসলাম। লঞ্চ ছাড়ার কথা পাঁচটার দিকে। লঞ্চ ঘাটের কাছে নদীটা তেমন চওড়া নয়। লঞ্চে বসে দেখা গেলো নদীর অন্য তীরে পানিতে লাশ ভাসছে। এমনকি আমাদের লঞ্চের গায়েও দুই একটা লাশ এসে লেগেছিল। ঢেউয়ের ধাক্কায় দোলা খাচ্ছিল। সদ্য খুন করা লাশের ছড়াছড়ি এভাবে আগে কোনোদিন দেখিনি।

www.pathagar.com

জীবনে মানুষের করুণ মৃত্যুর অনেক চেহারা আমি দেখেছি। একেবারে প্রথম সেই ছেলেবেলায় ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ, তারপর কোলকাতায় ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, ১৯৭০ সালে দক্ষিণ বাঙলায় সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস। তারপর ১৯৭১ সালের এই সব মৃত্যু। পরে আরও দেখেছি, ঢাকায় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর থেকে করুণ আর কোনো মৃত্যু নেই। আর গণহত্যা ও দাঙ্গায় মৃত্যুর থেকে মানুষের সামষ্টিক অমানুষিকতার বড় দৃষ্টান্ত মনে হয় আর নেই। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে এই অমানুষিকতার সাথেই আমরা বসবাস করছিলাম।"

সেনাবাহিনীকে আক্রমণ

আওয়ামীলীগ মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করে। সেনানিবাসে খাদ্য ও জ্বালানী সরবরাহ বন্ধ করে দেয় সশস্ত্র ক্যাডাররা। স্থানীয় বাজারের দোকানদাররা সেনাবাহিনীর কাছে সব ধরনের পণ্য বিক্রিতে অস্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হয়। সেনানিবাসে তাজা খাবার, মাছ, মাংস, সবজির সংকট দেখা দেয়। এমনকি বাচ্চাদের দুধের মজুদও শেষ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর চলাফেরা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় ও সেনাসদস্যদের ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করা ছাড়াও তাদের দিকে থুথু নিক্ষেপের মতো ঘটনা ঘটে। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে কিছু কিছু স্থানে সশস্ত্র সেনাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং এ সব ক্ষেত্রে হতাহতের ঘটনাও ঘটেছিল।[৪৪৭]

দুই একজন সেনা সদস্যকে প্রতিদিন হত্যা করা এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে একজন ছিলেন লে. আব্বাস। বাঙালি সেনা রক্ষীদের একটি দল নিয়ে লে. আব্বাস সেনাদের জন্য সবজি ক্রয় করতে বের হন। বাঙালি জঙ্গিরা ওই সেনাদলকে আক্রমণ করে আব্বাসকে হত্যা করে ও অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। তবে বাঙালি সৈনিকদের ফেরত পাঠায় অক্ষত অবস্থায়। লে. আব্বাসের হত্যাকান্ডের কোনো প্রতিকার করা যায়নি। তার কোর্সমেটেরা এর প্রতিশোধ নিতে চাইলে সরকার থেকে জানানো হয়েছিল, এ সময় কোনো অপরাধীকে গ্রেফতার করাটা হবে অবিবেচকের মতো কাজ। সেনাদের ওই নিষ্ক্রিয়তা জঙ্গিদের চাঙ্গা করে তোলে।[৪৪৮]

---

৪৪৭. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৮

৪৪৮. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৮

www.pathagar.com

মার্চের শুরু থেকে নতুন রেশন পাওয়াটাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় সেনাদের জন্যে। সেনা অফিসার ও সৈনিকদের বাধ্য হয়ে কেবল ডাল, রুটির মতো খাবার খেতে হয় বিরামহীনভাবে। একবার এক ব্যাংক ম্যানেজার লে. শাহ'র লেখা ব্যাংক চেকের বিপরীতে সমপরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকার করে জানান যে, শেখ মুজিব সেনা অফিসারদের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এক রাতে লে. শাহ অপর একজন সেনা কর্মকর্তার জরুরী বার্তা (SOS) পেয়ে একটি পশ্চিম পাকিস্তানি পরিবারকে উদ্ধার করে সেনা নিবাসে নিয়ে আসেন ও তাদের পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করেন। সেদিন রাতে উগ্রপন্থী বাঙালিরা ওই পরিবারটির বাড়ি-ঘর ও কারখানায় হামলা চালিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে অপেক্ষারত অবাঙালিরা ভয়ে ও আতঙ্কে বিমানবন্দরের বাইরে না গিয়ে ভিতরেই বসে থাকতো। এ অবস্থায় তেজগাঁও বিমানবন্দরকে মনে হচ্ছিল যেন একটি উদ্বাস্তুদের ট্রানজিট ক্যাম্প।[৪৪৯]

সেনা কর্মকর্তারা পরিস্থিতির অবনতি, আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়া আর উসকানিমূলক আচরণে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তাদের শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি ছিল না এবং তারা সেনা নিবাসের মধ্যেই দিন পার করতেন। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন সরওয়ার বর্ণনা করেছেন কীভাবে সেনা নিবাসের সীমানার ঠিক পরেই উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী কর্মীরা নিজস্ব ব্যারিকেড তৈরি করেছিল যেখানে তারা পশ্চিম পাকিস্তানি, বিহারী, উপজাতি মোটকথা বাঙালি ছাড়া সবার তল্লাশি করতে ও এমনকি অনেক সময় মূল্যবান জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতো। কিন্তু সেনাদের করার কিছুই ছিল না, কারণ তাদের এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[৪৫০]

সেনাবাহিনীর ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ হয় গাজীপুরের জয়দেবপুরে। সেখানে ২মার্চ সমরাস্ত্র কারখানা দখলের জন্য চেষ্টা চালায় নিউক্লিয়াস ও আওয়ামীলীগ। ভেতরের কিছু শ্রমিকদের সহায়তায় সেই কারখানা ও অস্ত্রের গুদাম দখল করতে আসে শত শত আওয়ামী কর্মী। তাৎক্ষনিকভাবে অনেক চেষ্টা করে হতাহত ছাড়া জঙ্গীদের থেকে অস্ত্র রক্ষা করতে সক্ষম হয় সেনাবাহিনী।

---

৪৪৯. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৯
৪৫০. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩৯

www.pathagar.com

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে গাজীপুরের সমরাস্ত্র কারখানার নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের নেতৃত্বে একদল সৈন্য সেখানে পৌঁছানোর আগে আওয়ামীলীগ কর্মীরা জয়দেবপুরে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। ব্যারিকেডের জন্য তারা একটি ট্রেনের বগি ব্যবহার করে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাহানজেবের নেতৃত্বে সৈন্যদল। তারা ব্যারিকেড সরিয়ে সেখানে পৌঁছায়। নিরাপত্তার বিষয়গুলো দেখে জাহানজেব আরবাব আবার যখন হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন বিশৃঙ্খলাকারীরা সৈন্যদলকে আবারো ঘিরে ফেলে। বন্দুক, শর্টগান, লাঠি, বোমা ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালায়। জাহানজেব বাঙালি অফিসার লে. ক. মাসুদকে গুলি চালাতে নির্দেশ দিলেন। মাসুদ ইতস্তত করলে অপর বাঙালি অফিসার মঈন তার সৈন্যদের নিয়ে পাল্টা আক্রমন চালালে দুইজন নিহত হয় বাকীরা পালিয়ে যায়। মাসুদকে পরে ঢাকায় এসে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়।[৪৫১] তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় আরেক বাঙালি অফিসার কে এম শফিউল্লাহকে। এই কে এম শফিউল্লাহ শেখ মুজিবের আমলে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ছিলেন।

এই ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কে এম শফিউল্লাহ বলেন, ১৯মার্চ সকাল দশটায় তার ইউনিটকে জানানো হয় ব্রিগেড কমান্ডার মধ্যহ্নভোজে আসছেন এবং নিকটবর্তী গাজীপুর সমরাস্ত্র কারখানা পরিদর্শন করবেন। কিন্তু জনতা প্রায় ৫০০ ব্যারিকেড বসিয়ে সৈন্যদের আটকে দেয়। এগুলো সরিয়ে তারা আসলেও ফিরে যাওয়ার সময় জয়দেবপুরে মজবুত ব্যারিকেড সৃষ্টি করলে লে. ক. মাসুদ তাদের বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমন সময় দু'জন বাঙালি সৈনিক জাহানজেবকে জানায় তাদেরকে বেধড়ক পিটিয়েছে, অস্ত্র গোলাবারুদ ছিনিয়ে নিয়েছে। এবার জাহানজেব গুলি করার নির্দেশ দিলে মঈন তার সৈন্যদের গুলি করতে বলে। তবে বাংলায় বলে দেয় ফাঁকা গুলি করার জন্য। এরপরও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রনে না এলে এবার জাহানজেব কার্যকরভাবে গুলি করার নির্দেশ দেন। তারাও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। দু'জন নিহত হয়। শফিউল্লাহ আরো জানান, গাজীপুরের পরিস্থিতিও ছিল উত্তেজনাকর। রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছিল। সমরাস্ত্র কারখানার আবাসিক পরিচালক ব্রিগেডিয়ার করিমুল্লাকে আটকে ফেলে বাঙালিরা। আবাসিক পরিচালককে উদ্ধার করতে আমরা সেনা প্রেরণ করেছিলাম।[৪৫২]

---

৪৫১. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৪২-৪৩

৪৫২. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৪২-৪৩

www.pathagar.com

এদিকে ঢাকা ভার্সিটিতে কিছু বিদ্রোহী সেনাসদস্যের তত্ত্বাবধানে চলতে থাকে ছাত্রদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ, প্যারেড ও শরীরচর্চা। ২৫মার্চের সেদিনের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া জগন্নাথ হলের কালীরঞ্জন শীল উল্লেখ করেন ৭মার্চের পর থেকেই তারা ঢাবির জিমন্যাসিয়ামে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তিনি নিজেও সেই প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। কয়েকদিন পর যখন তাদের ও মেয়েদের একটা গ্রুপের প্রশিক্ষণ শেষ হয়, তখন তারা রাস্তায় বের হয় এবং মার্চ পাস্ট করেন। সেটা বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকায় ছাপা হয়। সারা পৃথিবীকে জানানো হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন ঢাবির হলগুলোতে বহিরাগত ব্যক্তি ও ছাত্ররাও প্রশিক্ষণ নিতো। ঢাকা ভার্সিটির দুইটি হল, জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে চলে নিউক্লিয়াসের জঙ্গী প্রশিক্ষণ। আর বাকীগুলোতে নিউক্লিয়াসের জঙ্গী কার্যক্রম একটিভ ছিল না।[৪৫৩]

অপারেশন সার্চলাইট কী গণহত্যা ছিল?

আমাদের শেখানো হয়েছে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে ঢাকার ঘুমন্ত মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেনাবাহিনী। এটা ঠিক নয়। মার্চের ২৫ দিন কাদের নেতৃত্বে সারাদেশে গণহত্যা চালানো হয়েছে, যুদ্ধের পরিবেশ কায়েম করা হয়েছে, তা সম্পর্কে সেনাবাহিনীর কাছে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য ছিল। ২৫মার্চ কি এক পক্ষের হত্যাযজ্ঞ ছিল নাকি উভয় পক্ষের গোলাগুলী ছিল এটা আমরা সহজেই এখান থেকে অনুমান করতে পারি। জানুয়ারী থেকেই বাঙালির কিছু অংশ উস্কানীমূলক শ্লোগান দিতো যা ছিল স্পষ্টত রাষ্ট্রবিরোধী। যেমন "বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। ঢাবির অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা যিনি ছাত্রদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে উস্কানী দিতেন, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন, তার স্ত্রীর লেখায় পাওয়া যায় ঢাকা ভার্সিটির কিছু ছাত্র রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ নিতো। বাসন্তি গুহ ঠাকুরতা বলেন, আমি প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বা একটার দিকে গুলির শব্দে জেগে উঠি। আমি আমার স্বামীকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করি যুদ্ধ কি শুরু হয়ে গেলো নাকি? তিনি বললেন, ও কিছু না, ছাত্ররা প্র্যাক্টিস করছে মাত্র। জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার এই কথা প্রমাণ করে ছাত্রদের কাছে যে রাইফেল রয়েছে এটা তিনি ভালোভাবেই জানতেন।

---

৪৫৩. ডেড রেকনিং / শর্মিলা বসু / অনুবাদ : সুদীপ্ত রায় / হার্স্ট এন্ড কোম্পানী / পৃ. ৩২

www.pathagar.com

ঢাকা ভার্সিটিতে অনেকগুলো হল থাকলেও মূলত যুদ্ধ হয়েছে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে। অন্য সব হলের ছাত্ররা নিরাপদে ছিল। ইকবাল হল এখন যেটা জহুরুল হক হল নামে পরিচিত তার ঠিক উল্টোদিকেই মহসিন হল। ইকবাল হলে ঝামেলা হলো অথচ মহসিন হলে কিছুই হয়নি। শুধু মহসিন হল নয়, দু'টি হল বাদে বাকী সব হল ছিল নিরাপদ। কারণ সেখানে কোনো অস্ত্রধারী ব্যক্তি বা ছাত্র ছিল না। এটা দ্বারাও স্পষ্ট হয় ২৫মার্চের অপারেশন সার্চলাইট নিরস্ত্র ছাত্রদের বিরুদ্ধে ছিল না এবং এটা কোনো নির্বিচার হত্যাকাণ্ড ছিল না, গণহত্যা তো মোটেই না। এটা শুধুমাত্র একটা জঙ্গীবিরোধী অভিযান ছিল যা দেশরক্ষায় অত্যাবশ্যকীয় ছিল।

তবে আমার মনে হয় সে সময় ঢাবিতে নিউক্লিয়াসের একটা অংশ যারা সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তারা ঘন্টাখানেকের বেশি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। সেক্ষেত্রে তারা বিদ্রোহী জঙ্গীদের পাইকারি হত্যা না করে গ্রেফতার করা যেতো। তাহলে হয়তো পরিস্থিতি মোকাবিলা আরো সহজ হতো। কিন্তু তাই বলে ২৫মার্চের অপারেশন সার্চলাইট অযৌক্তিক বা ঘুমন্ত-নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা, এটা বলা মোটেই যৌক্তিক নয়। বরং সারাদেশে বিহারীদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যে পাপ করেছে, সে তুলনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অনেক সহনশীল আচরণ করেছে। ঢাকায় ২৫মার্চ আরেকটি স্থানে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয় সেটা হলো শাঁখারিবাজার। আর্মিদের কাছে রিপোর্ট ছিল, সেখানে অস্ত্র তৈরি করা ও অস্ত্রের মজুদ রয়েছে। সেনাবাহিনী সেখানেও অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে। শাঁখারিবাজারেও সেনাবাহিনী সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে পড়ে। সেখানেও সেনাবাহিনীর অভিযানে নিহত হয় ১৫-১৬ জনের মত। এই ঘটনার পরম্পরায় রাজারবাগে কিছু পুলিশ সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে ও বিদ্রোহীদের নিরস্ত্র করে।

পাকিস্তানি সাংবাদিক ম্যাসকারেনাস যিনি পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনা অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন। তিনিও ওই মার্চে পাকসেনাদের শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের প্রশংসা করে বলেছেন, অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওইরূপ ধৈর্যধারণকে প্রশংসা করতেই হয়, কারণ সেনা কর্মকর্তারা এতো কিছুর পরও তাদের সৈনিকদের ২৫ দিনের দুঃস্বপ্নের ক্রান্তিকালে শান্ত রাখতে সক্ষম

www.pathagar.com

হয়েছেন। তার মানে ১ থেকে ২৫মার্চ সেনাবাহিনীর ওপর যে নিদারুণ নির্যাতন করা হচ্ছিল, তার একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল অপারেশন সার্চলাইট। সেনা অভিযান শুরু হলেও রাতারাতি সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং বলা যেতে পারে, তখনই এক সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা শুরু হয়। সম্পূর্ণ ভূখণ্ড অর্থাৎ ভারতের সাথে দেশের সীমানা ব্যাপী সরকারের কর্তৃত্ব পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে সেনাবাহিনীর কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

ভারতীয় গুপ্তচরের চোখে মার্চের সেই দিনগুলি

কালিদাস বৈদ্য। জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের পিরোজপুরে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি উঠতি তরুণ। পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলেন। কিন্তু তার পরিবার দেশভাগের সময় সব ছেড়েছুড়ে কোলকাতায় চলে যায়। যে পাকিস্তান গঠনের কারণে তাকে দেশ ছাড়তে হলো সেই পাকিস্তানের প্রতি তার চরম ঘৃণা তৈরি হলো। আর মুসলিমদের প্রতি মুশরিকদের সহজাত ঘৃণা তো আছেই।

তিন বছর পর ভারত সরকার তাদের হয়ে ঢাকায় কাজ করার জন্য এমন কিছু লোক চাইলেন, যারা কোনো কিছুতেই ভারতের স্বার্থের বাইরে যাবে না। যারা বাংলা থেকে সম্পদ ছেড়ে চলে এসেছে এবং আবার বাংলায় ফেরত যেতে চায়। এমন অনেক লোককে খুঁজে গোয়েন্দারা বাংলাদেশে পাঠায়। যারা পাকিস্তানকে ভাঙ্গার কাজে নিয়োজিত হয়। পাকিস্তানকে ভাঙ্গার শপথ নিয়ে কোলকাতা থেকে তিনজন একত্রে ঢাকায় আসলেন। তারা হলেন চিত্তরঞ্জন সূতার, নীরদ মজুমদার আর কালিদাস বৈদ্য। চিত্তরঞ্জন ও নীরদ রাজনীতি করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন আওয়ামীলীগের এমপি হতে সক্ষম হয়েছিল।

আর কালিদাস ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তার কাজ ছিল আড়াল থেকে কাজ করা। ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা মেডিকেল একটি ভালো ঘাঁটি ছিল ভাষা আন্দোলনকারীদের। এর পেছনে অবদান ছিল কালিদাসের। নিউক্লিয়াস প্রতিষ্ঠা ও নিউক্লিয়াসের সাথে ভারতের সেতু হিসেবে কাজ করেছেন কালিদাস বৈদ্য। কালিদাসরা বাংলাদেশকে একটি হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি কাজ করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সেদিকে হাঁটেনি। অনেকটা সেক্যুলার ও কমিউনিজম টাইপের দেশ তৈরি হয়েছে, তাতে খুব একটা খুশি ছিলেন না তারা।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ একটু একটু করে ইসলামপন্থীদের ছাড় দিতে শুরু করে। ইসলামপন্থীরা আবার প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পায়। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসক জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করতে থাকে। সংবিধান পরিবর্তন করে মূলনীতিতে 'আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' যোগ করে। এতে কালিদাসরা হিংস্র হয়ে ওঠে। খুলনাকে কেন্দ্র করে ছয়টি জেলা নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে তারা। তাদের রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে একের পর এক দাঙ্গা তৈরি করে। নিজেরাই ষড়যন্ত্র করে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করে।

বাংলাদেশকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে না পেরে অবশেষে দু'টুকরো করে হিন্দুদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য জোর তৎপরতা চালিয়েছে। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ২০, ০০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের উদ্যোগ চলছে অনেকদিন, ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে স্বাধীন বঙ্গভূমি সরকার।

বঙ্গভূমি আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সংগঠক নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ। ১৯৭৭ সালের ১৫আগস্ট কোলকাতায় এই সংগঠনটির জন্ম হয়। উপস্থিত ছিলেন ডা. কালিদাস বৈদ্য, সুব্রত চট্টোপাধ্যয় (বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার), নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার (পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী) এবং শরৎ চন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী)। অন্য সূত্রের খবর চিত্তরঞ্জন সূতারও ঐ সভায় হাজির ছিলেন। ১৭সেপ্টেম্বর সংস্থা গোলপার্কে সভা করে প্রথম প্রকাশ্যে হোমল্যাণ্ড দাবী করে। এরপর মাঝে মধ্যে সভা-সমাবেশ হতো।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর তাদের সাহস বেড়ে যায়। তারা বাংলাদেশ ভাঙ্গার জোর প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং বঙ্গভূমি আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়। ঐ বছরের ২৫মার্চ ঘোষিত হয় স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্র। তৈরি হয় সৈন্য বাহিনী "বঙ্গসেনা"। সেনাধ্যক্ষ ডা. কালিদাস বৈদ্য। পরে বঙ্গদেশ মুক্তি পরিষদ তৈরি করে সৈন্যবাহিনী লিবারেশন টাইগার্স অব বেঙ্গল (বিএলটি)। এই সংগঠন মাঝে মাঝেই বঙ্গভূমি দখলের ডাক দেয়। সীমান্ত অভিযান করে। কিন্তু কখনই ব্যাপারটা এদেশের মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

বঙ্গভূমির প্রস্তাবিত ঘোষণায় যা ছিল,

রাষ্ট্রপতি : পার্থ সামন্ত (চিত্তরঞ্জন সূতার)।

www.pathagar.com

রাজধানী : সামন্তনগর, (মুক্তিভবন)।

পতাকা : সবুজ ও গৈরিক রঙের মাঝে সূর্যের ছবি।

জাতীয় সঙ্গীতঃ ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।

সীমানা : উত্তরে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। প্রস্তাবিত সীমানার মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের দুইটি বিভাগ অর্থাৎ খুলনা ও বরিশাল বিভাগ পড়েছে।

এই অঞ্চল নিয়ে ২৫মার্চ ১৯৮২ সালে ঘোষিত হয়েছে তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্র। স্বাধীন বঙ্গভূমিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সমস্ত উদ্যোগই চলছে কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ থেকে। নেপথ্য নায়করা সবাই জানেন এই রাজ্যেই বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন জেলা - ২৪ পরগনা, নদীয়া এবং উত্তর বাংলায় চলছে ব্যাপক তৎপরতা। সে সময় ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা কাদের সিদ্দিকী এবং চিত্তরঞ্জন সূতার মদদ দিচ্ছেন হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে। প্রবক্তাদের যুক্তি বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসন চলছে। হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি তাদের হাতে নিরাপদ নয়। বিশেষত বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষনার পর ঐ দেশের হিন্দুরা পরাধীন জীবন যাপন করছে। তাই প্রয়োজন হিন্দুদের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-বঙ্গভূমি।

৮৮ এর জুলাই থেকে অবস্থাটা ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। ঐ বছর ২২জুলাই বঙ্গসেনা একটি সম্মেলন করে। এরপরই শুরু হয় একের পর এক কর্মসূচী। সীমান্ত জেলাগুলোতে চলতে থাকে একের পর এক সমাবেশ মিছিল মিটিং। ২৩নভেম্বর বঙ্গভূমি দখলের জন্য বনগাঁ সীমান্ত অভিযানে ৮/১০ হাজার লোক হয়। ২২-২৩জানুয়ারী বনগাঁ থেকে বঙ্গসেনার মহড়া হয়। ২৪মার্চ ও ২৫মার্চ হয় আবার বঙ্গভূমি অভিযান। ৭এপ্রিল রাজীব গান্ধীর কোলকাতা আগমন উপলক্ষে সিধু কান ডহরে বিএলও এক জমায়েতের ডাক দেয়। প্রত্যেকটা কর্মসূচীতে ভালো লোক জড়ো হয়। বাংলাদেশ গেলো গেলো রব ওঠে। ঢাকার সংবাদ মাধ্যমগুলো এই প্রথম গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করে খবর প্রচার করে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো অভিযান চালায়। কোনো যুদ্ধ ছাড়াই জঙ্গীরা ভারতে পালিয়ে যায়।[৪৫৪]

---

৪৫৪. একশ বছরের রাজনীতি / আবুল আসাদ / বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি / পৃ. ৩২৩-৩৩০

www.pathagar.com

ডা. কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন সূতারকে নিয়ে অনেক কথা বলতে হলো তাদের চরিত্র উপলব্ধি করার জন্য। এবার মূল বক্তব্যে আসা যাক। কালিদাস ১৯৭১ সালে অপারেশন সার্চলাইটের আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে যা বলছিলেন, আমরা তা তার বয়ানেই পড়ি-

"অবস্থা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে চিত্তবাবুর কাছ থেকে নির্দেশ এলো এবং আমি মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। স্বাভাবিকভাবেই, আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কী করা উচিত। তার কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার বুঝা গেলো যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার চেয়ে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়াকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিলেন। এই সময় আমি তার আত্মগোপনের কথা তুললাম। চিত্তবাবু আমাকে আগেই বলেছিলেন যে, তার আত্মগোপনের ব্যবস্থা তিনি ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। আমি মুজিবকে বললাম, "দেশের পরিস্থিতি যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে শীঘ্রই আপনার আত্মগোপন করা উচিত।"

(চিত্তবাবু ও কালিদাসের চাওয়া শেখ মুজিব যাতে বিদ্রোহ করতে ভয় না পায়। এজন্য তাকে সাহস দিতে চাইলেন। তার নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে চাইলেন। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলে পাকিস্তানকে ভাগ করা কঠিন হবে এটা ভারত মনে করতো)

তার আত্মগোপনের জন্য তিনটি পথের কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম। যার মধ্যে প্রথম ও প্রধান পথ ছিল ভারতে পালিয়ে যাওয়া। তাই আমি তাকে বললাম, "বাংলাদেশে আত্মগোপন করে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এখানকার সব লোকই হয় আপনাকে দেখেছে নয়তো আপনার ছবি দেখেছে। তাই সব থেকে ভালো হয় যদি আপনি ভারতে চলে যান। ইতোমধ্যে চিত্তবাবু যে নিরাপদে তার আত্মগোপন করে থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করে এসেছেন তাও তাকে বললাম। আমি আরও বললাম যে, ইচ্ছা করলে তিনি তার সঙ্গীসাথীদের নিয়েও ভারতে যেতে পারেন এবং সেখানে সকলেরই থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হবে। তাকে আমি আরও বলেছিলাম যে ভারতে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা পাবেন ও সমস্ত সুযোগ তার থাকবে।

সব শুনে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মুজিব। বললেন, 'কবিরাজ! ভারতের মাটিতে থেকে আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবো না।" আমিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে

www.pathagar.com

বললাম, "দেশে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে পারলেই সব থেকে ভালো হয়। কিন্তু তা বড়ই কঠিন কাজ।" (এখানে একথা সহজে অনুমেয় মুজিব আগেই মুশরিকদের সাথে দেশ ভাগ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ তাকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। সে ভারতে যেতে চায়নি কারণ ভারতে গেলেই তার রাজনীতির ইতি হবে। এর মূল ব্যাপার ছিল বাংলার মানুষ মুশরিকদের সাথে নিয়ে সমঝোতা করবে এটা মেনে নিতে রাজি ছিল না। তদুপুরি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক বিরোধীরা তাকে মুশরিকদের মদদপুষ্ট বলে অভিযোগ করতো। মুজিব সেটা দৃঢ়ভাবে নাকচ করতো। এখন ভারতে থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে তার বিরোধীদের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হবে)

দ্বিতীয়টি তার নিজস্ব নির্ধারিত পথ। তা তিনিই বেছে নিবেন-

সব শেষে আমি তাকে তৃতীয় পথটির কথা বললাম। বিশেষ জরুরি অবস্থায় আত্মগোপনের সব রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায়। তখন এই তৃতীয় পথটিকেই গ্রহণ করতে হবে এবং নিকটবর্তী একটি বিশেষ দূতাবাসে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। সেই পরিস্থিতিতে দেওয়াল টপকে সেই দূতাবাসে ঢুকবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও একটা হালকা মই আগে থেকেই তৈরি করে রাখার কথাও আমি তাকে জানিয়েছি। এভাবে তাকে নিরাপত্তার সব দিকগুলোর কথা বলে এবং সব রকম আশ্বাস দিয়ে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তাকে আমি বারবার বলছিলাম যে উক্ত দূতাবাসে পৌঁছতে পারলে তার জীবনের কোনো ভয় থাকবে না। সেই দূতাবাসের তথা যে দেশের দূতাবাস সে দেশের সরকারের দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতেই তাকে তা বলা হয়েছিল। তাও তাকে আমি জানিয়ে দেই। (আমরা ধারণা করি সেটা রুশ দূতাবাস)।

মুজিবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন ভারতে যাবার কথা বলায় তিনি এত রেগে গেলেন? উপরন্তু, ইয়াহিয়ার সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করে তিনি কী বিষয়ে আলোচনা করেছেন? আরো একটা প্রশ্নও আমার মনে উঁকি মারছিল। তার দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই কি তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন? স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশ্ন কি তিনি আপাতত স্থগিত রেখেছেন?

চিত্তবাবু কোলকাতায় ছিলেন, তাই তার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ ছিল না। তবে আমার একক চিন্তায় মনে হলো যে, মুজিবের প্রতি আমাদের

www.pathagar.com

প্রাথমিক সন্দেহই বাস্তব রূপ নিতে চলেছে। এতদিন ধরে ক্রমাগত বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা আমাদের গোপনে বললেও চরম মুহূর্তে পাকিস্তান ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

যাইহোক, ইতোমধ্যে ঢাকায় অবস্থা হয়ে উঠেছে অগ্নিগর্ভ। দেশের প্রশাসন যন্ত্রও কার্যত থমকে দাঁড়িয়েছে। মোটামুটিভাবে ছাত্ররাই (নিউক্লিয়াস) প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ঘটে গেছে আর এক পরিবর্তন। এতদিন ধরে ন্যাপ.ও কমিউনিস্ট পার্টি সব দিক দিয়ে মুজিবের বিরোধিতা করে এসেছে। এমন কি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেও তারা এক হাস্যকর প্রচেষ্টা বলে বিদ্রুপ করে এসেছে। বলেছে স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তবে কখনো সম্ভব নয়। তারা আরও বলে এসেছে যে, পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হলে তার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। সে ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তারাই আজ চিৎকার করে বেড়াচ্ছে, "আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ চাই। মুজিব তুমি স্বাধীনতা ঘোষণা করো।

ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির এই হঠাৎ পরিবর্তন কেন তা বুঝতে বেশি অসুবিধা হয়নি। দুই দিক দিয়ে লাভ তোলার জন্যই তারা এই পথ বেছে নিয়েছিল। প্রথমত মুজিব যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তবে ভুট্টো-ইয়াহিয়া তাকে ছেড়ে দেবে না। তারা তাকে হয় মেরে ফেলবে অথবা কারারুদ্ধ করবে। সেই অবস্থায় বাঘহীন বনে তাদের পক্ষে শৃগালের রাজত্ব করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয় এই জন-জাগরণকে উপেক্ষা করে মুজিব যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়। তবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রচার করা যাবে। জনগণের কাছে তাকে বিচ্ছিন্ন করে জন-জাগরণকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

তাদের এই হঠাৎ দিক পরিবর্তনের সম্ভবত আরও একটি কারণ ছিল। পরের দিকে এক অভূতপূর্ব জন-জাগরণ লক্ষ্য করে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুজিব স্বাধীনতার ডাক দিলে বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। কোনো শক্তিই তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার হবার জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা। এর পিছনে হয়তো রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুজিবের বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে চিৎকার করতে থাকলো— "মুজিব তুমি স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণা করো, জয় বাংলা।" "ঢাকার পথে পথে মানুষের তখন একই কথা—স্বাধীনতা।

রাশিয়া তখন বাংলাদেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছিল। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সেই

www.pathagar.com

ন্যাপ কমিউনিস্ট জোটকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হতে নির্দেশ দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন না করলে তারা যে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, সেটাও রাশিয়াই তাদের বুঝিয়েছিল। এই কারণেই তারা হঠাৎ করে স্বাধীনতার বড় সমর্থক বনে গেলো এবং মুজিবের বাড়ির সামনে হাজার হাজার সমর্থকের জমায়েত করতে লাগলো। সেদিনের ঢাকার সেই উত্তাল গণ-জাগরণ নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয় এবং ভাষায় তা বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। অভূতপূর্ব সেই গণ-জাগরণ দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছি। নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছি। মনে মনে গভীর ইচ্ছা থাকলেও, সেই পরিবেশে মুজিবের পক্ষে অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্ভব ছিল না।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ববাংলার প্রশাসন তখন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল এবং এই সঙ্কট কাটাতে না পেরে পাকিস্তানের অখণ্ডতার পূজারী তিন নেতা, ভুট্টো, ইয়াহিয়া ও মুজিব প্রমাদ গুনলেন। পাকিস্তানকে সুরক্ষার জন্য এই তিন নেতাকে আবার আলোচনায় বসতে হলো। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া আবার মুজিবকে ভালো করে বোঝার ও চিনবার সুযোগ পেলেন। তারা দেখলেন যে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যে মুজিবের মধ্যে কোনো ভেজাল নেই।

তাই ভুট্টো-ইয়াহিয়া এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা করলেন। তারা মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হবার আমন্ত্রণ জানাবেন ঠিক করলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হলে মুজিব আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলবেন না বা তার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না। ফলে তিনি বাংলা জাতীয়তাবাদীদের থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন এবং তখন তাদের পক্ষে ইসলামী জাতীয়তাবাদ প্রচার জোরদার করা সম্ভব হবে। সেই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুজিবের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের ডাক দেওয়া আর সম্ভব হবে না।

অন্যদিকে সেনাবাহিনীতেও বাঙালির সংখ্যা খুবই কম। তাই মুজিব সেনাবাহিনীকেও পুরোপুরি নিজের পক্ষে নিতে পারবেন না। সবার ওপরে থাকবে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতি গভীর আনুগত্যসম্পন্ন একজন প্রেসিডেন্ট, যাকে অতিক্রম করে মুজিবের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না। এই সব দিক বিবেচনা করে তারা মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করার আশ্বাস দিলেন।

মুজিব বুঝলেন যে, তিনিই অখণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। ফলে পাকিস্তানও অখণ্ড থাকবে এবং ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্ব রক্ষা পাবে। উপরন্তু

www.pathagar.com

স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝুঁকিও তাকে নিতে হবে না। মুজিবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ইয়াহিয়া ২২মার্চের রেডিও ভাষণে দেশের জনগণকে জানিয়ে দিলেন। আর ঐদিন মুজিবও সমঝোতার কথা বললেন এবং দেশের যোগাযোগ, পাট শিল্প ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর ব্যাপারে অসহযোগ তুলে নিলেন।

তারপর সারা পৃথিবীতে ছাত্র-জনতার বিদ্রোহের প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেওয়া হলো। ইয়াহিয়ার সাথে মুজিবের বিশ্বাসে ফাটল ধরে। মুজিব স্বেচ্ছায় গ্রেফতারবরণ করে। পাক বাহিনী হিংস্র মূর্তি ধারণ করে হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদি সময় মতো জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা না করতো তবে পাকিস্তান ভাগ হওয়া সম্ভব ছিল না।" এতোক্ষন আমরা যে কথাগুলো পড়লাম এগুলো ভারতীয় গোয়েন্দা কালিদাসের বক্তব্য"[৪৫৫]

জিয়া, তাজউদ্দিন ও স্বাধীনতার ঘোষণা

২৩মার্চ ছিল পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবস। সেদিন সকল সরকারি অফিস আদালতে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের কথা। সেদিন ঢাকায় বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানের পতাকার স্থলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে আওয়ামীলীগ। এই পতাকার নকশা তৈরি করে ১৯৬৮ সালে নিউক্লিয়াস। বাংলাদেশের এই পতাকা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে উত্তোলন করা হয় ২মার্চ শেখ মুজিবের বাসার সামনে। শেখ মুজিব সেটা তৎক্ষণাৎ নামিয়ে ফেলে। এরপর বিভিন্ন স্থানে বিশৃঙ্খলাকারী লোকদের হাতে এই পতাকা দেখা যায়। ৭মার্চ ভাষণের সময় অনেকের হাতে এই পতাকা দেখা যায়।[৪৫৬]

২৩মার্চ ১৯৭১ সালে আওয়ামীলীগের অফিসসহ ঢাকার অনেক স্থানে পাকিস্তানের পতাকার বদলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর মাধ্যমে স্পষ্ট মেসেজ দিতে থাকে আওয়ামীলীগ যে, তারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। তারা পাকিস্তানের নেতৃত্ব চায় না। বরং পাকিস্তানকে ভাগ করে দিতে চায়। অথচ ২২মার্চ মুজিব ও ভুট্টো সমঝোতা হয়েছে এবং মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়। একটি রহস্যজনক বিষয় হলো

---

৪৫৫. বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অন্তরালে শেখ মুজিব / কালিদাস বৈদ্য / কর্মকার বুক স্টল / পৃ. ১৩৪-১৪৩
৪৫৬. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৫৮

www.pathagar.com

সেদিন ঢাকায় দু'টি দূতাবাসে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন হয়। সেই দু'টি রাষ্ট্র হলো রাশিয়া এবং বৃটেন।[৪৫৭]

স্বাধীনতার ঘোষণা আক্ষরিক অর্থে না হলেও ১মার্চ থেকেই স্বাধীনতার প্রচারণা চলতে থাকে। নিউক্লিয়াসের প্ররোচণায় "বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো" এই স্লোগান চলতে থাকে পুরো মার্চ জুড়ে। শেখ মুজিব দ্বিধায় ছিল আলাদা দেশ করবে না কি পাকিস্তানেই থাকবে। মুজিব কখনো আশা করেনি সে পুরো পাকিস্তানের নেতা হতে পারবে। তাই সে ১৯৬৩ সাল থেকেই ভারতের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু যখন পুরো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ আসলো, তখন সে দ্বিধায় পড়ে যায়। তাই স্বাধীনতার কথা বলেও আবার সেটা ক্লিয়ার করতে পারেনি। অন্যদিকে বামপন্থী নিউক্লিয়াসের সদস্যরা তার দ্বিধাকে আশঙ্কার নজরে রেখেছে। যখন শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবে, আপাতত পাকিস্তান ভাঙ্গা বাদ। তখনই নিউক্লিয়াস ও ভারত মুজিবকে দেশবিরোধী হিসেবে প্রমাণ করে।

মুজিব তার ওপর সকল অভিযোগ থেকে বাঁচাতে না পেরে পালিয়ে আইনের কাছে আত্মসমর্পন করে। একমাত্র কামাল হোসেন ছাড়া বাকীসব আওয়ামী শীর্ষ নেতা পালিয়ে যায়। বেশিরভাগ যায় ভারত সীমান্তে। মুজিব দুইদিনের হরতাল ডেকে নিজ বাসায় অবস্থান করেছেন। সেনাবাহিনী তাকে তুলে নিয়ে যায়। ঢাকায় রাত ১০টা থেকে পিলখানায় ২২ এফএফের সদস্যরা ইপিআরের বাঙালি সদস্যদের নিরস্ত্র করতে শুরু করে। ইপিআর কন্ট্রোল রুম থেকে মেজর দেলওয়ার ও কুতুবুদ্দীন ওয়্যারলেসে অনবরত অন্যান্য বাঙালি অফিসারদের বার্তা পাঠাতে থাকেন, যে যেখানে আছ, তোমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশনে যাও।' তারা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত বার্তা পাঠান । তারপর তাদেরও নিরস্ত্র করা হয়।[৪৫৮]

রাত ১০টার দিকে চট্টগ্রামে ইপিআরের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম বার্তাটি পান। তখনই তিনি অ্যাকশনে চলে যান। তিনি ওয়্যারলেসে বার্তা পাঠান 'ব্রিং সাম উড ফর মি'। এই বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীনে সবাই বিদ্রোহ করেন। ক্যাপ্টেন রফিকের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি ২৫মার্চ রাত

---

৪৫৭. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৫৮

৪৫৮. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৭৪

www.pathagar.com

৮টা ৪৫ মিনিটে ইপিআরের ওয়্যারলেস স্টেশনের দায়িত্বে থাকা অবাঙালি প্লাটুন কমান্ডার ক্যাপ্টেন হায়াতকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন। ২৬মার্চ সকালে তিনি চট্টগ্রাম আওয়ামীলীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন।[৪৫৯]

সে সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশভাগের বিষয়টি সমগ্র বাঙালি সেনাসদস্যের জানা ছিল। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত ছিল, তারা নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। আর যারা যুক্ত ছিল না তারা অবগত ছিল। কারণ প্রত্যেক বাঙালি অফিসার ও সৈনিকই বাংলাকে আলাদা করার গোপন প্রস্তাব ১৯৬৭ সাল থেকে পেয়ে আসছিল। অফিসারের চাইতে সৈনিকদের মধ্যেই নিউক্লিয়াস সদস্য বেশি ছিল।

ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম তার প্রতিরোধের বিষয়টি বেতারের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আওয়ামী নেতাদের অনুরোধ করেন। ইতোমধ্যে রফিকুল ইসলামের বার্তা মেজর জিয়ার কাছেও পৌঁছে কর্নেল অলির মাধ্যমে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ করেন তার সিনিয়র জানজুয়াকে এরেস্ট করার মাধ্যমে। জিয়ার সম্বল ছিল ৩০০ সৈন্য। জিয়া বুঝতে পেরেছেন তিনি শহরে থাকতে পারবেন না, তাই তিনি কর্ণফুলি নদী পার হয়ে পটিয়ায় চলে গেলেন। সেখান থেকে অলি ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে এসে কালুরঘাটে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ২৬মার্চ। এই ঘোষণায় তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র জিয়া তার নিজের দখলে রাখার প্ল্যান করে লে. সমশের মবিন চৌধুরীকে দিয়ে একদল সৈন্যকে পাহারায় রেখে যান।[৪৬০]

১৯৭২ সালের ২৬মার্চ দৈনিক বাংলায় ছাপা হয়, এই বিরাট শক্তির (পাকিস্তানি বাহিনী) মোকাবিলায় বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না এ কথা বাঙালি সেনারা বুঝেছিলেন। তাই শহর ছেড়ে যাওয়ার আগেই বিশ্ববাসীর কাছে কথা জানিয়ে যাওয়ার জন্য মেজর জিয়া ২৭মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে যান। বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা মেজর জিয়াকে পেয়ে উচ্ছ্বল হয়ে ওঠেন।

---

৪৫৯. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৭৪
৪৬০. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৮১

www.pathagar.com

কিন্তু কী বলবেন তিনি? একটি করে বিবৃতি লেখেন আবার তা ছিড়ে ফেলেন। কী জানাবেন তিনি বিশ্ববাসী ও দেশবাসীকে বেতার মারফত? এদিকে বেতারকর্মীরা বারবার ঘোষণা করছিলেন আর পনেরো মিনিটের মধ্যে মেজর জিয়া ঘোষণা দেবেন। কিন্তু পনেরো মিনিট পার হয়ে গেলো। মেজর জিয়া মাত্র তিন লাইন লিখতে পেরেছেন, তখন তার মানসিক অবস্থা বোঝবার নয়। বিবৃতি লেখায় ঝুঁকিও ছিল অনেক। ভাবতে হচ্ছিল শব্দচয়ন, বক্তব্য পেশ প্রভৃতি নিয়ে। প্রায় দেড় ঘন্টা মুসাবিদার পর তিনি তৈরি করেন তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি। নিজেই সেটা বাংলা ও ইংরেজিতে পাঠ করেন।

৩০মার্চ সকালে মেজর জিয়া চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আরেক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডার হিসেবে ঘোষণা করেন। এই দিনই পাকিস্তানি বিমান থেকে দু'টি গোলাবর্ষণ করে বেতার কেন্দ্রটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়।[৪৬১]

ঘটনার পরম্পরায় বোঝা যায় যে, জিয়াউর রহমান নিউক্লিয়াসের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন না। তবে তার রাজনৈতিক মতাদর্শে ছিল না, একথা জোর করে বলা যায় না। তিনি ভাসানী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মাওবাদের প্রতি তার ঝোঁক ছিল। মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর মশিউর রহমান যাদু মিয়া বলেছেন, পাকিস্তান আমলে মেজর জিয়া মেজর কমল নামধারণ করে ভাসানীর সাথে গোপনে দেখা করতেন ও আলাপ আলোচনা করতেন। এ থেকে বোঝা যায় একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রবল আগ্রহ জিয়ার ছিল। নইলে এতো বড় রিস্ক তার মতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ নিতেন না। এপ্রিলের শুরুতেই মেজর জিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। অলি ও আওয়ামী নেতাদের সহায়তায় তিনি রামগড় হয়ে ভারতে চলে যান।

এদিকে চিত্তরঞ্জন ও কালিদাসের সহায়তায় নিউক্লিয়াসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাজউদ্দিন আহমেদ কোলকাতায় পৌঁছে যান। একে একে অনেক নেতাই কোলকাতায় চলে যান। সেখানে তাদের সকল ব্যবস্থা করে রাখে চিত্তরঞ্জন। আওয়ামী নেতাদের ভারত পাড়ি দিতে বেশ সহায়তা করেন এম এ জি

---

৪৬১. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা ১৯৭১ / মহিউদ্দিন আহমদ / প্রথমা প্রকাশন / পৃ. ৮৫-৮৬

www.pathagar.com

ওসমানী। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে সথে নিয়ে ৩১মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পদার্পণ করেন তাজউদ্দিন। সীমান্ত অতিক্রম করার বিষয়ে মেহেরপুরের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী তাদের সার্বিক সহায়তা করেন।[৪৬২]

এদিকে নিউক্লিয়াস সদস্যরা ঢাকার বাইরের ব্যাংকগুলো লুট করতে থাকে। লুটকৃত অর্থ ছিল অনেক, যার সঠিক হিসেব তাজউদ্দিনরা দেয়নি।

তবে স্বাধীনতার পর চাপে পড়ে বলেছে সেখানে ১০০ কোটি টাকা ছিল। কিন্তু সেই টাকা আত্মসাৎ করে মুজিবনগর সরকার। সেই টাকার হিসেব পাওয়া যায়নি।

একাত্তরের মার্চে তাজউদ্দিন ও মনসুরের পরিকল্পনায় এবং নিউক্লিয়াসের পরিচালনায় সারাদেশে অনেকগুলো ব্যাংক ডাকাতি হয়। সবচেয়ে বেশি হয় বগুড়াতে। সেখান থেকে প্রাপ্ত অর্থ কত ছিল, তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। টাকাগুলো গচ্ছিত ছিল মনসুরের কাছে। এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি অফিসে থাকা বরাদ্দ ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন লুট করে মুক্তিযোদ্ধারা। অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করে ক্যাপ্টেন মনসুরকে সেই সব টাকা জমা করে দায়িত্ব দেওয়া হয় অর্থমন্ত্রীর।

অবশেষে বাংলাদেশ সৃষ্টি হলে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সেই ব্যাংক লুটের টাকা নিয়ে কথা হয়। কথা হয় সারা পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত ডোনেশনের হিসেব নিয়ে। নানামুখী চাপে শেষ পর্যন্ত মনসুর বলতে বাধ্য হয় ব্যাংক লুট বাবদ আয় হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ জানে না একাত্তরে ১০০ কোটি টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে। কী তার হিসেব? ইত্তেফাক পত্রিকা এই নিয়ে অর্থ আত্মসাতের কয়েকটি প্রতিবেদন করেছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা মনসুর সেই সাংবাদিকের হাত ভেঙ্গে দিয়েছে।

---

৪৬২ একাত্তরের মার্চ থেকে প্রবাসী সরকার / এম আমীর-উল ইসলাম / ২৬ মার্চ ২০১৫

www.pathagar.com

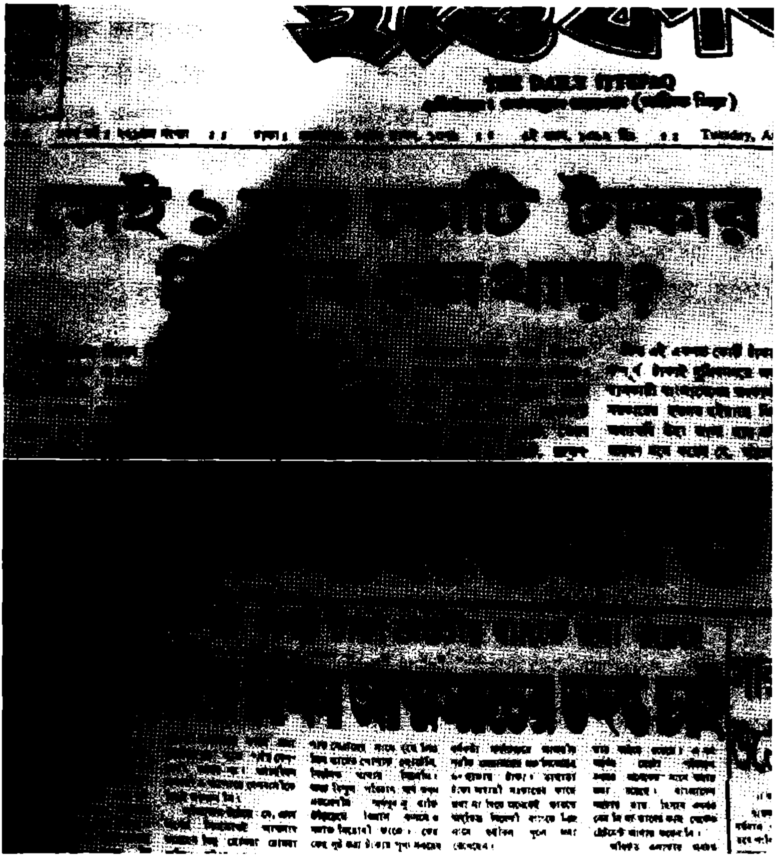

এরপর চিত্তরঞ্জনদের চেষ্টায় তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লিতে। সেখানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে বৈঠক করাই ছিল উদ্দেশ্য। দিল্লিতে পৌঁছানোর পর ভারত সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে নিশ্চিত হন যে, তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকের আগে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদের কয়েক দফা বৈঠক হয় এবং তিনি তাদের বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে সব সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠকের সূচনাতে তাজউদ্দীন জানান যে পাকিস্তানিরা

www.pathagar.com

আক্রমণ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ২৬মার্চেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করে সরকার গঠন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকে যোগদানকারী সকল প্রবীণ সহকর্মীই মন্ত্রিসভার সদস্য। ইন্দিরার কাছে তাজউদ্দিন নিজেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করেন। ঐ বৈঠকে তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যুদ্ধে সহায়তা ও স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ করেন। ইন্দিরা গান্ধী তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, উপযুক্ত সময়ে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তার আগে তাজউদ্দিনকে চুক্তি করার জন্য বলেন। তাজউদ্দিন সাতটি বিষয়ে চুক্তি করেন,

১- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যারা যুদ্ধ করেছে, তারাই দেশ স্বাধীন হলে প্রশাসনে নিয়োগ পাবে। বাকীরা চাকরীচ্যুত হবে। যে শূন্যপদ সৃষ্টি হবে তা ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা দ্বারা পূরণ করা হবে।

২- বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী মিলে যৌথ কমান্ড গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। ভারতের সেনাপ্রধান উক্ত যৌথ কমান্ডের প্রধান হবেন। তার কমান্ড অনুসারেই যুদ্ধে শামিল হওয়া বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৩- স্বাধীন বাংলাদেশের কোনো নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকবে না।

৪- আভ্যন্তরীন আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে প্যারামিলিটারি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৫- দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কিন্তু সময়ে সময়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বানিজ্য নীতি নির্ধারণ করা হবে।

৬- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় সেনাবাহিনী অনির্ধারিত সময়ের জন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে।

৭- বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ আলোচনা করে একই ধরনের পররাষ্ট্র নীতি ঠিক করবে।[৪৬৩][৪৬৪][৪৬৫][৪৬৬]

---

৪৬৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে র' এবং সিআইএ / মাসুদুল হক / পৃ. ৮১

৪৬৪. বাংলাদেশে র' / আবু রুশদ / পৃ. ৪৯

৪৬৫. দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি / ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ / পৃ. ৪৬২

৪৬৬. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ২৩৫

www.pathagar.com

ইন্দিরা গান্ধীর সাথে বৈঠক ও চুক্তি শেষে তিনি বাংলাদেশকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলে তাজউদ্দীন আহমদ আওয়ামীলীগের এমএনএ (MNA) এবং এমপিএদের (MPA) কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে অধিবেশন আহ্বান করেন। উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। এই মন্ত্রিপরিষদ এবং এমএনএ ও এমপিএগণ ১০এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক করে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্র প্রধান এবং মুজিবের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীসমূহের অস্থায়ী সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী (অর্থ মন্ত্রণালয়), খন্দকার মোশতাক আহমেদ (পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান(স্বরাষ্ট্র, কৃষি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রণালয়) কে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১১এপ্রিল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ১১এপ্রিল বাংলাদেশ বেতারে মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণা দিয়ে ভাষণ প্রদান করেন।[৪৬৭]

এরপর ১৭এপ্রিল ১৯৭১ পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে বৈদ্যনাথতলার এক আম বাগানে মন্ত্রিপরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। নতুন রাষ্ট্রের মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কর্নেল এম এ জি ওসমানী এবং মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রব এবং মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ উইং কমান্ডার আবদুল করিম খন্দকার এর নাম ঘোষণা করেন। এরপর সেখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এই ঘোষণাপত্র এর আগে ও ১০এপ্রিল প্রচার করা হয় এবং এর কার্যকারিতা ঘোষণা করা হয় ২৬মার্চ ১৯৭১ থেকে। ঐদিন থেকে ঐ স্থানের নাম দেওয়া হয় মুজিবনগর।

এখানে লক্ষ্যনীয় ঘোষণাপত্র প্রথম ১১এপ্রিল প্রকাশ করা হলেও কার্যকর করার ঘোষণা দেওয়া হয় ২৬মার্চ থেকে। এর মূল কারণ তারা চেয়েছিল জিয়ার ঘোষণা যাতে আর কার্যকারিতা না পায়। যদিও মেজর জিয়ার ঘোষণা তাদের অনেক উপকার করেছে। পালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের আবার ঘুরে দাঁড়াতে

---

৪৬৭. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৭৭

www.pathagar.com

সহায়তা করেছে। সারাদেশে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ২৫মার্চের পর দেশের সেনাবাহিনী শুধুমাত্র ঢাকা আর বিভাগীয় শহরের নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বাকী জেলাশহর ও গ্রামে একচ্ছত্রভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দখল করে রেখেছিল। সেখানে অবাঙ্গালিদের ওপর চালাচ্ছিল নির্মম গণহত্যা। এই সন্ত্রাসীরা সাহস পেয়েছে জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমেই।

যদিও তাজউদ্দিনদের উপকার হয়েছে তবুও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে মেজর জিয়ার ঘোষণাকে পজেটিভলি দেখেনি। এ কারণে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ২৬মার্চ থেকে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেছে।

বেসিক্যলি তাজউদ্দিন সাহেব রুশপন্থী বাম ছিলেন। এই ব্যাপারে কমরেড তোয়াহা বলেন, তাজউদ্দীন পূর্বাপর কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যদিও তাজউদ্দীন বাহ্যত: আওয়ামীলীগ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সাথেই জড়িত ছিলেন। পার্টির সিদ্ধান্তেই তাকে আওয়ামীলীগে রাখা হয়। একবার সম্ভবত: '৬২ সালের দিকে তিনি জেল থেকে বের হয়ে আমাদের বললেন 'আর ছদ্মনামে (অর্থাৎ আওয়ামীলীগে) কাজ করতে আমার ভালো লাগছে না। আমি নিজ পার্টিতেই কাজ করবো।' তখন কেউ কেউ মনে করলো, 'থাক না আমাদের একজন আওয়ামীলীগে আছে, সেখানেই কাজ করুক না।' পরে অবশ্য পার্টিতে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছিল, কিন্তু তাজউদ্দীনকে প্রত্যক্ষভাবে পার্টিতে নেওয়া হয়নি।

আমার মতে সেটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। তবে তাজউদ্দিন আওয়ামীলীগে থেকেও আমাদের জন্য কাজ করেছেন। আওয়ামীলীগের সব তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন। ইন্ডিয়াতে গিয়ে অসম-চুক্তি করার পরই তার মাঝে একটা বিক্ষিপ্তভাব এসে যায়। এরপর তিনি কিছুটা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তবে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর যখন আমরা তাকে তাঁবেদার সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনে করতাম, তখনও তিনি আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। (বারান্দার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একবার এ বারান্দায় বসে আমার সাথে আলাপ করে গেছেন। ভুল-শুদ্ধ যখন যা করেছেন সবই এসে আমাদের কাছে অকপটে বলেছেন।[৪৬৮]

---

৪৬৮. ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন / মোস্তফা কামাল / বাংলাদেশ বুক কো-অপারেটিভ সোসাইটি/ পৃ. ৬৭

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে দেশভাগের বিরুদ্ধে যারা ছিলেন

নিজ সেনাবাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা লাগামহীনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা শুরু করে। অবাঙ্গালি ও সেনাসদস্য কাউকে পেলেই হত্যা করেছে। এমনকি ভুলবশত বহু বাঙালি সেনাসদস্য যারা নিজ বাহিনীর সাথে বিদ্রোহ করেছে তারাও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছে। পুলিশ প্রায় নিষ্ক্রিয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। সেনাবাহিনী শুধুমাত্র ঢাকা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিল। বিভাগীয় শহরগুলোতে ক্যান্টনমেন্ট ও তার সংশ্লিষ্ট এলাকা ছাড়া বাকী সবস্থানে অরাজক পরিস্থিতি কায়েম হয়েছিল।

১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে সেনাবাহিনী তাদের এরিয়া বাড়াতে থাকে। দেশকে মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থায় আনতে সেনাবাহিনীর প্রায় দুইমাস সময় লেগেছিল। এই সময় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনে কৌশলী ভূমিকার চাইতে বর্বর চরিত্র প্রকাশ করেছে বেশি। যেসব এলাকা থেকে বা গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী ও অবাঙালিদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনীও পাল্টা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। এপ্রিল-মে মাসে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রায় সবাই ভারতে পালিয়ে গেছে। সেখানে তারা ভারতীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে অস্ত্র ও স্বল্প প্রশিক্ষন লাভ করেছে। সেনাবাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে বহু বাঙালি ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘটনা প্রবাহে একটি যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যা নিউক্লিয়াস, ভারত ও কম্যুনিস্টরা চেয়েছিল। যুদ্ধের সময় যারা স্বাধীনতা তথা দেশভাগের বিরোধী ছিলেন, তারা ছিলেন বাঙালিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজনৈতিকভাবে আওয়ামীলীগের বড় অংশ, মুসলিমলীগ, নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী, ওলামায়ে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জাতীয় দল, শেরে বাংলার প্রতিষ্ঠিত কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (চীনপন্থী), পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি ইত্যাদি দল স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। এ ছাড়াও ইসলামপন্থী মানুষ, মুসলিম জাতীয়তা বোধ সম্পন্ন মানুষ এবং চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেন। রাজা ত্রিদিব রায়ের সকল চাকমা প্রজাসহ অন্যান্য প্রায় সকল উপজাতি পাকিস্তান রক্ষার ভূমিকা রাখেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকল মানুষ পাকিস্তানের ভাঙ্গন ঠেকাতে তৎপর ছিলেন।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার বিপক্ষে তাদের অবস্থানের কারণ

১- স্বৈরাচার বিরোধী ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনকে দেশভাঙার আন্দোলনে পরিণত হতে দিতে চাননি

২- যেখানে শেখ মুজিব পুরো পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেখানে দেশ ভেঙে নিজেদের ক্ষমতাকে ছোট করা অযৌক্তিক

৩- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই সকল সমস্যা ও সংকটের অবসান হয়, সেখানে চিরশত্রু ভারতের প্ররোচনায় যুদ্ধ লাগিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাননি

৪- পাকিস্তান বৃহত্তম ও শক্তিশালী মুসলিম দেশ। বিশ্ব মুসলিমের নেতৃত্ব এই দেশ দিচ্ছে। তারা দেশকে ছোট করতে চাননি

৫- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চাইতে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে

৬- পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে এদেশের মুসলিমদের অবস্থা বিপন্ন হবে

৭- ভারতের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র তৈরি হলে, সেই রাষ্ট্র হবে ভারতের আজ্ঞাবহ একটি রাষ্ট্র, যার জাতীয় পতাকা থাকবে, সরকার থাকবে কিন্তু কোনো সার্বভৌমত্ব থাকবে না।

যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন, তাদেরকে আমরা ছয়টি ভাগে ভাগ করতে পারি[৪৬৯]

১. রাজনৈতিক শক্তি : পাকিস্তান সরকার, মালেক মন্ত্রীসভা, শান্তি কমিটি, সামরিক সরকারের মুখপাত্র, রাজনৈতিক দলসমূহ

২. সামরিক শক্তি : পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনীসমূহ, বাংলাভাষী পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও রেজাকার বাহিনী

৩. ধর্মীয় শক্তি : ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তা বোধসম্পন্ন সকল দল ও গোষ্ঠী, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি : বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী এবং অন্যান্য পেশাজীবী

---

৪৬৯. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯০

www.pathagar.com

৫. প্রশাসনিক শক্তি : সরকারি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা

৬. অন্যান্য সহায়ক শক্তি : বিহারী, আল-বদর, আশ-শামস ও মুজাহিদ বাহিনী।

পাকিস্তান সরকার

তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক সরকার অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে তাদের ভাষায় সকল 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' দমন করতে চেয়েছেন। তারা অভিন্ন পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সামরিক দিক দিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের খুব প্রয়োজন ছিল সামরিক বাহিনীর।

ক- Geo- Military strategic point এ পূর্ব পাকিস্তান একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান

খ- পূর্ব-পাকিস্তানের জনসংখ্যার হিসেবকে কাজে লাগিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা সহজ

গ- চিরশত্রু ভারতকে সামরিক দিক থেকে কাবু রাখার জন্য দ্বিমুখী আক্রমনের কৌশলের জন্য পূর্ব পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ[৪৭০]

মালেক মন্ত্রীসভা

দেশে স্থিতাবস্থা কায়েম হলে সামরিক সরকার ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে থাকে। তারই অংশ হিসেবে আগস্টে গভর্নর টিক্কা খানকে প্রত্যাহার করে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. মালেককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্ণর ছিলেন ডাঃ আব্দুল মোত্তালেব মালেক।[৪৭১] যদিও তিনি মুসলিমলীগ করতেন। তবে তিনি বাম ভাবাপন্ন ছিলেন। তার নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠন করা হয়। তিনি এবং তার ১৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভাই মালেক মন্ত্রীসভা হিসেবে পরিচিত। এই মন্ত্রীসভায় ইসলামী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল ছাড়াও আওয়ামীলীগের তিনজন সংসদ সদস্য ছিলেন। নিচে তাদের নাম ও দলের নাম উল্লেখ করা হলো।[৪৭২]

---

৪৭০. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯১

৪৭১. মালিক, এ.এম / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3ca5ZNQ / অ্যাকসেস ইন ৯ মার্চ ২০২১

৪৭২. চরমপত্র / এম আর আখতার মুকুল / অনন্যা / পৃ. ৩৩০

www.pathagar.com

১- ডা. আব্দুল মোত্তালেব মালেক/ মুসলিমলীগ (কাউন্সিল)

২- আবুল কাশেম/ মুসলিমলীগ (কাউন্সিল)

৩- নওয়াজেশ আহমেদ/ মুসলিমলীগ (কাউন্সিল)

৪- আখতার উদ্দিন আহমেদ/ মুসলিমলীগ (কনভেনশন)

৫- মুজিবুর রহমান/ মুসলিমলীগ (কাইয়ুম)

৬- ওবায়দুল্লাহ মজুমদার/ আওয়ামীলীগ (জাতীয় পরিষদ সদস্য)

৭- শামসুল হক/ আওয়ামীলীগ (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য)

৮- আউং শু প্রু চৌধুরী/ আওয়ামীলীগ (প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য)

৯- এ এস এম সোলায়মান/ কৃষক শ্রমিক পার্টি

১০- মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক/ নেজামে ইসলামী

১১- জসিম উদ্দিন আহমদ/ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি

১২- এ কে মোশারফ হোসেন/ পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি

১৩- এ কে এম ইউসুফ/ জামায়াতে ইসলামী[৪৭৩]

১৪- আব্বাস আলী খাঁন/ জামায়াতে ইসলামী

শান্তি কমিটি

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন থেকে যুদ্ধাবস্থা তৈরি হলে এদেশের রাজনৈতিক নেতারা যুদ্ধ থামানো এবং পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য শান্তি কমিটি গঠন করেন। এতে মুসলিমলীগের তিনটি অংশ, আওয়ামীলীগের একাংশ, নেজামে ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী এবং উপজাতিরা এই কমিটিতে অংশগ্রহন করেন। এই কমিটি গঠনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পিডিপির নুরুল আমীন। প্রথমে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং পরে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে ৪এপ্রিল নূরুল আমিনের নেতৃত্বে মৌলবী ফরিদ আহমদ, সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দিন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মওলানা নুরুজ্জামানসহ ১২ জন রাজনৈতিক নেতা গভর্নর টিক্কা খানের সাথে দেখা করেন। [৪৭৪]

---

৪৭৩. একেএম ইউসুফকে আখতার মুকুল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির বলে উল্লেখ করলেও ইউসুফ সাহেবের ছেলে নিশ্চিত করেছেন তিনি জামায়াতের পক্ষ থেকেই মন্ত্রীসভায় অংশগ্রহণ করেছেন।

৪৭৪. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯৪

www.pathagar.com

সেখানে তারা সেনাবাহিনীকে সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেনাবাহিনীকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' ধরার অজুহাতে সাধারণ মানুষদের ওপর জুলুম অত্যাচার বন্ধের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। উপরোক্ত নেতারা ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটিতে মুসলিমলীগের নুরুল হক, আবুল কাশেম, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, আওয়ামীলীগের আব্দুল জব্বার খদ্দর, এ কে এম রফিকুল হোসেন, পিডিপির মাহমুদ আলী, ব্যারিস্টার আফতাব উদ্দিন, জমিয়তে উলামার পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়া প্রমুখ নেতা ছিলেন। পরবর্তিতে জেলা-উপজেলা পর্যন্ত শান্তি কমিটি বিস্তৃতি লাভ করে।[৪৭৫]

সরকারের মুখপাত্র

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মুখপাত্র হিসেবে কিছু বাঙ্গালী নেতা অংশগ্রহন করেন। তারা বহির্বিশ্বে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাকে আভ্যন্তরীণ ইস্যু এবং এই ইস্যুতে প্রতিবেশী ভারতের ষড়যন্ত্রের বিষয়গুলো প্রচারণার দায়িত্বে ছিলেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় বহির্বিশ্বের সহযোগিতা কামনা করেন। এদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো[৪৭৬][৪৭৭]

১- হামিদুল হক চৌধুরী/ মালিক, পাকিস্তান অবজার্ভার

২- মাহমুদ আলী/ পিডিপির ভাইস চেয়ারম্যান

৩- শাহ আজিজুর রহমান/ মুসলিমলীগ নেতা/ পরবর্তিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী (১৯৮৩)

৪- জুলমত আলী খান/ মুসলিমলীগ নেতা/ পরবর্তিতে এরশাদ আমলের মন্ত্রী

৫- মিসেস রাজিয়া ফয়েজ/ মুসলিমলীগ নেতা/ পরবর্তিতে এরশাদ আমলের মন্ত্রী

৬- ড. ফাতিমা সাদিক/ অধ্যাপক, ঢাকা ভার্সিটি

৭- এডভোকেট এ কে সাদী/ আইনজীবী, ঢাকা হাইকোর্ট

৮- মৌলভী ফরিদ আহমদ/ পিডিপি নেতা/ সৌদী ও মিশরের দায়িত্বে ছিলেন

---

৪৭৫. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯৪

৪৭৬. চরমপত্র / এম আর আখতার মুকুল / অনন্যা / পৃ. ৩৩১

৪৭৭. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯২

www.pathagar.com

৯- তবারক হোসেন/ চীনের দায়িত্বে ছিলেন/ সর্বশেষে বাংলাদেশ আমলে পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন

১০- বিচারপতি নুরুল ইসলাম/ বিশেষ দূত, জেনেভা/ পরবর্তিতে এরশাদ আমলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন

১১- ড. সাজ্জাদ হোসাইন/ বিশেষ দূত, মধ্যপাচ্য এবং ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ/ ভিসি, ঢাবি

রাজনৈতিক দল

পাকিস্তান গঠনের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিমলীগের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। উপরন্তু এই মুসলিমলীগ তিন ভাগে ভাগ হয়ে তাদের শক্তি আরো হারিয়ে ফেলে। কাউন্সিল, কনভেনশন এবং কাইয়ুম এই তিন ভাগে তারা ভাগ হয়। মুসলিমলীগের তিন পক্ষই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতা করে। এছাড়া ন্যাপ (মুজাফফর), ন্যাপ (ভাসানী), মনি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল এবং আওয়ামীলীগের একটা বড় অংশ অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত করে।[৪৭৮]

আওয়ামীলীগের একাংশ

২৫মার্চ অপারেশন সার্চলাইট এবং ২৬মার্চ মেজর জিয়ার ক্যু এর পর আওয়ামীলীগের একটা অংশ খুব দ্রুত ভারতে সশস্ত্র অবস্থায় পাড়ি জমায়। কারণ তাজউদ্দিন আহমদের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সরকারের সঙ্গে আগেই সমঝোতা হয়েছিল এবং তাজউদ্দিন আহমদ দেশবিক্রির চুক্তি করেছে। আর এর ফলেই বেসামরিক লোকের সাথে মিশে গিয়ে সশস্ত্র আওয়ামী কর্মীরা ভারত পাড়ি দেয়। এই ধরণের ষড়যন্ত্রের সাথে একমত না হয়ে অনেকে আওয়ামীলীগ থেকে মনোনীত হয়ে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যসহ বহু নেতা কর্মী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহন করা থেকে শুধু বিরত

---

৪৭৮. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯৭-৯৮

www.pathagar.com

থাকেননি বরং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহন, শান্তি কমিটিতে নেতৃত্ব প্রদান, রেজাকার বাহিনীতে সহায়তাসহ সব ধরণের স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন করেন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মেয়ে আক্তার সোলায়মান অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালান এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেন। এই ব্যাপারে তিনি সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অধিকাংশ আওয়ামীলীগের সদস্যরা আওয়ামীলীগের একটা অংশের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার কথা জানতেন না। আমরা জানি জনগণ নির্বাচনের সময় অধিকতর শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ পাকিস্তান গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আওয়ামীলীগকে ভোট দিয়েছিল'। এছাড়াও আওয়ামীলীগ নেতা ড. কামাল হোসেনও যুদ্ধে যোগ না দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান এবং সেখানে আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। আওয়ামীলীগ নেতাদের মধ্যে জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন, এমন বহু নেতার তালিকা পাওয়া যায় আখতার মুকুল এবং সামছুল আরেফীন সাহেবের লেখা বইয়ে। নির্বাচিত সদস্যের বাহিরে খন্দকার নূর হোসেন, তার ছেলে খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মুসা বিন শমসের এবং মীর্জা কাশেম মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।[৪৭৯]

আওয়ামীলীগের বেশিরভাগ নেতা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন

অনেকে মনে করেন সকল আওয়ামী নেতা মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করেছেন। বিষয়টা আদতে সঠিক নয়। শুনতে ভিন্নরকম শোনালেও বেশিরভাগ আওয়ামী নেতা মুক্তিযুদ্ধ সাপোর্ট করেননি। এটাই বাস্তবতা।

১৯৭১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে সেনাবাহিনী দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পুরো দেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরপরই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বেসামরিক নেতৃত্বের হাতে পূর্ব পাকিস্তান পরিচালনার ভার হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে গভর্নরের অফিসে রিপোর্ট করতে বলা হয়। পাকিস্তান জাতীয়

---

৪৭৯. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৯৭-৯৮

www.pathagar.com

সংসদে আওয়ামীলীগের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন ১৬০ জন। এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন ৮২ জন যারা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিলেন। উপস্থিত হন নাই ৭৮ জন, যারা হয় মুক্তিযুদ্ধ করছেন বা ভারতে পালিয়ে গেছেন।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সংসদে আওয়ামীলীগ নির্বাচিত হয়েছে ২৮৮ আসনে। এর মধ্যে ১৮৩ জন প্রাদেশিক মেম্বার দেশে থেকে পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। অনুপস্থিত ছিলেন ১০৫ জন যারা ভারতে পালিয়ে গেছেন বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান করেছেন।

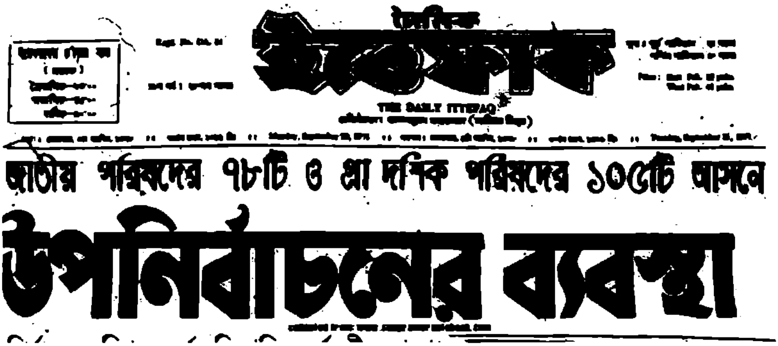
দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

জাতীয় পরিষদের ৭৮টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১০৫টি আসনে

উপনির্বাচনের ব্যবস্থা

গভর্নর টিক্কা খান ৭৮ জন জাতীয় পরিষদের মেম্বার ও ১০৫ জন প্রাদেশিক পরিষদের মেম্বারকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। কিন্তু তারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হাজির না হওয়ায় তাদের আসন শূন্য ঘোষণা করা হয়। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব ছিল না।

এমতাবস্থায় টিক্কা খান দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ করেন। সবার ঐক্যমতে একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কাউন্সিল মুসলিমলীগের নেতা ডা. আব্দুল মোতালিব মালেককে গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

ডা. মালেক গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান ৩১আগস্ট। শপথ গ্রহণ করেন ৩সেপ্টেম্বর। এরপর তিনি সব দলের অংশগ্রহনে ১৩ সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এদিকে নির্বাচন কমিশন ৭৮টি জাতীয় আসন ও ১০৫টি প্রাদেশিক আসনে উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। ১৯সেপ্টেম্বর উপনির্বাচনের

www.pathagar.com

সম্ভাব্য ডেট ঘোষণা হয়। উপনির্বাচন কমপ্লিট হলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে মালেক মন্ত্রীসভা। ততদিন পর্যন্ত তারাই পূর্ব পাকিস্তান পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।

মে মাসের পরে দেশ থেকে কার্যত বিদ্রোহীরা হারিয়ে যায়। অনেকেই মারা পড়েছে, কিছু ভারতে পালিয়েছে আর কিছু আত্মগোপনে ছিল। দেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাঙালিরা আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। এতে ক্ষোভ বাড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের। তাছাড়া ইতোমধ্যে কয়েক দল বিদ্রোহী মুশরিকদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সাহায্য নিয়ে এসেছে।

মুক্তিবাহিনী এখন মূল কাজ হিসেবে নিয়েছে নির্বাচন বানচাল করা। তারা ভোট কেন্দ্রগুলোতে অর্থাৎ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতর্কিত বোমা হামলা করছিল। এতে বহু সাধারণ মানুষ হতাহত হচ্ছিল। মালেক সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তায় স্কুল-মাদরাসা-কলেজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এদিকে দেশের অবস্থা পুরোপুরি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন বন্ধ রাখতে দাবী জানায় আওয়ামীলীগ ছাড়া বাকী দলগুলো। অবশেষে নির্বাচন পিছিয়ে ১২ডিসেম্বর নিয়ে যাওয়া হয়।

অনেকে মনে করেন বিশেষত বিএনপিপন্থী মুক্তিযোদ্ধারা দাবী করেন তারা সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করে ফেলেছিল। পরে ভারতীয় বাহিনী ৩ডিসেম্বর আক্রমণ করে যুদ্ধের ক্রেডিট নিয়ে নেয়। এটাও সত্য দাবী নয়। বস্তুত বাঙালি বিদ্রোহীরা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ন্যুনতম প্রতিরোধই করতে সক্ষম হয়নি। তারা তাণ্ডব ও গণহত্যা যা করেছে তা মার্চ ও এপ্রিল মাসে।

মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের কাজ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করা। তারা সুযোগ পেলেই রাস্তা কেটে ফেলতো, পুল/কালভার্ট ভেঙে ফেলতো, স্কুল কলেজে হামলা চালাতো, রেল স্টেশন, সেনা চৌকি ও বাজারে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করতো। এসব টুকটাক গেরিলা হামলা ছাড়া তারা কোনো মুক্তাঞ্চল তৈরি করতে সক্ষম হয়নি।

এদিকে যে গ্রামে বা গঞ্জে সেনা চৌকিতে হামলা হতো। সে গ্রামে তার পরদিন হামলে পড়তো সেনাবাহিনী। বিদ্রোহী সন্দেহ হলেই অবলীলায় খুন করতো যুবকদের। এভাবে মুক্তিবাহিনী ও সেনাবাহিনী উভয়ের আক্রমণের শিকার হতো এদেশের সাধারণ মানুষ।

www.pathagar.com

এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিল টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকী। তিনি সত্যিকারের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সাথে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। মূলত ভারতীয় সেনাবাহিনী যখন বাংলাদেশকে ঘিরে ফেলে তখনই মুক্তিবাহিনী অর্থাৎ এদেশের বিদ্রোহী পাকিস্তান সেনারা ভালোভাবে একটিভ হয় এবং সম্মিলিত আক্রমণ করে।

চীনপন্থী সমাজতান্ত্রিক দল[৪৮০]

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের কারণেই চীন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়। চীনের এই নীতির প্রভাব পড়ে এদেশের চীনপন্থী দলগুলোর ওপর। আর ভারতের জন্যও সমস্যা ছিল চীনপন্থী বামেরা। তারা পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সব মিলিয়ে এদেশের চীনপন্থীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি। বরং পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের মোটিভেশন ক্লাসে এ রকম বলা হতো যে, "একজন রেজাকারকে যদি তোমরা ধরো, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তাকে নানাভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। বার বার এই রকম করবে। তাকে নানাভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। এতেও যদি কাজ না হয়, প্রয়োজনে শারিরীক নির্যাতন করবে এবং এভাবে যত পারো তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে। এরপর এদের কারাগারে নিক্ষেপ করবে। আর যদি একজন চীনা কমিউনিস্টকে ধরো সাথে সাথে তার প্রাণ সংহার করবে"।[৪৮১]

রুশপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ৩১.০৮.১৯৭১ এ তাদের যে রাজনৈতিক নীতিমালা প্রকাশ করে, তাতেও চীনা নেতাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী ও শত্রুদের সাহায্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের থেকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। "মনে রাখতে হবে চীনের নেতারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করিতেছে ও আমাদের শত্রুদের সাহায্য করিতেছে। দেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী চীনপন্থীদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকতে হবে।"

---

৪৮০. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১০২-১০৫

৪৮১. দুঃসময়ের কথাচিত্র সরাসরি / ড. মাহবুবুল্লাহ ও আফতাব আহমেদ / পৃ. ৩০৯

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও চীনপন্থীদের ওপর মুজিববাদীদের হুমকির কথা বর্ণনা দিয়ে শেখ হাসিনার স্বামী ওয়াজেদ মিয়া বলেন, "ঐদিন (১৫জানুয়ারী ১৯৭২) ড. ইসহাক তালুকদার আমাকে আরো জানান যে, কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেননদের দলসহ পিকিংপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের নিধন করা হবে বলে মুজিব বাহিনী হুমকি দিয়েছে। যার ফলে সম্ভাব্য হানাহানি ও রক্তপাত এড়ানোর জন্য ঐ দলগুলোর নেতা ও কর্মীরা লুকিয়ে আছেন"[৪৮২] এম আর আখতার মুকুল বলেন, "পিকিংপন্থী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় আগ্রাসন বলে আখ্যায়িত করলো। যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলে এদের নেতৃত্ব দেন কমরেড আবদুল হক, কমরেড সত্যেন মিত্র, কমরেড বিমল বিশ্বাস, কমরেড জীবন মুখার্জী প্রমুখ। এসব অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সময় পিকিংপন্থী হক গ্রুপের সাথে মুক্তিবাহিনীর বেশ কয়েক দফা সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়।"[৪৮৩]

ইসলামী দলসমূহ

ইসলামী দলসমূহের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি জামায়াতের থাকলেও জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে নেজামী ইসলামী ভালো অবস্থানে ছিল। সব ইসলামী দলগুলো তাদের নিজেদের মধ্যকার বিভেদকে অতিক্রম করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষায় এবং ভারতের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করার জন্য একত্রে কাজ করেন এবং বক্তব্য বিবৃতি দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে ও বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারতীয় ক্রীয়ানকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

কাউন্সিল মুসলিমলীগের নেতৃত্বে মুসলিমলীগের অন্য দু'টি অংশ, পিডিপিসহ সকল মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল তাদের বিভেদ সত্ত্বেও পাকিস্তান রক্ষায় একাট্টা হয়ে যায়। স্বাধীনতা বিরোধী প্রায় সকল প্লাটফর্মের নেতৃত্বে তারা ছিলেন।

---

৪৮২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ / ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া / পৃ. ১৩৭

৪৮৩. আমি বিজয় দেখেছি / এম আর আখতার মুকুল / পৃ. ৩৬৫

www.pathagar.com

সামরিক শক্তি

পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনীসমূহ, বাংলাভাষী পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও রেজাকার বাহিনী।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে যারা বাঙালি ছিলেন না তারা পুরোদস্তুর পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন। আর যেসব সেনা অফিসার বাঙালি ছিলেন। তাদের মধ্যেও অধিকাংশ অফিসার তাদের শপথের ব্যাপারে ও দেশের প্রতি কমিটমেন্টের ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। বিপুল সংখ্যক বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পাকিস্তান রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছেন এমন ১০৪ জন সেনা অফিসারের তালিকা পাওয়া যায় সামছুল আরেফীনের লেখা 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান' বইয়ে।[৪৮৪] এর মধ্যে মেজর ফরিদ উদ্দিন, ক্যাপ্টেন ফখরুল আহসান, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইমদাদ হোসেন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাছির উদ্দিন, স্কোয়ার্ড্রন লিডার হাসানুজ্জামান মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমনে মৃত্যুবরণ করেন। মজার বিষয় হলো যুদ্ধ শেষে শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর এই অফিসারদের প্রায় সকলকেই বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। শুধু তাই নয় যেসব বাঙালি সেনা অফিসার পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন, তাদেরও তিনি সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন। জিয়াউর রহমানও একই নীতি বজায় রেখে এসব অফিসারদের প্রমোশন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারদের আক্রোশের কবলে পড়েন।

পুলিশ বাহিনী

পুলিশ বাহিনী যুদ্ধাবস্থায় সামরিক বাহিনীর কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। তৎকালীন পুলিশের অল্প কয়েকজন হাতে গোনা অফিসার ছাড়া বাকী সবাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেন এবং এর জন্য তাদেরকে মূল্যও দিতে হয়। মুক্তিবাহিনীর বেশিরভাগ আক্রমণের শিকার হয়েছে পুলিশ বাহিনী এবং প্রচুর হতাহত হয়েছে তারা। সে সময় যারা পুলিশের অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন

---

৪৮৪. 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান / এ এস এম সামছুল আরেফীন / পৃ. ৩৬২- ৩৭৫

www.pathagar.com

এবং স্বাধীনতা বিরোধী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তাদের তালিকাও সামছুল আরেফীন সাহেবের বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৪৮৫]

এখানেও মজার কাজ করেছেন শেখ মুজিব। মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থানকারী কোনো শীর্ষ পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ তো করেননি বরং তাদের অনেককে সচিব বানিয়ে পুরস্কৃত করেন। আইজি টি আহমেদ, অতিরিক্ত আইজি আহমেদ ইব্রাহীম, ডিআইজি আবদুর রহীম এরা সবাই শেখ মুজিবের আমলে পর্যায়ক্রমে স্বরাষ্ট্র সচিব হন। এখানে আরো ইন্টারেস্টিং বিষয় রেজাকার বাহিনী গঠন করার পর পুলিশ থেকে ডি আইজি আব্দুর রহীমকে নিয়ে রেজাকার বাহিনীর প্রধান করা হয়। রেজাকার বাহিনীর প্রধানও শেখ মুজিব কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

রেজাকার বাহিনী[৪৮৬]

"রেজাকার" শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার "আনসার আইন ১৯৪৮" বাতিল করে "রেজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১" অনুযায়ী এ বাহিনী গঠন করে। জেনারেল নিয়াজী এক সাক্ষাৎকারে মুনতাসীর মামুনকে বলেছিলেন যে, রেজাকার বাহিনীর তিনিই স্রষ্টা। বিলুপ্ত আনসার বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্যরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবগঠিত রেজাকার বাহিনীর কমান্ডার ও রেজাকার সদস্য হিসেবে গণ্য হন।

এর বাইরে রাজনৈতিক কর্মী, স্থানীয় বখাটে, বেকার যুবকদের মধ্য থেকে প্রায় ৩৭,০০০ হাজার জনকে এ বাহিনীতে কমান্ডার হিসেবে রিক্রুট করা হয়। প্রতিটি কমান্ডারের অধীনে কমপক্ষে দশজন রেজাকার সদস্য ছিলেন। এ বিপুল সংখ্যায় রেজাকার রিক্রুট হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ কাজ করেছিল। বাংলাদেশের সবগুলো ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলের কোনোটিই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে তাদের সমর্থকদের মধ্য থেকে একটা অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রেজাকার বাহিনীতে শামিল হয়। তবে এ বাহিনীতে আদর্শবাদী লোকদের সংখ্যা

---

৪৮৫. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১১৪-১১৫

৪৮৬. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১১৪-১২২

www.pathagar.com

ছিল খুবই নগণ্য। প্রকৃতপক্ষে নিয়মিত ভাতা, রেশন, স্থানীয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং সর্বোপরি হিন্দু সম্প্রদায় ও স্বাধীনতার পক্ষের সদস্যদের ঘরবাড়ী ও বিষয়-সম্পত্তি অবাধে লুটপাট ও ভোগ দখল করার লোভে সমাজের সুযোগ-সন্ধানী এক শ্রেণীর লোক ব্যাপকহারে রেজাকার বাহিনীতে যোগদান করেন।

কামরুদ্দিন আহমদ তার "স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়" বইতে এ বিষয়ের একটা প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, বাঙালিদের রেজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার কতকগুলো কারণ ছিল, তা হলো,

১. দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সময় ঘোষণা করলো, যারা রেজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেওয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত হয়ে সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিল, তাদের এক অংশ এ বাহিনীতে যোগদান করলো।

২. এতদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তারা রেজাকারদের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

৩. এক শ্রেণীর সুবিধাবাদীরা জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল।[৪৮৭]

রেজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার পর তাদের বুঝানো হলো যে, যুদ্ধে পাক সেনারা হারলে, পাক সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তি বাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করবে। সুতরাং জীবন রক্ষা করার জন্য মুক্তি বাহিনীর গুপ্ত আশ্রয়স্থলের সংবাদ তারা পাক সেনাদের জানিয়ে দিতে শুরু করে।

খন্দকার আবুল খায়ের বলেন, আমি যে জেলার লোক, সেই জেলার ৩৭টি ইউনিয়ন থেকে জামায়াত আর মুসলিমলীগ মিলে ৭০ এর নির্বাচনে ভোট পেয়েছিল দেড়শতের কাছাকাছি। আর সেখানে রেজাকারের সংখ্যা ১১ হাজার যার মাত্র ৩৫ জন জামায়াতে ইসলামের ও মুসলিমলীগারদের। বাকীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল আওয়ামীলীগের ও সাধারণ মানুষ।

---

৪৮৭. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর / কামরুদ্দিন আহমদ / পৃ. ১২৬-১২৭

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন, আমার কিছু গ্রামের খবর জানা আছে, যেখানে ৭১ এর ত্রিমুখী বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রামে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, দুই দিকেই ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে । এই সিদ্ধান্ত মোতাবিক যে গ্রামের শতকরা ১০০ জন লোকই ছিল নৌকার ভোটার, তাদেরই বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেদের দেয় রেজাকারে। যেমন কলাইভাঙা গ্রামের একই মায়ের দুই ছেলের সাদেক আহমদ যায় রেজাকারে আর তার ছোট ভাই ইজহার যায় মুক্তিফৌজে।[৪৮৮]

রেজাকার বিষয়ে আওয়ামীলীগ নেতা ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদের মূল্যায়ন প্রায় একই; তিনি বলেন, বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি হতে একথা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, রেজাকার রেজাকারই; তবে সব রেজাকার এক মাপের ছিল না । প্রাথমিকভাবে রেজাকার বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যুবক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়

১. যারা নিজেদের ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষা করার লক্ষ্যে পাক সামরিক বাহিনীকে সহায়তা, বাঙালি হত্যা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল। যারা পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিল।

২. যারা হিন্দু সম্পত্তি দখল, লুটপাট, ব্যক্তিগত গ্রামীণ রেষারেষিতে প্রাধান্য বিস্তার ও প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নানান অপকর্ম করার সুযোগ গ্রহণ করেছিল।

৩. যাদের দেশ ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল, তারা বেশিরভাগ পেটের তাড়নায় কর্মসংস্থানের জন্য এবং একই সাথে ভয়ভীতি এবং প্রলুব্ধ হয়ে রেজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।[৪৮৯]

রেজাকার বাহিনী সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল না। বরং এদেরকে পাকবাহিনী দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। অধিকাংশই হয়েছে বলির পাঠা। তাদেরকে সামনে রেখেই পাকবাহিনী সর্বত্র অগ্রসর হয়েছে। রেজাকার বাহিনীর প্রধান কমান্ডার ছিলেন পুলিশের ডিআইজি আবদুর রহিম[৪৯০] যাকে শেখ মুজিব স্বাধীনতা যুদ্ধে

---

৪৮৮. ১৯৭১ সালে কী ঘটেছিল? রাজাকার কারা ছিল? / খন্দকার আবুল খায়ের / পৃ. ৪৪-৪৫

৪৮৯. সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম / অধ্যাপক আবু সাইয়িদ / পৃ. ৭৫

৪৯০. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১২০

www.pathagar.com

হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রধান ও পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র সচিব করেছিলেন। রাজাকার বাহিনীর মূল পরিচালক, জেলা ও মহকুমা কমান্ডারদের তালিকা পাওয়া যায় সামছুল আরেফীনের 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান' বইয়ে।

ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে শুধু ইসলামপন্থী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী দলসমূহ ছিল তা নয়, প্রায় সকল ধরনের ইসলামী ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। যারা কোনো রাজনীতি করেননি, এমনকি ইসলামে রাজনীতি হারাম বলে মনে করতেন সে ধরনের আলেম, পীর মাশায়েখ পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে ছিলেন। চরমোনাই এর পীর, শর্ষীনার পীর থেকে শুরু করে ফুলতলীর পীর মওলানা আবদুল লতিফ ফুলতলী, মওলানা সৈয়দ মোস্তফা আলী মাদানী, মওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর, মওলানা মুফতি দ্বীন মোহাম্মদ খান, মওলানা আনিসুর রহমান, মওলানা আশ্রাফ আলী, মওলানা আমিনুল হক, মওলানা মাসুম, মওলানা নূর আহমদ, মওলানা আব্দুল মান্নান (জমিয়াতুল মোদারেছীন), মওলানা সিদ্দীক আহমদ, মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, মওলানা আজিজুল হকসহ শত শত আলিম পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ করার বিপক্ষে ছিলেন।[৪৯১]

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী

ইসলাম পন্থীদের মতই এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগীরা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন। এই ধর্মের ধর্মীয় গুরু ও বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো বলেন, পাঁচ লাখ বৌদ্ধের প্রিয় মাতৃভূমি পাকিস্তান, চিরদিন পাকিস্তান বৌদ্ধদের পবিত্র স্থান হয়েই থাকবে। বৌদ্ধরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে দেশকে দুস্কৃতিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবে। বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো, প্রফেসর ননী গোপাল বড়ুয়া এবং অন্যান্য নেতারা যখন কোনো সফরে যেতেন, তাদের নিরাপত্তার জন্য সব সময় পুলিশ ও কমান্ডো

৪৯১. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১২৩

www.pathagar.com

বাহিনী থাকতো। সে সময় চট্টগ্রাম জেলার অনেক বৌদ্ধ গ্রামে 'চীনা বৌদ্ধ' বলে বড় বড় ব্যানার রাখা হতো। ডিসেম্বরে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধ শুরু হলে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকা আওয়ামী বুদ্ধিজীবী পিজি হাসপাতালের তৎকালীন পরিচালক প্রফেসর নূরুল ইসলামের কৃপায় হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিস্থিতি একেবারে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই ছিলেন।[৪৯২]

বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য পেশাজীবী

যুদ্ধের সময় প্রায় সকল বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগীর ভূমিকায় অবস্থান নেন। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে নিয়মিত ক্লাস হয়। প্রায় সকল শিক্ষক পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে ক্লাস চালু রাখেন। ১৯৭১ সালের ১৪ডিসেম্বর বেশ কিছু শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আবাসিক ভবন থেকে অপহৃত হওয়াই প্রমাণ করে তারা মূলত পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন। আবার বাংলাদেশ হওয়ার সাথে সাথেই দল বদল করে বিপরীত শিবিরে তাদের জোরালো অবস্থান মোটামুটি বেশ চমকপ্রদ এবং বিরল। ১৪ডিসেম্বর খুন হওয়া মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৭মে পাকিস্তানের পক্ষে ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে বিবৃতি দেন ৫৫ জন প্রথিতযশা শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

শিবনারায়ন দাস যিনি নিউক্লিয়াস সদস্য ছিলেন, তিনি বলেছেন, "কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু তারা ব্যস্ত ছিলেন পাকিস্তানের সংহতি এবং তমুদ্দুনকে বাঁচিয়ে রেখে আদমজী, ইস্পাহানীর পুরস্কার নেবার প্রতিযোগীতায়"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডঃ এম এন হুদা, ডঃ এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ডঃ এম ইন্নাস আলী, ডঃ এ কে এম নাজমুল করিম, ডঃ মফিজুল্লাহ কবীর, অধ্যাপক আতিকুজ্জামান খান, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডঃ কাজী দ্বীন মোহাম্মদ, ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক, ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম, ডঃ এস এম আজিজুল হক, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ এ কে রফিকুল্লাহসহ সকল শিক্ষক কাজে যোগদান করেছেন।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীসহ রাবির প্রায় সকল শিক্ষক কাজে যোগদান করেছেন। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, "আমরা

---

[৪৯২] বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১২৪

www.pathagar.com

আমাদের প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে খন্ড করার অভিসন্ধির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। রাজনৈতিক চরমপন্থীদের একতরফা স্বাধীনতা ঘোষনায় আমরা দুঃখ পেয়েছি ও হতাশ হয়েছি।"

বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ও কবি শামসুর রাহমান, যারা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন বজায় রেখে যুদ্ধের পর বড় বড় মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে ড. মাহবুবুল্লাহ বলেন, "কে এই কে এম সোবহান? যিনি ৭১ সালে সেনা শাসকের অধীনে পূর্ব-পাকিস্তানের বিচারক হিসেবে শপথ নিয়েছেন, সেই কে এম সোবহানের মুখে স্বাধীনতার স্বপক্ষ উচ্চারণ শোভা পায় না। কে এই কবীর চৌধুরী? তার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটি সরকারের সেবা করা। আইয়ুব খাঁন থেকে শুরু করে ইয়াহিয়া খাঁন, মোনেম খাঁন পর্যন্ত প্রত্যেককে তিনি সেবাদান করেছেন। তিনি আজ যখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে কথা বলেন, তখন প্রশ্ন করতে হয় কেন তখন তিনি বাংলা একাডেমীর দায়িত্ব পালন করেছেন? আজকে যখন শামসুর রাহমান তালেবানী হামলার শিকার হন বলে দাবী করেন, মিথ্যাচার করেন। তখন প্রশ্ন করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সময় শামসুর রাহমানকে যখন আমি বলেছিলাম সীমান্তের ওপারে যেতে এবং আমি তাকে সাহায্য করবো, কেন তিনি ঢাকার মাটিকে আঁকড়ে ধরে 'দৈনিক পাকিস্তানে' মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয় রচনা করেছেন?"।

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ওয়েবসাইট অনুসারে "হাইকোর্টের ৩৮ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানের ঘরোয়া বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপকে নগ্ন ও নির্লজ্জ অভিহিত করে এর প্রতিবাদ জানায় এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে দুষ্কৃতিকারীদের বাধাদানের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান"।[৪৯৩]

সংবাদপত্র

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলায় প্রকাশিত সকল পত্রিকা পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে ছিল দৈনিক আযাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক পাকিস্তান, দৈনিক পূর্বদেশ উল্লেখযোগ্য। দৈনিক আযাদ এবং দৈনিক পূর্বদেশ ছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদী, দৈনিক সংগ্রাম ছিল জামায়াতের মুখপত্র,

---

৪৯৩. ৩৫- বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১২৫-১২৯

www.pathagar.com

দৈনিক পাকিস্তান ছিল সরকারি আর দৈনিক ইত্তেফাক ছিল আওয়ামীলীগের মুখপত্র। সবচেয়ে বেশি অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে এবং 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' বিরুদ্ধে জাতীয় শত্রু হিসেবে গণ্য করে প্রচারণা চালায় দৈনিক পূর্বদেশ। ইত্তেফাক পত্রিকার ভূমিকা, স্বাধীনতার বিরোধীতা, তাজউদ্দিনের বিমাতাসুলভ আচরণ, শেখ মুজিবের ক্ষমা ইত্যাদি নিয়ে লিখেছেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী।

যাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীতার বড় অভিযোগ, তারা হলেন পূর্বদেশ ও Pakistan observer এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, Pakistan observer এর সম্পাদক মাহবুবুল হক, পূর্বদেশ সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, দৈনিক পাকিস্তান সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন, দৈনিক আযাদ সম্পাদক সৈয়দ শাহদাত হোসেন এবং দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আখতার ফারুক।[৪৯৪]

সরকারি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১৯৭১ সালে প্রায় দু'শ জন সি এস পি ছিলেন, যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ড. আকবর আলী খানের মতে তাদের মধ্যে মাত্র তের জন স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। এছাড়া ই পি সি এস ৬২ জন এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৫১ জন স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। যারা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং স্বাধীনতার বিপক্ষে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে তিন শতাধিক কর্মকর্তার তালিকা পাওয়া যায় এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্র বইতে।[৪৯৫] মজার বিষয় হলো এদের মধ্যে কাউকেই পরবর্তী জীবনে এই কারণে কোনো শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়নি। এই তালিকার প্রায় সবাইকে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের সচিব বানিয়েছে। এর মধ্যে নুরুল ইসলাম অনু যিনি টিক্কা খানের পি এস ছিলেন শেখ মুজিব তাকে নিজের পি এস বানিয়ে নেন। পরবর্তিতে তিনি আওয়ামীলীগ নেতা ও ব্যাংক এশিয়ার ভাইস চেয়ারম্যান হন।[৪৯৬]

---

৪৯৪. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৩৩-১৩৪

৪৯৫. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৩৪-১৪৫

৪৯৬. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স /

www.pathagar.com

পার্বত্য উপজাতি

সকল উপজাতি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সরাসরি বিরোধীতা করে। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যই শুধু দেখাননি, তিনি পাক সামরিক বাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে যান। তিনি বাংলাদেশ হওয়ার পর পাকিস্তানে চলে যান এবং পাকিস্তানের মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আওয়ামীলীগের উপজাতি এমপি আউং শু প্রু চৌধুরী পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। পার্বত্য জেলা সমূহের সকল উপজাতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এতটাই বিরোধী ছিল যে, পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ও সহায়তাকারী বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করলেও তারা এই ঘটনায় তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেনি। তারা যে সকল শর্তে আত্মসমর্পন করে তা হলো,

১- স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতার জন্য উপজাতিদের কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না

২- বাঙালিরা যাতে তাদের আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য ভারতীয় বাহিনীকে তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে

৩- তাদের রাজ পরিবার সমূহের ওপর কোনো আক্রমণ করা যাবে না বা তাদের মর্যাদা বিনষ্ট করা যাবে না

৪- নাগা ও মিজো দমনের নামে ভারতীয় বাহিনী কোনো উপজাতি সদস্যকে হয়রানী করতে পারবে না[৪৯৭]

বিহারী, আল-বদর, আশ-শামস ও মুজাহিদ বাহিনী

এরা কিছু সশস্ত্র গ্রুপ যারা সেনাবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল দেশকে রক্ষার জন্য। এদের মধ্যে বেশিরভাগই মুসলিম উম্মাহ চেতনা লালন করতো।

গনহত্যার শিকার হওয়ার পর ভারতীয় মুহাজিররা বিশেষত বিহার হতে আগত

পৃ. ১৩৪-১৪৫

৪৯৭. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৪৬-১৪৮

www.pathagar.com

বিহারীরা নিজেদের সংগঠিত করে। উগ্র বাঙালি সন্ত্রাসীদের হাত হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন বাঙালি এলাকায় হামলাও চালিয়েছে। তবে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করাই ছিল তাদের মূল কাজ। তারা সেনাবাহিনী ও পুলিশ থেকে অস্ত্রও পেয়েছিল।

বদর যুদ্ধের চেতনায় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে ইসলামপন্থীদের একটি সংগঠন 'আল-বদর'। আল-বদর বাহিনী অত্যন্ত সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল। মূলত জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ছাত্র ও যুবকরা ছিল এই আল-বদর বাহিনীর সদস্য। তারা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং ও অস্ত্র সাহায্য পেয়েছিল।

আশ-শামস ও আল-বদরের মতো অনুরূপ বাহিনী ছিল। তবে তারা ছিল মাদরাসাভিত্তিক সংগঠন। আরো ভালো করে বলতে গেলে তারা ছিল নেজামে ইসলাম পার্টির ছাত্র ও যুব কর্মী। তারাও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যদিও এখানে অনেকগুলো গ্রুপের কথা উল্লেখ করা হলো, কিন্তু এরা আদতে সংখ্যায় বেশি ছিল না। এরা স্বাধীন বাহিনী ছিল বিধায় রেজাকার বাহিনীর মতো সুযোগ সুবিধা এদের জুটতো না। এরপরও তারা রেজাকার বাহিনীর চাইতেও অনেক বেশি কার্যকর বাহিনী ছিল। এদের মধ্যে বিহারী গ্রুপ ছাড়া বাকীরা বাঙালি ছিল।

স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পক্ষে যারা ছিলেন

ভারত ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সংলগ্ন মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ১৭এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রসহ বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন হয়। এ সরকারই মুজিবনগর সরকার হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এ দিনই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত বলে গণ্য হয়। মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর এটি যুদ্ধের দ্বিতীয় মাইলফলক যা বাংলাদেশের অনেক তারুণ্যকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উৎসাহ যোগায়। ভারত সরকার দেশভাগের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ।

www.pathagar.com

ভারতের শরনার্থী গ্রহণ

২৫মার্চ অপারেশন সার্চলাইট ও পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সারাদেশে আগ্রাসী সামরিক অভিযান অনেককে ভীত সন্ত্রস্ত করে। প্রথমে হিন্দু জনগোষ্ঠী ভারতে শরনার্থী হিসেবে গমন করে। ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ দলবেঁধে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। পরে অন্যান্য অংশের মানুষও শরনার্থী হয়। এভাবে ভারতের শরণার্থী শিবিরে ৭০-৮০ লক্ষ মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪৯৮]

মুক্তিবাহিনী ও মুজিব বাহিনী গঠন এবং প্রশিক্ষণ

সেনাবাহিনীর সাঁড়াশী অভিযানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিদ্রোহীরা মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণায় দিকনির্দেশনা পায়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বিদ্রোহী বাঙালি সামরিক বাহিনী, ই.পি.আর, ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। ৪এপ্রিল ৭১ এ সামরিক কর্মকর্তাগণ মিলিত হন হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানে। পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগকারী সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার সদসদের নিয়ে গঠিত হয় মুক্তিফৌজ। এর প্রধান করা হয় কর্ণেল (পরবর্তীতে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানীকে।

অন্যদিকে তাজউদ্দিন ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভারতীয় নিরাপত্তা এজেন্সীগুলোর মাধ্যমে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রতিরোধ সংগ্রামের এ সব ঘটনা ও সিদ্ধান্তের সংবাদ তাজউদ্দিনের কাছে পৌঁছতে শুরু করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।[৪৯৯]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার আওয়ামী কর্মী ভারতে আশ্রয় নিলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। দেশত্যাগীরা নিজের অস্তিত্বের তাগিদে ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অনুপ্রেরণায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণের দাবী জানাতে থাকে। এ সময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও নিউক্লিয়াসের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। RAW এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় মুজিববাহিনী আর ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে গঠিত হয় মুক্তিযোদ্ধা। জুলাই মাসে

---

৪৯৮. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৭৮

৪৯৯. মূলধারা ৭১ / মঈদুল হাসান / পৃ. ১৪

www.pathagar.com

মুক্তিফৌজ আর মুক্তিযোদ্ধা একীভূত করে গঠন করা হয় মুক্তিবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে জেনারেল ওসমানী থাকলেও মুজিববাহিনীর নেতৃত্ব দেন ভারতীয় জেনারেল ওবান।[৫০০]

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দেশ রক্ষার মন্ত্র নিয়ে দেশদ্রোহীদের শায়েস্তা করার শুরুর দিন থেকে মাত্র পাঁচ দিন পরেই পূর্ব বাংলার বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য ভারতীয় পার্লামেন্ট যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা অল্পদিনের মধ্যেই কার্যকর রূপ লাভ করেছিল। ফলে এপ্রিল মাসে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ) বিক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সরবরাহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যে অল্প স্বল্প সাহায্য করে চলেছিল তার উন্নতি ঘটে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় চার সপ্তাহ মেয়াদী ট্রেনিং কার্যক্রম। এখানে শেখানো হতো সাধারণ হাল্কা-অস্ত্র ও বিস্ফোরকের ব্যবহার। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হয় দু'হাজার ছাত্র ও যুবকের প্রথম দলের ট্রেনিং।

তরুণদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে অবশ্য ভারতীয় প্রশাসন সতর্ক ছিল। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল, নক্সালবাদী, নাগা, মিজো প্রভৃতি সশস্ত্র বিদ্রোহীদের তৎপরতা-হেতু পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভারতীয়রা উদ্বিগ্ন ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত অস্ত্র এই সব সন্ত্রাসবাদী বা বিদ্রোহীদের হাতে যে পৌঁছবে না, এ নিশ্চয়তাবোধ গড়ে তুলতে বেশ কিছু সময় লাগে। তাই শুধু আওয়ামীলীগ ছাড়া অন্য সাধারণ যুবকদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেওয়া হয়নি।[৫০১]

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, সামগ্রিক সমস্যার চাপে ভারত সরকারের নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যখন দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব হ্রাস পায় এবং বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার মধ্যে তাজউদ্দিনের অবস্থান অপেক্ষাকৃত সবল হয়, তখন বাংলাদেশের বামপন্থী তরুণদের বিরুদ্ধে এই বিধি-নিষেধ বহুলাংশে অপসারণ করা হয়। মনি সিং এর তৎপরতার ফলে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে আলাদাভাবে একটি প্রশিক্ষণ শিবির চালু করা হয় অক্টোবর মাসে। তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পূর্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৫০০. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৭৮

৫০১. মূলধারা ৭১ / মঈদুল হাসান / পৃ. ১৯-২১

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়ে (মার্চ-এপ্রিল) পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অভিযানের মুখে জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সকল দল, মত, ধর্মের মানুষ ভারতে পাড়ি জমায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ট্রেনিং গ্রহণ করতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেন। এটি ছিল স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক প্রকার ঐক্য। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মনোনয়ন ও ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে প্রদর্শিত বৈষম্য তরুণদের সেই একতাবোধকে বহুলাংশে বিনষ্ট করে। বিশেষ করে দাড়ি টুপিধারী শরণার্থীকে মারধর অথবা বন্দী করে রাখার ঘটনা ইসলামপন্থী মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার মানুষদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায়।

ইসলামী ছাত্রসংঘের (পরবর্তীতে ইসলামী ছাত্রশিবির) কর্মী সন্দেহে ট্রেনিং থেকে বের করা সম্পর্কে মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে। প্রথমে আমরা বুঝতেই পারিনি কী হয়েছে! আমাদের ব্যাচের একজনকে ডেকে পাঠানো হয়। বলা হয়, ঐ ছেলেটিকে উইথড্র করা হয়েছে। একটা চাপা গুঞ্জন শুনি, সে নাকি ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে জড়িত ছিল।"[৫০২] মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে। জেনারেল ওসমানী এক সাক্ষাতে বলেন, এ সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার।

স্বাধীনতার পক্ষে রাজনৈতিক শক্তি

এ যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামীলীগের নাম প্রথমে আসে। আওয়ামীলীগের প্রায় সব কেন্দ্রীয় নেতা ও নির্বাচিত এমপিদের একটি অংশ স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেছে। এরপর মস্কোপন্থী কমুনিস্ট পার্টি, ন্যাপসহ কিছু ছোট ছোট রাজনৈতিক দল এবং মস্কোপন্থী অনেক বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি ভূমিকা রাখেন। আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিল ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রশক্তি। বৃটিশ পলিসি ছিল বরাবরই চতুর। বৃটেনের নীতিনির্ধারকদের একাংশ পাকিস্তানের পক্ষে আর অন্য অংশ বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য দেন।

চীনপন্থী রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীদের দুই একজন ব্যতিক্রম ছাড়া কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কোনো ভূমিকা রাখেননি। মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ

---

[৫০২] মূলধারা ৭১ / মঈদুল হাসান / পৃ. ১৯-২১

www.pathagar.com

গ্রহণের জন্য ভারতে গিয়ে বন্দী জীবন কাটান। রাশেদ খান মেনন বলেন "তারপর মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস মওলানাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। জানতাম তিনি আমাদের কাছেই আছেন। পত্রিকায় তার বিবৃতি পড়েছি। আকাশবাণীতে সাক্ষাৎকার শুনেছি। প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সভার ছবিও দেখেছি পত্রিকায়। কিন্তু মওলানা যা আশংকা করেছিলেন, তিনি সুভাস বসুর মতো বন্দী ছিলেন ভারত সরকারের হাতে"।

মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিবের উর্দ্ধে কোনো নেতার আবির্ভাব ভারতের কাছে বিব্রতকর ছিল। ভারত সরকার আশংকা করতো ভারতের বাইরে গেলে ভাসানী হয়তো বামপন্থীদের নিয়ে স্বাধীনতা শক্তির পক্ষে অপর একটি সরকার গড়ে তুলতে পারেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামীলীগ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভ করুক এটাও ভারত সরকারের কাম্য ছিল না। তাই ভাসানীকে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে গৃহ-অন্তরীণ থাকতে হয়।

আওয়ামীলীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ১৬০ জন ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ২৮৮ জন সদস্যের প্রায় অর্ধেক সদস্য ভারতে গমন করেন। তবে এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না। কতিপয় সদস্য মিয়ানমারে (বার্মায়) আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাকিস্তান সরকার ৭৭ জন জাতীয় পরিষদের ও ১৪৫ জন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদেরকে সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ইশতেহার জারী করে। এই থেকে অনুমান করা যায় ১৬৭ জনের মধ্যে ৭৭ জন স্বাধীনতার পক্ষে ও ২৮৮ জনের মধ্যে ১৪৫ জন স্বাধীনতার পক্ষে থেকে ভারতে গমন করেছে বা পলাতক হয়েছে।[৫০৩] বাকীরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত তথা দেশভাগের বিরুদ্ধে ছিল।

মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টি[৫০৪]

দু'টি ভিন্ন ভিন্ন নামের দল হলেও আদর্শিকভাবে তারা ছিল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ধারক। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ন্যাপের অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ

---

৫০৩. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৮৪

৫০৪. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৮৫

www.pathagar.com

আর কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিং যুগপৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ দু'জন নেতা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে বঙ্গবন্ধুকে ছদ্মবেশে আগরতলা প্রেরণ ও বিভিন্ন সময় গোপন বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতেন ন্যাপ ও কমিউনিস্ট নেতারা।

তৎকালীন ন্যাপ নেতা ক্যাপ্টেন হালিমের নেতৃত্বে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ ও বিক্রমপুর অঞ্চলে ৬ হাজার গেরিলা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব-পাক ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পাকিস্তান ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব আলী জাতিসংঘসহ পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একটি সর্বোচ্চ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এক হয়ে মোজাফফর ও কমরেড মণি সিংহ, সোভিয়েত পার্টিকে বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে কনভিন্স করেন। মোজাফফর আহমদ কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট ফোরাম ও ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সর্বোচ্চ উপদেষ্টা পরিষদ, সচিব পরে মন্ত্রী ডিপি ধর, পিএন হাকসার প্রমুখ ক্ষমতাধর ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভাসানী ন্যাপ (পিকিংপন্থী)

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন আওয়ামী মুসলিমলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরবর্তী সময়ে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামীপার্টি গঠন করেন এবং লেনিন ও মাও এর চিন্তাধারার ভিন্নতায় ন্যাপ দ্বিখন্ডিত হয়ে ভাসানী ন্যাপ ও মস্কোপন্থী ন্যাপ নামে দু'টি রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ভাসানী পিকিংপন্থী হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামীলীগের প্রতি ছিলেন দুর্বল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার স্বপ্ন তিনি ১৯৬৯ সাল থেকেই দেখতেন বিধায় মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি ভারতে পাড়ি জমান। ভারত প্রথম দিকে তাকে বন্দী ও পরে গৃহবন্দী করে রাখলেও মুক্তিযুদ্ধের উপদেষ্টা পরিষদে তাকে সভাপতি করে রাখা হয়। এ দলের মশিউর রহমান যাদু মিয়া, কাজী জাফরসহ শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাই ভারতে গিয়ে ফিরে আসেন।[৫০৫]

---

৫০৫. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৮৫

www.pathagar.com

বিদ্রোহী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বা দেশভাগের পক্ষে কাজ করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী বাঙালি সেনারা। বাংলাকে ১১ সেক্টরে ভাগ করে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করে। সামরিক বাহিনীর সকল শাখা, ইপিআর ও পুলিশের বিদ্রোহীরা মুক্তিফৌজ নামে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।[৫০৬]

ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠন

মুক্তিযুদ্ধের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্রদের দ্বারা গঠিত নিউক্লিয়াস। পরে তারা ভারতের সহায়তায় গঠন করে মুজিব বাহিনী। সিরাজুল আলম খান, শেখ মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, আসম আব্দুর রব প্রমুখ ছাত্রনেতাদের নেতৃত্বে এদেশের অনেক ছাত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ ও বামপন্থীদের প্রভাব। সেই প্রভাবেই রাজনীতি সচেতন ছাত্রদের একটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

কাদেরিয়া বাহিনী

আবদুল কাদের সিদ্দিকী আওয়ামীলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১-২৫মার্চ তিনি টাংগাইলে আওয়ামী কর্মীদের সাথে নিয়ে গণহত্যা চালান। সেনাবাহিনীর অভিযানে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরে তিনি ভারত না গিয়ে এলাকার যুবক, কৃষক ও ডাকাতদের সংগঠিত করতে থাকে টাংগাইলের সখীপুরে। এই বাহিনীই কাদেরিয়া বাহিনী হিসেবে পরিচিতি পায়। অতর্কিত ও চোরাগোপ্তা হামলা করে তারা সেনাবাহিনীকে নাজেহাল করতে থাকে। সাফল্য আসায় তাদের বাহিনী বড় হতে থাকে। এই বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় ১৭,০০০ হাজার। সমগ্র টাঙ্গাইল জেলা এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনার কিছু অংশ ছিল এর কর্মক্ষেত্র। এ বাহিনীর কোনো যোদ্ধাই বাংলাদেশের বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেনি। তবে এদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে ডাকাতির সাথে যুক্ত ছিল বিধায় যৎসামান্য আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্রের ব্যবহার তারা জানতো। ফলে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশের

---

৫০৬. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৮৫-৮৬

www.pathagar.com

অভ্যন্তরেই তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পাক সেনাবাহিনীকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। টাঙ্গাইলে তারা মুক্ত অঞ্চল গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।[৫০৭]

হেমায়েত বাহিনী

হেমায়েত উদ্দিন ছিলেন ২য় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন হাবিলদার। তিনি জয়দেবপুর ক্যাম্পে ছিলেন। তিনি এবং তার অনুসারী সৈনিকরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৫ জনকে হত্যা করে শতাধিক অস্ত্র, প্রচুর গোলা-বারুদ, ৩টি গাড়ী এবং কয়েকজন জোয়ান নিয়ে পূর্ব দিকে চলে যান। হেমায়েত প্রথমে বাঘিয়ার বিলে তার ঘাঁটি স্থাপন করেন। ২৯মে গৌরনদী থানার বাটরা বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে হেমায়েত বাহিনীর উদ্বোধন করেন। ১জুন বরিশাল অঞ্চলে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। হেমায়েত বাহিনীর কর্মক্ষেত্র ছিল বরিশালের উজিরপুর ও গৌরনদী থানা, ফরিদপুরের কালকিনি, মাদারীপুর, রাজৈর, গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া। সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণভাবে গড়ে উঠেছিল এই হেমায়েত বাহিনী। তার দলে মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৫, ০৫৪ জন। তাদের মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর লোক ছিল ৪০ জন। এদের সাহায্যে তিনি কোটালীপাড়া থানার জহরের কান্দি হাই স্কুলে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিন মাসে প্রায় চার হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এদের মধ্যে দেড় হাজার গরীব শ্রেণীর মুক্তিযোদ্ধাকে মাসিক ৯৫/- হিসেবে বেতনও দেওয়া হতো। বিভিন্ন বাজার থেকে তারা চাঁদা কালেকশন করতেন।[৫০৮]

সরকারি ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা

১৯৭১ সালে প্রায় ২০০ জন সিএসপি ছিলেন, যারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হতে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মাত্র ১৩ জন স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ইপিসিএস ৬২ জন অন্যান্য বিভাগের ৫১ জন উচ্চপদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[৫০৯]

---

৫০৭. বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ / রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী / পৃ. ৪০৮

৫০৮. বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ / রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী / পৃ. ৪০৯

৫০৯. বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১ / এইচ টি ইমাম / পৃ. ১৩৯

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধ ও বাটা স্যু কোম্পানী

উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে মুসলিম পরিচয়ে রাষ্ট্র গঠন হওয়া ছিল একমাত্র ঘটনা। পৃথিবীর প্রায় সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র চেয়েছিল পাকিস্তান যাতে ভেঙে যায়। এজন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছিল। ২২মার্চ পাকিস্তান বিষয়ে পাকিস্তানের নেতারা (ইনক্লুডিং শেখ মুজিব) ঐক্যমতে পৌঁছে যাওয়ায় সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিউক্লিয়াস শেখ মুজিবকে চেপে ধরেছে যাতে তিনি প্রধানমন্ত্রী না হন।

ভারত, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড থেকেও চাপ অব্যাহত থাকে যাতে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চাপের অংশ হিসেবে ২৩মার্চ রাশিয়া ও ইংল্যান্ড তাদের ঢাকাস্থ দূতাবাসে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয়। বলাবাহুল্য মেজর জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার আগেই দু'টি রাষ্ট্র প্রকাশ্যে স্বাধীনতাকে সাপোর্ট করে। এর দ্বারা অনুমান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এসব রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র ছিল দীর্ঘদিনের।

আমরা আজ এমন একজন দক্ষ গোয়েন্দাকে নিয়ে কথা বলবো যিনি হিটলারকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম ছিলেন। তার নাম ওডারল্যান্ড। পুরো নাম উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড। তিনি ওলন্দাজ বাহিনীর গেরিলা কম্যান্ডো হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। জার্মানি কর্তৃক নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম দখল করার পর তিনি জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ শুরু করেন। তার উপর্যুপরি আক্রমণে হিটলার বাহিনী নাজেহাল হয়। এক পর্যায়ে জার্মান গোয়েন্দারা ওডারল্যান্ডকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তবে তাকে ধরে রাখা জার্মানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যান এবং হল্যান্ডের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে থাকেন। জার্মানদের পরাজয়ে তার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল।[৫১০]

২য় বিশ্বযুদ্ধের ২৫ বছর পর ওডারল্যান্ড তখন বড় গোয়েন্দা অফিসার। বৃটেন পাকিস্তান ভাঙার কাজে তাকে লাগাতে চায়। তিনি রাজি হন। এরপর ঢাকায় তিনি তার বাহিনীর সদস্যদের পাঠান। তারা নিউক্লিয়াস, আওয়ামীলীগ, সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়েন। ৭০ সালের শেষদিকে যখন পাকিস্তানের ওপর

৫১০. Ouderland, William AS / Banglapedia / https://bit.ly/3bsFJiG / Access in 9 mar 2021

www.pathagar.com

চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় বেছে নিয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা, তখন ওডারল্যান্ড নিজেই ঢাকায় আসেন।

এত বড় একজন গোয়েন্দা অফিসার ঢাকায় আসবেন ও কাজ করবেন, পাকিস্তানি গোয়েন্দারা নিশ্চয়ই তা সহজ চোখে দেখবে না। তাই তিনি 'বাটা স্যু কোম্পানী'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নেদারল্যান্ডস থেকে ঢাকায় আসেন। যাতে তাকে কেউ সন্দেহ না করে। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি বাটার নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি নেন। টঙ্গীর বাটা জুতো কারখানায় ছিল তার অবস্থান। সেখান থেকেই তিনি একই সাথে সেনাবাহিনী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে যুক্ত ছিলেন।[৫১১]

বাটা স্যু কোম্পানী ভালো ব্যবসা করেছে মিত্রবাহিনীর সেনাবাহিনীর জন্য জুতো তৈরি করে। সেই হিসেবে ওডারল্যান্ড পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জুতো, বেল্ট ইত্যাদি তৈরি করার প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সখ্যতা গড়ে তুলেন। তিনি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নীতিনির্ধারক মহলে অনুপ্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে ঢাকার বেলুচ রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্ণেল সুলতান নেওয়াজের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। সেই সুবাদে শুরু হয় তার ঢাকা সেনানিবাসে অবাধ যাতায়াত। এতে তিনি পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হতে থাকলেন আরো বেশি সংখ্যক সিনিয়র সেনা অফিসারদের সাথে।

এক পর্যায়ে লেফট্যানেন্ট জেনারেল টিক্কা খান, পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লেফট্যানেন্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, এডভাইজার সিভিল এফেয়ার্স মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলিসহ আরো অনেক সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে তার হৃদ্যতা গড়ে ওঠে।

নিয়াজীর ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টার তাকে 'সম্মানিত অতিথি' হিসেবে সম্মানিত করা হয়। এই সুযোগে তিনি সব ধরনের 'নিরাপত্তা ছাড়পত্র' সংগ্রহ করেন। এতে করে সেনানিবাসে যখন তখন যত্রতত্র যাতায়াতে তার আর কোনো অসুবিধা থাকলো না। তিনি প্রায়শঃ সেনানিবাসে সামরিক অফিসারদের আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। এক পর্যায়ে তিনি পাকিস্তানিদের

---

৫১১. Ouderland, William AS / Banglapedia / https://bit.ly/3bsFJiG / Access in 9 mar 2021

www.pathagar.com

গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা শুরু করলেন। এ সকল সংগৃহীত সংবাদ তিনি গোপনে প্রেরণ করতেন ২নং সেক্টর এর ক্যাপ্টেন এ. টি. এম. হায়দার এবং জেড ফোর্সের কমান্ডার মেজর (পরবর্তীতে লেফটেনেন্ট জেনারেল) জিয়াউর রহমান এর কাছে।[৫১২]

মার্চের শুরুতে আওয়ামী কর্মীরা যে অরাজক পরিস্থিতি ও গণহত্যা চালিয়েছিল, এতে পরিকল্পনা ও অস্ত্র সহায়তা দিয়েছেন ওডারল্যান্ড। বাটা স্যু কোম্পানীর মালামালের সাথে তিনি অস্ত্র, বোমা ও গোলাবারুদ পরিবহন করে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। ভারত থেকে আসা নিরীহ ও গরীব মুহাজির বিহারীদের ওপরে গণহত্যা চালানোর পরিকল্পনা ছিল তারই।

একইভাবে যুদ্ধ শুরু হলে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন উপায়ে অস্ত্র সাহায্য করতেন। ওডারল্যান্ড বাটা কারখানা প্রাঙ্গণসহ টঙ্গীর কয়েকটি গোপন ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত গেরিলা রণকৌশলের প্রশিক্ষণ দিতেন। তার প্রতিটি কাজের সাইনবোর্ড ছিল বাটা স্যু কোম্পানী। যার কারণে তিনি সব সময় রাষ্ট্রের সন্দেহের বাইরে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। কমান্ডো হিসেবে তিনি ছিলেন অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজেই আওয়ামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

তিনি দুই নং সেক্টরের গেরিলাদের থেকে আশানুরূপ সাফল্য পাননি। হতাশ হয়ে তিনি নিজেই যুদ্ধে নেমে পড়েন। তিনি তার ঢাকাস্থ গোয়েন্দাদের নিয়ে একের পর এক টঙ্গী-ভৈরব রেললাইনের ব্রিজ, কালভার্ট ধ্বংস করে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে থাকেন। তার পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বহু অপারেশন সংঘটিত হয়। সেনাবাহিনীর সাথে সখ্যতা থাকায় তাদের অভিযানের খবর ও অবস্থানের খবর আগেই বিদ্রোহীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এতে সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়।

এর পাশাপাশি তিনি মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে বাংলাদেশে বিহারীদের ওপর করা নৃশংস নির্যাতন ও গণহত্যার ছবি তুলে বৃটিশ মিডিয়াতে পাঠাতে থাকেন। নিজেই বিহারীদের হত্যা করে তাদের বাঙালি বলে চালিয়ে দেন এবং বহির্বিশ্বে খবর

---

৫১২. জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা / মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া / সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ / পৃ. ৬০-৬৩

www.pathagar.com

পৌঁছে দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যা চালাচ্ছে। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে ওঠে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালি গণহত্যার মিথ্যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

যুদ্ধের পর বাংলাদেশ সরকার বাটা স্যু কোম্পানীর নির্বাহী পরিচালক ওডারল্যান্ডকে 'বীরপ্রতীক' সম্মাননায় ভূষিত করে।[৫১৩] স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর প্রতীক পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকায় তার নাম ২ নম্বর সেক্টরের গণবাহিনীর তালিকায় ৩১৭ নম্বর।

১৯৭১ এ যেভাবে ধরাশায়ী হয় পাকিস্তান সেনাবাহিনী

ইন্দিরা গান্ধীর প্ল্যান ছিল আওয়ামী কর্মী, ভারতীয় গোয়েন্দা ও অন্যান্য বিদেশী গোয়েন্দাদের ব্যাপক তৎপরতা ও গেরিলা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনী নাজেহাল হয়ে পড়বে। ম্যাসাকার চালাবে পাকিস্তান। অবশেষে মানবতার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়বে। রাশিয়া এক্ষেত্রে ভারতকে সাপোর্ট দিলেও সরাসরি যুক্ত হয়নি, কারণ তা চীন ও আমেরিকাকে আরো বেশি পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় করবে। কিন্তু মে মাসে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সকল স্থানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। তখন ইন্দিরা আর কোনোভাবেই পাকিস্তানে অস্থিরতা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছিল না।

আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়ার জন্য তিনি তৎপরতা চালাতে লাগলেন। কিন্তু সে রকম পজেটিভ কিছু পাননি। আমেরিকা তাকে হতাশ করলো। এরপরও দমে যেতে চাননি তিনি। এদিকে পাকিস্তান পরিস্থিতি ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে দেখে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পূর্ব-পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। টিক্কা খানকে প্রত্যাহার করে ডা. আব্দুল মোতালেব মালেককে গভর্ণর করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন শূন্য আসনগুলোতে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে। বাঙালিরা আবার নির্বাচনের উৎসবমুখর পরিবেশে চলে গেছে। এসব ঘটনাপ্রবাহ ইন্দিরাকে ব্যাপকভাবে বিচলিত করে।

তাই তিনি পাকিস্তান ভেঙে দেওয়ার সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় সেজন্য কাজ করতে থাকেন।

---

৫১৩. বিদেশি বীর প্রতীককে নিয়ে আজ তথ্যচিত্র / প্রথম আলো / ৯ আগস্ট ২০১৬ / https://bit.ly/3v7g6f0

www.pathagar.com

ভারতীয় সামরিক বাহিনী পাকিস্তানে কর্মরত RAW এর এজেন্ট, মুক্তিযোদ্ধা ও সে দেশে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সার্বিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করে। সামগ্রিক পরিস্থিতি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার পর তারা এ যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা ভারতীয় সেনাপ্রধান মানেক'শ কে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বলেন। মানেক'শ রাজি হননি। কারণ যুদ্ধে জড়ানোর মতো উপযুক্ত কারণ তখনো তৈরি হয়নি। এছাড়া আমেরিকা যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার মতো সক্ষমতা ভারতের নেই।

এদিকে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি আদায়ে তাজউদ্দিন আহমেদ মুসলিম ছাড়া আর যত জাতি আছে সবার কাছে ধরনা দিয়েছে। ভারত, রাশিয়া আর ইংল্যান্ড তো সাথে আছেই পাকিস্তানের মিত্র হিসেবে পরিচিত আমেরিকা ও চীনের সাথেও যোগাযোগ চালিয়ে গেছে। চীন তাদের পুরোপুরি হতাশ করেছে আর আমেরিকা বরাবরের মতো আশা-নিরাশার দোলাচলে রেখেছে। শুধু তাই নয় তাজউদ্দিন মুসলিমদের সর্বোচ্চ দুশমন বলে পরিচিত ইহুদীদের কাছে সমর্থন আদায়ের জন্য গিয়েছেন। কারণ তিনি জানতেন ইহুদি-খ্রিস্টানরা ধর্ম বিবেচনায় হলেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যাবেন।

তাজউদ্দিন ইসরাইলের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব দেন আওয়ামীলীগের আব্দুস সামাদ আজাদকে। ইসরাইল প্রবাসী সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে কোনো সহায়তার অঙ্গিকার প্রকাশ করে। প্রবাসী সরকারের অনেক কর্মকর্তাই এটিকে ভালো চোখে দেখেনি। হয়তো ইহুদী হওয়ায় মুসলিম সত্ত্বাটি জেগে উঠেছে। সমাজতন্ত্রী ছাড়া যারা শুধু আওয়ামীলীগ তারা কেউই ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই প্রবাসী সরকারের সাথে ইসরাইলের সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়ে ওঠেনি।

তারপরও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ইসরাইলের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। ইসরাইল বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যারা ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালের ২জুলাই ইসরাইলি পার্লামেন্ট বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণের অভিযোগ এনে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনকি ইসরাইল রেডক্রস বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা,

www.pathagar.com

শরণার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঔষধ কাপড় ও খাবার ভারত সরকারের নিকট পাঠায়।[৫১৪]

সরাসরি যোগাযোগ না রাখলেও তাজউদ্দিন ও ইসরাইলের সাথে সম্পর্কের মধ্যস্থতা করেছেন ভারতের পূর্বাঞ্চলের ইহুদী কমান্ডার জ্যাকব। মূলত ভারত ১৯৭১ সালের যুদ্ধ করেছিল জ্যাকবের নেতৃত্বে। ইন্দিরা গান্ধী শুরু থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে বাংলাদেশকে আলাদা করার ব্যাপারে দৃঢ় ছিল। কিন্তু সেনাপ্রধান মানেক'শ এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে যুদ্ধ জড়াতে চাইছিল না।

পাকিস্তানের সাথে মার্কিনীদের সমাজতন্ত্রী বিরোধী সিয়াটো চুক্তি রয়েছে। তাতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে, কোনো সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র দ্বারা তারা পরস্পরের কেউ আক্রান্ত হলে উভয়েই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। সেই হিসেবে পাকিস্তান তাদের সমস্যাকে সমাজতন্ত্র সমস্যা হিসেবে বেশি আখ্যায়িত করেছে। এদিকে ভারতও রাশিয়াকে এই যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানাতে চায় না। কারণ রাশিয়ার অংশগ্রহণ যুদ্ধকে জটিল করবে এবং আমেরিকা রাশিয়াকে ঠেকাতে সব ধরনের চেষ্টা করবে।

মানেক'শ তাই সরাসরি যুদ্ধে না জড়িয়ে বাঙালিদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করানোর নীতি গ্রহণ করেছে। এদিকে ইহুদী জে এফ আর জ্যাকব ইন্দিরাকে আশ্বস্ত করেন আমেরিকাকে নিষ্ক্রিয় করার ও স্বল্পমেয়াদি যুদ্ধে পাকিস্তানকে হারাবার সকল পরিকল্পনা তার আছে। জ্যাকব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ে ইসরাইলকে ব্যবহার করেন। ইসরাইলও সর্বাত্মক সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল। সে সময় ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ছিল গোল্ডা মেয়ার। গোল্ডা মেয়ার দফায় দফায় পাকিস্তান ইস্যুতে মিটিং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে। তিনি আমেরিকাকে নিরপেক্ষ থাকতে রাজি করান।

পাকিস্তান যাতে ভেঙে যায় এই ব্যাপারে ইসরাইল আন্তরিক ছিল। গোল্ডা মেয়ার ভারতকে অস্ত্র সাহায্য পাঠায়। ইন্দিরা যাতে এই যুদ্ধে স্ট্রং থাকে সেজন্য অস্ত্র সাহায্য ও শরনার্থী সমস্যা মোকাবেলায় ভারতকে সাহায্য করে ইসরাইল। ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো ভারতের সাথে তখন ইসরাইলের কোনো কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া ৭১ সালে ইসরাইল অর্থনৈতিকভাবেও

---

৫১৪. বাংলাদেশের ইসরাইল নীতি কী হবে এখন? / আনিস আলমগীর / জাগো নিউজ / ২০ আগস্ট ২০২০ / https://bit.ly/30CcDqA / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

দুর্বল ছিল। তবুও গোল্ডা মেয়ার এসব সাহায্য পাঠিয়ে ভারতকে মুসলিম বিরোধী যুদ্ধে চাঙা রাখে এবং এর মাধ্যমে ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইন্দিরা সাহায্য গ্রহণ করলেও রাশিয়ার বিরাগভাজন হওয়ার আশংকায় সে সময় কূটনৈতিক সম্পর্কের ইসরাইলি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়।[৫১৫]

১৯৭১ সালের অক্টোবরের শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত সকল বাহিনী তথা মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, কাদেরিয়া বাহিনী ইত্যাদির কমান্ড ভারতীয় বাহিনী গ্রহণ করে এবং জেনারেল ওসমানীর বিরোধিতা সত্ত্বেও যৌথবাহিনী গঠন করে জ্যাকব। ভারতীয় বাহিনী সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। তাজউদ্দিন-ইন্দিরা চুক্তির দ্বিতীয় দফায় উল্লেখ ছিল যে, বাংলাদেশ ও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী মিলে একটি যৌথ কমান্ডের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী পরিচালিত হবে।

ভারতের সেনাপ্রধান উক্ত যৌথ কমান্ডের প্রধান হবেন এবং তার কমান্ড অনুসারে যুদ্ধে শামিল হওয়া বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সে অনুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল বাহিনী (সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, মুক্তিফৌজ, মুজিব বাহিনীসহ অন্যান্য আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী) কার্যতঃ ভারতীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী যাকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়, তাকে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা লে. জেনারেল আরোরার অধীনে কমান্ড গ্রহণ করতে হয়।

এদিকে জে এফ আর জ্যাকব তার পরিকল্পনা অনুসারে ও ইসরাইল থেকে পজেটিভ ইঙ্গিত পেয়ে সর্বাত্মক যুদ্ধে নেমে পড়ে। যুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়। দিল্লি কিংবা মানেক'শর জন্য অপেক্ষা করে না। আত্মসমর্পনের খসড়া প্রস্তাব তার নিজেরই লেখা। সে কীভাবে অল্প সময়ে কৌশলে ব্লাফ দিয়ে আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজীকে পরাজিত করেন তা কিংবদন্তি হয়ে আছে। এজন্য সে ব্লাফ মাস্টার খ্যাতি পায়।[৫১৬]

---

৫১৫. ভারত-ইসরাইল কীভাবে এত কাছে এলো? / সময় নিউজ / ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ / https://bit.ly/30vw4By / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

৫১৬. ভারত-ইসরাইল কীভাবে এত কাছে এলো? / সময় নিউজ / ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ / https://bit.ly/30vw4By / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয় চারটি অঞ্চল থেকে

১. পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে তিন ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ৪র্থ কোর সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী অভিমুখে

২. উত্তরাঞ্চল থেকে দু'ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ৩৩তম কোর রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া অভিমুখে

৩. পশ্চিমাঞ্চল থেকে দু'ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত ২য় কোর যশোর কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর অভিমুখে এবং

৪. মেঘালয় রাজ্যের তুরা থেকে ডিভিশনের চাইতে ছোট একটি বাহিনী জামালপুর ও ময়মনসিংহ অভিমুখে

এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভারতের বিমান ও নৌশক্তি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচ্ছন্ন কিন্তু সদা তৎপর সহযোগিতা

এসব মিলে বাংলাদেশকে ডিসেম্বরের এক তারিখ থেকে ঘিরে ফেলে ভারত। [৫১৭][৫১৮]

২ডিসেম্বর ভারত সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে খুলনার কিছু অংশ দখল করে। এর প্রতিবাদে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩ডিসেম্বর দুই দেশ পাল্টাপাল্টি বোমা হামলা করে ও সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের কয়েকদিনের মধ্যেই পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ রণে ভঙ্গ দেয়। পূর্ব-পাকিস্তান কমান্ডার নিয়াজী কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। ইস্টার্ন রিফাইনারিতে হামলা করে ভারত জ্বালানী তেলের মজুদ ধ্বংস করে দেয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী আকাশ থেকে লিফলেট ফেলে ঢাকাকে আত্মসমর্পনের জন্য নির্দেশ দিতে থাকে। এদিকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন নিয়াজীকে জ্যাকব ব্লাফ জানান দেয় যে, সেনাবাহিনী একটা অংশ ও অবাঙালিরা তার কাছে জিম্মি হয়ে আছে।

১৩ তারিখ গভর্নর হাউসে (বঙ্গভবনে) বোমা হামলা করে ভারত। সাহস হারিয়ে ডা. মালেক পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি ও তার সরকারের কিছু মন্ত্রী Hotel Intercontinental (বর্তমান রূপসী বাংলা) এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটি আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত নিরপেক্ষ স্থান ছিল। মূলত ১৩ তারিখ থেকেই

---

[৫১৭] মূলধারা ৭১ / মঈদুল হাসান / ইউপিএল / পৃ. ১৬২

[৫১৮] বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৫০

www.pathagar.com

নিয়াজির বাঁধ ভেঙে যায়। সে হতাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া চারদিক থেকে ধীরে ধীরে ঢাকার দিকে এগোতে থাকে ভারতীয় বাহিনী। ১৩ডিসেম্বর নিয়াজী জ্যাকবের কাছে আত্মসমর্পন করার সিদ্ধান্ত জানান। এরপর পাকিস্তান বাহিনী যারা সারাদেশে যুদ্ধ করছিল, তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেয় ও পিছু হটে ঢাকার দিকে আসতে থাকে।[৫১৯]

১৬ তারিখ আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানের ডেট নির্ধারিত আয়োজন হয়। ভারতীয় জেনারেলরা আত্মসমর্পনের ব্যাপারে ওসমানীকে অন্ধকারে রাখে। নিয়াজীও চেয়েছিল মুক্তিবাহিনীর কাছে নয় বরং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করতে। কারণ মুক্তিবাহিনীর কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ নয়। তারা বন্দীদের সাথে নৃশংস আচরণ করতে পারে যা ভারতীয় সেনাবাহিনী করবে না। ১৬ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মাত্র ১৩ দিনের যুদ্ধে পরাস্ত হয় পাকিস্তান।

২২ডিসেম্বর একটি ভারতীয় বিমানে করে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিসহ মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণ ঢাকা আসেন। কি কারণে প্রবাসী মন্ত্রীসভা ছয়দিন পর প্রত্যাবর্তন করে তা পরিষ্কার নয়। এ সময়ে ভারতীয় বাহিনী সকল সেনানিবাস ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার (KPI) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ভান্ডারের অধিকাংশ ভারতে স্থানান্তরের সুযোগ পায়। এ সময়ই ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজের বিরোধিতা করায় সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলকে গ্রেফতার করে ভারত।

১৯৭১ সালের হত্যাযজ্ঞ, ধর্ষণ ও সত্যাসত্য প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে ৫২ বছরে এই পর্যন্ত ৭১ এর হত্যাযজ্ঞ নিয়ে ভালো কোনো তালিকা বা রেকর্ড তৈরি করেনি এদেশের কোনো সরকার। বরং পারলে বাধা দিয়েছে। মুজিব সরকার কমিটি গঠন করে পরে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে যারাই ব্যক্তিগতভাবে এই কাজের সাথে জড়িত হয়েছেন তারা খুন হয়েছেন। এই ধারাবাহিক খুনের সর্বশেষ শিকার জাতীয় ভার্সিটির ভিসি আফতাব

[৫১৯] বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৭১: আত্মসমর্পণের আগে পাকিস্তানী সেনাদের সেই মুহূর্তগুলো / আকবর হোসেন / বিবিসি বাংলা / ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ / https://bbc.in/3teKPVR / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

আহমাদ। তাই আজ পর্যন্ত সুষ্ঠু কোনো শুমারি হয়নি যে, কতজন মানুষ ১৯৭১ এ খুন হয়েছেন।

২০১০ সালে সংসদে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম বলেন, 'স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে তা গণনার কোনো পরিকল্পনা এ সরকারের নেই'।[৫২০] বিদেশের অনেক ব্যক্তি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্য দিলেও দেশের সব সরকার ছিল বরাবরের মতই নির্বিকার। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৯৭২ সালের ১০জানুয়ারী ভারতের পালাম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে; আজোবধি ৩ (তিন) মিলিয়ন তথা ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছে এ সংখ্যাই প্রচলিত আছে। শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে বের হয়ে দেশে না আসতেই কোনো তদন্ত ছাড়াই কেন এমন বললেন এই বিষয়ে বিবিসি সাংবাদিক সিরাজুর রহমান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বাংলাদেশে ফেরত আসার সময় মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন কেমন মানুষ মারা গেলো যুদ্ধে? তখন সিরাজুর রহমান তাকে জানিয়েছেন আমরা আশংকা করছি প্রায় তিন লক্ষ মারা গেছে। এরপর সাংবাদিকদের তিনি থ্রি মিলিয়ন বলেছেন। বিবিসি বংলার সাংবাদিক সিরাজুর রহমান বলেছেন সেই সময়ের উত্তেজনা ও উদ্ভ্রান্ত মুহূর্তে শেখ মুজিব তিন লক্ষকে ভুলে থ্রি মিলিয়ন বলে ফেলেছেন।[৫২১]

বাংলাদেশে সেই সময় মুজিবকে তার অনুসারীরা প্রফেটিক মর্যাদা দিয়েছে। মুজিব বলেছে অতএব তাই ঠিক! এমন অবস্থা আজো চলমান। এ ব্যাপারে ১৫.০৬. ১৯৯৩ তারিখে সংসদে আলোচনায় কর্ণেল আকবর হোসেন বলেন যে, আওয়ামীলীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩ (তিন) মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছে উল্লেখ করে যা মূলতঃ প্রকৃত সংখ্যার ১০ (দশ) গুণ। তখন আওয়ামীলীগের আবদুস সামাদ আজাদ বলেন যে, জিয়াউর রহমানসহ কেউ এ সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করেননি; আমাদের নেতা শেখ মুজিব যেহেতু সংখ্যাটি বলেছেন ধরে নিতে হবে এটিই সঠিক।[৫২২]

---

৫২০. ৪৫৭ - বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬১

৫২১. তিন লক্ষকে তিন মিলিয়ন বানিয়ে ফেলার ইতিহাস / সিরাজুর রহমান / https://youtu.be/d4LyBXGorR0

৫২২. ৪৫৭ - বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬১

www.pathagar.com

বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে এই সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার, শর্মিলা বসু বলেন এ যুদ্ধে প্রায় ৩৬ হাজার নিহত হয়েছেন, কল্যাণ চৌধুরীর মতে ১২, ৪৭, ০০০ জন এবং British Medical Journal এ প্রকাশিত "Fifty Years of Violent War Deaths from Vietnam to Bosnia: Analysis of Data from World Health Survey Programme" বলা হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ২, ৬৯, ০০০ (দু' লক্ষ ঊনসত্তর হাজার) জন মানুষ মারা গিয়েছে। এভাবে নানান বর্ণনা পাওয়া যায়।[৫২৩]

বাঙালি লেখকরা প্রায় সবাই মুজিবের কথাকে চূড়ান্ত ধরে নিয়ে নিহতের সংখ্যা তিরিশ লাখ উল্লেখ করেছেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ টিভি ভাষণে বলেন, "দশ লক্ষাধিক মানুষের আত্মাহুতির মাঝ দিয়ে আমরা হানাদার পশুশক্তির হাত থেকে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বিধৌত বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ঢাকার বুকে সোনালী রক্তিমবলয় খচিত পতাকা উত্তোলন করেছি।

শর্মিলা বসু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মারা গিয়েছে সে হিসেব দিতে গিয়ে শাঁখারীবাজারের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে" In Shakharipara an estimated 8, 000 men, women and children were killed when the army, having blocked both ends of winding street, hunting them down house by house. The description is entirely false. Survivors of the attack on Shakharipara on March 26 testify that about 14 men and one child (carried by his father) were killed inside a single house that day."[৫২৪]

বস্তুত ১৯৭১ সালের ১ থেকে ২৫মার্চ আওয়ামী ও নিউক্লিয়াসের সন্ত্রাসীদের চালানো বর্বরতার একটি গোপন ঘাঁটি ছিল সেই বাড়িটি। যেখানে সন্ত্রাসীরা একত্রিত হতো এবং এখানে অস্ত্র ও বোমা বানানো হতো। সেনাবাহিনীর অভিযানের সময় তারা সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে মারা যায়। এই সংখ্যা ১৫। কিন্তু ইতিহাস বিকৃতকারীরা সংখ্যা দেখিয়েছে ৮০০০। শাঁখারিবাজারে সব বাড়িতে গণহারে অভিযান চালানো হয়নি, শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে

---

৫২৩. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬২

৫২৪. Anatomy of Violence Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971 / Sarmila Bose

www.pathagar.com

একটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। যেভাবে ঢাবির সব হলে অভিযান চালানো হয়নি। শুধুমাত্র দু'টি হলে অভিযান চালানো হয়েছে।

শর্মিলা বসু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন গবেষক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইস্যুতে তিনি একজন নিরপেক্ষ গবেষক বলে বিবেচিত। তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা ও গণহত্যা প্রমাণ করতে এসে প্রচলিত ইতিহাসের সাথে সত্যের ব্যাপক বিরোধ দেখতে পান। যা তিনি তার গবেষণায় উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ২৯জানুয়ারী ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব পুলিশ আব্দুর রহিমকে প্রধান করে মুক্তিযুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। অত:পর ৩০এপ্রিলের মধ্য হতাহতের সংখ্যা, ক্ষয়-ক্ষতিসহ এর সাথে জড়িত অপরাধীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে কমিটিকে পরে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত এই আব্দুর রহিমকে প্রধান করেই রেজাকার বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে শেখ মুজিব সরকার প্রধান রেজাকার কমান্ডার আব্দুর রহিমকে সচিব পদে উন্নীত করেন।[৫২৫]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা আমাদেরকে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সহায়তা করবে, তা হলো, ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব সরকার শহীদ পরিবারকে প্রতিজন শহীদের বিপরীতে ২, ০০০ (দু'হাজার) করে অনুদান দেওয়ার ঘোষণা দেন। সারাদেশ থেকে প্রায় ৭২, ০০০ হাজার আবেদন জমা পড়ে। যাচাই বাছাই করে দেখা যায় এর মধ্যে প্রায় ২২ হাজার হলো স্বাধীনতা বিরোধী, যারা মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হন। পরবর্তীতে রেজাকারদের নাম বাদ দিয়ে করে মোটামুটি ৫০, ০০০ হাজার নিহত ব্যক্তির জন্য তাদের পরিবারকে ২, ০০০ (দু'হাজার) করে অনুদান দেওয়া হয়। এই তথ্যকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ষ্ট্রাট্রেজিক স্ট্যাডিজের ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসের জার্নালে বলা হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের মেয়াদ ছিল ৮ মাস ৩ দিন । এ যুদ্ধে নিহত হয় ৫০ হাজার মানুষ।[৫২৬]

উপরে হত্যাকান্ড বা নিহতের যে হিসেব দেওয়া হয়েছে তা শুধু পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, এর সহযোগী বাহিনী বা দালাল কর্তৃক বাঙালি হত্যার

---

৫২৫. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬৩

৫২৬. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬৩

www.pathagar.com

সংখ্যা। এভাবে বিষয়টি একপেশে প্রচারণার শিকার। মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী বাঙালি, বিহারী ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি নিহত হওয়ার বিষয়টি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি যুদ্ধে পাকিস্তান ও ভারতের সামরিক বাহিনীর সদস্য নিহত হওয়ার বিষয়টিও আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। যুদ্ধে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রায় ৪, ৫০০ সদস্য নিহত ও প্রায় ৮, ০০০ হাজার জন আহত হয়েছেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ১, ৪২১ সদস্য নিহত ও ৪, ০৫৮ জন আহত হয়েছে।

কোনো যুদ্ধেই শুধু একপক্ষের মানুষ মারা যায় না, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল পক্ষের মানুষই মারা যায়। যুদ্ধোত্তরকালে কোন পক্ষের কত জন নিহত বা আহত হয়েছে তার হিসেব বের করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু রাষ্ট্র সে দায়িত্ব পালন করেনি বা করতে পারেনি। বাংলাদেশে কত মানুষ মারা গেছে তা নিয়েই কেবল আলোচনা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন, তার সংখ্যা নিয়ে তেমন আলোচনা নেই। কারণ এ সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হলে যুদ্ধকালে ত্রিশ লাখ মানুষ মারা যাবার তথ্যটি সকলের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়বে। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোট ৬, ৬২৯ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হচ্ছে ১, ৫১১ জন। ৬, ৬২৯ জনের মধ্যে সেনাবাহিনীর সংখ্যা ১, ৫৪৪, নৌবাহিনীর সংখ্যা ২১, বিমানবাহিনীর সংখ্যা ৪৭, ইপিআরের সংখ্যা ৮১৭, পুলিশ ১, ২৬২ আর বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা ২, ৯৩৮ জন নিহত হয়েছে।[৫২৭]

হত্যার সংখ্যা নিয়ে যেমন অসততার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, ধর্ষণের সংখ্যা নিয়েও তেমনই অসত্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম, তখন এই সংখ্যা জরিপ ছাড়াই ছিল দুই লক্ষ। ইতোমধ্যে এক যুগ পরে সেই সংখ্যা আর এক লক্ষ বেড়ে গিয়েছে। এখন বলা হয়, তিন লক্ষ মা-বোনকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই যে প্রচারণা চলছে তারও কোনো জরিপ করা হয়নি।

শর্মিলা বসু বলেন "60000 Pakistan Army to kill three million and rape three hundred thousand women, each and everyone of them had to kill 50 persons and rape 5 women."

---

[৫২৭] বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬৫

www.pathagar.com

(পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল ৬০, ০০০ হাজার; তারা যদি ত্রিশ লক্ষ মানুষ মেরে থাকে ও তিন লক্ষ মহিলাকে ধর্ষণ করে থাকে , তা হলে প্রতিজন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্য গড়ে ৫০ জন মানুষ মেরেছে ও ৫ জন করে মহিলাকে ধর্ষণ করেছে)।

বাংলাদেশে একাত্তরে যত নারী-ধর্ষণ হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়েছে সত্যকে ধর্ষণ। গবেষক শর্মিলা বসু তেমনটাই মনে করেন। নারী ধর্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার পর তার মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে, বাংলাদেশে একাত্তরে নারী-ধর্ষণ হয়তো হয়েছে ঠিকই, তবে বিপুল সংখ্যক অবাঙালি মহিলাও বাঙালিদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে তার কোনো উল্লেখই নেই। ১৯৭১ সালের ধর্ষণ নিয়ে শর্মিলা বসু তার নিজের গবেষণায় যে উপসংহারটি টেনেছেন তা হলো, "একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আমি দেখলাম, বাংলাদেশি অংশগ্রহণকারীগণ এবং যারা ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, তারা যুদ্ধের বর্ণনা দিলো, গুলি করে হত্যার বর্ণনাও দিলো। কিন্তু তারা আমাকে এ কথাও বললো, "আর্মি মহিলাদের কোনো ক্ষতি করেনি। তবে যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রস ফায়ারে পড়ে যায় তবে অন্য কথা। একাত্তরে ধর্ষণের যে বিশাল সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল সে প্রেক্ষিতে এটি আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। আমার কেস স্টাডিজে আমি একটি মাত্র ঘটনারও প্রমাণ পেলাম না।[৫২৮]

শর্মিলা বসু আরো লিখেছেন, "*একাত্তরের যুদ্ধের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম ২ লাখ থেকে ৪ লাখ ধর্ষিতার যে সংখ্যা বাংলাদেশে বলা হয় তার হিসেব নিকাশের কোনো ভিত্তি নেই। এটি অবশ্যই অপ্রত্যাশিত নয় যে ভূক্তভোগীদের সংখ্যার একটি অনুমান (estimate) করা হবে। তবে প্রতিটি অনুমানের মূলেও মাঠ পর্যায়ের কিছু সাক্ষী প্রমাণ থাকতে হয় যার ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যান বের করা যায় । কিন্তু বাংলাদেশে একাত্তরে তেমন কিছুই ছিল না। এ ব্যাপারে কোনো সরকারি পরিসংখ্যানও নাই। পরিসংখ্যানের একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হতে পারতো মাঠপর্যায়ের তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ক্ষতিপূরণ থেকে। কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি।*"[৫২৯]

---

৫২৮. Anatomy of Violence Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971 / Sarmila Bose

৫২৯. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬৭-১৬৮

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ষণের প্রমাণরূপে খাড়া করা হয়েছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীকে। শাহরিয়ার কবির তার সম্পাদিত "একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি" বইতে তার জবানবন্দীকে দলিলরূপে পেশ করেছেন। শর্মিলা বসু এই ঘটনা কেস স্টাডি হিসেবে নিয়ে কাজ করেছেন। এই বিষয়ে শর্মিলার মন্তব্য হলো, ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত মহিলা এবং পেশায় ভাস্কর। তার কাজের স্থান ছিল খুলনার এক জুটমিলের অফিসে। ফেরদৌসীর অভিযোগ তাকে প্রথমে তার আগাখানী জেনারেল ম্যানেজার ধর্ষণ করে। তারপর সে ১৫ জন পাকিস্তানি সামরিক অফিসারের নাম নেয় যাদের অবস্থান ছিল যশোর ও খুলনায়। তাদের মধ্য থেকে একমাত্র দুইজন বাদে সবার বিরুদ্ধে হয় ধর্ষণ অথবা ধর্ষণের চেষ্টা বা অন্য প্রকার যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে যা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে।

তার নিজের ভাষ্য মতে সে একজন তালাকপ্রাপ্তা তিন সন্তানের মা। তার সন্তানেরা খুলনায় ফেরদৌসীর নানীর কাছে থাকতো আর নিজের মা এবং ৭ জন ভাই-বোন নিয়ে সে খালিশপুরে থাকতো। যেখানে সে জুটমিলে কাজ করতো। আহসান উল্লাহ আহমেদ নামে ফেরদৌসীর একজন পুরুষ বন্ধু ছিল এবং সে ছিল পার্শ্ববর্তী আরেকটি জুটমিলের লেবার অফিসার। মিলিটারি এ্যাকশনের পর আহসান উল্লাহ তার নিজের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলে। ফেরদৌসীর মা এবং তার ভাই-বোনেরাও শহরে চলে যায়। তখন ফেরদৌসী একা থেকে যায় তবে মাঝে মধ্যে তার কোনো ভাই বা বোন বেড়াতে আসতো। তখন তার পুরুষ প্রেমিকটি পাশেই কাজ করতো।

ফেরদৌসীর যুক্তি হলো, সে ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি, তাই তাকে খালিশপুরে থাকতে হয়েছিল। তার মতে যেদিন সে প্রথম ধর্ষণের শিকার হয়, সেদিন সে তার ম্যানেজারের সাথে দুপুরের খানা খেতে গিয়েছিল, কাজ শেষে সে তার সাথে তার এপার্টমেন্টেও গিয়েছিল এবং সেখানেই সে ধর্ষণের শিকার হয়। পরের দিন সে আবার কাজে গিয়েছিল। এখানে প্রশ্ন হলো, যে ধর্ষণ নিয়ে একাত্তরের পর সে এতবড় জবানবন্দী পেশ করলো এবং ইতিহাসের বইয়ে প্রকাণ্ড ও একমাত্র সাক্ষীতে পরিণত হলো, অথচ যেদিন সে ধর্ষিতা হলো, সেদিন তার নিজের আচরণটি কেমন ছিল? সে যখন ধর্ষিতা হওয়ার মুখে তখনও সে বাধা দেয়নি। প্রতিবাদও করেনি। ধাক্কাধাক্কি করে সে ধর্ষণ থেকে বাঁচার বা

www.pathagar.com

পলায়নেরও চেষ্টা করেনি। যেখানে ধর্ষণকারি হলো স্বয়ং ম্যানেজার, সে স্থান কোনো অবস্থাতেই তার জন্য নিরাপদ ছিল না। অথচ সে বিপদজনক স্থান থেকে সেদিন বা পরের দিন পলায়নও করেনি। পরবর্তী নয় মাসেও সে পলায়নের চেষ্টা করেনি। বরং পরের দিন আবার সে অফিসেই কাজে গেছে। অথচ কোনো অবস্থাতেই এ বিশ্বাস করা যাবে না যে ফেরদৌসী বন্দী ছিল। নিরাপদ স্থানে সে চলে যেতে পারতো। কিন্তু সে যায়নি।[৫৩০]

ধর্ষণের ইতিহাস কীভাবে বিকৃতি করা হয়েছে তার একটি নমুনা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী আর জেয়াদ আল মালুমের কথোপকথন থেকেই অনুমান করা যায়। "জেয়াদ আল মালুম বলেন, আমাদের আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যের জায়গাটা হলো, সাধারণ ফৌজদারী সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য যে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের বিষয় থাকে, আমাদের ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন, আমাদের আইনে শুধুমাত্র ব্যক্তি সাক্ষী তাই নয়, এমনও হতে পারে, রায়ের বাজার বধ্যভূমি, এটাতো নিজেই একটা সাক্ষী। টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের একটা অঞ্চলে রেপের ঘটনা রয়েছে। ছাব্বিশাতে বহু রেপ ভিকটিম আছে।

এ সময় কাদের সিদ্দিকী প্রবল আপত্তি তুলে ধরে বলেন, এখানে আমার আপত্তি আছে। ইতিহাস বিকৃত করা অত্যন্ত অন্যায়। ছাব্বিশাতে একটি রেপও হয়নি। ছাব্বিশা মুক্তিযুদ্ধে আমার নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিল। ছাব্বিশা গ্রামটি সমস্ত পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিল। তাই আমি বলবো, বিভ্রান্ত করা ভালো কাজ না। এটা বিরক্তিকর। জেয়াদ আল মালুম বলেন, আমি বিভ্রান্ত করছি না। আমাদের কাছে সে ধরনের তথ্য-উপাত্ত আছে। কাদের সিদ্দিকী এ পর্যায়ে বলেন, তথ্য যদি ওই রকম বিভ্রান্তিকর হয় তাহলে তো হবেই। যুদ্ধ করলাম আমি। ছাব্বিশা গ্রামে এক দিনে ৩৬ জন রেপ, যে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা হলো, তখন কেউ রেপ করে?"[৫৩১][৫৩২]

এখানে যদি জেয়াদ আল মালুম সত্য হয়ে থাকেন তবে ছাব্বিশাতে রেপের ঘটনা কাদেরিয়া বাহিনীর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। যা এখন জেয়াদ আল মালুম সেনাবাহিনীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আর যদি কাদের সিদ্দিকী সত্য হয়ে

---

৫৩০. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬৭-১৬৮

৫৩১. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৬৯

৫৩২. RTV টক শো / ৬ অক্টোবর ২০১১ / https://bit.ly/30BlfxL

www.pathagar.com

থাকেন, তবে সেখানে কোনো রেপের ঘটনা ঘটেনি। জেয়াদ আল মালুম মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। এখানে জেয়াদ আল মালুম দুই ক্ষেত্রেই মিথ্যেবাদী। কারণ ছাব্বিশাতে একদিন মাত্র অভিযান চালিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয় সেনাবাহিনী। তাই সেনাবাহিনী দ্বারা রেপের ঘটনা অবাস্তব।

আর বধ্যভূমির কথা যা বলা হয়েছে তার দিকে যদি আমরা নজর দেই, তাহলে দেখতে সবগুলো বধ্যভূমি ছিল ভারত থেকে আসা বিহারের মজলুম মুহাজিরদের আবাসস্থলে বা তার কাছাকাছি। বলা যায় এপ্রিল ও মার্চে বিহারীদের ওপর ঘটে যাওয়া নির্মম ও নির্বিচার হত্যাযজ্ঞই বধ্যভূমির কারণ। যেগুলো এখন বাঙালি হত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আইসিটি ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জেয়াদ আল মালুমরা এভাবেই তথ্য বিকৃতি করে গেছেন পুরোটা সময় জুড়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামীলীগের কোনো নেতা মারা গেছেন অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজনরা মারা গিয়েছেন এমনটা শুনা যায়নি। শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার বলেন "আওয়ামীলীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি।"[৫৩৩] অথচ এর বিপরীতে পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাসী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে মুক্তিযোদ্ধারা তার বাড়িতেই হত্যা করে। পূর্ব পাকিস্তানে শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের আহবায়ক মৌলবী ফরিদ আহম্মেদকে গুম করা হয়। মুসলিমলীগ নেতা আজিজুল হক চৌধুরী, আব্দুল জব্বার আমীন ও সোলায়মান পাইকারকে হত্যা করে মুক্তিযোদ্ধারা। সাবেক মন্ত্রী জহুরুল হক (লাল মিয়া), সিলেট পিডিপি সভাপতি জসিমউদ্দিন, প্রাক্তন এমএনএ আবদুল হামিদ, মুসলিমলীগ নেতা সিরাজুল হক, বগুড়ার খোরশেদ আলমসহ শত শত স্বাধীনতা বিরোধী নেতা কর্মীকে যুদ্ধ কালেই হত্যা করা হয়। অথচ তারা বেসামরিক নাগরিক ছিলেন। তারা কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ন হননি।[৫৩৪]

এদেশে প্রকাশ্যে গণহত্যা শুরু হয় ১৬ডিসেম্বরের পর থেকে। যেসব বাঙালি নেতা স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেননি তাদের বিরুদ্ধে নির্বিচার হত্যা চলতে থাকে। এই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন কাদের সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনী ও নিউক্লিয়াসের সদস্যদের দিয়ে গঠিত ভারতীয় জেনারেল ওবানের বিশেষ বাহিনী

---

৫৩৩. একাত্তরের ঘাতক দালাল কে কোথায়? / মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র / পৃ. ২৩

৫৩৪. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৭০

www.pathagar.com

'মুজিব বাহিনী'। বহু মসজিদ ও মাদরাসা বিশেষত কওমী মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায় সেদিন থেকে। এই হত্যাযজ্ঞ ও গণহত্যা এতই মর্মান্তিক ছিল যে, ঢাকার অনেক কওমী মাদরাসা চালু হতে প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে।

১৯৭০ সলের নির্বাচনের পরপরই বিহারীরা নির্যাতিত হতে শুরু করে। ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত বিহারীরা দলবদ্ধভাবে থাকা শুরু করে। তারপরও তারা নিজেদেরকে বা পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করতে পারেননি। স্কুল-কলেজ ও কর্মস্থলে যাতায়াতকালে তাদের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য স্থানে ৭১ সালের ১মার্চ হতেই বিহারী ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ওপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ড ঘটায় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ও নিউক্লিয়াস। ১৯৭১ সালের ঘটনার ওপর পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে এসব ঘটনায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ উল্লেখ করা হয়।

এতোক্ষণের আলোচিত বিষয়গুলি হতে বুঝা যায়, যা বিভিন্ন সোর্স থেকে যুদ্ধের হতাহত উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা অত্যন্ত বিপদজনক। তাই বিভিন্ন সোর্স থেকে সত্যের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছি। পর্যালোচনা থেকে আরেকটি বিষয় আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই যা দ্বারা আপনারা অনুমান করতে পারবেন কী পরিমাণ হত্যাকাণ্ড হয়েছে!

স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার বিপক্ষের মানুষদের বিচার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে শেখ মুজিব সরকার। যেহেতু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বন্দী সদস্য ও তাদের পরিবার ভারতের জিম্মায়, তাই তাদের বিচার ইচ্ছেমত করার সুযোগ ছিল না। তাদের বিচার হবে আন্তর্জাতিক আইনে যুদ্ধাপরাধ মামলায়। আর যারা ছিলেন বাঙালি কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী। তাদের বিচার করার জন্যে মুজিব সরকার দালাল আইনের ব্যবস্থা করেছিল।

সে সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সব বাহিনী মিলে আত্মসমর্পন করেছে ৬০, ০০০ হাজার সেনা ও কর্মকর্তা। ৯৩, ০০০ হাজার বলে যে সংখ্যা আমরা শুনতে পাই তা হলো সেনাবাহিনীর পরিবার পরিজন ও পশ্চিম পাকিস্তানি সাধারণ জনগণসহ। বাংলাদেশ সরকার যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনে তখন স্পেসেফিক নাম দেওয়ার প্রয়োজন

www.pathagar.com

হয়। প্রথমে পাক সেনাবাহিনীর ৫, ০০০ হাজারেরও বেশি সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়। যুদ্ধাপরাধ মানে বেসামরিক মানুষ হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণ। এরপর যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশ সরকার এই তালিকা আরো ছোট করে প্রায় ১, ২০০ জনের তালিকা প্রস্তুত করে। এরপর যখন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করার প্রয়োজন হয়, তখন বাংলাদেশ সরকার মাত্র ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে সক্ষম হন। এই ১৯৫ জনকে বিচারের আওতায় আনার কথা ছিল। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ ত্রিদেশীয় 'শিমলা চুক্তি'র মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫৩৫]

এই ১৯৫ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই হত্যার নির্দেশের জন্য অভিযুক্ত অর্থাৎ তারা যুদ্ধ করেননি বা সরাসরি অভিযানে যাননি। তাহলে কারা তিরিশ লক্ষ মানুষকে হত্যা করলো? অথবা কারা লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করলো? ১০০ জনের কম মানুষ কীভাবে লাখ লাখ মানুষকে খুন করলো? এবার আসুন ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে কথা বলা যাক। ১৯৫ জনের মধ্যে মাত্র ১৩ জনের বিরুদ্ধে মহিলাদের উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আসলো! তাহলে কী এই ১৩ জনই ৩ লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করলো! আবার খেয়াল করুন এই ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে মাত্র, প্রমাণিত নয়। যদি অভিযোগ সত্যও প্রমাণিত হয়, তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনা অনধিক ২০। এখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে, কোনো স্থানে ধর্ষণ হয়েছে কিন্তু শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কারণ পাকিস্তান বাহিনীর সব সদস্যকেই বাঙালি সৈনিকরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তারা চিনতো। একই ক্যান্টনমেন্টেই তারা থাকতো।

তাহলে এবার বলা যেতে পারে পাকিস্তানিরা নয়, বাঙালিদের মেরেছে ও ধর্ষণ করেছে রেজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালিরা। সেই চিত্রটাও আমরা একটু দেখে নিতে পারি। এ দেশীয় জনগণ যারা স্বাধীনতার বিরোধীতা করেছিল তাদের বিচারের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪জানুয়ারী দালাল আইন প্রণয়নের পর ৬ফেব্রুয়ারী, ১জুন ও ২৯আগস্ট তিন দফা সংশোধনীর পর আইনটি চূড়ান্ত হয়।[৫৩৬]

---

৫৩৫. সিমলা চুক্তি / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/3cruw1b / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

৫৩৬. দালাল আইন, ১৯৭২ / বাংলাপিডিয়া / https://bit.ly/38vBcKa / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

এ আইনের অধীনে প্রায় এক লাখ লোককে আটক করা হয়। এদের মধ্য থেকে অভিযোগ আনা সম্ভব হয় ৩৭, ৪৭১ জনের বিরুদ্ধে। বাকীদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকায় ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযুক্ত ৩৭, ৪৭১ জনের মধ্য থেকে দালালী বা অপরাধের কোনো প্রকার প্রমাণ না পাওয়ায় ৩৪, ৬২৩ জনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করাই সম্ভব হয়নি। সারাদেশে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে ২২ মাসে বাকি ২, ৮৪৮ জনকে বিচারের আওতায় আনা হয়।

১৯৭৩ সালের ৩০নভেম্বর দালাল আইনে আটক যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধীদের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর থেকে প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় হয়, 'যারা বর্ণিত আদেশের নিচের বর্ণিত ধারাসমূহে শাস্তিযোগ্য অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অথবা যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তারা কোনোভাবেই ক্ষমার যোগ্য নন।'[৫৩৭]

যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয়েছে, তাদের বিচার হয়। তাদের মধ্যে বিচারে মাত্র ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। বাকী ২, ০৯৬ জন বেকসুর খালাস পায়। যে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও গুরুদন্ড দেওয়ার মতো ছিল না। একজনের বিরুদ্ধেও ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। শুধুমাত্র চিকন আলী নামের একজনকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। তাহলে সেই আবার আগের প্রশ্ন এত হত্যা কে করলো? এত ধর্ষণ কে করলো?

প্রাসঙ্গিকভাবে বলে রাখি ২০১০ সাল থেকে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের মামলা হয়েছে, যারা অভিযুক্ত হয়েছে ও যাদের দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং হচ্ছে তাদের কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ তো দূরের কথা দালাল আইনেও মামলা করা হয়নি। তারা প্রকাশ্যে তাদের বাড়িতে, কর্মস্থলে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেছেন। এটা বানোয়াট এবং প্রতিহিংসামূলক বিচার তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালের অপরাধীদের মধ্যে অবাঙালি হলেন ১৯৫ জন। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু বিচার হয়নি।

---

৫৩৭. দালাল আইন বাতিলের দাবী জানিয়েছিল জাসদ, আলটিমেটাম দিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী / মানব জমিন / ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২০/ https://bit.ly/3bApL5Y / অ্যাকসেস ইন ১১ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

আর বাঙালি অপরাধী হলেন ৭৫২ জন। এই ৭৫২ জনের ১ জন বাদে কেউই হত্যা, গণহত্যা ও ধর্ষণের অপরাধ করেননি বলে বাংলাদেশের আদালত ঘোষণা দিয়েছেন।

যদি সত্যিই অনেক ধর্ষণ হয়ে থাকে অথবা কিছু ধর্ষণের ঘটনাও ঘটে থাকে তবে এর দায় যুদ্ধের জয়ী পক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর। আর যদি তা না হয়ে থাকে তবে পুরো বিষয়টাই বানোয়াট ও মিথ্যা।

মেজর জিয়াউর রহমান ও গণহত্যা প্রসঙ্গ

১৯৭১ সালে মার্চের শুরু থেকেই ঢাকার চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করেছে চট্টগ্রামে। এর কারণ চট্টগ্রামে ছোট বড় প্রচুর কারখানা। আর এসব কারখানায় কাজ করে হাজার হাজার ভারত থেকে আসা অবাঙালি। আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা দেশে একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য এসব বিহারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ৪মার্চ থেকে শুরু হয় লীগ কর্তৃক অবাঙালি গণহত্যা এবং সেটা কন্টিনিউ করে।

সেনাবাহিনীকে কোথাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত না হওয়ায় তারা ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল না। জিয়া চট্টগ্রামের উপঅধিনায়ক হলেও তার সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা, নিউক্লিয়াসদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়। এজন্য তিনি ঢাকার খবর, বিদ্রোহের নির্দেশনার জন্য ক্যাপ্টেন অলি, ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও আওয়ামীলীগের নেতা কর্মীদের ওপর নির্ভর করেছিলেন।[৫৩৮]

চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেওয়ার আগে মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের কাছে পরিস্থিতি ও নির্দেশনা কিছু জানলে তাকে জানাতে বলেছেন।[৫৩৯]

ঘটনার দিন অর্থাৎ ২৫মার্চ সকাল থেকে আব্দুর রশিদ জানজুয়ার নির্দেশে মেজর মীর শওকত আলী এক কোম্পানী সেনা নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের কাজে নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত ছিলেন।

৫৩৮. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা/ মহিউদ্দিন আহমদ / পৃষ্ঠা ৮৩

৫৩৯. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা/ মহিউদ্দিন আহমদ / পৃষ্ঠা ৭৯

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার আনসারিও সেখানে ছিলেন। সন্ধ্যার পর রশিদ জানজুয়া ও শওকত শহরে রেজিমেন্টের ইউনিট লাইনে ফিরে আসেন। এই পুরো ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানের বর্ণনায়। সেদিনের বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিও একজন।

"জানজুয়া আমাকে ডাকলেন। বললেন, 'খালেক, ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য পোর্ট টু টেক ওভার কমান্ড অব দ্য এরিয়া।' এমন সময় মেজর জিয়া সেখানে উপস্থিত হন। জিয়াকে দেখেই জানজুয়া বললেন, 'জিয়া, ইউ গো ফার্স্ট, খালেক উইল ফলো ইউ। জিয়া উঠলেন। সঙ্গে দু'জন অবাঙালি অফিসার, সে. লে. হুমায়ুন আর সে. লে. আজম। আমি ওপাশে গেলাম। জিয়া বললেন, 'খালেকুজ্জামান, কিছু শুনলে জানিয়ো।'

গাড়ি চলে গেলো। জানজুয়া তার বাসা আলহামরা বিল্ডিংয়ে চলে গেলেন। মীর শওকত চলে গেলেন মেসে। ডিউটি অফিসার ক্যাপ্টেন অলি আহমদ চলে গেলো উপরে। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। তখন অলি উপর থেকে বললো, স্যার, আপনার একটা ফোন আসছে। আমি গেলাম । বাই দ্যাট টাইম অলি হ্যাজ টড। উনি ছিলেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অব স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক মি. কাদের (আবদুল কাদের)।

অলির সঙ্গে কী কথা হয়েছে জানি না। বললেন, 'ঢাকায় তো ইপিআরের ওখানে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেছে। আর্মি হ্যাজ রেইডেড ক্যাম্পস। তোমরা কী করছ?' আরও কিছু বললেন। আমাকে এক্সাইটেড করলেন। আমি অলিকে বললাম, তোমাকে কী বলেছে জানি না । ডিউটি করো ওখানে। কিপ আ ট্র্যাক অন দিস। আই অ্যাম গোয়িং টু গেট ব্যাক আওয়ার বস জিয়া।

পিক আপ এলো। আমি কয়েকজন গার্ড নিলাম। জিয়াকে দেওয়ানহাট ওভারব্রিজের সামনে পেলাম। রাস্তায় ব্যারিকেড ছিল। ওখানে আল্লাহর রহমতে ওইটা (ব্যারিকেড) ছিল। জিয়া, লাইক আ ড্যান্ডি ম্যান, স্মার্ট, হাতে ফিল্টার উইলস, দ্যাট ফেমাস উইলস। সিগারেট খাচ্ছেন। বললেন, ইয়েস খালেক, হোয়াট হ্যাপেনড? আই সেইড, ফায়ারিং হ্যাজ স্টার্টেড।

ইপিআর ক্যাম্প হ্যাজ বিন অ্যাটাকড... ব্লা ব্লা ব্লা। উনি তখন চিৎকার করে বললেন,

www.pathagar.com

- হোয়াট শ্যাল উই ডু?

- ইউ নো বেটার।

- ইন দ্যাট কেস, উই রিভোল্ট অ্যান্ড শো আওয়ার এলিজিয়েন্স টু দ্য গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ।

ইউনিট লাইনে ফিরে আসার পর ল্যান্স নায়েক শফির হাত থেকে রাইফেলটা হাতে নিয়ে বললেন, হুমায়ুন, আজম (জুনিয়র অবাঙালি অফিসার) কাম এলংগ। শফি, তোমার স্যারদের কোয়ার্টার গার্ডের ভেতর নিয়ে যাও।' দে অয়ার স্টার্ন্ট। কোয়ার্টার গার্ডের ভেতরে নিয়ে গেলো। জিয়া বললেন, 'খালেক, লেট মি গো অ্যান্ড গেট দিস বাস্টার্ড (জানজুয়া)।'

জিপে করে আলহামরা বিল্ডিংয়ে গেলেন। জানজুয়া কেইম আউট। জিয়া জানজুয়াকে বললেন :

খালেক অ্যান্ড অলি উড লাইক টু টক টু ইউ। ইউ কাম টু দ্য ইউনিট লাইন। দে আর ওয়েটিং ফর ইউ টু টক।

চলো, চলতা হু।

জানজুয়াকে গাড়িতে বসালেন। জিয়া গাড়ি চালালেন । পেছনে যে সিপাই ছিল, সে বন্দুক ধরে রেখেছিল, সো দ্যাট হি ডাজ নট রান অ্যাওয়ে । (ইউনিট লাইনে) নামার সঙ্গে সঙ্গে জিয়া এক আজব কাণ্ড করলেন। ওখানে শফি ছিল । তার হাত থেকে রাইফেলটা নিলেন, পয়েন্টেড দ্য ব্যারেল অ্যাট হিম। বললেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' জানজুয়া হতভম্ব হয়ে গেছে।

(জিয়া) বললেন, 'খালেক, টেক হিম। আমি জানজুয়াকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে গেলাম। বাই দ্যাট টাইম কোয়ার্টার গার্ডের মধ্যে সে, লে. আজম, সে. লে. হুমায়ুন, আহমেদ দ্বীন বলে একজন ক্যাপ্টেন, পাঞ্জাবি অফিসার। আজম, হুমায়ুন, আহমদ দ্বীন অয়ার টেকেন আপ। অ্যান্ড দে অয়ার এলিমিনেটেড ইন দ্য মেলু।

মেজর জিয়া সার্বিক পরিস্থিতি বলে সবার কাছ থেকে আনুগত্য চাইলেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে আছ'? সবাই এক আওয়াজে বলেছিল, আমরা আছি।'

জিয়া শওকতকে বলেছিলেন, একটি গাড়ি নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে মাইক দিয়ে বলে দাও যে আমরা, এইট বেঙ্গল হ্যাজ রিভোল্টেড ফর দ্য কজ অব বাংলাদেশ।'

www.pathagar.com

বিফিটিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলার জন্য। হি ডিড দ্যাট। জিয়া অফিসে বসে...হি ওয়াজ রিংগিং আপ-এমপি, ডেপুটি কমিশনার আর যাদের ফোন করে পায় নাই, অপারেটরকে বলেছেন, সবাইকে বলে দিন এইট বেঙ্গল রিভোল্ট করেছে বাংলাদেশের পক্ষে।'

তারপর আমরা ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে গেলাম। তখন রাত গড়িয়ে ভোর হয়ে গেছে। আমরা পটিয়া পর্যন্ত যাই। তখন কিছু কিছু অফিসার ডেপ্লয়েড হয়ে গেছেন। পটিয়া যেহেতু অলির জায়গা, তিনি সব কিছু চিনতেন। এতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। বন্দোবস্তটা উনি ভালোভাবেই করে রেখেছিলেন। সেখান থেকে আমাদের বলে দেওয়া হলো, পজিশন, কে কোথায় যাবেন। আমাকে বলা হলো রেডিও স্টেশনটা প্রটেকশন দেওয়ার জন্য, রেডিও স্টেশন থেকে কর্ণফুলীর পূর্বপার পর্যন্ত।"[৫৪০]

আমার অনুমান কর্ণেল অলি নিউক্লিয়াস অথবা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। কারণ জিয়াকে তিনিই বিদ্রোহ করতে উস্কে দিয়েছেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের আব্দুল কাদেরের বরাত দিয়ে। এরপর আরেকটি কথা বলে জিয়াকে নিয়ে চলে গেলেন কক্সবাজার। অলির কাছে তথ্য ছিল, বিদ্রোহ শুরু হলে কক্সবাজারে অবস্থানরত ৭ম নৌ-বহরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

মার্কিনীদের সহায়তা পাওয়ার জন্য অলি ও জিয়া একটি জিপ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। এখানেও অলি একজন আওয়ামী নেতা সরোয়ার আলমকে তাদের সাথে যুক্ত করে নেন যাতে জিয়া স্বাধীন সিদ্ধান্ত না নিতে পারেন। সরোয়ার আলম ছিলেন কক্সবাজারের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য।

এদিকে কর্নেল অলির সাথে যোগাযোগ রাখেন মাহমুদ নামের এক ভারতীয়। সম্ভবত মাহমুদ হোসেন তার ছদ্ম নাম। মাহমুদ পরিচয় দিতেন তিনি ভারতের বিজেপি নেতা মোরারজি দেশাই-এর ভাইজি জামাই। বাংলাদেশে তার আগমন লোকসংগীত কালেকশনে। এই পরিচয়ে তিনি চট্টগ্রামের বহু গণ্যমান্য মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাঙালিদের বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেলে তার রাজনৈতিক পরিচয় বের হয়ে আসে। তিনি কর্নেল অলির কাছ থেকে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে আগেই কক্সবাজার রওনা হন।

---

৫৪০. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা/ মহিউদ্দিন আহমদ / পৃষ্ঠা ৭৯-৮০

www.pathagar.com

মাহমুদ হোসেনিরই জিয়াকে মার্কিনীদের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। কক্সবাজার আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীরা মাহমুদ হোসেন ও তার সাথে সৈন্যদের পাক সেনা মনে করে পিটিয়ে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখে।[৫৪১]

মেজর জিয়া ও অলি আহমেদ কক্সবাজার গিয়ে যার বাসায় যাওয়ার কথা সেখানে গিয়ে কাউকে পাননি। মাহমুদের করুণ পরিণতি দেখে তারা অত্যন্ত মর্মাহত হন। এদিকে তারা খবর নিয়ে জানতে পারেন আশে পাশে বা কাছাকাছি কোথাও মার্কিন ৭ম নৌ-বহর নেই। ব্যর্থ মনোরথে তারা চট্টগ্রামের পটিয়ায় ফিরে এলেন।

এর মধ্যে চট্টগ্রামের আওয়ামী নেতাদের সাথে মিটিং হয় তার। অতঃপর ৩০মার্চ আবার কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে এসে আবারো স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এবার শেখ মুজিবের নামে ঘোষণা দেন। এভাবে তিনি চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেন।[৫৪২]

মেজর জিয়া বিদ্রোহ করার আগে চট্টগ্রামে ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম আগেই বিদ্রোহ করেন। ঢাকায় রাত ১০টা থেকে ইপিআরের বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের দায়িত্বমুক্ত ও নিরস্ত্র করে ব্যারাকে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ আসে। ইপিআর কন্ট্রোল রুম থেকে মেজর দেলোয়ার ও কুতুবউদ্দিন ওয়্যারলেসে বার্তা পাঠাতে থাকে তোমরা যে যেখানে আছো একশনে যাও।

'নিরস্ত্র করার সংবাদ' গুজব সৃষ্টিকারীদের মাধ্যমে হত্যা করার সংবাদে পরিণত হয়। সাড়ে দশটার পর আর মেজর দেলোয়ার আর কুতুবুদ্দিনের বার্তা পাওয়া যায়নি। অতএব তাদেরকেও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতে হলো। চট্টগ্রামে ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম ঢাকার বার্তা পেয়ে বিদ্রোহ শুরু করেন। এরপর তিনি তার অধীনস্থ অফিসার ও সৈনিকদের কাছে বার্তা পাঠান 'ব্রিং সাম উড ফর মি'। এতে তার অধীনে থাকা সব বাঙালি সেনা সদস্য বিদ্রোহ করে। এরপর তিনি অবাঙালি প্লাটুন কমান্ডার হায়াতকে এরেস্ট করেন।[৫৪৩][৫৪৪]

---

৫৪১. মহিউদ্দিন আহমেদের কাছে কর্নেল অলির সাক্ষাৎকার

৫৪২. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা/ মহিউদ্দিন আহমদ / পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

৫৪৩. ১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন / আমীন আহমেদ চৌধুরী/ পৃষ্ঠা ২১-২৮

৫৪৪. লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে/ মেজর রফিকুল ইসলাম/ পৃষ্ঠা ১২০

www.pathagar.com

সমশের মুবিন চৌধুরি বলেন, রফিকুল ইসলামের বার্তা পেয়ে কাপ্তাইতে দায়িত্বরত ইপিআরের ক্যাপ্টেন হারুন ৬৫ জন সেনা নিয়ে বিদ্রোহ করলেন এবং মেজর জিয়ার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ নিলেন। জিয়া তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। ২৯মার্চ সমশের ও হারুন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে চকবাজারে এক খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হলেন।[৫৪৫][৫৪৬]

গণহত্যা প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে দুই ধাপে গণহত্যা হয়। প্রথমত হয় মার্চে মূলত শহর এলাকায়। দ্বিতীয়ত হয় এপ্রিল ও মে মাসে শহরের বাইরে। শহর এলাকার হালিশহর, পাহাড়তলী, আগ্রাবাদ, বায়েজিদ, শেরশাহ কলোনী, ওয়্যারলেস রেলগেইট, কালুরঘাট ইত্যাদি স্থানে গণহত্যা হয়। ২৬মার্চ থেকে সেনাবাহিনী শহর দখলে নিতে থাকলে চট্টগ্রাম শহরে অবাঙালিদের নিরাপত্তা জোরদার হতে থাকে। কিন্তু ইতোমধ্যে সাড়া মার্চ জুড়ে হাজার হাজার বেসামরিক বিহারী খুন হতে থাকে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় কুতুবউদ্দিন আজিজের লেখা 'ব্লাড এন্ড টিয়ার্স' বইতে। এখানে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সারাদেশের বিহারী হত্যার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।[৫৪৭]

চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ধাপের অবাঙালি গণহত্যা শুরু হয় চট্টগ্রাম শহরের বাইরে। এই গণহত্যায় নেতৃত্ব দেন মেজর জিয়ার কাছে আনুগত্যের শপথ করা বিদ্রোহী বাঙালি সেনা সদস্যরা। এর মেয়াদকাল প্রায় দুই মাস। যতক্ষণ না পুরো দেশ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে না আসে। রাঙামাটির কাপ্তাইতে ইপিআর ক্যাপ্টেন হারুন তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে অবাঙালি ইপিআর সদস্য এবং তাদের পরিবারের ওপর গণহত্যা চালায়। ২৫মার্চের পরের দুই সপ্তাহ ছিল ভয়াবহ। যেখানেই অবাঙালিদের দেখা মিলছিল, সেখানেই তাদের ঘিরে ধরে হত্যা করা হচ্ছিল। ইপিআর ও পুলিশের কিছু লোক এই হত্যাকান্ড চালাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় কিছু লোক।[৫৪৮]

---

৫৪৫. মহিউদ্দিন আহমেদের কাছে সমশের মুবিনের সাক্ষাৎকার

৫৪৬. আওয়ামীলীগ : যুদ্ধদিনের কথা/ মহিউদ্দিন আহমদ / পৃষ্ঠা ৮৩

৫৪৭. ব্লাড এন্ড টিয়ার্স/ কুতুবুদ্দিন আজিজ/ পৃষ্ঠা ৩৫-৭৮

৫৪৮. বসন্ত ১৯৭১/ ফারুক আজিজ খান/ পৃষ্ঠা ৪৭

www.pathagar.com

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের একান্ত সচিব ফারুক আজিজ খান আরো বলেন, রাঙামাটি থেকে দিনে ও রাতে বাস বোঝাই করে ইপিআরের সদস্যদের সীমান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অবাঙালি ইপিআরের সদস্যরা ও তাদের পরিবার তাদেরই বাঙালি সহকর্মীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হতে থাকে। অনেককে হাত-পা বেঁধে খাদের পানিতে ফেলে দেওয়া হয় বলেও শুনতে পাই। রাতে যখন তারা বাস-ট্রাকে চেপে চট্টগ্রামে রওনা হতো, তখন যে আওয়াজ হতো, তা ছিল রীতিমতো লোমহর্ষক। অবাঙালিদের হত্যা করার পর আমাদের নৈতিক শক্তিও ফুরিয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেককেই আমরা ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম।[৫৪৯]

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা ও আশপাশের অবাঙালিরা প্রায় সবাই ইপিআরের লোকজন ও তাদের সহযোগীদের কব্জায় চলে আসে। এরপর থেকে নিয়মিতভাবেই অবাঙালিদের হত্যা করা হতো। সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনা ঘটে ২৬-৩০এপ্রিল, ১৯৭১। কর্নফুলী পেপার ও রেয়ন মিলস, চন্দ্রঘোনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকান্ড অনুষ্ঠিত হয়। মেয়েদের ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। উদ্ধার করার পর তারা অবর্ণনীয় ধর্ষণ ও বর্বরতার কাহিনী বর্ণনা করে। হতাহতের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। একই সাথে রাঙামাটি শহরেও মেজর জিয়ার কাছে আনুগত্যের শপথ নেওয়া বাঙালি সৈনিকেরা বেসামরিক অবাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়। সেখানে প্রায় ৫০০ অবাঙালি খুন হন।[৫৫০][৫৫১]

রাঙামাটির পাশাপাশি মেজর জিয়ার অধিনস্থ সৈনিকেরা এপ্রিল মাসেও শহরের কিছু কিছু স্থানে বেসামরিক নিরীহ মানুষ খুন করে। ১৯৭১ সালের মে মাসে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তারা ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টারে লিখেন "বন্দর নগরী চট্টগ্রামে একটি জুট মিলের বিনোদন ক্লাবে কাপড়ের স্তূপের ভেতর রক্তমাখা একটি পুতুল গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

এ ক্লাবে বাঙালিরা ১৮০ জন মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে। বাঙালিরা

---

৫৪৯. বসন্ত ১৯৭১/ ফারুক আজিজ খান/ পৃষ্ঠা ৫০

৫৫০. বসন্ত ১৯৭১/ ফারুক আজিজ খান/ পৃষ্ঠা ৫১

৫৫১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র / বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর/ পৃষ্ঠা ১৪৩

www.pathagar.com

দেশপ্রেমের উত্তেজনায় মত্ত হয়ে কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে হত্যা করে। বাঙালি বেসামরিক লোক ও মুক্তিফৌজ (জিয়ার সৈনিক) ভারতের বিহার রাজ্য থেকে আগত (ভারতীয় অভিবাসী) বিহারীদের গণহত্যায় লিপ্ত হয় এবং হাটবাজার ও বসতবাড়ি তছনছ করে, ছুরিকাঘাত, গুলিবর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ করে। কখনো কখনো ধর্ষণ ও লুটপাটেও লিপ্ত হয়।"

১৯৭১ সালের ১২মে আমেরিকান বার্তা সংস্থা এপি প্রেরিত একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টারে আরো বলা হয় "গতকাল গুরুত্বপূর্ণ এ বন্দর নগরী সফরকারী সাংবাদিকরা জানিয়েছেন যে, তারা ব্যাপক গোলা ও গুলিবর্ষণে ক্ষয়ক্ষতির এবং বিদ্রোহীদের হাতে ব্যাপক বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন।

প্রভাবশালী ইস্পাহানি পরিবারের মালিকানাধীন জুট মিলগুলোতে সাংবাদিকরা মিলের ক্লাবে গত মাসে (এপ্রিলে) বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের হাতে নিহত ১৫২ জন অবাঙালি মহিলা ও শিশুর গণকবর দেখতে পেয়েছেন। বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত এ ক্লাবের মেঝেতে এখনো রক্তমাখা জামা-কাপড় ও খেলনা পড়ে রয়েছে। দায়িত্বশীল সূত্রগুলো জানিয়েছে, ২৫মার্চ থেকে ১১এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানি ও ভারতীয় অভিবাসীদের (১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসতি স্থাপনকারী মুসলমান) হত্যা করা হয়েছে। অধিবাসীরা একটি ভস্মীভূত ডিপার্টমেন্ট ভবন দেখিয়ে বলেছে, সেখানে বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানের সাড়ে তিন শ' পাঠানকে হত্যা করেছে।"

এন্থনি মাসকারেনহাস এপ্রিলের সময়গুলোতে চট্টগ্রামে ছিলেন। তিনি লন্ডনের সানডে টাইমসের পূর্ব পাকিস্তান প্রতিনিধি। ১৯৭১ সালের ২মে সানডে টাইমসে এন্থনি মাসকারেনহাস প্রেরিত এক রিপোর্টে বলা হয়: "চট্টগ্রামে মিলিটারি একাডেমির কর্নেল কমান্ডিংকে হত্যা করা হয়। এ সময় তার আট মাসের অন্তঃসত্তা স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তলপেটে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়।

চট্টগ্রামের আরেকটি অংশে জীবন্ত অবস্থায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের একজন অফিসারের চামড়া ছিলে ফেলা হয়। তার দু'পুত্রের শিরচ্ছেদ করা হয়। তার স্ত্রীর তলপেটে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে তার উন্মুক্ত শরীরের ওপর পুত্রদের মাথা রেখে যাওয়া হয়। বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো বাঁশ দিয়ে জরায়ু বিদীর্ণ

www.pathagar.com

বহু যুবতী মেয়ের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম এবং খুলনা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানিরা সমবেত হয়েছিল।"[৫৫২]

মেজর জিয়া ও তার নেতৃত্বে ঘটে যাওয়া গণহত্যা ও গণধর্ষণের সবচেয়ে লোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলামের বর্ণনায়। তিনি তার স্মৃতিচারণে বলেন, তিনি এবং তার ছাত্রলীগের বন্ধুরা মেজর জিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রামগড় ক্যাম্পে ছিলেন। একদিন বাঙালি সেনা অফিসাররা জিয়ার নেতৃত্বে সীতাকুন্ডের হাফিজ জুটমিলে অভিযান চালায়। সেখানে নিরীহ সকল অবাঙালি পুরুষ শ্রমিকদের হত্যা করে। এরপর সেখানে থাকা নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিকদের স্ত্রী কন্যাদের রামগড় ক্যাম্পে নিয়ে আসেন এবং দিনের পর দিন তাদের নির্যাতন করেন। এরপর যখন দেশের সেনাবাহিনী রামগড় ক্যাম্প দখলে নিতে আসে তখন জিয়া বুঝতে পারেন তিনি সেনাবাহিনীর সাথে পেরে ওঠবেন না তাই তিনি দলবল নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যান। ভারতে যাওয়ার আগে বাঙালি সেনা অফিসাররা রামগড় ক্যাম্পে থাকা সকল অবাঙালি নারীদের হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে যান।[৫৫৩]

মেজর জিয়া কি গণহত্যায় জড়িত ছিলেন?

যে তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন হয়েছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় রামগড়, রাঙামাটি, কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা ও চট্টগ্রাম শহরে মেজর জিয়ার অনুগত বিদ্রোহী সেনারাই এই অবাঙালি গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখন মেজর জিয়ার সমর্থকেরা যারা তাকে ভালোবাসেন তারা বলতে পারেন জিয়া কি তাদের গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছেন? এর কী প্রমাণ আছে। আমি তাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই জিয়া কী গণহত্যাকারী তার অধীনস্থ সেনাদের শাস্তি দিয়েছেন? যদি না দিয়ে থাকেন তবে এই গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ মেজর জিয়ার প্রত্যক্ষ মদদেই হয়েছে। একজন সেনানায়ক হিসেবে জিয়া তার অধীনস্থদের সকল কৃতিত্ব বহন করতে বাধ্য। আর হাফিজ জুট মিলের ঘটনায় সকল বেসামরিক পুরুষকে হত্যা করা, নারীদের বন্দী করে ধর্ষণ করা ও পরবর্তীতে হত্যা করা মেজর জিয়ার খুনীও ধর্ষক চিত্র ফুটে ওঠে।

---

৫৫২ ব্লাড এন্ড টিয়ার্স/ কুতুবুদ্দিন আজিজ/ পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

৫৫৩ https://youtu.be/fOfaYa48_4I

www.pathagar.com

মেজর জিয়া কী খুনি চরিত্র লালন করতেন?

একজন সেনানায়ক যুদ্ধে কঠোর হবেন। তিনি শত্রুদের খুন করবেন এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সহকর্মীদের বিরুদ্ধে বিনা দোষে অস্ত্র উত্তোলন এবং নির্বিচার খুন জিয়ার চরিত্রে আছে এবং তিনি তা দেখিয়েছেন। খালেকুজ্জামানের বর্ণনা থেকে যা বুঝতে পারি তাতে তার সিনিয়র অফিসার জানজুয়া তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বন্দর নিয়ন্ত্রণে পাঠিয়েছে তা একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কারণ জানজুয়া প্রথমে খালেককে পাঠিয়েছেন। জিয়া এসে পড়ায় তিনি তাকে যেতে বলেছেন। তার মানে টার্গেট জিয়া ছিল না।

ক্যাপ্টেন খালেকের বর্ণনা অনুসারে অলি ঢাকার ব্যাপারে তথ্য দিয়েছেন। জিয়াকে খুন করার কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না। আর যেহেতু এই সংবাদ খালেক নিজেই জিয়াকে দিয়েছেন, তাই এখানে কোনো ভুল ম্যাসেজ ছিল না। খালেক তাকে শুধু ঢাকার ইপিআরের কথাই বলেছেন। তার মানে জিয়ার সাথে জানজুয়ার কোনো খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। একই সাথে জিয়ার অধীনে থাকা নবীন অবাঙালি অফিসাররা জিয়ার একনিষ্ঠ অনুগত ছিল। কিন্তু জিয়া তার অফিসার জানজুয়া, তার অবাঙালি সহকর্মী ও তার অনুগত অবাঙালি শিষ্যদের একত্র করে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাদের হত্যা করা হয়। এই ঘটনাই মেজর জিয়ার খুনী চরিত্রকে ফোকাস করে।

মেজর জিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শ কী ছিল?

মেজর জিয়ার রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। তিনি ভাসানী দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ সহচর মশিউর রহমান যাদু মিয়া বলেছেন, পাকিস্তান আমলে মেজর জিয়া মেজর কমল নামধারণ করে ভাসানীর সাথে গোপনে দেখা করতেন ও আলাপ আলোচনা করতেন।[৫৫৪]

এ থেকে বোঝা যায় একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রবল আগ্রহ জিয়ার ছিল নইলে এতো বড় রিস্ক তার মতো ঠাণ্ডা মাথার মানুষ নিতেন না। এরপর জিয়ার ক্ষমতার সময়ে ভাসানী কর্তৃক জিয়াকে একনিষ্ঠ সমর্থন দান ও তার রাজনৈতিক আদর্শকে ইঙ্গিত করে। ভাসানীর ইন্তেকালের পর মেজর জিয়া তার

---

৫৫৪. মাওলানা ভাসানী : রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রাম/ পৃষ্ঠা ২২

www.pathagar.com

দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে ব্যবহার করেই বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠন করেন। চীনপন্থী বাম ন্যাপের যাদু মিয়াকেই তিনি প্রথমে তার প্রধানমন্ত্রী করে নেন। বিএনপি'র বর্তমান অনেক নেতা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন জিয়া ভাসানীর আদর্শ লালন করতেন। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও তেমনটাই বলেছেন।[৫৫৫]

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাহ্ বুলু বলেছেন ভাসানীর আদর্শেই বিএনপি গঠিত হয়েছে।[৫৫৬] অতএব এটা অনুমান করা যায় মেজর জিয়াউর রহমান মওলানা ভাসানীর মতো পিকিংপন্থী বামাদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি ভাসানীর দলের প্রতীক নিজের দলের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তথাকথিত স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র

স্বাধীনতার পরপরই এদেশের ইসলামপন্থীদের ওপর ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসে। এটা অনুমিত ছিল। কারণ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ইস্যুতে সৃষ্টি হওয়া পাকিস্তানকে ভাঙতে দিতে চায়নি সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিম। যারা মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই পাকিস্তান বিভক্তির বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু মুজিব তাকে দেওয়া ম্যান্ডেটের মর্যাদা রাখতে পারেনি।

১৮ডিসেম্বর যুদ্ধাপরাধ শুরু করে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিশেষত কাদের সিদ্দিকীর অধীনে কাদেরিয়া বাহিনী ও জেনারেল ওবানের অধীনে মুজিব বাহিনী। ঢাকা ও তার আশপাশের মুসলিমলীগের নেতা-কর্মী, নেজামে ইসলামের নেতা-কর্মী, জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী, ন্যাপের নেতা-কর্মী, মসজিদগুলোর ইমাম মুয়াজ্জিন, কওমী মাদরাসার শিক্ষক ও সিনিয়র ছাত্রদের পল্টন ময়দানে জমায়েত করা হতো। তারপর তাদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হতো। এটা কোনো গোপন ঘটনা ছিল না। এটি ছিল খুবই প্রকাশ্য এবং দেশি-বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে চলে বেসামরিক নাগরিক হত্যা। এদের অপরাধ ছিল তারা পাকিস্তান ভেঙে যাক এটা চায়নি।[৫৫৭]

---

৫৫৫. ভাসানী রাজনীতি নির্মাণ করতেন: ফখরুল/ প্রথম আলো/ ২০/১১/২০১৬

৫৫৬. ভাসানীর আদর্শে গড়া দল বিএনপি: বরকতুল্লাহ বুলু/ বাংলা ট্রিবিউন/ ১৭/১১/২০২০

৫৫৭. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ৩১৫-৩১৭

www.pathagar.com

একই সাথে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সব ক্যান্টনমেন্ট দখলে নিয়ে সেখানের অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সম্পদ লুটপাট করে। এটাও ছিল যুদ্ধাপরাধ। বিরোধী মতের রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ঘর দখল ও লুটপাটের আয়োজন করে মুক্তিবাহিনী। এ সবই ছিল যুদ্ধাপরাধ। যে মুহাজিররা ১৯৪৭ সালে ভারতের বিহার থেকে নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলায় এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে মুক্তিবাহিনীর অত্যাচারে আবার ভারতে পাড়ি জমান। এ এক জিল্লতির জীবন ছিল। বিহারীরা ফিরে যেতে পারলেও এদেশের ইসলামপন্থীদের পালানোর জায়গা ছিল না বললেই চলে। সে সময়ের বেশ কয়েকজন ভিকটিমের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তারা নির্যাতনের মুখে তাদের নিজ জেলা থেকে পালিয়ে দূরের জেলায় পালিয়ে থেকেছে।

ইসলামের প্রতি আক্রোশ

শুধু যে ইসলামপন্থীরা আক্রান্ত হয়েছে তা নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা ইসলাম বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারা ইসলামের প্রতি আক্রোশ দেখিয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নামে ইসলাম ও মুসলিম ছিল সেগুলো থেকে তারা ইসলাম ও মুসলিম শব্দ বাদ দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম বাদ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো থেকে 'রাব্বি জিদনি ইলমা' ও কুরআনের চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়েছে। নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম বাদ দিয়েছে। পাবনার সেরা কলেজ ইসলামিয়া কলেজকে বুলবুল কলেজে পরিণত করা হয়েছে। এভাবে সারা বাংলাদেশে সব স্থান হতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কওমী মাদরাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের বোরকা নিষিদ্ধ করে শাড়ি পড়তে বাধ্য করা হয়েছে। এই কারণে বহু ছাত্রী একাত্তর পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে যায়নি।

সংবিধান প্রণয়ন করে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, নেজামী ইসলামী ও জামায়াতে ইসলামী এই দুইদলই ছিল সে সময় ইসলামী রাজনীতির ধারক ও বাহক। এদের নিষিদ্ধ করা হয় নাই যে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন। বরং তাদের এইজন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা ইসলামী রাজনীতি করেন। সে সময় মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

বিরোধীতাকারী ন্যাপ (মুজাফফর), মনি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় দল, কৃষক শ্রমিক পার্টি, পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি এবং কৃষক শ্রমিক সমাজবাদী দল, এই দলগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। সুতরাং এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের যারা কুশীলব তাদের মূল আক্রোশ ছিল ইসলামের সাথে। এই সাধারণ ব্যাপার সে সময়ের সকল ইসলামী রাজনীতিবিদ বুঝেছিলেন এবং তারা এজন্যই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন। সে সময়ের অনেক মুসলিম না বুঝে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল এটা তাদের ব্যর্থতা ও অদূরদর্শিতা ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করুন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এনেছে মুক্তিযোদ্ধারা। তারা রেডিও টেলিভিশনে বিসমিল্লাহ, সালাম দিয়ে শুরু করা বাদ দিয়ে সুপ্রভাত, শুভকামনা ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করেছে। রেডিওতে কুরআন তিলওয়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী একাডেমি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ইসলামী একাডেমীকেই তিনবছর পরে ইসলামী ফাউন্ডেশন নামে চালু করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুনরায় রেডিও টেলিভিশনে সালাম, বিসমিল্লাহ, আযান ও কুরআন তেলওয়াত শুরু হয়েছিল।

এইসব কাজ শেখ মুজিব তার নিজস্ব পরিকল্পনাতে করেছেন এটা আমি বলতে চাই না। মুজিব পরিবেষ্টিত ছিলেন তাজউদ্দিনদের মতো এক ঝাঁক কমিউনিস্ট দ্বারা। তার ফলে মুজিবের শাসনামলের শুরুর দিকে সমস্ত ইসলাম বিরোধী কাজের জোয়ার শুরু হয়েছিল। সংবিধান থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বাদ পড়েছে। মূলনীতি থেকে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস বাদ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কমিউনিজম, সেক্যুলারিজমের মতো ইসলাম ও ধর্ম বিদ্বেষী মতবাদকে। ক্ষমতায় থেকে ইসলামপন্থা দমনে সব কাজ করেছেন শেখ মুজিব। যখন জাসদ গঠিত হয় এবং বামপন্থীদের সাথে সরকারের চরম বিরোধ শুরু হয়, তখন মুজিব কোনঠাসা হয়ে থাকা ইসলামপন্থীদের কাছে টানতে থাকেন তার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য। তবে অবশ্যই তিনি ইসলামী রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি শুধুমাত্র অরাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দিয়েছেন। তাবলীগের প্রসার করার চেষ্টা করেছেন। কওমীদের শুধুমাত্র মাদরাসার গণ্ডির মধ্যে থেকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

জাতীয়করণ

কমিউনিজমের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে একের পর এক শিল্প কারখানা জাতীয়করণ করেন মুজিব। তবে কোনো বাঙালির কারখানা জাতীয়করণের আওতায় আসেনি। ১৯৪৭ এর পর বাঙালি রাজনীতিবিদেরা সব সময় মুসলিম বিশ্বের ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানাতেন এদেশে ব্যবসা করার জন্য, শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাতে সাড়া দেয় অনেক অবাঙালি কোম্পানী। এরা বেশির ভাগ ভারত ও মিয়ানমারের। এর মধ্যে বড় ব্যবসায়ি গোষ্ঠী ছিল আদমজি, বাওয়ানী ও ইস্পাহানী পরিবার। এর বাইরেও বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা এদেশে এসেছিলেন। বাংলা ও বাঙালির উন্নয়নে এসব উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনেক অবদান ছিল। কিন্তু শেখ মুজিব জাতীয়করণের নামে এসব অবাঙালি ব্যবসায়ীদের সমস্ত সম্পদ ও কারখানা দখল করে নেয়। যারা এতদিন এদেশের নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের উন্নয়নে ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রেখেছিল, শেখ মুজিব তাদের রিক্ত হস্তে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। তবে দুঃখজনক হলো, এসব শিল্প কারখানা থেকে বাংলাদেশ কখনোই লাভবান হতে পারেনি। সরকার বছর বছর কেবল এগুলোতে ভর্তুকি দিয়েই আসছে।[৫৫৮][৫৫৯]

লুটপাট

যুদ্ধপরবর্তী মানুষের পুনর্বাসন একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মুজিব সরকারের জন্য। সেজন্য মুজিব জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশাল ত্রাণ সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু আওয়ামীলীগের লুটেরা গোষ্ঠীর লুটপাটে এই ত্রাণ থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের এতো উর্ধ্বগতি হয়েছিল যে, লবণের কেজি ৯০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। অথচ যুদ্ধের সময়ও ১ মণ চাউলের দাম ছিল ১৫-২০ টাকা। মুজিবের আমলে চাউলের কেজি ১০০-১৬০ টাকা, মশুর ডাল ১২০-১৫০ ও সয়াবিন ৫৯০ টাকা পর্যন্ত

---

৫৫৮. ক্ষতির দায় বিজেএমসির ওপর চাপালেন পাটমন্ত্রী / বিডি নিউজ ২৪ / ৩ জুলাই ২০২০ / অ্যাকসেস ইন ১২ মার্চ ২০২১

৫৫৯. পাটশিল্পসহ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত রক্ষা গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গীকার / দ্যা ডেইলি স্টার / ২৪ জানুয়ারী ২০২১/ https://bit.ly/3l7fSzO / অ্যাকসেস ইন ১২ মার্চ ২০২১

www.pathagar.com

দাম উঠেছে। এর বড় কারণ ছিল মুক্তিযোদ্ধারা আমদানিকৃত দ্রব্য আটকে দাম বাড়াতো, একই সাথে এ দেশীয় কৃষকের ক্ষেতের ফসলও তারা লুটপাট করে নিজেদের দখলে নিয়ে নিয়েছে। ১৯৭০ সালে 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' বলে মিথ্যা প্রচারণাকারীরা টের পেলো সোনার বাংলা কীভাবে মুজিবের হাতে শ্মশান হয়![৫৬০]

রক্ষীবাহিনী

মুজিব তার একান্ত অনুগত একটি বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এটা অনেকটা জার্মানীর গেস্টাপো বাহিনীর মতো ছিল। সবচেয়ে বেশি যুদ্ধাপরাধ করা কাদেরিয়া ও মুজিব বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে এই বাহিনী গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে মুজিব তার সমস্ত পরিকল্পনা মুহূর্তেই বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। একই সাথে বিরোধী মত দমনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে রক্ষীবাহিনী। মূলত পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন আদর্শের লোক থাকায় সেসব বাহিনীর ওপর মুজিব ভরসা করতে পারেননি। শুরুর দিকে রক্ষীবাহিনী বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চোরাচালানের মালামাল উদ্ধার করে এবং মজুতদার ও কালোবাজারীদের কার্যকলাপ কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খুব দ্রুতই বাহিনীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে থাকে। এই বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, গুম, গোলাগুলি, লুটপাট এবং ধর্ষণের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। ঝটিকা বাহিনীর মতো রক্ষীবাহিনী প্রায়ই একেকটি গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং অস্ত্র ও দুষ্কৃতিকারীদের খুঁজতো।

তাদের নিয়ন্ত্রণ করার এবং তাদের কার্যকলাপের জবাবদিহিতার আইনগত কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য গ্রেফতারকৃত লোকদের প্রতি নৃশংস অত্যাচারের অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে ওঠে। তাদের বিরুদ্ধে লুটপাট এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগও ছিল। তাদের কার্যকলাপের সমালোচনা যখন তুঙ্গে ওঠে এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, তখন ১৯৭৩ সালের ১৮অক্টোবর সরকার জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী)

---

৫৬০. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল / মওদুদ আহমেদ / পৃ. ২০১-২০২

www.pathagar.com

অধ্যাদেশ-১৯৭৩ জারি করে রক্ষীবাহিনীর সকল কার্যকলাপ আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করে। রক্ষীবাহিনীর কোনো সদস্য সরল বিশ্বাসে কোনো কাজ করলে অথবা সৎ উদ্দেশ্যে উক্ত কাজ করে থাকলে অনুরূপ কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়।

এর মাধ্যমে এই বাহিনীকে বিরুদ্ধ মত ও জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন শেখ মুজিব। রক্ষিবাহিনীর সাথে সরাসরি বিরোধ তৈরি হয় সেনাবাহিনীর। এই দুই বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই গোলাগুলি হতো। জনগণের ওপর অত্যাচারের কারণে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে সারাদেশে ঘৃণা তৈরি হয়।[৫৬১][৫৬২]

লালবাহিনী

রক্ষীবাহিনী যেভাবে সরকারের ঘোষিত বাহিনী ছিল, লালবাহিনী সেভাবে সরকারি বাহিনী ছিল না। আওয়ামীলীগের মধ্যে বামপন্থীরা বেশ সক্রিয়ভাবে ছিল। বামদের বড় অংশ ছিল শ্রমিকদের মধ্যে। যখন আওয়ামীলীগের মধ্যে থাকা বামপন্থীরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে আলাদা হয়ে যায়। তখন বাকীরা আওয়ামী শ্রমিকলীগ নাম ধারণ করে। যেহেতু জাসদের বড় অংশ ছিল শ্রমিক তাই শেখ মুজিব জাসদকে কন্ট্রোল করার জন্য শ্রমিকলীগকেই বেছে নিয়েছেন।

আবদুল মান্নান, যিনি বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিকলীগের প্রধান ছিলেন, তার নেতৃত্বেই লালবাহিনী গঠন করা হয়। এটি ছিল একটি সশস্ত্রবাহিনী। এটিও সরকারের আজ্ঞাবহ, তবে সরকার এর দায়দায়িত্ব নিতো না। তাদের মূল কাজ ছিল বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করা। শ্রমিকদের মধ্যে জাসদের কার্যক্রম বন্ধ করাও ছিল লালবাহিনীর কাজ। ১৯৭২ সালের মার্চ থেকে অবাঙালিদের কারখানাগুলিকে জাতীয়করণের নীতি ঘোষণার পরে লাল বাহিনী তাদের 'বিরোধী দল' হিসেবে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্মূল করার জন্য শুদ্ধি অভিযান শুরু করে। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে লালবাহিনীর শুদ্ধি অভিযানের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান

---

৫৬১. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৮৫- ১৮৮

৫৬২. দেয়াল / হুমায়ুন আহমেদ / পৃ. ৯৪ ও ১০৭

www.pathagar.com

তথাকথিত শোষণকারীদের শেষ করতে তার ‘লাল ঘোড়া’ মোতায়েনের হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি বহু ভাষণে লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেওয়া হবে হুমকি দিতেন। লালবাহিনীর প্রধান আবদুল মান্নানকে এমনও বলতে শোনা গেছে যে, "নতুন ফ্রন্ট (জাসদের শ্রমিক ফ্রন্ট) যদি মুজিববাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে তবে আমি তাদের জিহ্বা কেটে দেব"।[৫৬৩]

লালবাহিনীর গণহত্যা

লালবাহিনীর প্রথম নৃশংসতা করেছিল মংলা বন্দরে। সেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কুলি হিসেবে কাজ করতো। ধারণা করা হয়েছিল যে বামপন্থী শ্রমিক মোর্চা ও বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিকলীগের মধ্যে কুলিদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব থেকেই এই গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। সরকারের আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসারে দাঙ্গার ফলে প্রায় ৩৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। তবে প্রকৃত মৃত্যুর হার সরকার কর্তৃক বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। দাঙ্গা চলাকালীন বাংলাদেশে থাকা বিশিষ্ট সাংবাদিক মাসকারেনহাসের মতে, সেদিন প্রায় ২, ০০০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল এবং তারা সবাই বামপন্থী শ্রমিক ছিল। এই ঘটনা স্বাধীনতার কিছু দিন পর ১৯৭২ সালের মার্চে সংঘটিত হয়।

আরেকটি ভয়াবহ ঘটনা ছিল ৫এপ্রিল। টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কর্মীদের ওপর লালবাহিনীর লোকেরা হামলা করে। এই হামলার লক্ষ্য ছিল টঙ্গীর ন্যাপ (ভাসানী) সমর্থিত ফেডারেশন কর্মীদের প্রভাব শেষ করা। ঐ সময় বাংলাদেশের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে এটি বৃহত্তম ছিল। লালবাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডারদের হামলায় হাজার হাজার শ্রমিক নির্যাতিত ও সহিংসতার শিকার হয়। ন্যাপের দাবী অনুসারে সেখানে শতাধিক শ্রমিক খুন হয়।

কালুরঘাট শিল্পাঞ্চলে এবং চট্টগ্রামের আরআর জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল মিলের দাঙ্গার জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী ছিল এই লালবাহিনী। এই দাঙ্গার পেছনের প্রধান কারণ ছিল ‘স্থানীয় ও অ-স্থানীয় সমস্যা’ এবং ‘জেলাবাদ’ যা লালবাহিনী সদস্যরা প্রবর্তন করেছিল এবং এটি শ্রমিকদের পার্থক্য করতে ব্যবহৃত হতো।

---

৫৬৩. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৮৮- ১৮৯

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম যেহেতু একটি বন্দর নগরী ছিল, তাই অন্যান্য জেলা থেকে কাজের সন্ধানে অনেক শ্রমিককে চট্টগ্রাম আসতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালের মে মাসে লালবাহিনী সদস্যরা স্থানীয়-অস্থানীয় সমস্যাটি ব্যবহার করে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছিল। যেভাবে আগে তারা বামপন্থী ইস্যুতে শুদ্ধি অভিযান করেছিল। এই হামলায় চট্টগ্রামে কাজ করতে আসা শত শত শ্রমিককে খুন করে লালবাহিনী। আরো বেশ কয়েকটি দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছিল এবং খুনোখুনি ছিল নিয়মিত ঘটনা। এতে মিলগুলির উৎপাদন ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেয়েছিল। লালবাহিনীর দৌরাত্মে কারখানাগুলো দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়েছিল। কারখানাগুলোর শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। লালবাহিনীর অশিক্ষিত শ্রমিকরাই তাদের ইচ্ছেমতো কারাখানা পরিচালনা করতে লাগলো। এরপর সরকার একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও সক্ষম হয়নি। [৫৬৪]

ভারতের আজ্ঞাবহ

শেখ মুজিব সরকার ভারতের আজ্ঞাবহ সরকারে পরিণত হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতো না। পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিটা সিদ্ধান্তের জন্য ভারতের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে মুজিবকে। শেখ মুজিব তার ক্ষমতার শেষদিকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা চালিয়েছেন। তদুপরি সে যখন দেখলো, সে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে, দুর্ভিক্ষ ছাড়ছেই না। জনগণ বেকার হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রের ইনকাম সোর্স বন্ধ হয়ে গেছে, তখন শেখ মুজিব তার নীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন। তিনি তার বন্ধু রাষ্ট্র রাশিয়া, কিউবা, ভারত, ইংল্যান্ড থেকে সরে এসে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে বন্ধুত্বের অনুরোধ নিয়ে ছোটাছুটি করলেন। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর শুভদৃষ্টি পেতে চাইলেন। ৭৪-এ আলজেরিয়াকে মিডিয়া বানিয়ে কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার শর্তে বাংলাদেশ ওআইসির স্বীকৃতি লাভ করে। এর পরপরই তিনি পাকিস্তানে ওআইসি'র সম্মেলনে যোগ দেন। এই ঘটনায় ভারতের সাথে শেখ মুজিবের দূরত্ব তৈরি হয়।

---

৫৬৪. Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman / Moudud Ahmed / UPL / P. 147-149

www.pathagar.com

বাকশাল

শেখ মুজিব তার ক্ষমতার একেবারে শেষদিকে এসে মাও সেতুং-এর মতো করে একদলীয় শাসন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশে শুধু একটি দল থাকবে তার নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল)। ১৯৭৫ সালের ২৪জানুয়ারী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুসারে বহুদলীয় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সমগ্র রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামক এই একক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। বাকশাল ব্যবস্থায় দলের চেয়ারম্যানই সর্বক্ষমতার অধিকারী। চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে গঠনতন্ত্রের যে কোনো ধারা পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করতে পারবেন এবং একমাত্র চেয়ারম্যানই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করতে পারবেন।

বাকশাল ব্যবস্থার অধীনে কোনো নির্দলীয় শ্রেণী ও পেশাভিত্তিক সংগঠন এবং গণসংগঠন করার কোনো অধিকার নেই। ট্রেড ইউনিয়ন মাত্রই তাকে বাকশালের অঙ্গদল শ্রমিকলীগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই ব্যবস্থায় জাতীয় শ্রমিকলীগ, জাতীয় কৃষকলীগ, জাতীয় মহিলালীগ, জাতীয় যুবলীগ এবং জাতীয় ছাত্রলীগ বাদে কোনো শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, যুব ও ছাত্র সংগঠন থাকতে পারবে না। আর উপরিউক্ত সংগঠনগুলি হচ্ছে বাকশালেরই অঙ্গ সংগঠন। বাকশাল আইনের অধীনে ১৯৭৫ সালের ৬জুন দেশে চারটি দৈনিক ছাড়া আর সকল সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়। ঐ চারটি ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার।[৫৬৫]

---

৫৬৫. বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ : বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ / এম আই হোসেন / ইস্টার্ন পাবলিকেশন্স / পৃ. ১৮৯-১৯০

www.pathagar.com

পাঠকের পাতা

www.pathagar.com

বই পরিচিতি

একটি জাতি যদি তাদের ইতিহাস না জানে তবে সে জাতির মেধায়, মননে জাতিগতভাবে হীনমন্যতা তৈরি হয়। দীর্ঘদিন শোষিত হওয়ার ফলে এবং শোষক ও তার অনুচরদের রচিত বিকৃত ইতিহাসের কবলে পড়ে এই জাতি তাদের শেকড় সম্পর্কে বেখবর হয়ে পড়েছে।

বাংলার ইতিহাস মানে হলো তাওহিদবাদী ও মুশরিকদের চিরন্তন লড়াই। বাংলা ভাষা ও সভ্যতা তৈরি হয়েছে তাওহীদবাদীদের হাতে। আর এই জাতি মুশরিকদের আক্রমণের শিকার হয়েছে বার বার। মুশরিকরা কখনো সাঁড়াশি আক্রমণ করে, কখনো বন্ধুর বেশ ধরে এই জাতির অস্তিত্ব বিনাশে ভূমিকা রেখেছে। বাঙালি জাতি তাদের স্বকীয়তা বজায় রেখে আল্লাহর আনুগত্যে অটুট থেকেছে। তাই বহু বিচ্যুতির পরও বাংলায় তাওহীদবাদীদের এক অপূর্ব সম্মিলন তৈরি হয়েছে।

মুসলিম জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি বড় জাতি হলো বাঙালি জাতি। এই জাতির সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ জরুরি। এ জাতির ওপর মুশরিকদের সশস্ত্র হামলার সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক হামলাও হয়েছে ব্যাপক। এর অংশ হিসেবে প্রকৃত ইতিহাস বিকৃতির কবলে পড়েছে। ফলে বিকৃত ইতিহাস দিয়ে সন্ত্রাসীকে বানানো হয়েছে মহামানব আর মহামানবদের বানানো হয়েছে সন্ত্রাসী কিংবা অনগ্রসর গোষ্ঠী।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আহমেদ আফগানী।

তরুণ প্রকৌশলী ও গবেষক। জন্মেছেন নোয়াখালীতে। বাড়ি কুমিল্লায়। লেখালেখি করেন ছাত্রজীবন থেকেই। বিভিন্ন ব্লগ ও অনলাইন প্লাটফর্মে লেখালেখির হাতেখড়ি।

তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগে (EEE) পড়াশোনা করেছেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে। পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্রজীবন থেকে ডানধারার রাজনীতির সাথে যুক্ত আছেন।

বর্তমানে তিনি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। পেশাগত কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন ও মানবাধিকার বিষয়ক কাজে যুক্ত রয়েছেন।

গবেষণার ব্যাপারে ইসলাম ও ইতিহাসে তার আগ্রহ বেশি। "বঙ্গকথা" একটি ইতিহাসভিত্তিক বই। এখানে বাংলার দীর্ঘ ইতিহাস সংকলন করা হয়েছে। এটি লেখকের প্রথম বই।

ব্যক্তিগত জীবনে আহমেদ আফগানী বিবাহিত ও দুই সন্তানের জনক।

www.pathagar.com

BONGO KOTHA

Published by:

Ikri bikri Prokashoni

Brunton Road, Birmingham,
United Kingdom, B10 9HY

ISBN: 978---984-9-623-7

9 789849 623755

www.pathagar.com